আশাপূর্ণা দেবী রচনা সংগ্রহ

আশাপূর্ণা রচনা সংগ্রহ

আশাপূর্ণা দেবী
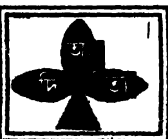
আদিত্য পাবলিশার্স
২৮/১, জাস্টিস মন্মথ মুখার্জী রো,
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
আগষ্ট, ১৩৬৭

প্রকাশক ঃ
হরিপদ বিশ্বাস
বি. বি. বুক কনসার্ন
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

বর্ণস্থাপন ঃ
কুশধ্বজ মান্না
মান্না প্রিণ্টার্স
৬৭/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৬

মুদ্রাকর ঃ
নবলোক প্রেস
৩২/২, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৬

আশাপূর্ণা রচনা সংগ্রহ

♦ সূচীপত্র ♦

হারানো খ[illegible]

ভালোবাসাটার সৃষ্টি হয়েছিল বড় আকস্মিকভাবে। প্রায় গল্প উপন্যাসের নায়ক নায়িকার মতো। আর সেটা যে সেকেলে লেখকেব কোন উপন্যাস। রেল গাড়িতে যেতে যেতে প্রেম সঞ্চার, একালে আবার কে লিখতে।

কিন্তু যার যা ভাগ্য।

ভবভূতি আর মালবিকা, এই দুই বেচারীর ভাগ্যে ওই 'সেকেলে' ব্যাপারটাই লেখা ছিল। অথচ দু'জনেই এই কলকাতা শহরের বাসিন্দা! কলকাতার এই লক্ষ লক্ষ মানুষের ভীড়েব মধ্যে কে কোথায় মিশে গিয়ে হারিয়ে থেকেছিল, কে জানে!

এর আগে হয়তো বা দু'জনে অনেকবার একই রাস্তা দিয়ে হেঁটেছে, একই ট্রামে বাসে চেপেছে, একই দোকানে ঢুকে দরাদবি করেছে, কেউ কাউকে তাকিয়ে দেখেনি, কেউ কাবো চোখে চোখ ফেলেনি।

ফেলেনি, মানে পড়েনি।

আবার এও হতে পারে, চোখে চোখ পড়েছে, দু'জনে দু'জনকে দেখেওছে, কিন্তু সে দেখা চোখের অন্তরালে কোন ছাপ ফেলতে পারেনি। চলন্ত গাড়ি থেকে পাশের গাছপালা দেখার মত চোখের ওপর দিয়ে ভেসে গেছে। চোখে পড়ল সেদিনের সেই রেল যাত্রায়।

ছাপ পড়ে গেল মুহূর্তে।

কারণের মধ্যে দু'জনের গন্তব্যস্থল ছিল একই!

অবশ্য ওটাকে 'কারণ' দেখালে সেটা প্রায় হাসির মতই। একই গন্তব্যস্থলের যাত্রীরা তো সাধারণত একই রেলগাড়িতে ওঠে। কেউ হয়তো মাঝখানে নেমে যায়, শেষ পর্যন্ত অনেকেই থেকে যায়।

কারণটা হচ্ছে ওবা যে শহরটায় (যদি তাকে শহরই বলা যায়) গিয়ে নামবে, সেটা এখন প্রায় পরিত্যক্ত শহর। অন্ততঃ বেড়াতে বিশেষ কেউ যায় না।

নামটা উহ্য থাক, শুধু এইটুকুই বলবো, অথচ সাঁওতাল পরগণার এই ছোট শহরটি একদা শুধু যে চেঞ্জে বেড়াতে আসারই জায়গা ছিল তা নয়, অ্যারিস্টোক্রাটদেরই একচেটে ছিল।

এখানে ছবির মত সুন্দর সুন্দর যে কটেজগুলি ছিল, তাদের নামগুলিও ছিল শ্রুতিসুখকর, কাব্যসুষমামণ্ডিত, কিংবা অভিধান মন্থন করা দুর্বোধ্য।

এই বাংলোগুলির বা কটেজগুলির বেশিরভাগই ছিল দেশের যতো গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের। যেমন কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী এদের বিশ্রাম নিবাস।

যিনি যেমন পেরেছিলেন, তেমন তেমনই একখানা বাড়ি বানিয়ে রেখেছিলেন, ছুটি হলেই ছুটে ছুটে চলে আসতেন এই অভিজাতদের একচেটিয়া ভূমিতে। আর শুধু যে তাঁরাই, মানে ওই গৃহবানেরাই আসতেন তা নয়, তাদের সাদর আমন্ত্রণে তাঁদের বন্ধুজনেরাও আসতেন। বিদগ্ধ জনেদের সাহচর্য আর কে জোগাতে পাববে বিদগ্ধ জনেরা ছাড়া?

বলতে গেলে—

সাঁওতাল পরগণার এই ছোট শহরটিই ছিল তখন বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। অথবা প্রাণের কেন্দ্র।

যাঁরা আসতেন, যাঁরা যাঁরা এখানে এসেছেন, তাঁরাই ছিলেন তখনকার দিনে সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। এই সংস্কৃতিবানেরা কোন না কোন সূত্রে এককে সময় এখানে এসে ঘুরে গেছেন।

এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতুলনীয়।

ভীষণে মধুরে নয়, মধুরে সুন্দরে এখানকার এক ঝর্ণাধারা ভূগোল বিখ্যাত, এখানকার খনিজ সম্পদও উল্লেখযোগ্য। মোটের ওপর এক ডাকে চিনতে পারার নাম ছিল।

অতএব কী মহিলা, কী পুরুষ, যদি নিজেকে সংস্কৃতবানেদের মধ্যে একজন ভাবতে ইচ্ছুক হতেন, তবে তাঁরা একবারও অন্ততঃ এই শহরে বেড়িয়ে যেতেন, আর সঙ্গতি থাকলে বাংলো বানাতেন। কটেজ বানাতেন।

কিন্তু কালক্রমে যা হয়। কালক্রমে পরমা সুন্দরীর যৌবন ঝরে, পরম বীর্যবানের বার্ধক্য আসে, জরা ধরে।

'উদয়-অস্ত' শব্দটা শুধু সূর্যের বেলায় একচেটে নয়, উদয়-অস্ত ঘটে চলেছে সব কিছুরই। ব্যক্তি জীবনের উদয়-অস্ত আছে, সমাজ জীবনের আছে, রাষ্ট্রের আছে, জাতির আছে, নদীর আছে, শহরের আছে।

কালক্রমে তারা আপন আপন কেন্দ্রে উদিত হচ্ছে ও অস্তমিত হচ্ছে। ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করছে। তা নিয়মগত যাই থাক—

সাঁওতাল পরগণার এই ছোট্ট শহরটি পরিত্যক্ত হবার দৃশ্যগত একটা কারণ এই, মানুষের ক্রমশঃ আর 'অল্পে সুখী' নেই। অল্পে সুখী হওয়াটাকে মানুষ দৈন্য মনে করতে শিখেছে। অতএব মাত্র কয়েক মাইল পথ অতিক্রম করে চেঞ্জে

যাওয়াটাকে অবজ্ঞার চোখে দেখা ফ্যাশান হয়ে গেল। দূরের পথ পাড়ি দিতে না পারলে মান মর্যাদা কোথায়?

একদা যে কাশী যাওয়াকে লোকে পশ্চিম যাওয়া বলতো, এ কথা শুনলে এ যুগে গায়ে ধুলো ছুঁড়ে মারে।

অতএব বিত্তমান সংস্কৃতিবানেরা তাঁদের স্বগে যাত্রা করতে শুরু করলেন আকাশে উড়ে, সাগরে ভেসে। অনেক সমারোহময় ঠাঁই বিস্মৃতির অন্ধকারে মুখ থুবড়ে পড়ে রইলো!

ওবা যেখানে যাচ্ছিল, সাঁওতাল পরগণার সেই একদা কুসুমিত, আব এখন জঙ্গল হয়ে যাওয়া ছোট শহরটিও তেমনিই পডে আছে।

ছবির মত কটেজগুলির যৌবন-হারা রূপসীর মতো চুল ঝরেছে, দাঁত পড়েছে, চামড়া ঝুলে পড়ে শিরাবহুল শীর্ণ শরীরটা কুঁজো হয়ে গুমড়ি খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অথবা পড়ে পড়ে ধুলিসাৎ হচ্ছে। নিতান্ত যারা চির বাসিন্দা, অথবা কার্যকাবণে আসতে হয়েছে, তারা আছে এদিকে ওদিকে ছিটিয়ে।

ওদের গাছে জল পড়ে, ওদের বারান্দায় কাপড় শুকোয়, ওদের রান্নাঘরে উনুন জ্বলে।

এমনি একটা বাড়ির উদ্দেশেই মালবিকার যাত্রা, কিন্তু ভবভূতির? না, তার জন্যে কোনখানে কেউ রান্না করে রেখে ট্রেনের সময় দেখবে না।

প্রথমটা যখন গাড়িতে উঠেছিল ওরা, তখন কেউ কাউকে গ্রাহ্য করেনি। শুধু ভবভূতি দেখেছে মেয়েটা আধুনিক হলেও অতি আধুনিক নয়। মাথার উপর দু'ফুট উঁচু চূড়ো নেই, চোখের কোণে ডানামেলা পাখির গড়নের কাজল নেই, নখের আগায় আ.রো খানিকটা বাড়তি বর্ণাঢ্য নখ নেই।......তাছাড়া মেয়েটার ব্লাউজের হাতা আছে, শাড়িতে শাঁস আছে এবং সবটা মিলিয়ে একটি ভব্য ছন্দ আছে।

মেয়েটা দেখতে বেশ, তবে বয়স বোঝা যাচ্ছে না।

দেখে ভেবেছিল ভবভুতি।

আর মালবিকা?

মালবিকা দেখেছিল, ছেলেটা একটু অধিক পরিমাণে স্মার্ট। ওর টেরিকট ট্রাউজার, টেরিলিন বুশশার্ট, শৌখিন ধাঁচের জুতো, আরো শৌখিন চওড়া ব্যাণ্ডের রিস্টওয়াচ, এসবই ওর ওই স্মার্টনেসের সহায়ক। আরো সহায়ক, পাতলা লম্বা দীর্ঘ শরীরটা।

মালবিকা ভাবলো, ছেলেটা দেখতে বেশ, তবে নিজেকে একটু জাহির করা ভাব আছে।

বয়সটা কতো কে জানে। ত্রিশের কিছু ওপরই হবে হয়তো।

তারপর আর কী?

যে যার জানলার ধারে একখানা বই খুলে বসলো।

গাড়ীতে যে আর যাত্রী ছিল না এমন মনে করবার হেতু ছিল না, কিন্তু ঠিক ওদের ধরনের কেউ ছিল না।

অনেকক্ষণ পর মালবিকা ওয়াটার বট্‌ল খুলে জল খেলো।

ভবভূতি তাকিয়ে দেখলো।

ওর জল খাওয়া হয়ে গেলে বলে উঠলো, 'সামনের স্টেশনে আপনার ওয়াটার বট্‌লটা ভরে এনে দেব!'

মালবিকা ফিরে তাকালো, চোখ কুঁচকে বললো, 'কি বলছেন?'

'বলছি সামনের কোন ভাল স্টেশনে আপনার বট্‌লটা ভরে এনে দেব।'

মালবিকার বুঝতে দেরী হল না এ হচ্ছে আলাপ করার নতুন এক অভিনব চাল। মালবিকা ভাবলো, যা ভেবেছি তাই, একটু মস্তান মার্কা। এই বয়সে এটা মানায় না। মনে মনে একটু শক্ত হলো সে।

মুখেও বিশেষ নরম রইলো না, বেশ তীক্ষ্ণ গলাতেই প্রশ্ন করলো, 'তার মানে?'

ভবভূতি হাতটা প্রায় বাড়িয়ে ধরে বললো, 'তার মানে আপনার সঞ্চিত জলটা আমি খাবো।'

শক্ত হয়ে ওঠা মালবিকার হঠাৎ ভারী হাসি পেয়ে গেল। চেষ্টা করে হাসি চাপলেও হাসিটা মুখের রেখায় রেখায় ছড়িয়ে পড়ে ধরা পড়িয়ে দিল। তবু মালবিকা গম্ভীর গলায় বললো, 'তা সেটা বলাই কি বেশি সহজ ছিল না?' জলটা দিয়ে দিল ওর হাতে।

ভবভূতি ওটার ছিপি খুলতে খুলতে মৃদু হেসে উত্তর দিল, 'মোটেই না। কোনো ভদ্র ব্যক্তি সহজে এমন কথা বলতেই পারে না, আপনার জলটা আমার দিয়ে দিন শেষ করি।'

'তাই আগে থেকে ধার শোধের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে জল গ্রহণ?'

মালবিকা হেসে ফেললো। মানে আর চাপতে পারলো না। জলের পাত্রটা

নিঃশেষ করে সেটা মালবিকার হাতে ফেরত দিয়ে ভবভূতি বললো, 'জলদান একটা পুণ্যকাজ।'

'তাই বুঝি?' মালবিকা বলে, 'তাহলে অজান্তে একটা পুণ্যকাজ করে ফেললাম বলুন?'

'নিশ্চয়!'

বলে ভবভূতি পকেট থেকে সিগারেট কেস বার করে বললো, 'অনুমতি পেতে পারি?'

মালবিকা গম্ভীর ভাবে বলে, 'আমি আপনার গুরুজন নাকি?'

ভবভূতি অম্লান মুখে বললো, 'মহিলামাত্রেই পুরুষ জাতির গুরুজন।'

'বাঃ চমৎকার! বেশ একটা নতুন কথা শিখলাম। যাক অনুমতির অপেক্ষায় যখন বসে রইলেন, তখন দিলাম অনুমতি।'

মালবিকা আর কথা বাড়াবে না ঠিক করে আবার বইটা খুলে বসলো।

কিন্তু কতক্ষণই বা?

ভবভূতি প্রশ্ন করলো, 'কোথায় যাবেন?'

মালবিকা বললো, 'অতি তুচ্ছ একটা জায়গায়।'

ভবভূতি বললো, 'প্রয়োজন যখন যাবার তখন আর কোনো তুচ্ছই তুচ্ছ থাকে না। আমি তো প্রয়োজনে পড়ে এমন একটা জায়গায় চলেছি, যেখানে আমি নাকি জ্ঞান হবার পর আর যাইনি। অথচ আমার বাবা প্রতি সপ্তাহে যেতেন।'

মালবিকার মনে হলো, আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানেই নয়তো? কেন মনে হলো কে জানে।

মালবিকা বললো, 'এরকম তো কতই হয়। আমার বাবা কোন একসময় গ্রামেই বাস করতেন, কিন্তু আমি জীবনেও সে গ্রামে যাইনি।'

'বাঃ ছেলেবেলায় তো অন্ততঃ—'

মালবিকা বলে ফেললো, 'আমার ছেলেবেলায় বাবার কোনো ভূমিকা ছিল না, বাবা যখন মারা যান আমি তখন সদ্যোজাত।'

বলে ফেলেই মনে হলো, নেহাৎ অপরিচিত একজন বাইরের লোকের সামনে এতো কথা বলার আমার দরকার কি ছিল? লোকটা বাচাল মত বলেই এ রকম হলো। কথা কইলেই তো কথা বাড়ে! মালবিকা নিজের পরিচয়টা দিয়ে ফেলেই সামলে নিলো নিজেকে।

কিন্তু কার কাছ থেকে সামলাবে? লোকটা যে বেহায়া!

দেখলো মালবিকা বইটা খুলে তাতে চোখ ডোবালো, তবু বলে উঠলো, 'তা সেই তুচ্ছ জায়গাটার নাম কী?'

মালবিকা গম্ভীর গলায় শুধু নামটাই বললো।

কিন্তু মালবিকার গাম্ভীর্য কোনো কাজে লাগলো না। ভবভূতি (যদিও কেউ কারো নাম জানে না) প্রায় লাফিয়ে উঠে বললো, 'আরে, আমিও তো ওইখানেই যাচ্ছি। আশ্চর্য তো?'

মালবিকার বুকটা হঠাৎ কেঁপে উঠলো!

মালবিকার ভয় হলো লোকটা কোনো বদমাইস নয়তো? ভদ্র-বেশী বদলোক এমন কত থাকে। আসলে আমাকে দেখা ইস্তক কোনো মতলব খেলছে মাথায়। তাই গায়ে পড়ে পড়ে, জল চেয়ে আলাপ করতে আসছে। নিজের হয়তো অন্য কোনোখানের টিকিট আছে, যেই শুনলো আমি ওখানে নামবো, অমনি এই গল্পটি ফাঁদলো।

মালবিকা নিতান্ত কিশোরী বা তরুণী নয়, মালবিকা নিজে হাতে একটা স্কুল গড়ে আজ তিন চার বছর চালাচ্ছে। একা ভ্রমণেও অনভ্যস্ত নয়, কিন্তু কি জানি কেন মালবিকার ভয় ভয় করলো। মনে হলো লোকটা তার ক্ষতি করতে পারে।

মালবিকা তাই চারিদিকে তাকিয়ে দেখলো। থার্ডক্লাস কামরা, গাড়িতে লোকের ঘাটতি নেই, কিন্তু ভরসাযোগ্য কাউকে দেখতে পেল না সে।

অতএব নিজেই আত্মস্থ হলো। বইটা মুড়ে রেখে, তীক্ষ্ণ গলায় বললো, 'এ আর আশ্চর্য কি? ট্রেনটার তো আর কেবলমাত্র আমার জন্যেই স্টেশনে থামার কথা ছিল না।'

ভবভূতি ওর এই তীক্ষ্ণতায় কৌতুক অনুভব করলো। ,

যদিও ভবভূতির মেয়ে দেখলেই আলাপ করতে আসার অভ্যাস নেই, এবং তার অনেক মেয়ে বন্ধুও নেই যে মেয়ে সম্পর্কে অভিজ্ঞ, তবু মনে মনে বললো, মেয়েদের এই এক রোগ। সব কিছুতেই ঠিকরে ওঠা।

হেসে ফেলে বললো, 'আপনি খুব রাগী।'

মালবিকা মনে মনে বললো, যতই ভেজাতে আসো আমি ভিজছি না! মুখে বললো, এতো কম সময়ের মধ্যে আমাকে চিনে ফেলার বাহাদুরীতে অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

'নাঃ আপনার বোধ হয় আবার খুব তেষ্টা পেয়ে গেছে।' ভবভূতি হাসে, 'সামনের স্টেশনটা তো আসছেও না, কী করি বলুন তো?'

'কে বললো আপনাকে যে, আমার তেষ্টা পেয়েছে?'

'বললো আপনার মুখের চেহারা। যা শুকিয়ে উঠেছে!'

মালবিকা গম্ভীরভাবে বললো, 'চলন্ত ট্রেনে কথা কইলে আমার কষ্ট হয়, তাই চুপ করে থাকাই পছন্দ করি।'

ভবভূতি হঠাৎ যেন নিভে গেল। বললো, 'এ হে হে! আগে বলবেন তো সেটা? আর আমি আপনাকে ডেকে ডেকে বিরক্ত করছি। আমার আবার অভ্যাসটা একটু উল্টো। বই আনি বটে, কিন্তু চলন্ত গাড়িতে মন বসাতে পারি না। কথা কইতে পেলে বাঁচি। সত্যি খুব দুঃখিত।'

মালবিকার এখন ওর কথার ধরনটা যেন সরল সরল মনে হলো। ওভাবে না বললেই হতো। কি আর করবে ও আমার, এই দিনে-দুপুরে? ওখানে যখন পৌঁছবো, তখনো বোধহয় ভাল করে সন্ধ্যা হবে না। একটা সাইকেল রিক্সায় চড়ে উঠে বলবো, মিসেস হালদারের বাড়ি।

তারপর আর ভয় কি? ভাবনা কী?

মালবিকা তাই সামান্য সৌজন্যে এলো।

বললো, 'না, অত বেশি দুঃখ পাবার কিছু নেই। এমনি একটা অভ্যাসের কথা বললাম।'

'তবু ভাল! আমার তো ভাবনা হয়ে গিয়েছিল। মেয়েদেব তো আবার সব কিছুতেই মাথা ধরে।'

'মেয়েদের সম্পর্কে আপনার অনেক তথ্য জানা আছে দেখছি।'

তারপর কি ভেবে থেমে গিয়েও আবার বলে, 'তা মিসেসকে সঙ্গে নিয়ে বেরোননি কেন?'

'মিসেস? কোন্ মিসেস? কার মিসেস?' ভবভূতি হেসে উঠে বলে, 'আপনার অনুমান শক্তির প্রশংসা করতে পারলাম না।'

মালবিকা দেখলো, লোকটা কেবলই কথায় জিতে যাচ্ছে। মালবিকার রাগ হলো, ভাবলো ঠিক আছে, আমিই কথা কইছি। দেখি হারিয়ে দিতে পারি কিনা। বললো, 'ওখানে কেউ আছে বুঝি?'

'কেউ না। কেউ না। বাবার সখের ফসল একটা বাড়ি ছিল, এতোদিনে

বোধহয় ভূমিসাৎ হয়ে গেছে, সেটা বেচে দেবার তালে আছি, তাই একবার দেখতে যাচ্ছি। জানিনা খুঁজে বার করতে পারবো কি না।'

'ওখানকার ভূমিসাৎ বাড়ি বিক্রী করবেন? খদ্দের পেয়েছেন?'

'না, খদ্দের কোথায়? আদৌ বাড়িটা আছে কিনা দেখতে যাচ্ছি। কেনবার লোক পাবো না বলছেন?'

'পিসিমা আজ বছর পনেরো ধরে চেষ্টা করছেন তাঁর বাড়ির বাগানের খানিকটা জমি বিক্রী করতে, এখনো তো সাফল্য লাভ করতে পারেননি।'

'আপনার পিসিমারও বাড়ি আছে বুঝি ওখানে?'

'আছে। চিরকালের বাসিন্দা। মিসেস হালদারের বাড়ি বললে সবাই বুঝতে পারে।'

'যাক, আপনি তো তাহলে পিসিমার কাছেই যাচ্ছেন। সাদর অভ্যর্থনা, তৈরি আহার, পাতা বিছানা আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

মালবিকার এখন রাগ গিয়ে লোকটার ওপর কেমন মায়া হয়। আহা কোথায় গিয়ে উঠবে তার ঠিক নেই। এই তো ব্যবস্থার ছিরি, একটু খাবার জল পর্যন্ত সঙ্গে নিতে জানে না।

আস্তে বললো, 'কোথায় উঠবেন তা ঠিক না করে—'

'ওই তো!' ওই ভেবে ভেবেই তো হয়ে ওঠে না। এখন কোনো কোনো হিতৈষী বলছেন, বাড়িটা তোমার বাবার শখের জিনিস ছিল, সারিয়ে টারিয়ে আবার যাওয়া আসা করো। কি করবো জানিনা, তবুও একবার দেখতে যাচ্ছি—'

'কিন্তু সে বাড়িতে গিয়ে ওঠার মতো অবস্থা আছে কি না তাও তো জানেন না মনে হচ্ছে।'

'ঠিকই মনে হচ্ছে। কি আর করা। একজন বলেছে স্টেশনের কাছাকাছি 'বিশ্রাম সুখ' নামে নাকি একটা হোটেল আছে—দেখি সত্যি মিথ্যে। কিছু না জুটুক, একটু স্নানের জল পেলে আর এক কাপ চা পেলেই—'

মালবিকার মনটা আবার মায়ায় ভরে যায়। অথচ বলে ফেলা তো যায় না, আপনি আমার সঙ্গে আমার পিসিমার বাড়িতেই চলুন. তাঁর প্রকাণ্ড ইঁদারা আছে, চা বানাবার মত লোকও আছে।

না, মালবিকার মায়া কোনো কাজে লাগে না ভবভূতির।

মালবিকা চুপ করে থাকে। একটুক্ষণ চুপচাপ।

ভবভূতিই আবার এক সময় বলে ওঠে, 'আপনার যখন পিসিমার বাড়ি, তখন প্রায়ই যান বোধহয়?'

মালবিকা হসে!

'প্রায়?'মেটেই না। তবে খুব ছেলেবেলায় এখানে কিছুদিন মানুষ হয়েছিলাম। মায়ের অসুখ করেছিল—'

তারপর বললো, 'তবে খুব প্রকাণ্ড একটা ইঁদারা আছে এটা মনে আছে। একটা চাকর ছিল সে কেবল আমায় ভয় দেখাতো, ওর মধ্যে ফেলে দেবে বলে. পিসিমা অনেকবার বলেন যেতে, যাওয়া উচিতও, বুড়ো হয়েছেন, কিন্তু হয়ে ওঠে না। গিয়ে এখন অভিমান ভাঙাতে কতক্ষণ লাগবে কে জানে!'

'পিসেমশাই আছেন?'

'পাগল! তিনি তামাদি হয়ে গেছেন। না হলে আর মিসেস হালদারের বাড়ি কেন?'

'ছেলেমেয়ে?'

'নিল্!'

'তাহলে থাকেন কার কাছে?'

'নিজের কাছেই। আর সেই চাকরটা আছে বুড়ো থুত্থুড়ো হয়ে যে আমাকে ইঁদারায় ফেলে দিতে চাইতো।'

'এখন গিয়ে গল্প করবেন তো?'

'দেখি যদি কান টান থাকে। পিসিমার চিঠিতে তো প্রায়ই এ অভিযোগ থাকে—বংশী এখন আর কোনো কথা কানে দেয় না। আসলে কানই হয়তো নেয় না।'

ওরা দু'জনেই হেসে ওঠে। ঘটাং করে থেমে যায় গাড়িটা।

স্টেশন এসেছে! ভবভূতি খালি ওয়াটার বট্‌লটা হাতে নিয়ে চট করে নেমে পড়ে।

ভবভূতি নেমে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মালবিকা আবার হঠাৎ গুম মেরে গেল। ভাবলো, আবার অনেক বেশি কথা বলা হয়ে গেছে।

লোকটা তুকতাক জানে নাকি? ভাবছি এড়িয়ে থাকবো, অথচ কেন কে জানে জড়িয়ে পড়ছি।...কি রকম লোক জানি না, কি নাম জানি না, অথচ সঙ্গে সঙ্গে ধাওয়াও করছে।

কি নাম মনে করতেই, ওর ফেলে রাখা বইটা টেনে নিলো।

থাকলেও থাকতে পারে নাম। ছিলই। প্রথম পাতার নীচের দিকে কোণাকুণি ভাবে লেখা ছিল।

মালবিকা নামটার ওপর চোখ ফেলে একটু তাকিয়ে রইল।

ভবভূতি রায়। নামটা সভ্য-ভব্য-ভদ্র।

অবিশ্যি বইটাই ওর নিজের কি না তা বলা যায় না। অন্যের বই চেয়ে এনে পড়া যায়। না বলে চেয়ে নিয়ে কাছে রাখা যায়। বই সংগ্রহের একটা বিশেষ পথই তো পরের বই পড়তে চেয়ে এনে আর ফেরৎ না দেওয়া। তবে পড়তে চেয়ে আনলেও রুচি আছে তা মানতেই হবে। এসব বই যারা পড়ে—

গাড়ি নড়ে উঠল। মালবিকা ভয়-ব্যাকুল মুখে দরজার কাছে ছুটে গেল। লোকটা এলো না এখনো?

আসছে। এক হাতে জলের ব্যাগ, অন্য হাতে খাবারের ঠোঙা নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে।

চলন্ত গাড়িতেই উঠে পড়লো। তার আগে মালবিকা হাত বাড়িয়ে ওর হাতটা ভারমুক্ত করে ফেলে এই রক্ষা।

'এটা কি হলো?'

মালবিকা প্রায় রেগে ফেটে পড়ে বলে, 'আর একটু হলেই কি হতো বলুন তো?'

ভবভূতি একটু হেসে বলে, কি আর? বড় জোর ভাবতেন লোকটা জোচ্চোর, ছুতো করে জলের পাত্রটা গ্যাঁড়াফাই করে কাট মারলো।'

'সত্যি! কি একখানা দামী জিনিস! এই রকম গোঁয়ার্তুমি করতে গিয়েই লোকে ইচ্ছে ক'রে বিপদ ডেকে আনে, বুঝলেন!'

'আমি ওটা মানি না। বিপদ যখন আসবার ঠিক আসবেই।'

মনে মনে বলে, এই তো এখনই তো। মনে হচ্ছে বেশ বিপদ ঘনিয়ে আসছে। আমি শ্রীভবভূতি রায়, এই ত্রিশ বছর বয়েস অবধি দিব্যি অক্ষত চিত্তে ঘুরে বেড়িয়ে এলাম, হঠাৎ এই ক'ঘণ্টা দেখা মেয়েটা আমাকে আলোড়িত করছে কেন?...... ওর জন্য বেছে বেছে ভাল খাবার আনতে গিয়ে আমি ট্রেন মিস করতে বসছিলাম কেন?

মালবিকা রেগে বলে, 'ঠাকুমা দিদিমার মতো কথা বলছেন যে! আমার এক

দিদিমা বলতেন, যতই যা কর বাপু—ভাগ্য ছাড়া কোন পথ নেই। আপনার কথা ঠিক তেমনি শোনালো।'

বলেই থেমে গেল মালবিকা।

আবার আমি বেশি কথা বলে মরছি! কি হবে আমার!

ভবভূতি বললো, 'ভাল করে অনুসন্ধান করলে দেখবেন, সকলের মধ্যেই একটি ঠাকুমা দিদিমা বর্তমান। যাক, খাবারটা ভাগ করে ফেলুন দিকি।'

মালবিকা স্থির গলায় বলে, 'ভাগ মানে?'

'ভাগ মানে, দু'ভাগ! অনেকক্ষণ তো হয়ে গেল, খাওয়া যাক এবার।'

'আমার খাবার প্রয়োজন নেই,' মালবিকা বলে, 'খিদে পায়নি।'

'তাহলে ওই জানালাটা দিয়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিন।'

বলে বইটা মুখের সামনে খুলে ধরে ভবভূতি।

মালবিকা তবে কি করে নিজেকে দৃঢ় রাখবে?

লোকটা আশা করে খাবার-টাবাব কিনে আনলে, খিদেও পেয়েছে নিশ্চয়, বাড়িতে কেউ যত্ন করার নেই বলেই মনে হচ্ছে, আমার একটু অহমিকার জন্য খেতে পাবে না?

তবে হেসেই ফেলতে হয়। উপায় কি?

হেসে ফেলে বলে, 'খুব হয়েছে, বসুন তো। জনা চার-পাঁচের খাবার এনেছেন দেখছি।'

নিজের ঝাঁপি থেকে একটা প্লাষ্টিকের প্লেট বার করে তাতে বেশ করে গুছিয়ে সাজিয়ে সামনে ধরে দেয়।

'আপনার থালাটি আমায় দিয়ে দিলেন। আপনি কিসে নিচ্ছেন?'

'হচ্ছে হচ্ছে। পাতাই তো রয়েছে কত!'

খাওয়ার পর আবার জলের সমস্যা। আবার তো ওয়াটার বট্‌ল ফাঁকা।

ভবভূতি বলে, 'ঠিক আছে। আবার পরবর্তী স্টেশনে নামা যাবে।'

'আবার একটা কাণ্ড করতে ইচ্ছে, কেমন? ওহো, আপনি তো আবার ভাগ্যবাদী।....যাক, এই বইয়ের মালিকটি কে?'

ভবভূতি অবাক হয়ে বলে, 'তার মানে? বইটার মালিক তো স্বয়ং সামনেই বসে।'

মালবিকা মৃদু হেসে বলে, 'বই জিনিসটা তো আবার না বলে চেয়ে নেবারও জিনিস কি না, তাই জিজ্ঞেস করছি।'

ভবভূতি আর একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলে, 'আমার সম্পর্কে আপনার ধারণাটি তো ক্রমেই বেশ গভীর হচ্ছে দেখছি। কিন্তু হঠাৎ বইয়ের মালিকের খোঁজ কেন?'

মালবিকা মৃদু হেসে বলে, 'আপনার নামটা জানতে।'

'জানলেন তাহলে। বইটা নিতান্তই পয়সা দিয়ে কেনা।'

'যিনি নামটা রেখেছিলেন, তাঁর পছন্দটা সুন্দর। মনে হচ্ছে অতীতের পৃষ্ঠা থেকে নেমে এলেন।'

'অতীতই তো বর্তমানের পৃষ্ঠায় নেমে আসে। ইতিহাসের ধর্মই এই। কিন্তু আপনি এখনো রহস্যময়ী হয়ে রয়েছেন, নাম জানতে পারলাম না।'

'এমন কিছু নতুন নয়। নাম মালবিকা চৌধুরী।'

'অর্থাৎ আপনার সম্বন্ধে বলা যায়—সংস্কৃত সাহিত্য থেকে নেমে এলেন।'

এমনি করে কথার পিঠে কথার বন্ধন।

মালবিকার কঠোরতা বিরূপতা আস্তে আস্তে যেন কমেই যাচ্ছে। নাঃ, লোকটা একটু বেশি কথা কয়, আর বোধহয় সেটা মেয়েদের দেখলে। তাছাড়া—আর কোনো সন্দেহ করবার নেই। অভব্য নয়, অমার্জিত নয়।

ক্রমেই ওরা বইয়ের জগতে চলে গিয়ে আলোচনার গভীরে ডুবে যায় এবং গন্তব্যস্থলে নামবার আগেই পরস্পরের সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে ফেলে। অবস্থা, পরিবেশ, রুচি, পছন্দ!

আর যখন মালবিকা নেমে পড়ে রিকশার খোঁজ করছে এবং ভবভূতি একে ওকে জিজ্ঞেস করছে স্টেশনের কাছে কোথায় হোটেল আছে, তখন মালবিকা হঠাৎ বলে বসে, 'আচ্ছা হোটেলের খোঁজ পরে হবে, এখন আমার পিসিমার বাড়িতেই চলুন। আর কিছু না পান, স্নানের জন্যে বড় ইঁদারার ঠাণ্ডা জল পাবেন।'

বড় ইঁদারার ঠাণ্ডা জল!

সেটা যেন এখানে দাঁড়িয়ে দেখতে পান ভবভূতি।

আস্তে বলে, 'তা কি হয়?'

'বাঃ, হলে কি হয়? দোষ কী?'

'দোষ হয় না জানি না, আদৌ হয় কিনা তাই ভাবছি?'

'ভাবনা চিন্তাগুলো পরে করবেন। এখন চলুন তো।'

ভবভূতি কি ওর চোখের মধ্যে সেই গভীর ইঁদারার ঠাণ্ডা জলের আশ্বাস পায়? বোধহয় পায়?

তাই আরো আস্তে বলে, 'চলুন। কিন্তু আপনার পিসিমাকে কী বললেন?'

'সে সমস্যা তো আমার।'

তারপর হেসে বলে ওঠে, 'বলবো বন্ধুজন।' আবার হেসে উঠে বলে, 'তবে সদ্যলব্ধ বললে চলবে না।' বলতে হবে অনেক দিনের, নাহলে চমকে উঠবেন বৃদ্ধা মহিলা। দুটো রিকশা নেওয়া হয়।

মিসেস হালদারের বাড়ি বললে সবাই চিনে নিয়ে যাবে।

পঙ্কজিনী হালদার এখানকার সব থেকে পুরনো বাসিন্দা।

এই ছোট মফঃস্বল শহরটির গৌরব-রবি যখন মধ্য-গগনে, বিধবা পঙ্কজিনী হালদার তখন এখানে এসে 'মালতি কুটির'টি নির্মাণ করিয়ে বসবাস স্থাপন করেন এবং এখানকার সমাজে নিজেকে রীতিমত প্রতিষ্ঠিত করে তোলেন।

পঙ্কজিনী নিজেকে সংস্কৃতির ধারক-বাহকদেব একজন বলে মনে করতেন। পঙ্কজিনী হালদার এখনও নিজেকে তাই মনে করেন। পঙ্কজিনীর মালতি কুটিরের যেমন গেটে মরচে ধরেছে, জানালা দরজার রং চটে গেছে, দেওয়ালের প্লাস্টারিং খসে পড়েছে, মেঝেয় ফাটল ধরেছে, পঙ্কজিনীর দেহেও তার প্রতিফলিত, তবুও পঙ্কজিনী এখনো সকাল হলেই সাদা ধপধপে লেসপাড় শাড়িখানি সেই আদিকালের ব্রাহ্মিকাধরনের মত করে পরে নেন, আঁচলে পিন আঁটেন, পাকা চুলেও বিশেষ একটি কায়দায় ফাঁপিয়ে লেসপিন লাগান এবং সিল্কের বেঁটে ছাতাটি হাতে নিয়ে ঠুক ঠুক করে রাস্তায় বেরোন। আগে তাঁর যৌবনে এবং মধ্য বয়সে যেসব বাড়িগুলিতে ঢুকে ঢুকে তাদের সমাচার নিতেন, সেই বাড়িগুলির মরচে পড়া তালা ঝোলানো গেটের সামনে এসে দাঁড়ান, একটা নিঃশ্বাস ফেলেন, আবার এগোন। বেলা হয়ে উঠলে ছাতাটা খুলে মাথায় দিয়ে বাড়ি ফেরেন।

সেখানে বংশী প্রস্তুত হয়ে বসে থাকে বকাবকি করার জন্যে।

বকাবকিটা বংশী তার জন্মগত বলেই গণ্য করে। মিসেস হালদারেবও ওটা না খেলে যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। বকাবকির পর বংশী বারান্দায় বেতের চেয়ারের সামনে ছোট বেতের টেবিল নিয়ে এসে পাতে। তার মাঝখানে ফুলদানিটি স্থাপন করে, এবং যখন যেমন জোটে একটি তোড়া বেঁধে সাজিয়ে দেয়। পঙ্কজিনীর সকালের আহার দু'টি টোস্ট, একটি কলা, এক পেয়ালা চা।

সেইটুকুই তারিয়ে তারিয়ে ঘণ্টাখানেক ধরে খান এবং সেকালের মার্জিত

ভঙ্গীর উচ্চারণে থেমে থেমে বংশী সঙ্গে কথা বলেন। কথা আর কি! পুরনো দিনের কথা।

এই শহরের কি চেহারা ছিল, কে কে আসতো যেত, মিসেস হালদারের এই বাড়িতে কতো কতো বড়লোক এসেছেন একদা, সেই গল্প।

অজস্রবার শোনা, মুখস্থ হয়ে যাওয়া গল্প।

তবু তার মধ্যেই যেন নতুন করে রস পান পঙ্কাজিনী।

ওঁর এই বাড়ির সামনে এখন আর কোনোদিন কোনো গাড়ি এসে থামে না।

সেদিন এসে থামলো। সকালে নয়, বিকেলে।

যখন পঙ্কজিনী হালদার বাগানে ফুল গাছের তদারক করছেন। তদারক করার মত গাছ নেই, ফুল নেই, তবু তদারকিটা আছে।

পঙ্কজিনী থমকে তাকালেন।

দুটো রিকশ এসে থামলো! তাড়াতাড়ি মাথার লেসপিনটা ঠিক করে বারান্দায় উঠে গিয়ে বললেন, 'বংশী, দেখ তো কে এলো।'

মালবিকার এখানে আসার খুব একটা ঠিক ছিল না, 'শীগ্রীই একদিন গিয়ে পড়বো,' এরকম চিঠি অনেকবার লিখেছে। কাজেই প্রতীক্ষা ছিল না। তা না থাকুক, হঠাৎ এসে পড়ারও একটা আনন্দ আছে। কিন্তু সে আনন্দটা পুরোপুরি ভোগ হল না, সঙ্গে আবার একটা বন্ধু! তা'ও মেয়ে নয় ছেলে।

ব্যাপারটা পছন্দ হবার মত নয়, তবু সামলে নেন পঙ্কজিনী। এরকম সামলে নেবার শিক্ষা-দীক্ষা আছে পঙ্কজিনীর! ভদ্রতা সৌজন্য, এই সবেরই তো অনুশীলন করেছেন জীবনে। তবে যা করেন মাত্রাটি রেখে। মাত্রাহীন আহ্লাদ প্রকাশ অথবা অভ্যর্থনার আতিশয্য, এসব পঙ্কজিনীর কুষ্ঠিতে নেই! অতএব প্রতিটি শব্দের মাঝখানে খাঁজ কেটে নিজস্ব বিশিষ্ট উচ্চারণে মিসেস হালদার প্রশ্ন করেন, 'এখন তো ডিনার টাইম হয়ে এসেছে খুকু, এখন কি তোমরা চায়ের সঙ্গে হেভি কিছু খাবে? না শুধু চা বিস্কুট?'

মালবিকাকে উনি বরাবর খুকুই বলেন।

এখন খুকুদের দু'জনেরই প্রাণভরা স্নান সারা হয়ে গেছে, আর দুজনেই মিসেস হলদারের 'পেটেন্ট মফঃস্বলি' ঢালু ছাদের বারান্দায় মুখোমুখি দু'খানি বেতের চেয়ারে বসতে পেয়েছে এবং স্নান-স্নিগ্ধ শরীর সাঁওতাল পরগণার জীবনীশক্তি বৃদ্ধিকর আমেজভরা মৃদু সান্ধ্য বাতাসে জুড়িয়ে নিচ্ছে।

দেহের সঙ্গে মনও।

মালবিকা ভাবছে ভদ্রলোককে পিসিমার কাছে ম্যানেজ করতে হলে কি রকম কথাবার্তা বলতে হবে, আর ভবভূতি ভাবছে, কি আশ্চর্য! আমি নিয়মিত কোন নির্দেশে এখানে এসে বসে আছি!

এই নিমগ্ন মনের ওপর মিসেস হালদারের 'হেভি' খাবাররে প্রশ্নটা প্রায় হাতুড়ির ঘা বসাল। আর সেই সঙ্গে পরিবেশ সচেতন করে দিল বৈকি!

প্রশ্নটা মালবিকাকেও চকিত করলো।

মালবিকার মনে পড়ল রিকশায় আসার সময় ভবভূতি বলেছিল, 'উ! জায়গাটা যে স্বাস্থ্যকর, তাতে আর সন্দেহ নেই। হাওয়াটা গায়ে লাগার সঙ্গে সঙ্গেই নিদারুণ ক্ষিদে পেয়ে যাচ্ছে।'

মেয়ে মন, কারুর ক্ষিদে পেয়েছে শুনলেই চঞ্চল হয়ে উঠতে বাধ্য, আবার ক্ষুধাতুর যদি পুরুষ হয়, আরো চাঞ্চল্য আসে সে মনে। ভেবে নিয়েছিল, পিসির বাড়িতে নামিয়ে ভালমত কিছু খাইয়ে দিতে হবে ভদ্রলোককে।

একটা মানুষ-বাসকরা বাড়িতে কিছু না কিছু তো থাকবেই।

তবে খাওয়ার থেকে নাওয়ার চাহিদাটা বেশি জোরালো ছিল, সেটাতেই অনেকটা সময় গেল। বারান্দায় এসে বসার আগে পিসিমার একমেবাদ্বিতীয়ম্ বুড়ো চাকরটিকেও জানিয়ে এসেছে সে 'আমার বন্ধুর কিন্তু খুব ক্ষিদে পেয়ে গেছে—'

আশা করছিল তদুপযুক্ত কিছু এসে যাবে। এখন এই প্রশ্ন!

কিন্তু এ প্রশ্নকে আশার বলবে, না হতাশার বলবে?

চা-টা খাইয়ে বিদায় দেবে লোকটাকে এই রকমই একটা ধারণা মনের মধ্যে ঝাপসা ভাবে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিল কিন্তু পিসিমার প্রশ্নটি তো ডিনারের আশ্বাসবাহী। তাহলে সেটা কি উচিত হবে?

মালবিকা আর ভাবলো না, চট করে বলে বসলো, মিস্টার রায় কিন্তু একটু আগে বলছিলেন, ওঁর বেশ খিদে পেয়ে গেছে।'

সঙ্গে সঙ্গেই একটু হেসে যোগ করলো, 'তোমার দেশের প্রশংসা করছিলেন। বাতাস গায়ে লাগতে লাগতেই না কি খিদে পেয়ে যায়।'

এ জায়গাটার প্রশংসায় যে পিসি পরমপ্রীত হন এটা চিরবিদিত, অতএব মালবিকা সুযোগ ছাড়ে না। অভ্যাগতের প্রতি প্রসন্ন হবেন ভেবেই।

বলাবাহুল্য বিশেষ প্রীতই হন শ্রীমতী হালদার, তবে উচ্ছ্বাস প্রকাশ তাঁর

নীতিবিরুদ্ধ। তাই তেমনি মাজা কাটা গলায় থেমে থেমে বলেন, 'এটা উনি কিছু নতুন বলছেন না, জল হাওয়ার গুণে স্যার এন. ডি. ঘোষ দু'দিনের জন্য বেড়াতে এসে জমি কিনে ফেলে ছিলেন। স্যার এন. ডি. ঘোষ। জানো তো? নবীনধর ঘোষ। তখনকার দিনে—' নিঃশ্বাস ফেললেন মিসেস হালদার, 'তোমরা আর কি দেখলে? উনি এসেছিলেন স্যার নীলরতনের বাড়িতে বললেন, ব্যস আর কোন কথা নয়, জমি কিনে রেখে তবে যাবো।....যে কথা সেই কাজ। সঙ্গে সঙ্গে জমির বায়না দিয়ে চলে গেলেন, পরের সপ্তাহেই বাড়ি শুরু। ছবির মত কটেজ! আসবার সময় দেখলে না, 'সুরভি কানন'? এখন অবশ্য ভগ্নদশা। ছেলেরা দেখে না।'

মালবিকা প্রমাদ গণে।

উনি যেভাবে প্রসঙ্গান্তরে চলে যাচ্ছেন, খাওয়ার কথাটা না ভুলে যান। তাই তাড়াতাড়ি বলে, তাহলে মিস্টার রায়, আপনাকে কিছু দিতে বলি?

মিসেস হালদার যেন নিরুপায়ের ভঙ্গিতে বলেন, 'তাহলে কেক দিতে বলি। অবিশ্যি ডিনার টাইম হয়ে এলো—'

মিসেস হালদার কখনো নিয়মের ব্যতিক্রম করেন না, তাই এই হতাশ মন্তব্য।

ভবভূতি তাড়াতাড়ি বলে, 'না না ওই ডিনার টিনার নিয়ে ব্যস্ত হবেন না, আমি এখনই চলে যাবো।'

'চলে যাবেন?'

মিসেস হালদার আকাশ থেকে পড়েন।

তথাপি তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করে ওঠেন না। শ্রোতার ধৈর্যের ওপর পিন মেরে মেরে প্রতিটি শব্দ সমান তালে উচ্চারণ করে করে বলেন, 'আপনি খুকুর বন্ধু, খুকুর সঙ্গে এসেছেন, অথচ চলে যাবেন বলছেন! এটা কি রকম হলো?'

সেরেছে! মালবিকার এই মধুর মলয়ানিলেও গলার কাছে ঘাম জমে ওঠে কে জানে বাবা ভবভূতি হুট করে কি বলে বসে। যদি বলে ফেলে, ওঁর সঙ্গে তো আসিনি! মাত্র এই আজই তো ওঁর সঙ্গে ট্রেনে পরিচয়!

মালবিকা অবশ্য আগেই সাবধান করে দিয়েছে, কিন্তু পুরুষমানুষকে বিশ্বাস নেই, ওরা শেখানো কথার [illegible]টা বেশিক্ষণ বজায় রাখতে পারে বলে মনে হয় না।

তাই পরিস্থিতিকে নিজের হাতে তুলে নেয় মালবিকা, তাড়াতাড়ি বলে ওঠে,
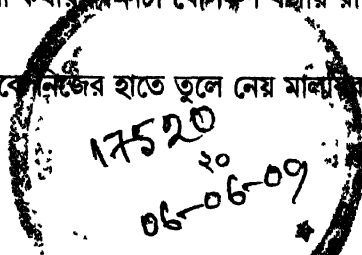
'সেই কথাই তো বোঝাচ্ছি পিসিমা ওঁকে তখন থেকে। কোথায় কতদূরে আপনার মামাতো কাকার বাড়ি, বহুকাল আসেননি, রাতে খুঁজে পাবেন না, বরং কাল সকালে—'

মালবিকা ঝপ করে ভবভূতির এক মামাতো কাকাকে সৃষ্টি করে ফেলে বুদ্ধির মহিমায় পরম আত্মপ্রসাদ লাভ করলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে নিলো সুযোগ পেলেই ভবভূতিকে একটু তালিম দিয়ে দেবে। কিন্তু হায় অবোধ বালিকা!

জানলেও না যে তুমি খাল কেটে কুমীর আনলে!

মামাতো কাকা শুনেই মিসেস হালদার সোজা হয়ে উঠে বসলেন! তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠলেন, 'আপনার কাকা এখানে থাকেন? কে বলুন তো কোন্‌দিকে বাড়ি?'

ভবভূতি বারান্দায় মৃদু আলোর সুযোগে একবার মালবিকার দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করে নিয়ে আলগা গলায় বলে, 'কোন্‌দিকে সে তো আমিও ঠিক জানি না। মানে বহুকাল তো আসিনি। খুঁজে নিতে হবে।'

মিসেস হালদার জোরালো গলায় বলেন, 'খুঁজে আপনাকে নিতে হবে কেন, আমিই এই বারান্দায় বসেই আপনার কাকার বাড়ি খুঁজে দেব। এখানের প্রতিটি ঘাসপাতাও আমার পরিচিত। কি নাম আপনার কাকার? বাড়ির নামটি কি?'

এখন মালবিকার শুধু গলাই নয়, আপাদমস্তকই ঘামে ভরে ওঠে। এতক্ষণে খেয়াল হয় বুদ্ধি প্রকাশ করতে গিয়ে কি কাণ্ড করে বসেছে। ভবভূতি নামের মানুষটা কি বলে আত্মরক্ষা করবে এখন?

তা চট করে কোনো কথা খুঁজে না পেয়েই বোধহয় ভবভূতি তাড়াতাড়ি বলে, 'আমায় আপনি করে বলবেন না। আপনি তো আমারও পিসিমার মত।'

এ কথার উত্তরটা দিক বুড়ি, সেই অবকাশে ভেবে নেওয়া যাবে।

বুড়ি কিন্তু অতো বেভুল বুড়ি নয়। ভবভূতির আবদারের উত্তরে মিসেস হালদার রসকসহীন কণ্ঠে বলেন, 'অনাত্মীয় পুরুষ ছেলেকে তুমি করে কথা বলার অভ্যাস আমার নেই। আমাদের কালে এটিকেট মেনে চলাটাই ছিল সভ্যতা! আমরা সেই রীতিনীতি মেনেই চলে আসছি। যখন আত্মীয় হবেন, সম্পর্ক সৃষ্টি হবে, তখন অবশ্যই সেভাবে কথা বলবো।.... কিন্তু কই? আপনার কাকার নামটি বললেন না তো?

এখন ভবভূতিরও কপালে ঘাম ফুটে উঠেছে। ওঁর কথার মধ্যে এ আবার কোন্ সর্বনেশে ইঙ্গিত?

'যখন আত্মীয় হবেন।' মানে কি এর? কি ভেবে বসেছেন ইনি?

না কি ওই নির্বুদ্ধি মেয়েটাই বেশি আটঘাট বাঁধতে গিয়ে কিছু ইসারা আভাস দিয়ে বসেছে।

বুদ্ধিহীন সে বিষয়ে তো কোন সন্দেহই নেই।

দুম করে আমার এক মামাতো কাকার আমদানী করে বসলো, এখন আমি তাঁকে কি করে হজম করি।

ভবভূতির খেয়াল এলো, সে নিজে রায় পদবীধারী অতএব তার কাকারও ওই পদবীটা থাকা উচিত। তাই বললো, 'কাকার নাম হচ্ছে বি. রায়। মানে আর কি বিভূতি রায়। আমার সঙ্গে মিলানো নাম আর কি।'

মিসেস হালদার আরো সোজা হয়ে বসেন, তাঁর উচ্চারণের ভঙ্গী আরো ছুরিকাটা হয়, 'কাকার নাম আপনার সঙ্গে মিলানো? না আপনার নাম কাকার সঙ্গে মিলানো।'

ভবভূতির ইচ্ছে হয় সামনে বসা ওই মেয়েটাকে জোর একটা চিমটি কেটে বলে, কি হে বুদ্ধিমতী, খুব যে বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে জলজ্যান্ত একখানা মানুষ আমদানী করে বসলে! এখন? এখন যে আমাকে তার নাম, বয়েস, সবকিছুর দায়িত্ব নিতে হচ্ছে।

কিন্তু ইচ্ছেটা যখন কাজে পরিণত করার উপায় নেই তখন অত্যন্ত অমায়িক হাসি হেসে বলে, 'ওই আর কি একই তো।'

'একই তো?'

মিসেস হালদার উত্তেজিত গলায় বলেন, 'এক মানে? কে আগে জন্মেছে?'

'বাঃ, তা তিনিই তো—'

'তবে? আপনারা ছেলে ছেকরারা ভাষা সম্পর্কে বড় অন্যমনস্ক। কিন্তু কি যেন বললেন? বিভূতি রায়? বিভূতি রায় নামে কাউকে তো—উঁহু, বিভূতি রায় বলে এ তল্লাটে কেউ থাকতেই পারে না।'

ভবভূতি আরো অমায়িক গলায় বলে, 'কিন্তু আমি তো বরাবরই জানি এখানেই কোথায় যেন তিনি আছেন।'

তাহলে অন্য কোনো নামে হয়তো পরিচিত।'

মিসেস হালদার আত্মস্থ গলায় বলেন, 'ডাক নামে পরিচিত কি? তাও তো

হয় না। রায় তো মাত্র তিন জন,'— পি. রায়, রিটায়ার্ড বৃদ্ধ—এই কিছুদিন হলো স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে। আর একজন নিরঞ্জন রায়। বিরাট বিজনেস ছিল, সাবানের কারখানা ছিল, সেই সমস্ত খুইয়ে একা এখানে বাস করছেন, স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে বনে না, স্ত্রী এক-আধবার আসেন, অত্যন্ত আত্মসুখী মহিলা, স্বামীর সুখ-দুঃখের ভাগী হওয়াই যে স্ত্রীর কর্তব্য, তা স্মরণে রাখেন না।.....ওঁর ধারণা স্বামী বুদ্ধির দোষে সব নষ্ট করে ফেলেছেন। ভদ্রমহিলা এ কথা, একবারও চিন্তা করে দেখেন না, একদা ওই ভদ্রলোকই সবকিছু করেছিলেন। যাক- -ওটা ওঁদের দাম্পত্য জীবনের ব্যক্তিগত কথা অপরের কিছু বলার নেই। আর রায়ের মধ্যে আছেন খোঁড়া শচীন রায়, ট্রেন অ্যাকসিডেণ্টে পা কাটা পড়েছিল. ওই কাটা পা নিয়ে আর কলকাতার সমাজে বাস করতে ইচ্ছুক হননি, তাই নির্বাসন দণ্ড গ্রহণ করে এখানে বাস করছেন। ওঁর কটেজের নাম 'বেলা কুঞ্জ,' নিরঞ্জন রায়ের বাংলোর নাম 'মধুনিলয়,' আর. পি. রায়ের বাড়ির নাম 'জীবন সায়াহ্নে।'....অবসর গ্রহণ করে বাস করবেন বলেই বাড়ির ওই নামকরণ!...এঁদের মধ্যে কি কেউ আপনার কাকা? অবশ্য বি. রায় কেউই নন।'

ভবভূতি আর পারে না। ভবভূতির আধো অন্ধকারের সুযোগে একটা পা বাড়িয়ে মালবিকার পায়ের আগায একটু চাপ দেয় যার অর্থ হচ্ছে, নাও বোঝো! এখন কি করবে কর!

এইভাবে প্রতিটি প্রতিবেশীর জন্মমৃত্যু বিবাহের হিসেব রেখে চলেছেন মিসেস হালদার! প্রত্যেকের অতীত ইতিহাসই তো তার নখদর্পণে। ভবভূতি হঠাৎ কার ভাইপো হতে যাবে?

ভবভূতি তবু লড়ে চলে।

'আমার মনে হয়, বোধহয় ঠিক এদিকটায় নয়, একটু দূরে টুরে।'

মিসেস হালদারও হাল ছাড়েন না, বলেন, 'কত দূরে? স্টেশনের ওপার পর্যন্ত সবই তো আমার জলভাত। অবিশ্যি থাকে আর ক'জন? আশী পার্সেণ্ট বাড়িতেই তো তালা ঝুলছে। কারো কটেজে ওই একটা মালি থাকে, কারোও আবার তাও থাকে না। শুধু এই মিসেস হালদার! কেউ বলতে পারবে না, বাড়িতে তালা ঝুলিয়ে কোথাও চলে গেছে।'

প্রসঙ্গের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটলো। মালবিকা এই মহামুহূর্তে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'বুড়ো কি করলো? চা টা—'

মিসেস হালদার সচকিত হন, 'তাই তো! ওকে তো সঠিক বলা হয়নি—

ইনি যে আবার কাকার কথা তুললেন। বি. রায়, বি. রায়।' কথা বলতে বলতেই উনি হাতের কাছে রাখা একটি কলিং বেল টিপে 'কর কর' করে একটু শব্দ তুলে পেছনের অন্ধকার প্যাসেজের উদ্দেশ্যে বললেন, 'শুধু চা আর বিস্কিট—'

'আপনাকে চা দেব?'

অন্ধকার থেকেই শব্দ উত্থিত হল। মিসেস হালদার কড়া গলায় বললেন, 'আমাকে চা দেবে? তুমি কি আজ নতুন এলে বংশী? ডিনার টাইম হয়ে এলো, এখন আমি চা খাবো?'

মালবিকা মরিয়া হয়ে বলে, 'মিস্টার রায়, মানে এঁকে তুমি আর কিছু না হয় দিও বংশী! এঁর খুব খিদে—'

ভবভূতি তাড়াতাড়ি বলে, 'না আর দরকার নেই। যা দেখছি, এখানেই বোধহয় খেতেও হবে, শুতেও হবে। খুব সম্ভব ভুলই শুনে এসেছি। মামা বোধহয় এখানে—'

'মামা? মামা মানে? মামা কে?' মিসেস হালদার চমকে ওঠেন। বলে ফেলেই ভবভূতি নিজের গালে নিজে চড়াচ্ছিল, এখন বললো, 'মামা? মামা বললাম নাকি? এই এক অন্যমনস্কতা আমার। কোন একটা কথা বললাম, ভাবছি ঠিকই বললাম, কিন্তু তার বদলে অন্য একটা ওয়ার্ড ব্যবহার করে বসেছি। খেয়াল থাকে না। কাকা না বলে—'

'তাই না কি?'

মিসেস হালদার মাথা নেড়ে বলেন, 'এই বয়সে এই রকমটা তো ঠিক নয়। বয়েস হলে একটা ব্যাধিতে দাঁড়াতে পারে।'

'বয়েস হলে কি গো পিসিমা—' মালবিকা হালকা গলায় হেসে ওঠে, 'রোগটা তো এখনই দাঁড়িয়ে কেন, শেকড় গেড়ে বসে আছে। এই আমাকেই কতবার যে মিস চৌধুরী বলতে মিসেস চৌধুরী বলে বসেন!'

'অ্যাঁ! আ ছি ছি!'

মিসেস হালদার শিউরে উঠে বললেন, 'না, না খুকু, এ রোগকে তুমি প্রশ্রয় দিও না। এটা হেসে উড়িয়ে দেবার জিনিস নয়। মিস কে মিসেস, ঈ-স! ধর যদি উনি ভুলক্রমে আমায় হঠাৎ মিস হালদার বলে ডেকে ফেলেন!'

ওঃ!

ভবভূতির নার্ভ জোরালো বৈকি।

অন্তত মালবিকার তাই মনে হয়।

নাহলে পিসিমা যখন লজ্জায় বেদনায় কপালে রুমাল সমেত হাতটি চেপে ধরেছেন, তখন কিনা ও অবলীলায় বলে বসলো, 'বাঃ আপনাকে ওসব বলতে যাব কেন? আপনাকে তো পিসিমাই বলবো।'

মিসেস হালদার গম্ভীর হল।

এবং শ্রোতার সহিষ্ণুতার ওপর হাতুড়ি ঠুকে ঠুকে বললেন. হ্যাঁ, সে তো বলবেনই। কিন্তু এক্ষুণি তো নয়। তার তো দেরী আছে।'

ভবভূতি উদাস গলায় বলে, 'বারণ করেন তো বলবো না অবশ্য। তবে আপনাকে দেখে পর্যন্ত আমার পিসিমা বলতে ইচ্ছে করছে। মানে আমার পিসিমাকে অনেকটা আপনার মত দেখতে কিনা।'

ভবভূতির চোখের সামনে নিজের পিসিমার চেহারাটি ফুটে ওঠে। ছাঁটা চুল, পরণে থান, গলায় কণ্ঠী।

সর্বদা গঙ্গাজল ছিটিয়ে বেড়ান সর্বত্র।

যাক ভদ্রমহিলা এসে হানা দেবেন না এই যা ভরসা।

অতএব এই লেসের ব্লাউস আর কাঁধে পিন আঁটা শাড়ি পরা বাঁদিকে সিঁথি কাটা এবং সিঁথির দু'ধারে জরাজীর্ণ দু'খানি পাতা কাটা, গলায় হাড় বার করা এই মহিলাটির মধ্যেই নিজের পিসিমাকে দেখতে চায় ভবভূতি। কিন্তু চাইলেই কি পাওয়া যায়?

মিসেস হালদার মাথা নেড়ে বলেন, 'হতে পারে। পৃথিবীতে একরকম দেখতে দু'জন মানুষ থাকা বিচিত্র নয়, কিন্তু আমি সেটার কোনো মূল্য দিই না! অকারণ পিসিমা পিসিমা ডাকা আমার মতে অর্থহীন। কোন কারণ ঘটলে, আত্মীয়তা ঘটলে, আলাদা কথা। এই যে এ শহরে একটা মাছি মশা পর্যন্ত আমার অচেনা নয়, কিন্তু বলতে পারবে কেউ মিসেস হালদার ছাড়া আমার আর কোনো নামে ডাকে বলে?'

মশামাছির উল্লেখে ভয় খান ভবভূতি—কে জানে আবার বি. রায়ের প্রসঙ্গ উঠবে কিনা।

সদ্যোজাত মামাতো কাকাকে একেবারে নিঃশেষ করে দিতে ভবভূতি তাড়াতাড়ি বলে, 'আপনি যখন পছন্দ করেন না, তখন তো আর ওকথা উঠতেই পারে না। আমার পিসিমা আপনার যমজ বোনের মত দেখতে হলেও না। কিন্তু চা?

মালবিকা লজ্জা পাচ্ছিল।

যদিও পিসিমার অন্তরালে ভবভূতিকে ষড়যন্ত্রের ভাগীদার হতে দেখে সদ্য পরিচয়ের দূরত্ব ঘুচে একটা কৌতুককর অন্তরঙ্গতা এসে গেছে—যেমন মালবিকা আর ভবভূতি একটা দল, মিসেস হালদার একটা পক্ষ, তবু চা খাওয়াতে এত দেরী, এ দেখে ভারী লজ্জা করছে। ও তো বলেছিল, 'বংশী পেরে উঠবে না, আমি বরং—'

মিসেস হালদার উত্তেজিত হয়েছিলেন।

খুব ক্ষুব্ধ গলায় বলেছিলেন, 'এভাবে ওকে অবহেলা কোরা না খুকু! আমার জন্মদিনে আর তোমার পিসেমশাইয়ের মৃত্যুদিনে ও একা হাতে বারো চোদ্দজন নিমন্ত্রিতের রান্না করে তা জানো?'

মালবিকাকে জানতেই হয়। অতএব মালবিকাকে চলে আসতেও হয়। এসে যখন বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসলো, তখন মনে করলো. যাক গে, মরুক গে, বুড়ো যা পারে করুক গে।

কিন্তু এখন ভারী অস্বস্তি লাগছে। যে মুখফোঁড় লোকটা, হয়তো বলে বসবে, চায়ের লোভ দেখিয়ে টেনে আনলেন, এ তো দেখছি কলকাতায় ফিরে গিয়ে খেয়ে আসার মতো হলো।

তা এখন আবার পিসিমা অবহিত করিয়ে দিচ্ছেন, ওর বয়েস হয়েছে কাজেই একটু 'স্লো'।

ভবভূতি আবার বলে ওঠে, ঠিক আছে, ব্যস্ত হবার কিছু নেই। এতো সুন্দর হাওয়া এতেই সব চাহিদা মিটে যায়। বি. রায়কে মিসেস হালদারের স্মৃতির জগৎ থেকে নির্মূল কবে ফেলার জন্যে যতোটা সম্ভব চেষ্টা করতে হবে বৈকি।

মিসেস হালদার প্রীত হলেন।

বললেন, 'হাওয়া! হাওয়াই তো প্রাণ! আপনি যে এই বয়সেই আসল তথ্যটুকু বুঝে ফেলেছেন এটা ভালো। হ্যাঁ এখানের বাতাসে সে গুণ আছে। নইলে রায় বাহাদুর অভয় ঘোষ এখান থেকে নড়তে চাইতেন না কেন? আর প্রফেসর বাগচি—'

মালবিকা উঠে দাঁড়ায়, 'আমি বরং বংশীর ওদিকটা একটু দেখি গে পিসিমা—'

পিসিমা দৃঢ় গলায় বলেন, 'দেখবার কোন প্রয়োজন নেই খুকু! তুমি খুব টায়ার্ড হয়ে এসেছো, তুমি স্থির হয়ে বোসো—'

মালবিকা ভবভূতির দিকে হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, 'না মানে—'

'মানে কিছু নেই খুকু! বয়েস হলে লোকে একটু স্লো হবেই।'

তারপর. মানে এতক্ষণের পর তিনি কথায় আগের মতই কাটা কাটা উচ্চারণে একটু হেসে বলেন. 'অবশ্য তুমিও হওনি। তুমি এখনো সেই ছোট খুকুটির মতই ছটফটে আছো।'

মালবিকা কৃত্রিম গাম্ভীর্যে বলে, 'বলছো কি পিসিমা? জানো আমি একটা মস্ত বড় স্কুলের হেডমিস্ট্রেস!'

'হতে পারো, তাবে তোমার স্বভাবটি কিন্তু বদলায়নি। লক্ষ্য করছি তো? তুমি বসে রয়েছ বটে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে যেন ছুটোছুটি করছো। কারণ এদিকে তাকাচ্ছো, ওদিকে তাকাচ্ছো, হাত দুটোকে নিয়ে কি করবে যেন ভেবে পাচ্ছো না—'

সর্বনাশ! ভবভূতির মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে।

এই রকম সাংঘাতিক লক্ষ্য ভদ্রমহিলার?

দেখে অথচ যাকে মনে হচ্ছে জগতের কোনোদিকেই দৃষ্টি নেই, এই শহরের অতীতে নিমগ্ন হয়ে আছেন।

তবে কি ভবভূতির টেবিলের তলা দিয়ে পা বাড়িয়ে মালবিকার পায়ের ডগা চেপে ধরাটাও ওঁর নজরে পড়ে গেছে? হে ঈশ্বর! এখান থেকে কেটে পড়বার রাস্তা দেখিয়ে দাও ভবভূতিকে।

মালবিকা চঞ্চল হলো।

পিসিমা কি গোড়া থেকেই ওকে সন্দেহ করছেন? ও যে আমার সদ্য পরিচিত একটা রাস্তার লোক তা ধরে ফেলেছেন? হে ভগবান, কেন মরতেই বা আমার এ দুর্মতি হলো! ওর কপালে যা হতো, হতো, আমার কি বয়ে যাচ্ছিল। আমি কেন ওকে নাওয়া-খাওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে—

নাওয়াটা অবিশ্যি হয়েছে ভাল। স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে ভবভূতি বলেছে, 'মনে হচ্ছে জীবনে এই প্রথম স্নান করলাম। স্নানে এতো আরাম জীবনে পাইনি। ইঁদারার জল এতো ঠাণ্ডা হয়? না বিশেষ করে এত বাড়ির ইঁদারাটাই—'

বোধহয় কিছুটা বিশেষত্ব আছে। লোকেরা নাকি দূর দূর থেকে এসে এখানে জল নিয়ে যায়। তা সে তো নাওয়া।

খাওয়ার কি হলো?

মালবিকা গলা তুলে বললো, 'বংশী!'

মিসেস হালদার ব্যাকুল গলায় বলে উঠলেন, 'তাড়া দিও না খুকু, তাড়া দিও না। হঠাৎ হাতে-টাতে পড়ে যেতে পারে—'

'কিন্তু পিসিমা, মানে—'

ভবভূতি তাড়াতাড়ি যোগ করে, মানে এদিকে তো আবার ডিনার টাইম হয়ে এলো—'

'ঠিক! আপনার এই হুঁশিয়ারিটি আমার পছন্দ হলো।'

মিসেস হালদার হাত বাড়িয়ে আস্তে একবার ঘন্টিতে চাপ দিলেন 'কর-কর' করে একটা শব্দ উঠলো।

আর এতোক্ষণে বংশীকে দেখতে পাওয়া গেল।

আস্তে এসে দু'জনের মাঝখানে একটি ছোট টিপয় লাগালো, কাঁধ থেকে একখানি সদ্য পাটভাঙ্গা তোয়ালে তার ওপর পাতলো, ধীরে ধীরে চলে গেল। একটু পরে এলো, হাতে ট্রে।

নিতান্ত ছোট শিশুকে যেভাবে মা সন্তর্পণে বুকে ধরে এনে দোলায় শুইয়ে দেয়, তেমনি সন্তর্পণে ট্রেটি বুকে ধরে এনে টেবিলে নামালো।

একটি একটি করে টী পট, মিল্ক পট, সুগার পট, চামচ, ছাঁকনি, কাপ-প্লেট সাজালো, তারপর বারান্দা সংলগ্ন ঘরে ঢুকে কোথা থেকে যেন একটি বিস্কিটের টিন বার করে নিয়ে এসে মিসেস হালদারের হাতে দিল। তার মানে ওটা পরিবেশনের ব্যাপারে তার স্বাধীনতা কম। দু'টি খালি প্লেট গুছিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই তার।

মিসেস হালদার টিনটি খুলে প্লেট দু'টিতে খান কয়েক নোনতা বিস্কিট রেখে বললেন, 'লাগে তো আর ক'খানা নিও। বুঝলে খুকু? চা-টা তুমি নিজেই ঢেলে নিচ্ছ? আচ্ছা নাও।'

চায় চুমুক দিয়ে ভবভূতি একটু আরামের 'আঃ' শব্দ করে বলে, 'না না আর লাগবে না, ওটা আপনি তুলেই রাখুন। ডিনারের সময় তো পার হয়ে এলো।'

'ওঃ ঠিক বলেছেন। তবে এটা রেখেই আসি।'

বলে মিসেস হালদার বিস্কিটের টিনটি হাতে নিয়ে ধীরভাবে ঘরে ঢুকে যান। তাঁর প্রস্থানের সঙ্গে তাল রাখতেই বোধহয় দু'জনে একযোগে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

ভবভূতি গলা নামিয়ে বলে, 'ডেঞ্জারাস মহিলা' মাপ করবেন কিছু মনে করবেন না, মানে আমি তো রীতিমত ভয় পেয়ে যাচ্ছি।'

মালবিকা শুকনো আশ্বাসের গলায় বলে, 'ভয়ের কি আছে?'

'ভরসারও কিছু নেই। আপনি আবার হঠাৎ আমার এক মামাতো কাকাকে সৃষ্টি করে—'

মিসেস হালদার ফিরে এলেন। বললেন, 'মামাতো কাকার কথা কি বলছিলেন?'

ভবভূতি বেপরোয়া গলায় বলে, 'বলছিলাম মিস্ চৌধুরীকে, মামাতো কাকা তো? বহুদিন খবর জানা নেই। আগে জানতাম এখানে থাকেন, এখন বুঝতে পারছি বোধহয় আমার ওই জানাটা ভুল।'

মিসেস হালদার বলেন, 'কতদিন আগে জানতেন? মানে আমি তো এখানে আমার তরুণ বয়েস থেকেই আছি। এবং সবাইকেই চিনি, চিনতাম।'

ভবভূতি মনে মনে মাথার চুল ছিঁড়ে, মুখে বলে, 'সে আমি ঠিক বলতে পারব না। সাল তারিখ সম্পর্কে আমি ভীষণ অন্যমনস্ক।

মিসেস হালদার বলেন, 'তাতো দেখতেই পাচ্ছি। আপনি কাকাকে মামা বলে উল্লেখ করেন, মিসকে মিসেস বলে বসেন।....কিন্তু আর দু'খানা বিস্কিট নিলে পারতেন, নিষেধ করলেন।'

ভবভূতি গম্ভীর ভাবে বলে,—'না না আব ঠিক নয়, এক্ষুণি তো ডিনার টেবিলে গিয়ে বসতে হবে।'

অবশেষে সেই 'ডিনার টাইম' আসে। মানে বংশীর হিসেব মতো।

এবং মিসেস হালদারও একটু চঞ্চল হয়ে বলেন, আচ্ছা খুকু, তোমরা একটু বোসো। আমি বরং দেখি গে—'

উনি ওদিকে কোথায় যেন মিলিয়ে গেলে ভবভূতি বলে, 'আপনার বিষয়ে খুব দরকারি কয়েকটা কথা আমায় তাড়াতাড়ি শিখিয়ে দিন দিকি।'

'তার মানে?'

'মানে আপনার সঙ্গে যে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয় সেটা যাতে প্রমাণিত হয়—'

'হঠাৎ আপনাকে কি তথ্য দেব?'

'আহা বুঝছেন না? টুকে পরীক্ষায় পাস করার মতো গোটাকয়েক পয়েন্ট, দু'একটা ইয়ে ...মানে ধরুন, আপনি কি খেতে ভালবাসেন, কোন্ রঙের শাড়ি পছন্দ করেন, এর আগে কোথায় ছিলেন, কোন্ কলেজে পড়তেন, আর আমার সঙ্গে কতদিন এবং কবে আলাপ হয়েছে—'

মালবিকা বলে, 'অর্থাৎ কি, কেন, কবে, কোথায় কখন? তা আপনি বরং

চট্‌পট্‌ ফরম্‌ তৈরি করে ফেলুন, ফিলাপ করে দিচ্ছি। কিন্তু তাহলে আপনার সম্বন্ধেও তো আমার কিছু জানা দরকার।'

'তা বটে। না জানার জন্যই মামাতো কাকাকে এনে ফেলে—'

'এই চুপ! ওই শব্দটি আর উচ্চারণ করবেন না।'

কোথা থেকে যেন হাস্নু হানার মৃদু গন্ধবাহী এক ঝলক বাতাস এসে ওদের ওপর দিয়ে বয়ে গেল।

ভবভূতি আস্তে বললো, 'আমার কিন্তু সত্যি ভারী অদ্ভুত লাগছে। নিজের সম্বন্ধেই মনে হচ্ছে, কি কেন? গতরাত্রেও ঠিক এ সময়ে জানতুম না আজ এই অবস্থায় এই পরিস্থিতিতে এরকম একটা জায়গায় বসে আছি।'

'আমি আপনাকে এই অদ্ভুত পরিস্থিতিতে টেনে নিয়ে এসে বিব্রত করলাম।'

ভবভূতি একটু আচ্ছন্ন গলায় বলে, 'বিব্রত? তা হবে!'

'বা বিব্রত নয়?' মালবিকা পরিস্থিতিকে সহজে নিয়ে আসবার জন্যে ব্যস্ত হয়। 'যে জেরার মুখে ফেলে দিয়েছি! প্রায় পুলিশী জেরা!'

'আমাদের মনে হচ্ছে উনি ভয়ঙ্কর একটা ভুল ধারণা পোষণ করেছেন—'

'ভুল আবার কি? যাঃ।'

মালবিকা গলা ফিকে ফিকে শোনায়।

'আপনিও অনুভব করছেন।'

মালবিকা আস্তে বলে, 'ওরা সেকেলে মানুষ তো, তাছাড়া বিশেষ করে উনি একটা খুঁটিতে আটকে বসে জীবন কাটিয়ে দিলেন। ওদের কালের ধারণা হচ্ছে, বিশেষ বন্ধুত্ব না হলে কোনো মেয়ে কোনো ছেলের সঙ্গে একত্রে ঘোরে না। আর সেই বন্ধুত্ব একটি বিশেষ পরিণামের দিকে না এগোনো পর্যন্ত সে বন্ধুকে নিয়ে গুরুজনদের সামনে এনে দেখায় না। সেকেলে মানুষদের এই সংস্কার একটু ক্ষমা ঘেন্না করে মেনে নিন একটা সন্ধ্যা। কাল সকালেই তো আপনার ছুটি।

'কাল সকালেই ছুটি? তা বটে!' কোথায় যেন একটা মৃদু নিঃশ্বাসের মত শব্দ হয়।

একটুক্ষণ চুপচাপ। ওদিকে সামান্য টুংটাং আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, বাসনের, চামচের।

তার মানে এই নিভৃতির কাল ফুরিয়ে এলো।

মালবিকা আস্তে বলে, 'কিন্তু আপনি যে কাজে এসেছেন, তার কি হচ্ছে?'

'ওঃ! ওই বাড়ি আর জমি বিক্রী করবার ব্যাপারে? ভাবছি থাকগে ওসব ঝামেলা কালই কলকাতায় ফিরে যাই। আপনি আপনার পিসিমার স্নেহরাজ্যে একধিপত্য করুন।'

'ওমা, কষ্ট করে এলেন! আপনি একটা কাজ করুন না, পিসিমাকে জিজ্ঞেস করুন না, যদি কোনো খদ্দেরের সন্ধান দিতে পারেন।'

'বলেছেন একথা?'

'বলছি তো।'

'আমার কিন্তু ওঁর সঙ্গে কথা বলতেই ভয় করছে। কি বলতে যে কি বলে বসবো! কোন ইতিহাসের অধ্যায়ে খুলে পড়বে--'

মালবিকা একটু হেসে ওঠে। মালবিকা তারপর বলে, 'তা ওটা তো আপনার বি. রায়ের মত হবে না। সত্যিকার নিজেদের বাড়ি রয়েছে যখন। সেটা কোন্ দিকে জানেন তো?'

'জানি। ঝর্ণার দিকে যেতে শহর ছাড়া একটা জায়গায়—'

'বাড়ির নাম আছে তো?'

'আছে একটা। 'অনুপমা কুটীর।'

'ও নির্ঘাৎ পিসিমার জানা।'

'তাই মনে হচ্ছে। মানে সেই আশঙ্কা হচ্ছে।'

'আশঙ্কার কি আছে?'

'কি জানি। হয়তো ওঃ 'অনুপমা কুটীর' নিয়ে আমার অজানা কোনো রহস্যময়, অথবা দুঃখময় ইতিহাস ফেঁদে বসবেন।'

'তবে থাক্, বলবেন না।'

ভবভূতি ব্যস্ত হয়ে বলে, 'আরে না না, বিশেষ কিছু ভাববেন না। এমনিই বললাম। বরং আপনি ঠিকই বলেন, ওঁকে বললে আমার একটু সুরাহাও হতে পারে।'

এই সময় বংশী এসে দাঁড়ালো। অর্থাৎ ডিনার প্রস্তুত।

তা লোকটা সাধ্যমত অনেক করেছে বটে।

ফ্রায়েড রাইস করেছে, ডিমের ঝাল করেছে, আলুর দম করেছে, চাটনীও করেছে কিসের একটা।

ভবভূতি চেয়ার টেনে বসে পড়ে বংশীকে বলে, 'উঃ, দারুণ। ভাল গন্ধ বার করেছে তো। এখন বুঝতে পারছি দুর্দান্ত খিদে পেয়েছে।

'এই তো, এই জন্যই—'

মিসেস হালদার হৃষ্টচিত্তে বলেন, 'এই জন্যই চায়ের সঙ্গে বেশি কিছু খেতে দেওয়ার বিরোধী ছিলাম আমি। খিদে নষ্ট করতে নেই। খিদে জিনিসটা ভাগ্যের আশীর্বাদ। এই তো দেখুন না আমার অবস্থা। খিদে মোটে হয় না।'

বলে নিজের আহার্য টেনে দিয়ে বসেন মিসেস হালদার।

খুবই অল্প সত্যি।

তবে কোলের উপর পরিপাটি করে ন্যাপকিনটি পাতেন, ছুরি কাঁটা চামচগুলি সাবধানে ঠিক মত গুছিয়ে নেন, সবিস্ময়ে বলে ওঠেন, 'ও কি খুকু, তোমরা হাতেই খাচ্ছো?'

খুকু অম্লান মুখে বলে, 'হ্যাঁ পিসিমা! হাতে না খেলে আমি খেয়ে সুখ পাই না।'

'তোমার বন্ধুও তো দেখছি তাই—'

ভবভূতিও অম্লান মুখে বলে, 'তাইতো। বলতে গেলে বন্ধুত্বের পত্তনই ওই নিয়ে।'

মিসেস হালদার সাবধানে আলুরদমে কাঁটা ফোঁটাতে ফোঁটাতে বলেন, 'শুনবো, সবই শুনবো, একে একে। খুকুর ব্যাপারে তো আমি উদাসীন থাকতে পারি না। তবে এখন নয়, ধীবে সুস্থে। এখন বরং অন্য আলোচনা করুন উনি। কলকাতার বর্তমান পরিস্থিতি বলুন।

স্টুডেন্টরা না কি পলিটিক্স নিয়ে খুব মাথা ঘামাচ্ছে?'

'হ্যাঁ তা তো ঘামাচ্ছেই।'

'খুব দুঃখের কথা। খুব দুঃখের কথা। আমাদের সময় এ রকম ছিল না। আমরা যখন পড়েছি—'

'তুমি তো বেথুনের সেরা ছাত্রী ছিলে, তাই না?'

মিসেস হালদার ঈষৎ ব্রীড়াবনত ভাবে বলেন, না, সেরা ছাত্রী বললে অহঙ্কার করা হয়। তবে হ্যাঁ, বি-এ, তে স্কলারশিপ পেয়েছিলাম একটা—'

'আর কি সুন্দর সেলাই করতে তুমি পিসিমা?'

'করতাম নয় খুকু, এখনো করি। তোমার বিয়েতে প্রেজেণ্ট করবার জন্য

একটা ডাবল সাইজ বেডকভারে কাশ্মীরী স্টিচ দিয়ে এমব্রয়ডারি করছি, সেটা দেখাবো তোমায়। ওটা হয়ে গেলে টেবল ক্লথটা ধরবো।'

'উঃ এখনো তোমার চোখ এতো চলে?'

'চলে কথাটার কোনো অর্থ নেই খুকু? চালাতে হয়। চালিয়ে চললেই চলে। থাক নিজের কথা, মিষ্টার রায় আপনি কিছু বলুন? অতিথিকেই সর্বদা কথা বলার স্কোপ দেওয়া উচিত।'

ভবভূতি মাথাটা নীচু করে হাসি গোপন করে বলে, 'আমি? আমি আর কি বলবো? বলবার মধ্যে বলতে পারি, আর একটু ফ্রায়েড রাইস দিলে মন্দ হতো না।'

মালবিকা হেসে ওঠে। মিসেস হালদারও একটু হাসেন। তারপর হাত বাড়িয়ে টেবিলের মাঝখানে রক্ষিত—সুন্দর পোর্সিলেনের পাত্র থেকে বাঁ হাতে একখানি ঝক্‌ঝকে চামচে দিয়ে কিছুটা ফ্রায়েড রাইস তুলে ভবভূতির পাতে দিয়ে বলেন, 'আর একটু দিই?'

'অল্প।'

'লজ্জা করে খাবেন না, আপনি খুকুর বন্ধু আমার সম্মানের আব আদরের অতিথি।'

'না না লজ্জার কি আছে। তবে এখানের যা আবহাওয়া, অতিথির পক্ষে লজ্জা পাবার মতো।'

আর একবার একটু হাসি উঠে। ডিনার টেবিলে হাসিখুসি সরস গল্পই করা নিয়ম, মিসেস হালদার তাতে প্রীত হন।

টেবিলের মাঝখানে রাখা এক ঝাড় ফুল সমেত ফুলদানীর পাশ থেকে সুন্দর গড়নের লবন ও মরিচদানী থেকে একটু মরিচ গুঁড়ো নিয়ে বলেন, "খুকু তোমার ফ্রেণ্ডকে ভালো করে খেতে বল।"

'সে ওঁকে বলতে হবে না।'

মালবিকা মুচকি হেসে বলে, 'বংশীর কেন দেবি হচ্ছিল বুঝেছি। এর মধ্যে বেচারী আবার ফুল এনে তোড়া গেঁথে ফুলদানী সাজিয়ে—'

মিসেস হালদার আহত গলায় বলেন, 'এটা তো ওর কেবলমাত্র আজকের জন্যই নয় খুকু! রোজই করে।'

'রোজই করে?'

'করবে না? ডাইনিং টেবিলে ফ্লাওয়ারভাস না রাখলে চলে? মনে করো না

আমি একা থাকি বলে নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম করি। কেন করবো? মানুষ জিনিসটা কি। কতকগুলি নিয়মের সমষ্টি কিনা?'

'তা তো বটেই।' ভবভূতি অগাধ সায় দেয়।

মিসেস হালদার বললেন, 'মিষ্টার রায়, আপনি কোথায় পড়াশুনা করেছেন?'

'কোথায় আর, কলকাতায়।'

'আহা সে তো আমিও। কোন্ স্কুলে, কোন্ কলেজে—'

মালবিকা প্রমাদ গনে। আবার কি বলতে কি বলে বসে ভবভূতি। হয়তো সেই নিয়েই একখানা জেরার সৃষ্টি হবে।

মালবিকা তাই ঝপ করে বলে ওঠে, 'সে সব না হয় পরে শুনো পিসিমা, এখন উনি একটা মুস্কিলে পড়েছেন, সেই সম্পর্কে তোমায় বলছিলাম—'

'মুস্কিলে? কি মুস্কিলে?'

'মানে আর কি কোন এক সময় ওঁর বাবা এখানে একখানা বাড়ি বানিয়ে ছিলেন—'

'বাড়ী বলাটা অবশ্য ঠিক নয়! ভবভূতি বলে, 'কুটির'!'

'তা না হয় তাই হলো। তা উনি সেই বাড়িটা বিক্রী করে দিতে চান।'

ততক্ষণে মিসেস হালদার সোজা হয়ে বসেন, 'এখানে বাড়ি আছে ওঁর? সে কথা তুমি এতোক্ষণ বলোনি আমায়? কোথায় সে বাড়ি? কি নাম?'

ভবভূতি আস্তে বলে, 'ওই ঝরণার দিকের পথে না কি অনেকটা জমির মাঝখানে ছোট্ট বাড়ি, আমার ভাল মনেও নেই। সে বাড়ির একটা ফটো আছে কলকাতার বাড়িতে, সেইটাই স্মৃতিতে রেখে—'

'নাম নেই?'

'আছে। নাম অনুপমা কুটির।'

মিসেস হালদার প্রায় তীরের মতো সোজা হয়ে বসে বলেন, 'কি বললেন? 'অনুপমা কুটির' আপনাদের বাড়ি? মানে আপনার বাবার? কিন্তু ওটা তো রায় চৌধুরীদের—'

'তাই!'

ভবভূতি একটু লজ্জিতভাবে বলে, 'আমিও তাই। বাহুল্য বলে ওই চৌধুরীটা আর লিখি না।'

'আশ্চর্য! বাহুল্যবোধে পদবীর সবটা লেখেন না? আপনি যদি চট্টোপাধ্যায়

হতেন? শুধু চট্টো লিখতেন? ছি ছি ! কিন্তু তা হলে—অনুভূতি রায় চৌধুরী আপনার কে হলেন?

'আমার বাবা।'

'আপনার বাবা!'

মিসেস হালদার চেয়ারের মধ্যে ডুবে বসে পড়ে বলেন, 'আপনি অনুভূতি রায় চৌধুরীর ছেলে। আর এতোক্ষণে আমি—ছি ছি! আপনি অনুভূতিবাবুর ছেলে।'

পঙ্কজিনী হালদার যেন ওই খবরটার আকস্মিকতায় স্তব্ধ হয়ে গেছেন। তাই অনেক্ষণ কোনো কথা বললেন না। হাতের চামচ খানা হাতেই স্থির হয়ে আছে।

এই স্তব্ধতার মাঝখানে কথা বলে ওঠায় অস্বস্তি আছে, আবার একেবারে নীরব থাকাটাও স্বস্তির নয়। একটু অপেক্ষা করে ভবভূতিই এ স্তব্ধতা ভাঙায়, আস্তে বলে, 'আমার বাবাকে আপনি চিনতেন?'

'চিনতাম!'

একটি মৃদু গভীর নিঃশ্বাস বাতাসে মিলিয়ে যায়।

আবার স্তব্ধতা। এও তো এক বিড়ম্বনা। ভবভূতি ভয় পায়।

কি জানি আবার তার বাবাকে নিয়ে কোন ইতিহাস রচিত হয়ে আছে এখানে। ভদ্রমহিলার ওই চিনতাম বলার ভঙ্গিটা তো রীতিমত সন্দেহজনক। তার সঙ্গে আবার এই স্তব্ধতা আচ্ছা বিপদে পড়া গেল।

উঃ, সাধে বলেছি ডেঞ্জারাস মহিলা! ভবভূতি মনে মনে বলে। তবু স্তব্ধতা ভাঙা দরকার। কথাই ভরসার যোগানদার।

ভবভূতি অতএব কথারই আশ্রয় নেয়। খুব সহজভাবে, যেন এইমাত্র এখানে কোনো মৃদু গভীর নিঃশ্বাস পড়েনি, যেন বেশ কিছুক্ষণ শব্দের আধিপত্য হারিয়ে যায়নি, যেন এমনি কথার পিঠে কথা কইছে সে, এই ভাবে বলে, 'আশ্চর্য তো! জানা থাকলে তো আগেই এসে পরিচয় দিতাম।

পঙ্কজিনী এবার গম্ভীর ভাবে বলেন, 'বোঝা উচিত ছিল। আমি প্রথমেই বলেছি, এখানের সব বাড়িই আমার চেনা। আর 'অনুপমা কুটির—'

আবার থেমে গেলেন। তারপর যেন ঘুম ভেঙে ওঠার মত বললেন, 'কটেজটা সারাতে এসেছেন?'

এই পরিস্থিতিতে ভবভূতি কি বলে বসে না বসে কে জানে, মালবিকা

নিজেই হালটা হাতে নেয়। একটু হালকা সুরে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'মোটেই না গো পিসিমা! ওটিকে উনি বিক্রী করে ফেলবেন মনস্থ করে এসেছেন!'

'বিক্রী করে ফেলবেন?'

পঙ্কজিনী হালদার যেন বিদ্যুতের আঘাত পান। পঙ্কজিনী হালদার শিউরে ওঠেন!

'আপনার পিতামহীর নামাঙ্কিত পিতৃস্মৃতি, সেটা আপনি বেচে দেবেন মনস্থ করেছেন? খুব আহত হলাম ভবভূতিবাবু!'

ভবভূতিবাবুর মাথাটা ঘুরতে থাকে।

একি গোলমেলে অবস্থায় পড়া গেলরে বাবা! ট্রেনে এই মেয়েটার সঙ্গে দেখা হওয়াই দেখছি গ্রহনক্ষত্রের ফের! তার থেকে একা আসতাম, কোনো হতচ্ছাড়া হো'টেল ফোটেল উঠে একটু খেয়ে নিতাম, একে ওকে জিজ্ঞেস করে, জলের দামে, ধুলোর দামে, যাহোক করে অনুপমা কুটিরের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কেটে পড়তাম! তার বদলে এ কী?

ওই ভদ্রমহিলা যে কিসে এবং কি পরিমাণ আহত হবেন, তাতো বোঝা মুস্কিল! অথচ ওই আঘাতের দায়টা যেন আমারই ঘাড়ে এসে পড়ে অপরাধী করে তুলছে। ভবভূতি ওই অপরাধী ভাবটা ঝেড়ে ফেলবার আশায় বলে, 'আমার বাবার সঙ্গে যখন পরিচয় ছিল, তখন আর আমাকে আপনি বলে কথা বলছেন কেন? তুমি বললেই তো ভাল।'

মিসেস হালদার বেশ তাড়াতাড়িই মাথা নাড়েন, এবং তাড়াতাড়িই বলেন, 'আমি ভাল মনে করি না। পূর্ণ বয়স্ককে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া উচিত। যেহেতু আপনার বাবার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, এই অজুহাতে আপনাকে পূর্ণবয়স্কের মর্যাদা দেব না, এ হতে পারে না। অবশ্য এর পরে কথা আলাদা।

মালবিকারও মাথা ঘুরতে থাকে। পিসিমা ক্রমাগতই যেভাবে পরের উল্লেখ করে চলেছেন, সেটা তো বিপজ্জনক। এই জন্যই বলে, মিথ্যার চারা মহীরুহ হয়ে দাঁড়ায়। এক মিথ্যা ঢাকতে শত মিথ্যা কইতে হয়! মিথ্যার একটা ফাঁস থেকে মিথ্যার জাল বুনতে হয়। মরতে যদি গোড়াতেই বলে দিতাম, ভদ্রলোকের সঙ্গে আজই, এই মাত্র পরিচয় হয়েছে, একটু মায়া-দয়া করে নিয়ে এলাম—তাহলে তো এ বিপদে পড়তে হত না। ওই বা কি ভাবছে! কি জানি বাবা একথা ভেবে বসেছে কিনা, যে এসবই আমার চালাকি! এ সব পূর্ব ব্যবস্থা মত ষড়যন্ত্র, বর ধরার ফাঁদ। হয়তো ভাবছে এই রকম করে থাকি আমি।

মালবিকার মাথা ঝিমঝিম করে। মালবিকা অন্য প্রসঙ্গে যায়। আস্তে বলে, 'তোমার যে সবই পড়ে থাকলো পিসিমা, কিছু খেলে না তো?'

পিসিমা বলেন, 'আমি ওই রকমই খাই খুকু! তোমরা ভাল করে খাও। আমি তেমন মন দিয়ে দেখাশুনা করতে পারলাম না! মানে আকস্মিক একটা অদ্ভুত পরিস্থিতিতে পড়ে—এখন বুঝতে পারছি কেন বারবার মনে হচ্ছিল এঁকে কোথায় যেন দেখেছি। হ্যাঁ—এই, ছেলেকে আমি দেখেছি। তখন বোধহয় বছর ছয়েক বয়স হবে, ফুটফুটে সোনার পুতুলের মত ছেলে—'

'ফুটফুটে সোনার পুতুলের মত?'

ভবভূতি চেষ্টা করে জোরে হেসে ওঠে, 'তাহলে ভুল করেছেন। আর কাউকে দেখেছেন?'

পঙ্কজিনী মুখ তুলে একটু তাকিয়ে বলেন, 'আর কাকে দেখবো? আপনার বাবার তো আর কোন ছেলে ছিল না। ওই একটিই ছেলে। বয়েসও হলে চেহারা বদলায়।'

হোপলেস! মনে মনে বলে ভবভূতি, এরপর আমার ঠিকুজি কুলুজি, বংশ তালিকা, ইত্যাদি বার করে আরো কি কি টেনে বার করবেন কে জানে! রাতারাতি কেটে পাড়া ছাড়া গতি নেই আমার। অবশ্য সে সব বার করলে আমার ক্ষতি কিছু নেই। আমি তো আর যে-সে ঘরের ছেলে নই। তবে অস্বস্তি হচ্ছে এর ভাবভঙ্গী দেখে। পরলোকগত অনুভূতি রায়চৌধুরীর সঙ্গে প্রেম-প্রণয় ঘটিত কোনো রকম ব্যাপার বা ঐ জাতীয় কিছু ছিল না তো ভদ্রমহিলার? সেই সব স্মৃতি এখন রোমন্থন করতে বসলেই তো গেছি।

ভবভূতি চেষ্টা করে একটা হাই তোলে। তারপর বলে ওঠে, 'ইস! দারুণ ঘুম পেয়ে যাচ্ছে। এতো চমৎকার হাওয়া—আচ্ছা এইখানে একটা চারপাই-টারপাইতে শুয়ে পড়া যায় না?'

পঙ্কজিনী চমকে ওঠেন।

বলেন, এইখানে চারপাইতে?'

'আপনি বলছেন কি ভবভূতিবাবু? আপনার বাড়িতে অতিথি এলে আপনি তাকে বারান্দায় চারপাইতে শুতে দিতে পারেন? অ্যাবসার্ড কথা!'

ভবভূতি বলে, 'না মানে এই বারান্দাটা এতো লোভনীয়! ইচ্ছে হচ্ছিল—'

'অদ্ভুত ইচ্ছেকে প্রশ্রয় দিতে নেই। আমার এই দীনের কুটিরে সব থেকে

ভাল ঘরখানিই অতিথির জন্য সাজানো থাকে। সে ঘরেও প্রচুর হাওয়া। তিন দিক খোলা—'

যত অন্য প্রসঙ্গ হয়, ততই ভাল। ভবভূতি মহোৎসাহে বলে ওঠে, 'তাই নাকি?' এটাও অদ্ভুত তো! সব থেকে ভাল ঘরটি কে কবে আসে বলে—তা' অতিথি-টতিথি প্রায় আসেন বোধহয়?'

'প্রায়ই?'

পঙ্কজিনী হালদার একটু হতাশ ভাবে হেসে বলেন, 'প্রায়? কদাচিৎ! দৈবাৎ। শেষ কে কবে এসেছিল বলতে গেলে অনেক দূরের ক্যালেণ্ডারে পিছিয়ে যেতে হবে।...খুকু আসছে বলে ঝেড়েমুছে রাখা হয়েছে—তা খুকু না হয় আমার কাছে থাকবে।'

'বাঃ। ওঁর জন্যে ব্যবস্থা করা সুন্দর ঘরটি আমি দখল করে নেব? না না সে হয় না। মিস চৌধুরী, আমি জোর আপত্তি করছি!'

মালবিকা হেসে বলে, 'আপনার আপত্তি শুনছে কে? আমাদের দিকে ভোট বেশি! এমন কি বংশীকে ভোট দিতে বললেও—'

'সে তো বুঝলাম! কিন্তু আমার মধ্যেও তো বিবেক বলে একটা বস্তু আছে।'

পঙ্কজিনী দৃঢ়ভাবে বলেন, 'সে বস্তুকে কাজে লাগাবার অন্য ক্ষেত্র আছে। খুকু যাও, যাও বংশী ঘরটাকে কিভাবে রেখেছে নিজে চোখে দেখে দাওগে। তোমাদের সব ছেলেমানুষী কাণ্ড। তুমি আসছো, শুধু এইটুকুই জানিয়েছো, সঙ্গে তোমার বন্ধু আসছেন, যিনি আমার সম্মানীয় এবং প্রিয় অতিথি হবেন, তাঁর কথা উল্লেখ করবে তো? তাহলে এভাবে—মানে উনিও অপ্রতিভ হচ্ছেন, আমিও অস্বস্তিবোধ করছি।....সেবারে তুমি আসছি লিখে আসনি। এবার তো তাই তোমার সম্বন্ধে শিওর ছিলাম না।...যাক কাল সকালে কথা হবে। ভবভূতিবাবু ক্লান্তিবোধ করছেন। আমিও—হ্যাঁ, আমিও একটু তাড়াতাড়ি বিছানায় যেতে চাই আজ। হঠাৎ টায়ার্ড ফীল করছি।....তুমি দেখে এসো ওঁর ঘরে খাবার জল আছে কিনা, মশারী ভাল ভাবে টাঙানো আছে কিনা—

মালবিকা তাড়াতাড়ি বলে, 'আহা সে আর দেখতে হবে না পিসিমা, বংশী আমার থেকে অনেক বেশি করিৎকর্মা—'

পঙ্কজিনী হালদার দৃঢ়ভাবে বলেন, 'তাহোক তোমারও একবার দেখা দরকার! বাড়িতে অতিথি এলে তাঁকে যত্ন করা বাড়ির মেয়েদের ডিউটি। আমার বাবা, মানে তোমার দাদু বলতেন এটা। বাড়িতে কেউ এলে লোকজনকে

দিয়ে সব কাজ করানো পছন্দ করতেন না। এমন কি রান্নাবান্নাও, মা নিজে না করলে ক্ষুণ্ণ হতেন। আমাদেরও—মানে তোমার আর একজন পিসিমা ছিলেন জানো তো? অল্প বয়সে মারা যান, তা বাবা আমাদের বলতেন—অতিথির সুবিধে অসুবিধে তোমরা দেখবে। এটা বাড়ির মেয়েদের ডিউটি। সে হিসেবে তোমারও ডিউটি রয়েছে। তাছাড়া এক্ষেত্রে উনি তোমার বন্ধু, সেদিক থেকে তোমার স্পেশাল ডিউটি।'

মালবিকার মুখে হালকা একটু হাসি ফুটে ওঠে।

মালবিকা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে বলে, 'তাই যাই, সাধারণ এবং স্পেশাল দু'টি ডিউটি দিয়ে আসি। চলুন ঘর দেখাইগে।'

সঙ্গে সঙ্গে ওর পিছু পিছু চলে যেতে লজ্জা আছে, তাই ভবভূতি বলে, 'ঘর দেখবার কিছু নেই, ওই তো বারান্দায় ওদিকটায় তো? ও আমি দেখে নিচ্ছি। আর দু'মিনিট এই চমৎকার বারান্দাটায় বসে নিই।'

পঙ্কজিনী চলে যাচ্ছিলেন, একটু থমকে দাঁড়ান, অস্ফুটে বলেন, 'আশ্চর্য! ঠিক বাবার মত কথার ধরন! রায়চৌধুরীও এইভাবে—' একটু যেন স্খলিতভাবে চলে যান।

ভবভূতি যখন সেই অতিথি-স্পেশাল ঘরটায় গিয়ে ঢোকে, তখন মালবিকা একটা খোলা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, ঘরের দিকে পিঠ ফেরানো। খোঁপাটা ঈষৎ ভেঙে ঘাড়ের কাছে লুটোচ্ছে। অথবা স্নানের পরে ভিজে চুল হাতে জাড়িয়ে রেখেছে। খবু স্তব্ধ ভাব।

ভবভূতি একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে একটা চেয়ার নাড়ায়।

মালবিকা চমকে ফিরে তাকায়। তারপর বলে, 'এসে গেছেন? আমি তো ভাবছিলাম বোধ হয় ওই চমৎকার বারান্দায় শুধু মাটিতেই হাত পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।'

'খুব দেরী হয়েছে আমার?'

'কি জানি। আমার তো মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ।'

বলতে যাচ্ছিল অনন্তকাল, সেটা আর বলল না।

ভবভূতি চেয়ারটা ঠেলে দিয়ে বললো, 'বসুন।'

'বাঃ এখন আবার বসে গালগল্প নাকি? চললাম।'

'আহা একটু নায় করলেই গালগল্প! বন্ধু যখন।'

মালবিকা মৃদু হেসে বলে, 'ওই শব্দটা পিসিমা এতোবার ব্যবহার করেছেন যে মনে হচ্ছে সত্যে পরিণত হয়েছে।'

'জানেন তো একটা মিথ্যাকে বারবার উচ্চারণ করে থাকলে, সেটা সত্যি হয়ে দাঁড়ায়!' মালবিকা একটু তাকিয়ে থেকে বলে, 'মিথ্যা?'

'তা নয়? আপনার কি মনে হচ্ছে?'

'শাস্ত্রে আছে এক সঙ্গে তিন পা হাঁটলেই বন্ধু বলে গণ্য করা যায়।'

'ওঃ শাস্ত্রে? আপনি তো আবার খুব শাস্ত্রে বিশ্বাসী।' হেসে উঠে বলে, 'হবেই তো, পিসিমার ভাইঝি তো। ব্যবহারে শাস্ত্রের এতটুকু এদিক ওদিক হবার জো নেই। সত্যি বলতে ওঁকে আমার দারুণ ভয় করছে। আমি কিন্তু কাল ভোরবেলাই পালাবো।'

'সে আপনার ইচ্ছে। কিন্তু এতো ভয়ের কি আছে?'

'ভরসাও নেই। যেভাবে উনি আমার বাবার স্মৃতিতে আলোড়িত হয়ে উঠলেন—'

'তাতে আপনার ভয় কিসের? সবই তো অতীত হয়ে গেছে।'

'তা ঠিক। তবু—নাঃ, ভোরবেলাই পালাবো। ওঁকে বলে দেবেন, হঠাৎ কলকাতার একটা দরকারি কাজ মনে পড়ায়—'

মালবিকা স্থির স্বরে বলে, 'তা তাহলে শুধু পিসিমাই নয়, আমিও ভাববো, আপনার সবটা ব্লাফ। রায় চৌধুরীদের সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই। মামাতো কাকার মতো ওটাও হঠাৎ তৈরি।'

'আপনিও ভাববেন?'

'ভাবাই তো স্বাভাবিক। বরং আরো ভাবতে পারি, জুয়াচুরি করে অপরের সম্পত্তি বেচে দিয়ে কিছু লাভ করতে এসেছিলেন, ধরা পড়ার ভয়ে কেটে পড়লেন।'

'এতোদূর পর্যন্তও ভাবতে পারবেন।'

'কেন নয়? যে অতিথি এতো আদর সমাদর ফেলে হঠাৎ না বলে পালায়, তার সম্বন্ধে আর কি ভাবতে পারে লোকে?'

'আপনাকে তো না বলে পালাচ্ছিলাম না।'

'ও বলাটা কিছুই নয়।'

'তার মানে এখানেই স্থিতি? এবং আপনার ওই ডেঞ্জারাস পিসিমার কাটা কাটা কথা, এবং পুলিশী জেরার মুখে পড়ে কচুকাটা হই?'

'উপায় নেই।'

ভবভূতি ঘরটার দিকে তাকিয়ে দেখে।

মানে এতোক্ষণ ঘরটার কথা খেয়ালে আসে।

সত্যিই বাড়ির সেরা ঘর।

তিনদিকে তিনটি বড় বড় জানালা, কোনো একদিক থেকে সেই হাস্নু হানার মৃদু গন্ধটুকু বাতাসে ভেসে আসছে। সামনের জানলাটার সামনে অন্ধকারে কোনো শাখাবহুল গাছ বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে, ঘরের আলো মৃদু নীলচে।

দেয়ালের ঘড়ি, দেরাজের ওপর রক্ষিত কাট-গ্লাশের ডিক্যাণ্টার, বড় আর্শির গায়ে ঝোলানো হাতে বোনা লেসের পর্দা, সব কিছুই যেন কোনো এত অতীত সমৃদ্ধির সাক্ষ্য বহন করছে।

ভবভূতি বলে ওঠে, 'মনে হচ্ছে আমি যেন পঞ্চাশ বছর আগে সাজিয়ে রাখা একটা ঘরে হঠাৎ এসে ঢুকে পড়েছি।'

'ঠিকই মনে হচ্ছে পঞ্চাশ বছর আগেরই। না হয়তো তার কাছাকাছি!'

'ঠিক অনধিকার প্রবেশের মত লাগছে।'

'অধিকার অনধিকারের প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামিয়ে শুয়ে পড়ুন।'

'শুতে ইচ্ছে করছে না।'

'এই যে বললেন দারুণ ঘুম পাচ্ছে।'

'ওটা ছল।'

'হু' তাই তো ভাবনা হচ্ছে। কোন্‌টা যে আপনার ছলনা আর কোন্‌টা—'

ভবভূতি আস্তে বলে, 'আপনি আমায় এখনো বিশ্বাস করতে পারছেন না।'

'খুব মিথ্যা নয়। মনে হচ্ছে হঠাৎ যেন সবকিছু হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে।'

'স্বাভাবিক।' ভবভূতি বলে, 'কতটুকুই বা দেখলেন আমায়। অথচ মজা দেখুন', একটু হেসে উঠে বলে, 'আমাদের এখন দীর্ঘ দিনের পরিচিত বন্ধুর ভূমিকায় অভিনয় করে যেতে হবে।'

'দু'চার দিন অভিনয় করতে করতে হয়তো আর চেষ্টা করে অভিনয় করতে হবে না।'

ভবভূতি হঠাৎ একটু এগিয়ে আসে আগ্রহ ব্যাকুল গলায় বলে ওঠে, 'বলছেন? বলছেন একথা?'

'বলছি, মানে আর কি অনুমান করছি। কিন্তু আর নয়, পিসিমা ভাববেন কি?'

'কি আর ভাববেন? ভাববেন বন্ধুর সঙ্গে জমিয়ে বসে গল্প করছে।'

'এটা সেই টাইম?'

'আহা, জমে গেলে কি আর টাইমের জ্ঞান থাকে? কিন্তু আমাকে যে কিছু শিক্ষা দীক্ষা দেবার কথা, তার কি করলেন?'

'শিক্ষাদীক্ষা?'

'বাঃ ওই যে বলেছিলাম, আপনার বিষয়ে কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য আমায় দিয়ে রাখতে। মানে আপনার পিসিমার জেরার মুখে অন্ততঃ কিছুক্ষণ যাতে লড়তে পারি। এক কথাতেই না ফোর-টোয়েন্টি প্রতিপন্ন হয়ে যাই?'

'দু'চার কথাতেই সব জেনে বুঝে ফেলবেন?'

'সেটা অবশ্য ধৃষ্টতা। তবু—'

'আচ্ছা তা'হলে ওই যা বলছিলাম, একটা ফরম প্রস্তুত করে রাখুন, কাল ভোরবেলা পালানো হচ্ছে না?'

'তাহলে কাল ভোরবেলা পালানো হচ্ছে না?'

'না।'

'আচ্ছা আপনার খুব আশ্চর্য লাগছে না?'

'এখনো ভাল করে ভেবে দেখিনি—' মালবিকা কথাকে সহজ খাতে এনে ফেলবার জন্যে বলে, অনবরত তো ম্যানেজ করার দিকেই চিন্তা ভাবনাগুলোকে নিয়োজিত রেখেছি।'

'সে তো আমিও! তবু কি অদ্ভুত যে লাগছে! এই ঘর, এই পরিবেশ! সামনে আপনি! আমি এখানে সমাদরের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হলাম।.....অথচ আমি কে?'

মালবিকা বলে, 'একেবারে কেউ নয়, সেটা আর এখন বলতে পারেন না। আপনি অনুভূতি রায় চৌধুরীর ছেলে। যাঁর নামে এ বাড়ির মালিকের স্মৃতি আলোড়িত হয়ে ওঠে।...যাকগে বাজে কথা। ঘুমিয়ে পড়ুন তো।.....ওই দেরাজের ওপর আপনার খাবার জল আছে, খাট থেকেই হাত বাড়িয়ে পাবেন, রাত্রে বেশি ঝোড়ো হাওয়া বইলে জানলা বন্ধ করে দেবেন, শেষ রাত্রে শীত শীত করলে এই পাতলা চাদরটা গাটে ঢাকা দেবেন। আর ভয় বোধ করলে দরজায় খিল লাগাবেন।'

ভবভূতি মাথা নেড়ে বলে, 'না। খিল লাগাবো না।'

'ঠিক আছে। বুঝলাম আপনি খুব নির্ভীক পুরুষ।.....যাচ্ছি। আমারও এখন ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।'

ভবভূতি বলে ওঠে, 'আপনার ওটা ছল। ঘুম পেতে পারে না।'
'ঘুম পেতে পারে না?'
'না! আজ সারারাত আপনার ঘুম আসবে না।'
'ভবিষ্যৎ বাণী করে বসছেন যে। যাবো, আর ঘুমোবো।'
এবার তাড়াতাড়ি চলে যায়।

পিসিমা জেগেই ছিলেন।
মালবিকা এসে বলে উঠলো, 'পিসিমা, ঘুমিয়ে পড়নি। আমি তো ভাবলাম—'
পঙ্কজিনী বললেন, 'না, ঘুম আসছে না। সেই থেকে ভাবছি, কি অদ্ভুত যোগাযোগ! তোমার বন্ধু কিনা অনুভূতি রায়চৌধুরীর ছেলে। ....আশ্চর্য! তোমার বন্ধু নির্বাচনে আমি খুব সুখী হয়েছি খুকু, খুব। উনি যদি ওঁর বাবার গুণের শতাংশের একাংশও পেয়ে থাকেন তো জীবনে পরম সুখ পাবে।'
'বাবাঃ। পিসিমা একেবারে জীবন-টিবন অবধি ভাবতে বসলে—'
'তা ভাবতে হবে বৈ কি খুকু! জীবনটা তো ছেলেখেলা নয়।.... আর তোমার ব্যবহারে আমি খুব সন্তুষ্ট। এখনো তুমি ওঁকে আপনি করে কথা বলছো। খুব ভালো!...যতক্ষণ না সবকিছু পাকাপাকি হচ্ছে, তুমি টুমি করে বলা অসভ্যতা।'
'ঘুমোচ্ছি পিসিমা! ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। ভদ্রলোক এত গল্প করতে পারেন! কেবল কথা বলছেন। আর বাড়িটা ওঁর এতো পছন্দ হয়েছে—
'হতেই পারে।'
পঙ্কজিনী গভীর ভাবে বলেন, 'এই ভাল লাগার মধ্যে প্রকৃতির একটা রহস্য নিহিত আছে।'

সকালে উঠতে অনেক বেলা হয়ে গেল। মালবিকা দেখতে পেলো ঘর বারান্দা বাগান রোদে ভাসছে। বিছানায় অবশ্যই পিসিমা নেই। ভারী অপ্রতিভ লাগলো মালবিকার, শুধু পিসিমার বাড়িতে ভাইঝি, এতে এতো অপ্রতিভ হবার কিছু ছিল না, কিন্তু আর একটা লোকের উপস্থিতি স্মরণ করে লজ্জা আর অস্বস্তি এসে প্রায় খাট থেকে টেনে নামিয়ে নিলো মালবিকাকে।
ইস্! ওই একটা নতুন ছেলেকে নিয়ে কি না জানি অসুবিধেয় পড়েছেন পিসিমা। তাছাড়া ওই 'ম্যানেজে'র ব্যাপার! সকাল বেলাই লোকটা কোনো

জেরার মুখে পড়েছে কিনা কে জানে। পড়েছে নিশ্চয়ই। ভাবনা এই সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে কিনা।

মালবিকার উচিত হয়নি এভাবে ঘুমিয়ে থাকা। মালবিকার আরো অনেক বেশি দায়িত্ববোধ থাকা উচিত ছিল।

খাট থেকে নেমে পড়ে শাড়ির আঁচলটা ঘাড় ঘুরিয়ে টেনে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে শূন্যকে উদ্দেশ্য করেই ডাকলো, 'পিসিমা!'

সাড়া পাওয়া গেল না পঙ্কজিনীর। বাথরুমের সামনে গিয়ে দেখলো, খোলা দরজা।

তার মানে বংশীর সাহায্যকল্পে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকেছেন। রান্নাঘরটা প্যাসেজ থেকে তিন চারটে সিঁড়ি নেমে একটু চাতাল পার হয়ে যেতে হয়।

মালবিকা সিঁড়ির কাছে গিয়ে গলা বাড়িয়ে এবং গলা তুলে ডাকলো, 'বংশী!'

বংশীরও সাড়া মিললো না। অবশ্য সেটা অপ্রত্যাশিত নয়, বংশীর শ্রবণ কক্ষের দরজায় তো প্রায় তালাচাবি পড়ে গেছে। কিন্তু পঙ্কজিনী কি আছেন ওখানে?

মালবিকা একটু ইতস্ততঃ করে এদিকে চলে এসে আস্তে সেই 'অতিথি স্পেশাল' ঘরটার দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো!

দরজা খোলা, কিন্তু ভারি পর্দাটা এমন পরিপাটি করে টানা যে ভেতরের অবস্থা কিছুই বোঝবার উপায় নেই পর্দা না সরালে।

অথচ চট্ করে সে কাজটা করা যায় না।

গলাটা ঝেড়ে নিয়ে খুব মাজা মোলায়েম গলায় ডাকলো, 'ভবভূতিবাবু!'

একবারে ফল হল না। আর একবার। আর একবার।

মালবিকার কপালে এখানেও নিঃসাড়ের পালা।

তার মানে ওঁর ঘুমটি এখনো পর্যন্ত ভাঙেনি।

তবু ভালো। জেগে উঠে পিসিমাকে ডিসটার্ব করেনি।

কিন্তু পিসিমা কোথায়?

হঠাৎ যেন গাটা ছম্‌ছম্ করে উঠলো মালবিকার। চারিদিক 'রোদে ভাসছে' অথচ চারিদিক নীরব নিথর, একটা সাড়াশব্দহীন বাড়িতে একজন প্রায় অপরিচিত নিদ্রিত পুরুষের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মালবিকা তার জাগার প্রতীক্ষায়।

এটা একটা অদ্ভুত ব্যবস্থা বৈ কি!

এ ধরনের মফঃস্বল শহর নির্জন হয় জানা কথা, কি এতো নির্জন, এতো নিঃশব্দ। বহির্জগতেও যেন কোনো জীবিত প্রাণীর বাস নেই। পাখিটাখি হয়তো ডেকেছে ভোরবেলায় বাসা ছাড়ার প্রাক্কালে, এখন রোদে ভরা আকাশ, একটা পাখিও দেখা যাচ্ছে না।

কলকাতার মানুষের কাছে এ রকম পরিস্থিতি গা ছম্‌ছম্‌ করবার মতই। মালবিকার এক বন্ধু ছেলেবেলায় 'স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা' এই লাইনটার প্যারডি করে কলকাতার রূপ বর্ণনা করেছিল, 'শব্দ দিয়ে তৈরি সে যে ভীতি দিয়ে গড়া।'

অজস্র শব্দ, অকারণ শব্দ, অভাবিত শব্দ, অনর্গল শব্দ, অফুরন্ত শব্দ। শব্দ বৈচিত্র্যের এক চরম নমুনা! 'কলকাতা' নামক শহরের বাসিন্দাদের স্নায়ুগুলো সমস্ত শব্দের জন্যেই প্রস্তুত, নৈঃশব্দ তাদের সেই অনুভূতির স্নায়ুকে থমকে দেয়। গা ছম্‌ছম্‌ করিয়ে দেয়।

মালবিকা একটি পূর্ণ যুবতী মেয়ে, মালবিকা একটা স্কুলের প্রতিষ্ঠাত্রী এবং প্রধান শিক্ষিকা, মালবিকার অন্য দিদিমণিরা যথেষ্ট ভয় করে চলে, তবু এখন মালবিকার কিশোরী মেয়ের মতই বুকটা থরথর করে উঠলো, আর মালবিকাকে হঠাৎ আর একটা আশঙ্কা যেন মুঠোর মধ্যে চেপে ধরলো।

গতরাত্রের সেই ঘোষণাটা 'সত্যি'তে পরিণত করে বসেনি তো ভবভূতি রায় নামধারী লোকটা! চলেই যায়নি তো? বিশ্বাস নেই। ওকে ঠিক বিশ্বাস হয় না।

মালবিকা আর ভদ্রতা রক্ষা করে উঠতে পারলো না, মালবিকা পর্দার একধার ধরে একটু সরালো, তারপর মালবিকা সবটা খুলে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

লোকটাকে তো পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছিল না মালবিকা তবুও প্রায় প্রত্যাশিতই এই ঘটনায় মালবিকা এমন স্তব্ধ হয়ে গেল কেন? ওর মুখ দেখে মনে হবে ঠিক যেন কেউ ওর হৃৎপিণ্ডটাকে হঠাৎ মুঠোয় চেপে ধরেছে।

বংশী কানে খাটো, কিন্তু কথায় খাটো নয়। গতকাল যে ওর গলা শোনা যায় নি তার কারণ, পঙ্কজিনী হালদার এবং তাঁর অতিথির একত্র উপস্থিতি।

অতিথির সামনে চাকর-বাকরদের খোলা গলায় কথা বলাটাকে বেয়াদপি বলে মনে করেন পঙ্কজিনী হালদার।

এখন পঙ্কজিনী ধারে কাছে নেই, অতিথিরও পাত্তা নেই, এখন বংশী বেশ উচ্চগ্রামেই জানিয়ে দেয়, ভগবানের নিয়ম পাল্টাবে, তবু মায়ের নিয়ম পাল্টাবে না। ঘুম থেকে উঠে দু'খানা বিস্কুট ও এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে তিনি ধোপদুরস্ত আদ্দির থানটি পরে ও সাদা লেসের জামাটি গায়ে দিয়ে বেঁটে ছাতাটি নিয়ে শহর টহল দিতে বেরিয়ে পড়েন। পায়ের চটিটিও নিখুঁত সাদা হওয়া আবশ্যক, আর থান ধুতির আঁচলটি ব্রোচ দিয়ে আটকানোও আবশ্যক। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা তিনি সঙ্গে ছাতা নেবেনই নেবেন।

টহল দেওয়ার কাজ সমাপ্ত করে উনি ব্বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসেন, বংশী চা এনে সামনে ধরে।

আহারের আয়োজন এবং মাপ যত স্বল্পই হোক, আড়ম্বরে ত্রুটি হবার জো নেই। হাতে বোনা লেসের ট্রে ঢাকায় ট্রে ঢেকে, আলাদা আলাদা পাত্রে চিনি, দুধ, চায়ের লিকার, মরিচের গুঁড়ো, নুন এবং প্রাতরাশের উপকরণ গুছিয়ে সাজিয়ে নামিয়ে দেয় বংশী। উনি নিজে মেপে মেপে দুধ চিনি মিশিয়ে দু'তিন বারে একটি ছোট টি-পট ভর্তি চা শেষ করবেন।

এই পঙ্কজিনী বংশীর সঙ্গে গল্প করেন।

সব কথার শেষে বংশী যোগ করে, 'এই বংশী তাই পারছে, আর কেউ হলে পারতো না। একজন মানুষের কাজ বললে কি হবে? কাজ একটা পুরো সংসারের মত।

মালবিকা কথাগুলো শুনে যাচ্ছিল বটে, কিন্তু মন দিচ্ছিল না। মন তার ছিল চঞ্চল। বার বার ভাবছে ভারি তো বংশী, ওকে আবার এতো লজ্জার কি আছে? জিজ্ঞেস করেই ফেলি না। কিন্তু পারছেনা।

এ কথা ভেবে দেখছে না আদৌ লজ্জার কি আছে। হ্যাঁ রে বংশী, ওই গেস্টবাবুটি কখন উঠেছিল, আর ভোরবেলাতেই কোথায় গিয়েছে জানিস? এই তো কথা।

এটা বলে উঠতে পারছে না কেন মালবিকা?

আর এই বুড়োটাও তো আচ্ছা! নিজে থেকেও তো বলতে পারিস, দিদিমণি, গেস্টবাবু সক্কালবেলাই চলে গেছে।

গেটে তো চাবি দেওয়া থাকে বাবা তোদের, সে চাবি তুই তো খুলে দিয়েছিস। গেট টপকে নিশ্চয়ই পালায়নি সে?

এক সময় আর পারলো না, বলে ফেললো, 'তা বংশী পিসিমার তো ফিরতে আরো দেরি আছে, আমরা চা খেয়ে নিতে পারি না?'

বংশী বাঁ হাতটা তুলে বাঁ কানটাকে টেনে ধরে মালবিকার কাছ বরাবর এগিয়ে এসে বললে, 'অ্যাঁ?'

'বলছি—আমরা চা খাবো?'

বংশী এবার বললো, 'কারা?'

'আমরা! আমি, তুমি আর তোমাদের গেস্টবাবু।'

কথার সঙ্গে সঙ্গে মালবিকা আঙুল দিয়ে নিজেকে, বংশীকে দেখিয়ে অতিথির ঘরটার দিকে দেখিয়ে দিল। যেন মালবিকা জানেনা ও ঘরে চা খাবার জন্যে কেউ বসে নেই। ঘরটা তার সেই পঞ্চাশ বছর আগের প্রসাধন মণ্ডিত মূর্তিতে নিথর হয়ে পড়ে আছে।

'গেস্টবাবু?'

বংশী অম্লান বদনে বলে, 'ও বাবু তো ভোর সকালে বেরিয়ে গেছে।'

জানতাম! এ আমি জানতাম।

মালবিকা মনে মনে বলে, ও চলে যাবে সেটা আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। তারপর ভাবে, অথবা ভাবতে চেষ্টা করে, ভালই হয়েছে, পরিচয়ের শিকড় বেশি গভীরে যাবার আগেই বিদায় নিয়েছে। ও আরো থাকলে ক্রমাগত মিথ্যার জাল বুনতে বুনতে ক্লান্ত হয়ে পড়তে হতো আমায়। আর পঙ্কজিনী হালদারের একটি ভ্রান্ত ধারণা ক্রমশই বদ্ধমূল হয়ে উঠে অনবরত ঠেলতে ঠেলতে আমাকে কোন্ পরিণামের দিকে নিয়ে যেত কে জানে!

আমি বাঁচলাম, আমি নিশ্চিন্ত হলাম, আমার আর কোনো দায় থাকলো না। আমি যে মুক্তির মন নিয়ে এসেছিলাম, সেই মুক্তির স্বাদ পাবো এবার।

কিন্তু আশ্চর্য, মাত্র কাল সকালে ওর সঙ্গে আমার চাক্ষুষ দেখা, আর ঘণ্টা কয়েক পর থেকে মৌখিক আলাপ, অথচ মনে হচ্ছে যেন পরিচয়টা অনেক দিনের। যদিও ওকে বুঝতে পারা শক্ত।....কাল রাত্রে কি অদ্ভুত ভদ্র, ভাল ও মার্জিত দেখাচ্ছিল ওকে, ও যে পালাবে বলছিল, সেটা যেন কৌতুক করে।...তবু আমার মন বলছিল থাকবে না, নিশ্চয় থাকবে না।

কিন্তু পিসিমাকে কি বলবো?

আর একবার গা শির শির করে এলো মালবিকার। পিসিমা যখন প্রশ্ন করবেন তোমার বন্ধুর এ কোন্ ধরনের ব্যবহার হলো, তখন কি বলবো আমি?

আমি কি বলে ফেলবো, পিসিমা, ও মাত্র আমার ঘণ্টা কয়েকের বন্ধু? না কি খুব অবাক হবার ভান করে আকাশ করে আকাশ থেকে পড়ে বলবো, কিছুতো বুঝতে পারছি না। এরকম কেন করলো আমার তো বুদ্ধির বাইরে।

তাহলেই কি সব সন্দেহ মিটে যাবে? কে না ভাববে কোথাও কোনো গলদ আছে, ধরা পড়বার ভয়ে পালালো। ওর 'মামাতো কাকা'র কথা ঠিক উঠবে তখন।

উঃ! আর ভাবা যাচ্ছে না। পিসিমাকে কি বলবো?

বানিয়ে বানিয়ে কত বলা যায়। তারপর নিজেকে ধিক্কার দিতে বসলো। ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে! উচিত শাস্তি হয়েছে তোমার যেমন বোকার মত কাজ করে বসেছিলে, তার শাস্তি পাওয়ার দরকার ছিল বৈকি! আশ্চর্য! আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি তোমার ব্যবহারে মালবিকা। জানা নেই, চেনা নেই, হঠাৎ একটা পুরুষ মানুষকে তুমি নিজের সঙ্গে নিয়ে চলে এলে, বন্ধু বলে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে এনে তুললে এমন একটি মহিলার কাছে, সুনীতি, সুরুচি আর নিয়মানুবর্তিতাই যাঁর সারা জীবনের ইষ্টদেবতা।

তোমার প্রাণে একটু ভয় হলো না মালবিকা চৌধুরী? বিবেকে বাধলো না? তারপর তুমি সেই লোকটাকে সেই মহিলার সামনে বন্ধু বলে প্রতিষ্ঠিত করতে অফুরন্ত মিথ্যার গুলিসুতো খুলে জাল বুনতে বসলে। তাকে এই অভিভাবকহীন বাড়িতে রাত্রে আশ্রয় দেওয়ালে। তোমার মনে একটু দ্বিধাও এলো না। মনে হলো না যে ভদ্রবেশী চোরও বিরল নয়? নাঃ মালবিকা তোমার উচিত নয় একটা মেয়ে স্কুলের ভার নিয়ে তাদের পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়া।...একটা কাঁচা বয়সের হঠাৎ প্রেমে পড়ে যাওয়া মেয়ের মত আচরণ তোমার।

তবু হে ঈশ্বর, অল্পের ওপর দিয়ে পার করেছ তুমি। কিন্তু সত্যিই কি তাই? অল্পের ওপর দিয়েই কি গেছে।....এমন যদি হয়, একটু পরেই ধরা পড়লো পিসিমার বাক্স আলমারি ভাঙা, পিসিমার টাকা-কড়ি গহনাপত্র কিছু নেই?

এখন আবার ভাবতে গিয়ে লজ্জা করলো। ছি ছি এ আমি কি ভাবছি, আমি এতো ছোটলোক হলাম কবে থেকে? খেয়ালী লোকটা খেয়ালের বশে চলে গেছে সেটুকু না ভেবে এতো সব আজে-বাজে কথা ভাবছি?

তবু—তবু কেবলই মনে হতে থাকলো—পিসিমা এসে পড়লেই ভয়ানক একটা ঝড় উঠবে। প্রথম ঝড়, না বলা না কওয়া চলে যাওয়া খুকুর বন্ধু। দ্বিতীয় ঝড় ভাঙা আলমারির দৃশ্য।

তারপর অবশ্যই দুটো ব্যাপারের মধ্যকার যোগসূত্রটি আবিষ্কার হবে।

'খুকু দিদিমণি চা খাবে?'

বংশীর ডাকে চমকে উঠে মালবিকা, ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কতার কোন অতল গভীরে তালিয়ে গিয়েছিল মালবিকা।

মালবিকা চমকে উঠে বললো, 'কি? চা? থাক্ পিসিমা এসে যান, তারপর।'

বোঝাতে অবশ্য সময় যায়।

আর বোঝার পর বংশী হতাশ গলায় বলে, 'তাহলে কি শুধু গেস্টবাবুকেই একা চা দেব?

'কাকে?'

মালবিকা যেন বিদ্যুতের আঘাত খায়। 'কাকে চা দেবে?'

'ওই তো আপনার বন্ধু বাবুকে। বেড়িয়ে এসেই চায়ের জন্য হামলা করছে।'

মালবিকা এতোক্ষণ যা কিছু ভাবছিল, সেগুলো সব যেন আততায়ীর মত তেড়ে এসে তার গলা টিপে ধরতে আসে। তবু হে ঈশ্বর, তোমার অশেষ করুণা যে, মনের কথা অপরের কানে যায় না।

এখন কি আরাম। কি শান্তি! কি মুক্তি!

মালবিকার আর মনে পড়ে না সে এতোক্ষণ কি কি ভাবছিল।

মালবিকা নীল আকাশ থেকে নিঃশ্বাসের হাওয়া পায়। কি প্রাণ জুড়োনো ওই কথাটা! গেস্টবাবু চায়ের জন্য হামলা করছে।

কিন্তু চাকরের কাছে তো খেলো হওয়া যায় না?

মালবিকা আপন সম্ভ্রম রক্ষা করে। গাম্ভীর্য বজায় রেখেই মালবিকা বলে, 'ঠিক আছে, তবে আমাকেও দিয়ে দাও। ভদ্রলোককে একা চা দেওয়া ভাল দেখায় না।'

নিজের দিকে এবং অনুপস্থিতের দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে ইসারা করে কাজটা সাঙ্গ করে তুলতে পারলো মালবিকা, তারপর যেন ভদ্রতা রক্ষা করতে যাচ্ছে এই ভাবে এগিয়ে এসে দেখলো বাগানের মাঝখানে আসামী হাজির।

ভবভূতির হাতে অনেকগুলো পুটুস ফুলের ডালসুদ্ধ একটা ঝাড়।

মানুষ কি অদ্ভুতভাবে পট পরিবর্তন করে নিতে পারে। পরিবর্তিত করে ফেলতে পারে নিজেকে!

এতোক্ষণ যে বিভীষিকার কল্পনায় মাথা ঝিমঝিম করছিল মালবিকার, এখন সেটাই পরম কৌতুকের হয়ে ওঠে। কৌতুকের করে নিতে পারা যায়।

মালবিকা দিব্যি এগিয়ে এসে হেসে বলে ওঠে, 'তবু ভালো যে ভেগে পড়েননি। আমি তো সকালে খাঁচাটি খালি দেখে ধরে নিয়েছিলাম পাখি হাওয়া।'

'একেবারে ধরেই নিয়েছিলেন?'

'নিয়েই ছিলাম তো।'

'ইস! তাহলে তো অনায়াসেই চলে যাওয়া যেতো!'

ভবভূতি উঠে এসে বারান্দায় সিঁড়ির ওপর বসে পড়ে বলে, 'কেবলমাত্র আপনার কাছে বিশ্বাসভঙ্গের পাপে পাপী হবার ভয়েই যেতে পারলাম না। অথচ দেখুন এখানে আদৌ বিশ্বাসটা ছিলই না। যা ছিল না, তা ভাঙবার ভয়ে আমি—' ভবভূতি হেসে উঠে বলে, 'ঠিক ভূতের ভয়ের মত, তাই না? জিনিসটা নেই, অথচ ভয়টা আছে।

মালবিকা ভেতরে ভেতরে মরমে মরে যায়। কিন্তু বাইরে তো অপ্রতিভ হওয়া চলে না। তাই বলে ওঠে, 'শুধু ওইটুকু শুনেই এই? আরো যা যা ভাবছিলাম, তা তো শোনাই হয়নি এখনো?'

ভবভূতি মৃদু হেসে বলে, 'কি? লোকটা শুধু চলেই যায়নি, চুরি-চামারি করে চলে গেছে?'

মালবিকা ওর ওই রোদ-পড়া ঝকঝকে মুখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলে, 'ভাষাটায় একটু তফাৎ আছে। চুরি চামারি নয়, লুটপাট।'

বললে। মুখে অনির্বচনীয় একটি অভিব্যক্তি ফুটিয়ে বললো।

অথচ মালবিকাকে স্বল্পভাষী বলেই এতোদিন জানতো লোকে। মালবিকার কথার ধরনে কোনো রহস্যের ছায়াটায়া থাকতে দেখেনি কেউ।

মালবিকার পিসি একটা ভ্রান্ত ধারণার বশে মালবিকাকে ঠেলতে ঠেলতে কি জানি কোন্ পরিণামের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে, এই ভেবে আতঙ্কিত হচ্ছিল মালবিকা অথচ, নিজেই নির্বোধের মত পায়ের তলায় গর্ত খুঁড়ছে।

মালবিকা সেই অনিবার্য পরিণতিটার দিকে যেতে না চাইলে এই গর্তটায় পা বসে যাবে না ওর? ভবভূতি ওই অনির্বচনীয় দ্যুতির প্রতি চোখ ফেলে বললো, 'আমি কিন্তু ভোরবেলা বেরিয়ে যাবার সময় আপনাকে এদিক ওদিক খুঁজেছিলাম এবং না পেয়ে আপনাদের ওই বংশীকে বলে গিয়েছিলাম—'

'বংশীকে? কানে তো সীসে ঢালা।' মালবিকা একটু হাসে।

'সেটা পরে মনে পড়লো। তখন বেরিয়ে পড়েছি। খুব আফসোস হলো,

কেন টেবিলে এক লাইন লিখে রেখে গেলাম না!...তারপর জানেন', ভবভূতি হেসে ওঠে, 'সত্যি কথাটা খুলে বলবো। তারপর ফিরতে যতো দেরি হয়ে যাচ্ছে, ততই মনে হচ্ছে—আপনি নির্ঘাৎ ভাবছেন—লোকটা ভেগেছে। এবং এও ভাবছেন হয়তো, কি জানি কিছু নিয়ে ভেগেছে।'

ভবভূতি সত্যি কথা খুলে বলে।

কিন্তু মালবিকা কি বলতে পারবে অমনি হেসে হেসে? হয় না।

অবস্থাটা উল্টো। তাই জন্ম-অভিনেত্রী নারীজাতির একটি নমুনা মালবিকা চৌধুরী বিপুল অভিনয়ের পারাকাষ্ঠা দেখিয়ে বলে ওঠে, আশা করি এই খুলে বলা সত্যি কথাটা এইমাত্র বানানো হলো।'

ভবভূতি আস্তে মাথা নেড়ে বলে, 'না!'

'না?'

মালবিকাকে হঠাৎ কে যেন ধরে আছাড় মারলো। মালবিকা সেই রকম শিউরে চমকে প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, 'সত্যি করে এসব ভেবেছিলেন আপনি।'

ভবভূতি হাসে একটু। বলে, 'ইচ্ছে করে কি আর ভেবেছিলাম? ভাবনাটা এসে যাচ্ছিল।'

মালবিকাও ফুলের ঝাড়টায় হাত বোলাতে বোলাতে বলে, 'আমাদের পরিচয়টা এমন আকস্মিক আর এমন পরিস্থিতিতে যে আমরা কেবলই পরস্পরকে অবিশ্বাস করছি।'

'পরস্পরকে?'

ভবভূতি বলে, 'কই? না না! আমার দিক থেকে ও জিনিসটার প্রশ্ন নেই মিস চৌধুরী!'

'নেই?' মালবিকা আর একবার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়, ভাগ্যি মনের চিন্তার ফটো উঠে যায় না কোথাও! ধন্যবাদটা দেবার পর আত্মস্থ হয়। সেই আত্মস্থ কণ্ঠেই বলে, 'নেই কি করে বলছেন? আমার দিক থেকে যে এমন কথা ভাবা সম্ভব, সেটা তো ভেবেছেন?'

'অন্যায় হয়েছে।' ভবভূতি বলে, 'ক্ষমা চাইছি।'

মালবিকা আবার হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়। আবার পায়ের তলার গহ্বর গভীর করে বসে। বলে ওঠে, 'ক্ষমা করতে পারি এই শর্তে, আর একবারও না বলে কোথাও চলে যাবেন না।'

বংশী এসে জানান দেয়—'চা'।

মালবিকা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'এইখানেই দাওনা।'

'এইখানে?'

বংশী কথাটা অনুধাবন করে শিউরে উঠে। এইখানে চা? মনিব যদি এসে পড়ে দেখেন বংশীর দ্বারা এমন অঘটন ঘটেছে, হয়তো এই দণ্ডেই বংশীকে দেশে চলে যাবার ভাড়া দিয়ে মাইনে-পত্র চুকিয়ে দেবেন।

'আহা তুমি বলবে, আমরা বলেছি।'

বংশী মাথা নাড়ে।

একটু উত্তেজিত ভাবে বলে, 'সগগের ভগবান এসে হুকুম করলেও বংশীর অপরাধ খণ্ডন হবে না খুকুদিদি! তোমাদের ঠিক জায়গায় যেতেই হবে।'

'তবে চল।'

ওরা বারান্দায় সেই চা-পানের জায়গায় উঠে এসে বংশীর পারিপাট্য দেখে কৌতুকের হাসি হেসে ওঠে। তারপর ভবভূতি বলে, 'আপনি বসুন। সবই যখন নিয়ম মাফিক করা আপনার পিসিমার আইন, তখন বাইরের ধুলো হাতটা সাবান দিয়ে ধুয়ে আসি।'

'বাঃ সেও কি পিসিমার আইন?'

'অন্তত আমার কাছে। আমি ওসবের ধার ধারিনা। আমার বিবেচনায় যে ধুলো আমার হাতে লেগে আছে বলে কল্পনা করছি, সেই ধুলো সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত। খাদ্যবস্তুই কি ওই ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী অস্তিত্বের কবল থেকে মুক্ত?'

'খুব ভাল যুক্তি, এখন যান। এই বেলা এসে হাত লাগান।'

মালবিকা হেসে ওঠে বলে, মিসেস হালদার এসে পড়লে আবার কি বিপাকে পড়ে যাবেন কে জানে।'

ভবভূতি চলে যায়।

আর যে মুহূর্তে চলে যায়, মালবিকা স্তব্ধ হয়ে যায়।

কি আশ্চর্য অভিনয় করে যাচ্ছি আমি। আমি আহত হবার অভিনয় করছি, অবাক হবার অভিনয় করছি। আর—আর প্রেমে পড়ার অভিনয় করছি।.....করছিই তো। না হলে অমন অর্থব্যাঞ্জক চোখে তাকাচ্ছি কেন? রহস্য ঘেঁষা মনোরম ভাষায় কথা বলতে চেষ্টা করছি কেন? আর এতো বেশি কথাই বা কইছি কেন?...

কবে তুমি এতো কথা বল মালবিকা? নিজেকে কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়ে

তীব্র প্রশ্ন করে মালবিকা। চিরকালই তো তুমি কম কথা বলতে পছন্দ করো। তোমার আশেপাশে যারা থাকে, তারা যখন অহেতুক কথা বাড়ায়, তুমি তো বিরক্তই হও। আর এখন? এখন ওহে মিস চৌধুরী, তুমি কেবলই তাসের পিঠে কথা জোগান দিয়ে পিঠ কুড়োবার মত, কথার পিঠে কথা জোগান দিচ্ছো....

কিন্তু এর থেকে কুড়োচ্ছো কি? বল, বল মিস চৌধুরী, তুমি তোমার স্বভাববহির্ভুত এই কাজ কবে কি লাভবান হচ্ছো?

একা হলেই প্রশ্ন পেয়ে যাচ্ছে মালবিকাকে।

আর আশ্চর্য, যেই ওই দীর্ঘকায় সুন্দর কান্তি লোকটা চোখের সামনে এসে পড়ছে, সব প্রশ্ন নিরুত্তর হয়ে যাচ্ছে।

অতএব লোকটা যখন রুমালে ভিজে হাত মুছতে মুছতে এসে বলে ওঠে, 'না, সত্যিই আপনার পিসিমার দেশের জল হাওয়াটা দারুণ। এই সকাল বেলাই এতো খিদে পেয়ে গেছে! ঘর খাই, নাড়ি খাই ভাব হচ্ছে।'

মালবিকা ওই হাস্যোজ্জ্বল মুখটার দিকে তাকিয়ে ভাবে, এই মানুষটা সম্বন্ধে আমি একটু আগেই সেই সব কথা ভাবছিলাম।

মালবিকা আবার অন্য কারণেও লজ্জিত হয়। এত দারুণ খিদে ভাঙাবার উপযুক্ত কিই বা দিয়েছে বংশী। দুটো টোস্ট, দুটো ডিম, একটা কলা আর এক টুকবো বাড়ির তৈরি শুকনো শুকনো কেক।

এখন আধ ডজন টোস্ট, অথবা ডজন দেড়েক লুচি হলে ওর পক্ষে ভাল হতো। কিন্তু মালবিকার হাতে তেমন কিছু নেই।

মালবিকা তৈরি করে দিতে পারে, কিন্তু শ্রীমতি পঙ্কজিনী হালদার কি তেমন অনিয়ম সহ্য করতে পারবেন? অসময়ে অবান্তর খাওয়া?

সে বোধকবি অসম্ভব।

মালবিকার মনটা মায়া মায়া হয়ে ওঠে। মালবিকার নিজের বাড়ির রান্নাঘরের দৃশ্যটা মনে পড়ে যায়। আর মালবিকা তার সঙ্গে সংযুক্ত একটা ছবি দেখতে পায়।

গ্যাসের স্টোভে কড়া বসানো, ঘিয়ের ধোঁয়া উঠেছে, প্লেটে লুচি আর আলুভাজা রাখা হয়েছে গরম গরম!

কিন্তু সেখানে মালবিকার সখী, পরিচালিকা, সেবিকা, রাঁধুনী, একাধারে সর্বভুমকাভিনেত্রী তরুবালা নেই কেন। মালবিকা নিজেই ব্যস্ত হয়ে কাজটা করে তুলেছে কেন? মালবিকার কি মতিচ্ছন্ন হলো?

ছিঃ ছিঃ। এই সব আবিল হৃদয়াবেগকে প্রশ্রয় দিচ্ছে মালবিকা? লোকটা তুকতাকই জানে বোধহয়! নাহলে এমন হচ্ছে কেন?

মালবিকা এবার থেকে নিজেকে খুব সতর্ক রাখবে।

হঠাৎ হেসে ফেলে মালবিকা।

গতকাল থেকে কতবার এ প্রতিজ্ঞা করলে মালবিকা চৌধুরী?

'বুনো ফুলের গন্ধে কি রকম একটা অদ্ভুত মাদকতা আছে দেখেছেন?'

ভবভূতি তার একটু আগে নিয়ে আসা সেই পুটুস ফুলের ঝাড়টা থেকে দুটো হালকা রঙিন ফুল তুলে নিয়ে বলে, 'মনটা যেন অন্যরকম করে দেয়।'

মালবিকাও সে ফুলগুলো হাতে তুলে নিয়ে বলে, 'মাদকতা আছে কিনা জানিনা, অন্য রকম করে দেয় তা ঠিক। আপনার আনা ফুলগুলো দেখে আমার খুব শৈশবের একটা স্মৃতি মনে পড়ে গেল। আমার মার অসুখের জন্য ছেলেবেলায় এখানে অনেকদিন ছিলাম বলেছি বোধহয়।....সেই সময় একদিন ওই সিঁড়িটায় অনেক ফুল জমা করেছি, বংশীই এনে দিয়েছে বোধহয়। ভাবছি সবটা সিঁড়ি যদি ফুল দিয়ে ঢেকে দিই, তাহলে বেশ হয়। পিসি আর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারবে না, জব্দ হয়ে যাবে—'

ভবভূতি কথার মাঝখানে হেসে ওঠে, 'উঃ! সেই ছেলেবেলা থেকেই এতো দুবুর্দ্ধি? পিসিকে জব্দ করে নির্মল আনন্দ লাভের ইচ্ছে?'

মালবিকাও মৃদু হাসে।

'মানুষের ধর্মই তো তাই। উপকারীর অপকার করা। তা যাক, ওই রকম একটা দুষ্টবুদ্ধি নিয়ে ফুলগুলি ছড়াচ্ছি। পিসি কেন সেগুলো মাড়িয়ে আসতে পারবে না, তা ভেবে দেখছি না।....হঠাৎ দেখি পিসি বাইরে থেকে এলো। বেঁটে ছাতাটি মুড়ে একপাশে রাখলো. হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে একখানা চিঠি বার করে হাতে রাখলো, তারপর আমার কাছে এসে গম্ভীর গলায় বললো, 'খুকু, তোমার এই চিঠিটা পড়বার ক্ষমতা নেই, সবে তো বর্ণপরিচয়টুকু হয়েছে তোমার, যদি পড়তে পারতে, চিঠিটা তোমায় পড়তে দিলেই আমার কর্তব্য মিটে যেতো। মুখ ফুটে বলতে হতো না।....বলতে যখন হচ্ছে তখন বলি, তোমার এখন একটি ভয়ানক দুঃখের জন্য মনকে প্রস্তুত করতে হবে। তোমার মা আর বেশিদিন বাঁচবেন না।'

ভবভূতি চম্‌কে উঠে বলে, 'বললেন এই কথা সেই বাচ্চাটার সামনে। সাধে বলছি—ডেঞ্জারাস মহিলা! এই নিষ্ঠুরতার কথা ভাবা যায় না।'

মালবিকা বলে, 'ঠিক তা বলাও যায় না হয়তো। প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থাকে, থাকে নিজস্ব জীবনদর্শন।.....আপনি যেটাকে নিষ্ঠুরতা ভাবছেন, উনি সেটাকেই মমতা ভেবেছেন। ভেবেছেন ছোট্ট মেয়ে আচমকা একটা শক পাবে যদি হঠাৎ শোনে তার মা আর নেই। তাই তাকে সইয়ে রাখতে চাইছিলেন।....মেয়েটা অবশ্য তখন ওঁর ভাব গম্ভীর ভাষার বিন্দু বিসর্গও বুঝতে পারেনি, পরে বড় হয়ে কথাগুলো মনে করে তার মানে বুঝেছিল।....তবু তার মার যে অসুখ বেশি, আর বেশিদিন বাঁচবেন না, এটা স্পষ্ট ছিল।

মেয়েটি যেন হতভম্ব হয়ে গেল, পিসির মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

পিসি বললো, 'না এখন কেঁদোনা, এখনো তোমার মা জীবিত রয়েছেন। জীবিত ব্যক্তির জন্য চোখের জল ফেলতে নেই।'

. 'উঃ, নমস্য। অর্থাৎ নমস্যা।'

ভবভূতি দুটো হাত জোড় করে কপালে ঠেকায়।

মালবিকা যেন স্মৃতির গভীরে তলিয়ে গেছে। মালবিকা বলে, 'না, ওঁকে ঠিক সাধারণের মাপকাঠিতে মাপা যায় না। ওঁর মনের গঠনে এমন একটা বদ্ধমূল সংস্কার আছে, তার থেকে ওঁকে নড়ানো অসম্ভব। জীবনটা ওঁর কাছে এতো বেশি সিরিয়াস।'

একটু হাসলো মালবিকা, 'অবশ্য এসব বোধ পরবর্তী চিন্তার ফল! তখন পিসিমাকে আদৌ ভাল লাগত না। বাধ্য হয়ে থাকতে হতো তাই।'

'এখন খুব ভাল লাগে?'

'মজা লাগে।' বলে একটু হেসে ফেলে মালবিকা। তারপর বলে, 'যে কথা বলছিলাম, হঠাৎ কি যে হলো—ফুলগুলো তখন ছুঁড়ে ছুঁড়ে চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে দিলাম, সেই থেকে এ ধরনের বুনো বুনো ফুলের গন্ধ পেয়েই সেই সকালটার কথা মনে পড়ে যায়।'

'সেটাই স্বাভাবিক! গন্ধ যেমন পারে অতীত স্মৃতিতে আলোড়ন তুলতে, এমন আর কেউ নয়।'

মালবিকা গেটের দিকে চঞ্চল দৃষ্টিপাত করে বলে, পিসি আসছে—'

ভবভূতি তাকিয়ে দেখে।

দূরে ছাতাটি ছড়িয়ে মাথায় দিয়ে ধীরে ধীরে আসতে দেখা যাচ্ছে পঙ্কজিনীকে। দেরি আছে এখনো। ভবভূতি হঠাৎ বলে ওঠে, 'একটা কথা বলবো কিনা এতক্ষণ ভাবছিলাম, বলেই ফেলছি! সকালে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। বাড়িটা—মানে আমাদের সেই 'অনুপমা কুটির'টা দেখতে গিয়েছিলাম, যথেষ্ট ভোর তখন। যখন কাছাকাছি পৌঁছেছি, তখন দেখতে পেলাম ওই রঙিন ছাতাটি হাতে নিয়ে আস্তে গেটটি খুলে বেরিয়ে এলেন উনি। গেটের কাছে দাঁড়ালেন, তালাতে চাবি লাগালেন, টেনে দেখলেন লেগেছে কি না, তারপর ছাতাটি মাথায় দিয়ে আস্তে আস্তে ওদিকে চলে গেলেন রাস্তা ছাড়িয়ে।'

মালবিকা অবাক হয়ে বলে, 'তার মানে পিসির কাছে আপনার বাড়ির ডুপ্লিকেট চাবি আছে?'

'তাইতো দেখালাম।'

এ বাড়ির গেটে শব্দ হলো।

পঙ্কজিনী হালদার ছাতাটি মুড়ে গেট খুললেন, বন্ধ করলেন, আবার ছাতাটি খুলে মাথায় দিয়ে এই ছোট্ট 'লন'টুকু পার হয়ে এলেন অনেকটা সময় নিয়ে। মালবিকা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো। বললো, ঈস্! এত রোদ্দুরে তুমি—এতক্ষণ কোথায় বেড়াও?'

পঙ্কজিনী ছাতাটিকে প্যাসেজের দেয়ালে গাঁথা হুকে ঝুলিয়ে রেখে এসে ধীরে সুস্থে বসে বলেন, 'তোমরা চা খেয়েছ? মানে বংশী দিয়েছে?'

ভবভূতি লজ্জিত হাসি হেসে বলে, না খেয়ে থাকতে পারলাম না, মানে দারুণ ক্ষিদে পেয়ে গিয়েছিল।'

'তুমি তো খুব ভোরবেলাই উঠে বেড়াতে বেরিয়ে গেছ।' পঙ্কজিনী যেন আরো থেমে থেমে আরে কাটা কাটা গলায় বলেন, 'খুব ভাল অভ্যাস। খুব ভালো। তোমার বাবাও এমনি ভোরবেলা উঠে বেড়াতে বেরোতেন বেশীর ভাগই ঝর্ণার দিকে। যখন বেড়িয়ে ফিরতেন তখনো রোদ উঠেছে কি ওঠেনি। বলতেন সারাদিনের পরিশ্রমে আমরা যেটুকু জীবনীশক্তি হারাই, ভোরের হাওয়ায় আবার সেটুকু সঞ্চয় করি।'

ওঁর ওই বাক্‌ভঙ্গী শ্রোতার পক্ষে প্রায় অসহনীয়, তবু ভবভূতির আর তেমন অসহনীয় লাগছে না। ওর বাবার বিষয়ে এমন ছোটখাটো কথা আর কে

কবে শুনিয়েছে ভবভূতিকে? অপরের মুখে নিজের মৃত প্রিয়জনের কথা শুনতে ভালো লাগে বৈ কি!

কিন্তু মালবিকার অসহিষ্ণুতা আসছিল। শুধু পিসির ওই থেমে থেমে কথা বলার জন্যই নয়, ভবভূতির বাবার সম্পর্কে আর কি বলে বসবেন সেই ভয়ে! কথাটথা শুনে তো মাঝে মাঝে সন্দেহ হচ্ছে, বিধবা মিসেস হালদারের সঙ্গে ভদ্রলোকের বেশ অন্তরঙ্গতাই ছিল। কতখানি নিবিড় ছিল কে জানে?

অনুভূতি রায়ের ভোরবেলা ঝর্ণার ধারে বেড়াতে যাওয়ার খবরের হিসেবটি পঙ্কজিনী রাখতেন কেমন করে? প্রত্যক্ষদর্শীর দাবি আছে নিশ্চয়। দু'জনে এক সঙ্গে যেতেন, না যেন দৈবাৎ দেখা হওয়া ভাবে—

কিন্তু ও কথা পরে ভাবা যাবে।

মালবিকা বলে, 'তুমি তো খেয়ে বেরোওনি পিসি?'

'না, অত সকালে গরম জিনিস খাওয়া আমার স্যুট করে না। ঠাণ্ডাজল খেয়ে বেরোই। ঠাণ্ডাজল আর বিস্কুট। আগে ওর সঙ্গে মিষ্টি খেতাম, এখনও খাই। বয়েস হলে মিষ্টি আর নুন, একটু কম খেতে হয়।....কিন্তু খুকু, তুমি কি এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোও? এটা তো ভাল অভ্যাস নয়। খুব খারাপ অভ্যাস। বেলা অবধি ঘুমোলে শরীরের দুর্বলতা আসে। অবসাদ বোধ হয়।....হেসে ফেললে যে? হাসির কথা নয়। সত্যি কথা। কেন নয় বল? ওতে ভোরের বাতাসটি তুমি আহরণ করতে পারছো না, যাতে জীবনীশক্তির উপাদান রয়েছে, তাছাড়া যে কোনো যন্ত্রকেই যেমন বসিয়ে রাখলে তাতে মরচে ধরে, তেমনি শরীর যন্ত্রেও। শরীরের সবটাই তো স্রেফ যন্ত্র।'

'পিসি, তোমার চায়ের কথা বলে আসি—'

'বলতে হবে না খুকু! বংশী ঠিক সময়েই আসবে। আমি বেড়িয়ে এসে একটু বিশ্রাম করে খাই।....একটা কথা তোমায় শেখাই খুকু, যখন কাউকে কোনো কাজের ভার দিয়ে রাখা হয় তখন তার কর্মক্ষমতার ওপর সবকিছু ছেড়ে দিতে হয়। দেওয়া উচিত। এতে তার দায়িত্ববোধটা থাকে। আর তুমি যদি তাকে বার বার তাগাদা দিতে থাকো অথবা ভাল করে করবার নির্দেশ দিতে থাকো, তাহলে তার মধ্যে থেকে ওই দায়িত্ববোধটি চলে যায়। ওই তাগাদাটার অপেক্ষায় থাকে। এতে করে তার নিজের প্রতি আস্থা চলে যায়।'

মালবিকা হেসে উঠে বলে, 'কিন্তু পিসি, সবাই তো আর তোমার বংশী

নয়? এমন গাড়িও তো থাকে, যে নিজে থেকে স্টার্ট নিতে চায় না, পেছন থেকে ঠেলতে হয়।'

'সে তো বিকল-যন্ত্র গাড়ি।'

পঙ্কজিনী হালদারের কণ্ঠস্বরটি উত্তেজিত শোনায়।

'বেশির ভাগ গাড়িই বিকল-যন্ত্র পিসি!' মালবিকা আবার হেসে ওঠে, 'বিশেষ করে যারা স্কুলের চাকরি নিয়ে এসে ঢুকেছে। দেখনি তো? না ঠেললে এক ইঞ্চি নড়বে না।'

'হুঁ। শিক্ষা বিভাগের অনেক গলদ, অনেক ত্রুটির কথা কাগজে পড়ি বটে।'

পঙ্কজিনী একটু নিঃশ্বাস ফেললেন, 'আমাদের পাঠ্য কালটি কি সুন্দরই ছিল। টীচারদের কর্মনিষ্ঠা, ছাত্রীদের প্রতি স্নেহ ও সহানুভূতি অথচ দৃঢ় শাসন। এখনো তাঁদের কথা মনে করলে মাথা নত হয়ে আসে।'

'মালবিকা বলে, 'তাঁদের ভাগ্য।'

'তাঁদের ভাগ্য বলছো কেন খুকু? আমাদেরই ভাগ্য। শ্রদ্ধা করার যোগ্য ব্যক্তিকে সামনে পাওয়া একটা ভাগ্যের কথা। তোমরা তা থেকে বঞ্চিত।'

মালবিকা এতো কথা কখনো বলে না। এতো হাসি কখনো হাসে না। তাই একটুক্ষণ হাসি কথার পরই তার মনের মধ্যে প্রতিক্রিয়াব সৃষ্টি হচ্ছে। গতকাল থেকেই দেখছে।

গতকাল!

মাত্র গকতাল থেকে?

সময়ের সীমা বলে কিছু কি সত্যিই আছে?

বংশী নিজস্ব নিয়মে এবং নিজস্ব রীতিতে চা এনে ধরে দিল।

মিসেস হালদার টীকোজি তুলে চায়ের কেটলীটির ঢাকনি খুলে পরীক্ষা করে আস্তে চামচ দিয়ে নাড়তে নাড়তে বললেন, 'তোমরা আর চা খাবে না কি?'

ভবভূতি দুষ্টু হাসি মুখে মালবিকার দিকে একটু কটাক্ষ করে বলে, 'দু'বার চা খাওয়া যদি আপনি অপছন্দ না করেন।'

পঙ্কজিনী খুব প্রসন্ন মুখে বলেন, 'এই জন্যেই তোমায় আমার এত ভাল লেগেছে ভবভূতি! এতো সরল ছেলে এ যুগে বেশি দেখা যায় না। সরল আর অনেস্ট।....না, দু'বার চা খাওয়া আমি সত্যিই পছন্দ করি না। ওতে খিদে নষ্ট হয়ে যায়। তবে পুরুষ ছেলেরা অত মানতে চায় না।....তোমার বাবা বলতেন, আপনার সব কথা মানতে প্রস্তুত আছি মিসেস হালদার, কিন্তু এইটি নয়!'

প্রথম ঢালা পেয়ালাটিই ভবভূতির দিকে এগিয়ে দেন পঙ্কজিনী।

ওঁকে এখন খুব গভীরে ডুবে থাকার মত দেখাচ্ছে।

মালবিকার কাছে একটা অস্বস্তিকর লাগে।

পিসি যে কথায় কথায় ভবভূতির বাবার প্রসঙ্গ তুলবেন, আর স্মৃতির গভীরে ডুবে যাবেন এ কোনো কাজের কথা নয়।

ক্রমশঃই মনে হচ্ছে মালবিকা যেন অবান্তর, মালবিকা যেন দূর সম্পর্কের আত্মীয়। ওই ভবভূতি রায় নামের লোকটাই আসল, এবং পঙ্কজিনীর আপনজন। না না, এ চলবে না।

মালবিকা বলে ওঠে, 'বারে পিসি বেশ! অন্য লোকের ছেলেটিকে আগেই চায়ের কাপ বাড়িয়ে দেওয়া হল। আর ঘরের মেয়েটির বেলায় ভুল?'

পঙ্কজিনী বেশ আত্মস্থ গলায় বলেন, 'না, তোমায় আমি আর চা দেব না। একেই তোমার খিদে কম, তাছাড়া একটুও বেড়ালে না—'

কলকাতায় কি আমাদের বেড়াবার সময় আছে পিসি?

পঙ্কজিনী জোর দিয়ে বলেন, 'নেই বলেই তো অন্যত্র গেলে, বেশি করে বেড়ানো উচিত।...যাক এখন চা খেয়ে আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবো, তোমরা ইচ্ছে করলে এ সময় বই-টই পড়তে পারো। অথবা গল্প করতে পারো। চানের সময় বংশীকে বলবে, সে সব ব্যবস্থা করে দেবে বুঝলে? এ সময় আমি একটু একাই থাকি।'

পঙ্কজিনীর চা খাওয়টা অবশ্য দীর্ঘ সময় নিয়ে। সে সময়টা তিনি একাই থাকেন।

কিন্তু কোন্ সময়ই বা নন? দেখা যাচ্ছে স্মৃতিই তাঁর সঙ্গী।

যে সব মানুষেরা অনেকদিন আগে মারা গেছেন, ওঁর কাছে তারা জীবিতের মূর্তিতে রয়েছে। উনি একা থাকতে চান, অতএব উঠে চলে আসতে লজ্জা দ্বিধা নেই।

অথচ 'গল্প করি চলুন, বলে গুছিয়ে গিয়ে বসাও যায় না, আর বললেও গল্প হয় না।'

ওরা বাগানে নেমে গেল। যে দিকটা পুবদিক।

সে দিকটায় যখন ছায়া পড়ে গেছে।

ভবভূতি বললো, ক্রমশঃই নিজেকে খুব অপরাধী লাগছে।'

'কেন?'

'ওই যে ওঁর আমার প্রতি বিশ্বাস, ওটা বিবেককে পীড়িত করছে। আসলে তো সরলও নই, অনেস্টও নই।'

'তাহলে আপনি কি?'

মালবিকা গাছের একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে টুকরো করতে করতে বলে, 'বলুন। আসলে আপনি কি?'

'উনি যা ভাবছেন ঠিক তার উল্টো।'

'কিন্তু সাধারণের ধারণা, বিবেকবান ব্যক্তিরাই ওই সব গুণের অধিকারী হয়। আপনি যে বিবেকবান সেকথা আপনি নিজেই স্বীকার করেছেন।'

'সেটা অন্য। পশু ব্যতীত মানুষ মাত্রেই কোথাও না কোথাও ও জিনিসটা লুকানো থাকে। কিন্তু আশ্চর্য এই, কাল ওঁর প্রতি—রাগ করবেন না—যে বিরূপতা আসছিল আজ যেন সেটা অনুভব করছি না। এবং একটা আকর্ষণ লাগছে। মনে হচ্ছে ওঁর স্মৃতির মধ্যে এমন কিছু রহস্য লুকানো আছে যা, আমার কোনো কিছুর সঙ্গে জড়িত।'

'পিসির কথা বলার ধরনই ওই।'

মালবিকা ভবভূতিকে লঘু করে ফেলতে যায়। এসব ওর ভাল লাগছে না। যে অদৃশ্য একটা শক্তি মালবিকাকেও কোন একটা জটিল জালের মধ্যে জড়িয়ে ফেলতে চাইছে।

'অদৃশ্য শক্তি' এই শব্দটিকেই কোনোদিন ভেবে দেখেনি মালবিকা, আজ ভাবছে। গতকাল থেকে একটা 'অদৃশ্য শক্তি'র শক্তি দেখতে পাচ্ছে মালবিকা। মাত্র এই দু'দিনে দেখা লোকটাকে জীবনের একটা অংশ মনে হচ্ছে। এ কি অন্যায়! এ কি লজ্জা! এ কি অস্বস্তিকর!

তার আবার এক অনুভূতি রায় এসে জুটলেন। ধুত্তোর।

মালবিকা ব্যাপারটাকে লঘু করে ফেলার জন্য বলে, 'এ দেশে যে যেখানে ছিল, সবাইয়ের সঙ্গেই পিসির আন্তরিক সম্পর্ক ছিল।

'তা হবে।' অন্যমনস্ক ভাবে বলে ভবভূতি।

তারপর চোখ তুলে মালবিকার দিকে তাকিয়ে বলে, 'মনে হচ্ছে পিসির গুণ আপনার মধ্যেও কিছু বর্তেছে। তাই একদিনের দেখাতেই আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।' মালবিকা আরও পাতা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে ফেলতে ফেলতে গম্ভীর ভাবে বলে, 'একটা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে মনকে চালাবেন না।'

ভবভূতিও গম্ভীর ভাবেই বলে, 'আপনার কাছে কি তা জানি না, কিন্তু আমার কাছে ভুল নয়।'

'উঃ। আপনি তো আমায় ভারী জ্বালাতনে ফেললেন।'

মালবিকা আবার গাম্ভীর্য ত্যাগ করে তরল হয়। বলে, 'কি কুক্ষণেই কাল ট্রেনে আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।'

'আমিও তাই বলতে যাচ্ছিলাম। শুরু একটা অক্ষরের অদল বদল করে! কি কুক্ষণেই কাল ট্রেনে আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।'

'আপনার আর সেটা মনে হবে না কেন? দিব্যি এক অচেনা অজানা বাড়িতে এসে উঠে 'জামাই আদরে'—বলেই হঠাৎ থেমে যায় মালবিকা। মনে মনে জিভ কাটে।

আঃ! এতো অসর্তক হয়ে যাচ্ছে কেন তার জিভটা? ছিঃ!

ভবভূতি ওই লজ্জাটি উপভোগ করে মৃদু হেসে বলে, 'হয়তো ওই আদরটা ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবাহী। কোনো এক অদৃশ্য শক্তি এই ভাবেই ঘচনাচক্রে ঘটাচ্ছে।'

অদৃশ্য শক্তি!

ভবভূতির মধ্যেও ও শব্দটা কাজ করতে শুরু করেছে তাহলে?

মালবিকার যেন গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

ওর মনে হয় সত্যিই যেন কোনো একটা শক্তি তাকে গ্রাস করতে আসছে।

মালবিকা আর কিছু না পেরে গাছের পাতাগুলো ছিঁড়তেই থাকে!

'আহা হা, কি করছেন?'

ভবভুতি বলে, 'গাছটার ওপর রাগ দেখাচ্ছেন কেন? ও বেচারী কি দোষ করলো? ওকে যে প্রায় নেড়া করে ফেলছেন। এ থেকে কি বোঝা যাচ্ছে জানেন? কোন প্রতিপক্ষকে ধরে তার চুল ছিঁড়ে দিতে ইচ্ছে করছে আপনার। তাকে পাচ্ছেন না বলেই নিরীহ গাছটাকে তার প্রতীক স্বরূপ—

'আপনার সাবজেক্টটা কি ছিল? মালবিকা বেশ চড়া গলায় বলে, 'সাইকলোজিক বুঝি?'

কিন্তু ওদিকে যে একজন ওদের দিকে দৃষ্টি ফেলেই বসে আছেন, তা কি ছাই জানে ওরা?

জানতে পারলো, যখন পঙ্কজিনীর শোবার ঘরের একটা সরু জানালা থেকে প্রায় একটি আর্তনাদ ভেসে এল, 'আহা হা, ওটা কি হচ্ছে খুকু? অত পাতা ছিঁড়ছো কেন?'

চমকে তাকিয়ে দেখে একটা কোণাতে দেওয়ালের আড়ালে একটা সরু এক পাল্লার জানালায় পঙ্কজিনীর ব্যথিত পীড়িত মুখ।

তার মানে উনি অনেকক্ষণ থেকেই নিরীক্ষণ করছেন ওদের। রাগে হাড়পিত্তির জ্বলে গেল মালবিকার।

তবু গলায় কিশোরীর লাবণ্য ফোটাতে হয়।

যে অকর্মটি করছে তার একটা কৈফিয়ৎ খাড়া করতে হয়। তাই খুব কোমল আলগা গলায় বলে ওঠে মালবিকা, 'হলদে হয়ে যাওয়া পাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছি পিসি।'

'হলদে হয়ে যাওয়া?'

পিসি লোহার গারদের ফাঁক দিয়ে মাথাটাকে প্রায় ঠেলে বার করে দিয়ে বলে ওঠেন, 'হলদে হয়ে যাওয়া পাতা আবার কোথায় পেলে খুকু? কোনো গাছেই তো একটিও হলদে হয়ে যাওয়া পাতা ছিল না।'

'ওরে সর্বনাশ!' ভবভূতি গলা নামিয়ে বলে, 'গাছের প্রত্যেকটি পাতার হিসেব রাখেন উনি।'

মালবিকা গলা খাটো করে বলে. 'তাই দেখছি', আবার সঙ্গে সঙ্গে গলা তুলে বলে, 'আমার যেন মনে হলো! আর ছিঁড়বো না।'

'না। সবুজ পাতা ছিঁড়তে নেই। গাছের লাগে?'

প'র মুখটি কিন্তু অন্তর্হিত হল না জানলা থেকে। অতএব এদেরই বাগান থেকে অন্তর্হিত হতে.হল কিছুটা সময় পার করে।

* * * *

কিন্তু ওই শোভনতার প্রয়োজন ছিল না।

খানিকটা পরে ভবভূতি যখন তার মুফতে পাওয়া জামাই আদরটুকু তারিয়ে তারিয়ে ভোগ করতে, সেই অতিথির ঘরের উঁচু গদীটার রাজকীয় বিচানাটিতে লম্বা একখানা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে, আর মালবিকা পিসির ঘরে বসে পিসির হাতের সেলাই দেখে প্রায় মূর্ছা যাচ্ছে, তখন পঙ্কজিনী বলছিলেন, 'তোমাদের যতই দেখছি ততই সন্তুষ্ট হচ্ছি আমি।....বিবাহের জন্য প্রস্তুত হয়েও যে তোমরা পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহারের সংযম রক্ষা করে চলেছো, এতে আমি ভারী সন্তুষ্ট হয়েছি। দেখলাম তো তখন। না কোন বাচালতা দেখিনি।'

মালবিকা বুক ধড়ফড়ানিটাকে কষ্টে সংহৃত করে ক্ষীণস্বরে বলে এখনো ঠিক সেভাবে প্রস্তুত হইনি পিসি।'

'দুষ্টু মেয়ে! আমার কাছে আর অত লজ্জায় কাজ নেই।'

পিসি সস্নেহ হাস্যে বলেন, 'আমি বাপু এতো বোকা নই। তবে দিনস্থিরটা করে ফেলাই ভাল। কোন্ সীজনে হলে তোমার সুবিধে? তোমার তো আবার স্কুল রয়েছে। অথচ আমারও বয়েস হয়েছে। নিয়মে থাকি বলেই এখনো ঠিক আছি। নিয়মই ভগবান, বুঝলে খুকু? তবু আয়ুর একটা লিমিট তো থাকে প্রত্যেকের। আমি সেলাই বোনা সবই তো তোমার বিয়ের প্রেজেনটেশনের জন্য। যাক এখন চানটান কর'গে। বেলা হয়ে যাচ্ছে। দিনস্থিরটার জন্য আমি ওকেই বলছি বরং। তুমি বা কি করবে সত্যি?'

*　　　　*　　　　*　　　　*

ভবভূতি চানের জন্য উঠেছিল। এবং বংশীকে সরিয়ে ইঁদারা থেকে জল তোলার তাল করছিল। মালবিকা দ্রুত পায়ে এসে কড়া গলায় বলে, 'হয় আপনি এই দণ্ডে বিদায় হোন, নয় বিয়ের দিন স্থির করুন।'

মালবিকার ওই উত্তপ্ত আরক্ত মুখটার দিকে তাকায় ভবভূতি। যা বোঝে তো বোঝে।

মৃদু হেসে বলে, 'শেষেরটাই লোভনীয় মনে হচ্ছে।'

'তা হবে বৈকি! জামাই আদরটা তাহলে বেশ পাকাপাকিই হয়, কেমন?'

'আমি তো চেষ্টা চরিত্র করে কিছু করছি না—' ভবভূতি ওর দিকে একটি কৌতুকোচ্ছল দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, 'ভাগ্য যদি নিজে থেকে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দেয়, নেব না বলে ফেলে দেব নাকি?'

'তা, দেখুন। ঠাট্টা রাখুন। পিসি আমায় কজ্জায় ফেলেছিল, এরপর বোধহয় আপনাকে ফেববে।

'আমি তো পড়তে আপত্তি করছি না।'

'দেখুন, ভাল হবে না বলছি।'

'মন্দ তো কিছুই দেখছি না। আগাগোড়া সবই ভালো।'

'আচ্ছা আপনি কি যাদুকর?'

'মনে হচ্ছে আগেও একবার এ প্রশ্ন হয়ে গেছে।'

ভবভূতি গভীর গলায় বলে, 'আমি যাদুকর কিনা এ প্রশ্ন আগে তো কেউ কোনদিন করেনি। উত্তর পত্রটা তৈরি করা নেই।'

মালবিকা বলে, 'প্রশ্ন পত্রের পরে উত্তর পত্র। ওটা কেউ আগে থেকে তৈরি করে রাখে না।'

'তাহলে অক্ষম পরীক্ষার্থী। যাদুবিদ্যা জানা আছে কিনা নিজেই জানি না।'

'জানেন। খুব জানেন। আর সেটিই সমানে প্রয়োগ করে চলেছেন। এখন আমার উপায় কি বলুন? ভেবে দেখছি হঠাৎ কলকাতায় কোন কাজ পড়েছে বলে চলে যাওয়া ছাড়া কোনো গতি নেই।'

ভবভূতি বলে, 'খবরটা তো বাতাসে আসতে পারে না? পিসিকে একটা প্রমাণপত্র দেখাতে হবে।'

'সেই তো—' মালবিকা ঠোঁট কামড়ায়।

ভবভূতি তেমনি কৌতুকের গলায় বলল, 'একটা কাজ অবশ্য করা যায়। তবে তাতেও একটা দিন অপেক্ষা করতে হয়।'

'মানে?'

'মানে হচ্ছে ঠাকুর চাকরদের মত দেশ থেকে একটা তৈরি টেলিগ্রাম আনিয়ে নেওয়া।....চট্ করে দু'একটা স্টেশন পার হয়ে গিয়ে যদি আপনার নামে 'পাওয়া মাত্র চলে আসুন' গোছের একটা টেলিগ্রাম করে দিয়ে আবার ভাল ছেলের মত ফিরে আসি?'

'দেখুন, আপনি সমানেই ব্যাপারটাকে কৌতুকের চক্ষে দেখে চলেছেন, আর মজা করছেন। মনে হচ্ছে খুব মজাই পেয়েছেন। চলে আসবো মানে? কোথায় চলে আসবো?'

'কেন কলকাতায়!'

'টেলিগ্রামটা কোথা থেকে এলো, সেটা দেখবে না পিসি।'

'না না, সেটা অত দেখবেন না।'

'তাহলে পিসিকে চিনতে আপনার দেরী আছে। যতই আপনার বাবা'— মালবিকা আবার ঠোঁট কামড়ে বলে, ওই আর একটা প্যাঁচে পড়ে গেছি! কোথা থেকেই যে পিসির পুরনো বান্ধব অনুভূতি রায়ের ছেলে তার স্কন্ধে ভর করলেন।'

ভবভূতি বলে, 'এবার মনে হচ্ছে আপনি সত্যি রেগেছেন।'

'আমার মত অবস্থা হলে বুঝতেন। যাক—বুঝবেন। একটু পরেই আপনাকেও বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হবে। আপনাকেই ভার দেওয়া হবে—দিন স্থিরের জন্য।'

'আমার পক্ষে এটা কোনো প্রবলেমই নয়।'

'প্রবলেম নয়?'

'না তো। স্রেফ বলে দেব আপনি যেদিন বলবেন।'

'ঠিক আছে। আমি আজিই চলে যাচ্ছি।'

'যান। আমি পিসির সঙ্গে পরামর্শ করে একেবারে দিনস্থির করে ফেলে—'

'উঃ। আপনি একটি শয়তান।'

'খুব একটা নতুন কথা শোনালেন না। এটা আমার নিজেরই জানা খবর।'

'নিজের জানা খবর?'

ভবভূতি উদাস উদাস গলায় বলে, 'বিবেকবান ব্যক্তি মাত্রেই নিজেকে শয়তান বলে টের পায়। যাক আপনি অত বিচলিত হবেন না। আমি আজই আপানার সমস্যার সমাধান করে দেব—'

ইঁদারায় বালতিটা নামিয়ে কপিকলের দড়িটা টানতে টানতে একটু ঝুঁকে দেখে ভবভূতি।

মালবিকার পা-টা ছম্‌ছম্‌ করে ওঠে। মালবিকা একটা যা তা কাণ্ড করে বসে। ভবভূতির জামার কোণটা টেনে ধরে বলে ওঠে, 'তার মানে?'

জলটা টেনে তুলে পাড়ে বসিয়ে ভবভূতি মৃদু হেসে বলে, 'ভয় নেই, এমন নাটকীয় ভাবে সমস্যার সমাধান করছি না। আজই চলে যাবো। একটু পরেই একটা ট্রেন আছে—'

'আমি আপনাকে আজই চলে যেতে বলেছি। এক্ষুণি।'

'ট্রেনের টাইমটা দেখতে হবে তো?'

'আপনি খুব খারাপ লোক?'

'তাহলে আরও একটা বিশেষণ বাড়লো।'

'মানে?'

নিজের ক্ষণপূর্বের দুর্বলতায় লজ্জিত হয়েই বোধকরি মালবিকা একটু বেশি তীক্ষ্ণ হয়।

ভবভূতি তেমনি উজ্জ্বল কৌতুকের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, 'এক নম্বর 'সাংঘাতিক' যেটা প্রথম দর্শনেই বলেছেন, তারপর দু'নম্বর 'যাদুকর', তিন নম্বর 'শয়তান', চার নম্বর 'খুব খারাপ'।'

'আপনি আমার অবস্থা বুঝছেন না বলেই এতো বিদ্রূপ করছেন। প্রথম থেকেই পিসি একটা ভুল ধারণা করে এইসব যা তা করছে—মরতে তখন সত্যি কথাটা না বলে যে—'

'আমি তো বলছি আপনি তখঁন সত্যি কথাই বলেছিলেন। অনেক দিনেরই পরিচিত আমরা, দৈবক্রমে এ যাবৎ দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি এই যা। বনলতা সেন কি শুধুই নাটোরের?'

মালবিকা ইঁদারার পাড়ের বেদীতে বসে পড়ে বলে, 'আপনি আজই চলে যান। আমি আর পারছি না।'

'বুঝতে পারছি সেটা। দেখুনগে যাবার জন্যে সব প্রস্তুত করেই রেখেছি। মানে যে ক'টা জিনিস ছড়িয়েছিলাম, সুটকেসে ভরে রেখে এসেছি, চান করে নিয়েই বেরিয়ে পড়বো।'

মালবিকা দাঁড়িয়ে উঠে বলে, 'চান করেই চলে যাবেন? মানে না খেয়ে?'

'খেতে গেলে এই গাড়িটা ধরা যাবে না—'

'ঠিক এই গাড়িটাতেই না গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না—'

মালবিকা ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'আমি আপনাকে গলাধাক্কা দিচ্ছি কেমন? তাই চান করে চলে যাবেন ভাত না খেয়ে। আর পিসি আজ আপনার জন্য মুরগী রান্না করতে দিয়েছে।

'সেটা পিসির ভাইঝিই খাবেন। ভালই হবে ভাগ বাড়বে।'

'উঃ! এই মানুষকে নিয়ে পিসি দিনস্থিরের স্বপ্ন দেখছে। উঠতে বসতে মানুষকে পাগল করতে পারে এই লোক।'

'দেখুন আমার সন্দেহ হচ্ছে, সেটা কারো করবার অপেক্ষায় নেই। এতোরকম উল্টোপাল্টা কথা বলতে শুরু করেছেন, খুব সুস্থ মাথা মনে হচ্ছে না। থাকাও চলবে না, যাওয়াও চলবে না, কাজের কথাও চলবে না—'

'আপনাকে কিছু করতে হবে না, দয়া করে চান করতে যান। কিন্তু এ কি, আপনি জল তুলে ড্রাম ভরছেন মানে?'

'কেন এতক্ষণ দেখতে পাননি?'

'লক্ষ্য করিনি। শীগগির ছাড়ুন। পিসি দেখলে রক্ষে রাখবে না।

'জল তুলতে কিন্তু বেশ মজা লাগে।'

'লাগুক। রাখুন।...বংশী! বংশী!'

'আঃ! তাকে কেন আবার। অনেক খোসামোদ করে তার কাছে পারমিশান আদায় করেছি—'

'পিসি যদি দেখেন তার আদরের গেস্ট ইঁদারা থেকে জল তুলছে—'

'পিসির দেখবার চান্স নেই। এটা তো বাড়ি থেকে বেশ দূরে।'

'হ্যাঁ। বাইরের লোকেও যাতে জল নিতে পারে সেই ভাবেই তৈরি। ইঁদারা-টিদারা সাধারণত এই ভাবেই করে লোকে।'

'তার মানে পুণ্য অর্জন। জল দানের পুণ্য! মানুষ খুব পুণ্য পিপাসু, তাই না?'

'হুঁ।'

'আচ্ছা আমাদের এই যুগ কি ঠিক সে রকম? সেকেলে লোকে পুণ্য লোভে কত কি করতো।'

'একালেও করে। সোস্যাল ওয়ার্ক করে।' বলে মালবিকা।

আসলে এসব কথা এদের কাছে এখন অন্ততঃ কোনো প্রয়োজনীয় কথা নয়। শুধু কথার সুখেই কথা।

আর মালবিকা বুঝি নিজের মনের দিকে তাকাতে ভয় পাচ্ছে, তাই ভবভূতির চলে যাওযার প্রসঙ্গ থেকে অন্য যাহোক একটা প্রসঙ্গে এসে বাঁচছে।

দুটো জল ভরা বালতি হাতে তুলে নেয় ভবভূতি।

মালবিকা অস্বস্তির গলায় বলে, 'নিজে নিয়েও যেতে হবে? বংশীকে ডাকলে হত না?'

ভবভূতি সহজ গলায় বলে, 'ওই বুড়ো লোকটা আমায় জল বয়ে দেবে, তবে আমি চান করবো। লজ্জার কথা, বলবেন না! তাছাড়া—সত্যিই কিছু আর আমি আপনাদের মাননীয় বা আদরে অতিথি নই।'

'ছিলেন না। কিন্তু সে দাবি তো অর্জন করে ফেলেছেন। 'অনুপমা কুটিরের মালিক অনুভূতি রায়ের ছেলে আপনি—'

ভবভূতি আস্তে বলে, 'হ্যাঁ ওইখানেই এক গিঁট বেঁধে বসে আছে?'

'আচ্ছা, সকালে পিসি কেন ওখানে গিয়েছিল, জিজ্ঞেস করবেন না?'

'পাগল হয়েছেন নাকি? উনি যেভাবে সন্ত্রস্ত হয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বেরোলেন দেখলাম! বেশ বোঝা গেল, চান না যে কেউ দেখুক!'

'এ এক রহস্য!'

মালবিকা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'চলুন একদিন ঝর্ণা দেখে আসি।'

'একদিন দেখে আসি।' ভবভূতি হেসে ওঠে।

বেশ খোলা গলাতেই হেসে ওঠে। 'এটা তো পূর্ব পরিকল্পনার সঙ্গে মিলছে

না। একদিন দেখে আসি মানে? ভাষান্তর হিসেবে তো তাহলে বুঝতে হয় অনেক দিনের মধ্যে যে কোনো একদিন।'

'আঃ। আপনি এতো কথা জানেন। একদিনটা না হয় কালই হোক। কাল সকালে। আজ তো আর যাওয়া হচ্ছে না।'

'তা বটে। মুরগীর ঝোল ফেলে খালি পেটে ট্রেন ধরতে যাওয়া বোধহয় খুবই মুখ্যুমি হবে, তাই না?'

ভবভূতি বলে, 'আপনি যখন সেই আপনার তালঠোকা সিরিয়াস ভঙ্গীটা ত্যাগ করে অসাবধানে হঠাৎ হালকা হয়ে যান, আপনাকে দেখতে ভারী ভালো লাগে।'

কথাটা শুনে মালবিকার হঠাৎ হাসি পেয়ে যায়।

নাঃ, পিসি ঠিকই ধরেছে, লোকটা সত্যিই বেজায় সরল। যা মনে আসে বলে বসে।

তবু চেষ্টা করে ওই হালকা ভাবটা মুখ থেকে মুছে বলে, 'সব মানুষই যদি আপনার মত হালকা হয়, ইহসংসারের কাজকর্ম চলে না।'

'ওই তো! ওই একটি ভুল ধারণা পোষণ করে এই মানুষ সমাজ অথবা সমাজের মানুষ নিজেদের করব নিজেরা খুঁড়ে চলেছে। জীবনটাকে এত একটা সিরিয়াস জিনিস ভাববার দরকারটা কি? এই মহাবিশ্বের মহাপ্রবাহের মধ্যে বুদ্বুদ সদৃশ এই মানুষের কতটুকু মূল্য? এই তো দাঁড়িয়ে আছি, এই মুহূর্তে হার্টফেল করতে পারি। ব্যস্ এতো ভাবনা চিন্তা, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, মন নিয়ে লড়ালড়ি, সব খতম! তবে?'

'আচ্ছা আপনার কি কোনো কথাই আটকায় না? হঠাৎ এসব তুলনা দেবার দরকার?'

ভবভূতি মালবিকার বিরক্তি বিরক্তি মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে।

মালবিকার এখনো চান হয়নি, রুক্ষ চুলের কুচিগুলো বাতাসে উড়ছে, মালবিকার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। রোদের আঁচ লাগছে মালবিকার মুখে। মালবিকা সুন্দরী নয়, এমন কি কেউ ওকে বিশেষ একটা সুশ্রী মেয়েও বলে না, তবু এখন যেন ওকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। অন্তত ভবভূতির চোখ দিয়ে দেখলে।

ওর এই সুন্দর হয়ে ওঠা মুখের দিকে তাকিয়ে ভবভূতি বলে, 'শুধু ওইটুকু বলেই ছেড়ে দিলেন যে? বাকিগুলো বলুন?'

'বাকিগুলো মানে?'

'মানে এই ভরদুপুরে শনিবারের বারবেলায় এসব অলুক্ষণে কথা বলবার কি দরকার রে।—এইটাই বলতেন আমার এক ঠাকুরমা।'

'আপনার ঠাকুমা বলতেন। তার সঙ্গে আমাব কি সম্পর্ক হলো?'

'খুব নিবিড় সম্পর্ক। আপনার মুখের রেখায় আমার সেই ঠাকুরমার মুখের ছায়া দেখতে পেলাম।'

'আপনি অমন অনেক ভূত ভবিষ্যতের ছায়া দেখতে পান। আমি এই চললাম।'

মালবিকা বললো, 'চললাম!' তবু দাঁড়িয়ে থাকলো বিহুলের মত। যতক্ষণ না ভবভূতির দীর্ঘ দেহটা মিলিয়ে গেল স্নানের ঘরের উদ্দেশে কোনো একটা দেওয়ালের আড়ালে।

দাঁড়িয়ে রইলো, যেন অভূতপূর্ব একটা দৃশ্যের মুখোমুখি হয়েছে।

একটা বলিষ্ঠ পুরুষ দু'হাতে বড় দু'বালতি জল নিয়ে যাচ্ছে। এটা কি খুব একটা আশ্চর্যের বিষয়? মালবিকার জীবনে একেবারে অদেখা দৃশ্য? তাই মালবিকা অমন আচ্ছন্নের মত তাকিয়ে দাঁড়িযে থাকে?

কিন্তু এ দৃশ্যের বিষয় তো সে শ্রীমতী পঙ্কজিনী হালদারের কাছে গল্প করতে যায়নি মালবিকা? তিনি আবার অমন বিহুল হলেন কেন?

অমন বিস্ময় আর অভিযোগের কণ্ঠে প্রশ্ন করে উঠলেন কেন, আপনি না কি নিজে ইদারা থেকে জল তুলে স্নান করেছেন?'

কিন্তু পঙ্কজিনীর প্রশ্নে কি শুধুই বিস্ময় আর অভিযোগ ছিল। কোথায় যেন একটু সপ্রশংস সসম্ভ্রম ভঙ্গীও ছিল না কি?

যেটাকে ভাষায় দাঁড় করালে হয়তো এই রকমটা হতে পারে—'তা' তুমি তো এই রকমটাই করবে। তোমাকে এ ছাড়া অন্য কিছু মানাতোও না।'

এখন ভবভূতি স্নান সেবে সঙ্গে আনা একমেবাদ্বিতায়ং-এর 'দ্বিতীয়' পোষাকটা পরে আহারের সামনে এসে বসেছে। পরিষ্কার মুখ, পরিপাটি চুল, ফর্সা ধবধবে পায়জামা আর হালকা নীলরঙা পপলিনের হাওয়াই শার্টে সত্যিই রীতিমত ভাল দেখাচ্ছে তাকে।

ভবভূতির ইচ্ছে হচ্ছিল এমন চমৎকার স্নানের পর জামাটা আর গায়ে চড়াবে না, শুধু হাতকাটা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে আরাম করে খেতে বসবে, কিন্তু

সাহস হয়নি। কি জানি রুচিশীলা মহিলার চোখে ওই পোষকটা যদি অরুচিকর ঠেকে।

সেটা কী হতো কে জানে, এটা যে অন্ততঃ খুবই প্রীতিকর হয়েছে, তা' পঙ্কজিনী হালদারের মুখের রেখার অভিব্যক্তিতে ধরা পড়েছে। প্রীতিস্নিগ্ধ প্রসন্ন সেই মুখ থেকে ওই অভিযোগটি ঝরে পড়ে। 'আপনি নাকি নিজের হাতে জল তুলে—'

ভবভূতি অবশ্য বলতেই পারতো, 'বুড়ো বংশীকে দিয়ে জল তুলিয়ে চান করা, আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না—'

কিন্তু ভবভূতি সে কথায় গেল না, ও হেসে উঠে বললো, 'আঃ যা দারুণ মজা লাগলো! আমার তো ইচ্ছে করছিলো জল তুলে তুলে বাড়ির সব বালতি চৌবাচ্চা, সোরাই-টোরাই ভরে ফেলি। আর কী অপূর্ব জল! আঃ! বাইরে এতো রোদ কিন্তু জলটা যেন বরফ জল!'

পঙ্কজিনী অবশ্যই নিজের ভঙ্গীতে খাঁজ কেটে কেটে বিচ্ছিন্ন উচ্চারণে কথা বলছেন, তবু শুনতে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া কানে আর তেমন অসহ্য লাগছে না। ভবভূতির মনে হলো, উনি বেশ সহজ ভাবেই বললেন, 'ভালোলাগার ক্ষমতা একটা আলাদা ক্ষমতা, ওটা সকলের থাকে না, আপনার আছে! আগে তো এই ইঁদারার জলে কতো অতিথিই স্নান করে গেছে, 'জলটা অপূর্ব' একথা বলতে মনে পড়েনি কারুর!

ভবভূতি এই অন্যের সঙ্গে তুলনায় লজ্জিত হয়, তাড়াতাড়ি বলে, 'আপনার এখানে ভালো লাগবার উপকরণ এতো আছে যে, ওটা বলতে বোধহয় মনে পড়ে না। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, আজকের এই সুন্দর স্নানটা চিরকাল মনে থাকবে।'

পঙ্কজিনী একটু হাসেন, মাপা জোপা। তবু প্রসন্নতায় ভরা। 'তা চিরকাল তো আসতেও হবে এখানে। আমি তো চিরকাল থাকবো না। বাড়িটা তো আপনাদেরই দেখতে হবে।'

ভবভূতি একটু চোরাদৃষ্টি নিক্ষেপ করে, কাজ হয় না। মালবিকার মুখ অন্যদিকে ফেরানো।

রান্নার অজস্র প্রশংসা করে ভবভূতি পঙ্কজিনী হিসেবে খাদ্যবস্তুর বেশ মাত্রা ছাড়া মাপ আদায় করে নিয়ে হৃষ্টচিত্তে আহার পর্ব সমাধা করে।

পঙ্কজিনী শুধু বলেন, 'রাত্রে বংশীকে বলে রাখবো, লাইট কিছু রান্না

করতে, কি বল খুকু? বেশি মাসলাদার 'রীচ' খাবার দুবেলা খাওয়া ঠিক নয়।'

পঙ্কজিনী নিত্য অবশ্য ওই সব 'রীচ' খাদ্যের ভাগীদার নয়। রাত্রে তাঁর নিরামিশ আহার্যের পাত্রে শুধু দু'খানা হাতে গড়া রুটি, দুটি আলু-সিদ্ধ, আর একটু মধু।

এখন খাচ্ছেন কয়েক চামচ ভাত, সামান্য কিছু সবজি।

মালবিকার বিস্ময় প্রশ্নে ধীরে বলেন, 'বেশি বয়সে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাওয়া মানেই আয়ুকে ক্ষয় করে মৃত্যুকে ডেকে আনা।...অনেকে অবশ্য আমার এ কথায় হাসে—হ্যাঁ খুকু, এখানেই এমন কেউ কেউ আছেন যাঁরা বলেন, 'এ বয়সে আবার বাঁচার জন্যে এতো—আমাদের তো ভাই এখন মরাই ভালো। আপনার নিয়ম দেখে হাসি পায়—'

আমি এ কথার সমর্থন করি না। মরলেই ভালো এমন অদ্ভুত কথা ভাবতে যাবো কেন? মৃত্যুর পর আমার এই অবস্থার থেকে উত্তম কোনো অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়বো, ও গ্যারাণ্টি কেউ দিতে পারবে আমায়? এখন আমি কি খারাপ আছি? এই আকাশ, এই বাতাস, এই গাছপালা, ফলফুল, এই চিরকালের পরিবেশ, আর নিজের এই চিরচেনা 'আমি'টা, এ সব কত শান্তির, কত তৃপ্তির!...মৃত্যু মানেই তো এ সমস্তই হারিয়ে যাওয়া।'

ভবভূতি আস্তে বলে, 'আপনি খুব ভাবেন তো!'

মালবিকাও আস্তে বলে, 'ভাবা ছাড়া আর তো কিছুই করার নেই।'

পঙ্কজিনী বলেন, 'হয়তো ঠিকই বলেছো তুমি খুকু! চোখের অসুবিধার জন্যে বই পড়াটা এখন কমে গেছে, তাছ'ড়া ভাল বইও তেমন পাই না! তাই চুপচাপ বসে বসে ভাবি। ভেবে ভেবে দেখি মানুষ কত ভুল চিন্তার মধ্যে থাকে। এখানে যাঁরা আছেন, তাঁদের প্রত্যেকের বাড়িতেই অবশ্য যাই আমি, রোজই যাই খবর-টবর নিতে। ভোরের বাতাসটাও কিছুটা ভিতরে ভরে নেওয়া হয়। তবে ওই ওঁদের কারুর সঙ্গেই আমার মতের ঠিক মিল হয় না।...ওঁদের মতে আমার এই একা থাকাটা খুব কষ্টের। আমি তো ভেবে পাই না কেন কষ্টের। আমার কাছে কেউ নেই, এও তো আমি খুব 'ক্ষীণ' করি না। একদা যারা ছিলো, তারা তো রয়েইছে। স্মৃতি থেকে তো হারিয়ে যায়নি। তাদের স্মৃতিই তো সঙ্গ।'

পঙ্কজিনী যখন এসব কথা বলছিলেন, মনে হচ্ছিল যেন জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য কোথাও ডুবে গেছেন।

মালবিকা এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পেতে চায়। মালবিকার ভয় হয়, ওঁর এই নিমগ্ন চিত্তের অনুভূতি থেকে হঠাৎ অনুভূতি রায়চৌধুরী উঠে আসবেন। তাই একটু হেসে বলে, 'কিন্তু যাই বলো পিসি, তোমার এঁই 'শান্তি'র শান্তিতে বংশীর যথেষ্ট অবদান আছে। ও যদি এভাবে না থাকতো, দেশেটেশে পালাতো, তোমারও হয়তো প্রাণ পালাই পালাই করতো।'

পঙ্কজিনী আস্তে মাথা কাৎ করে বলেন; 'এটা তুমি খুব ভুল বলনি খুকু। বংশীও আমায় অনেক দিয়েছে। এখনো দিচ্ছে। তবে মজা কি জানো, এই পাওয়াটা সব সময় মনে পড়ে না। যেমন মনে পড়ে না এই আলো, এই বাতাসকে।.....ঠিক বলেছো, ঠিক বলেছো তুমি। বংশীও আমার এই শান্তির একটা অংশ।'

ভবভূতি পরিস্থিতিকে হালকা করে ফেলতে হেসে ওঠে, 'দুঃখের বিষয় আপনার বংশী কানের দরজায় একেবারে তালাচাবি মেরে ফেলেছে।'

পঙ্কজিনী অন্যমনস্কের মত বলেন, 'হ্যাঁ, ওটাই যা একটু অসুবিধে। কিন্তু আগে তো এমন ছিল না। আমি সেই আগের বংশীকেই ওর মধ্যে থেকে দেখতে চেষ্টা করি। কী স্মার্ট, কী এক্সপার্ট ছিল। অনুভূতিবাবু বলেছিলেন, আপনাকে একটি 'জুয়েল' এনে দিলাম মিসেস হালদাব।'....কত ঠিক যে বলেছিলেন!'

আবার অনুভূতি বাবু। মালবিকা একটা হতাশ নিঃশ্বাস ফেলে।

খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, পঙ্কজিনী বললেন, 'আপনার সঙ্গে একটা বিষয়ে একটু আলোচনা করবার আছে ভবভূতিবাবু—'

'বলুন।'

'না-না, এখন না। এখন আপনি বিশ্রাম করতে যান—'

ভবভূতি অনায়াস গলায় বলেন, 'বিশ্রাম? বিশ্রামের কি আছে?'

পঙ্কজিনী মৃদু হেসে বলেন, 'আপনার নেই, আমার আছে। মানে এ বয়সে, প্রয়োজন না হলেও বিশ্রাম করা উচিত।'

'তা বটে। মাপ করবেন। বুঝতেই পারছেন বোধহয় আমার খেয়াল-টেয়াল একটু কম—'

পঙ্কজিনী একটু যেন চমকে ওঠেন। বিহ্বলের মত বলেন, 'খেয়াল-

টেয়াল!—কথায় কি অদ্ভুত সাদৃশ্য!....আচ্ছা আমি একটু বিশ্রাম করতে যাচ্ছি।'

চলে গেলেন! একটু যেন স্খলিত পায়ে।

ভবভূতি তাকিয়ে দেখল, মালবিকা বারান্দার ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এখন এদিকটার রোদ পড়ে গেছে, হাওয়া বইছে স্নিগ্ধ। মালবিকার মুখের চারপাশে চুল উড়ছে।

ভবভূতি আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

মালবিকা টের পেলো, কিছু বললো না।

ভবভূতি একটু চুপ করে থেকে গাঢ় গভীর গলায় বললো, 'আপনার পিসিমা আলোচনা করতে চাইছেন দেখে, মিথ্যে বলবো না, এতক্ষণ খুব মজা লাগছিলো, এখন আর লাগছে না। এখন সত্যিই নিজেকে খুব নীচ মনে হচ্ছে। আপনি যদি বলেন, উনি ওঠবার আগেই আমি চলে যেতে পারি। স্টেশনে ঘণ্টা কতক কাটিয়ে রাত্তিরের ট্রেনে চলে যাবো।'

মালবিকা ফিরে দাঁড়ায়।

তীক্ষ্ণ গলায় বলে, 'আমি বলবো? আমি বলতে যাব কেন? আমি বলবার কে? আমি তো সম্পূর্ণ অবান্তর। আপনি বাড়ির মালিকের এমন একজন বন্ধুপুত্র, যে বন্ধুর নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মালিকের স্মৃতি সমুদ্রে উথাল-পাতাল ঢেউ ওঠে।'

'আমার দুর্ভাগ্য।' বললো ভবভূতি।

'দুর্ভাগ্য কেন?' মালবিকা বলে, 'সৌভাগ্য বলুন।'

ভবভূতি হতাশ স্বরে বলে, 'জানিনা একেই ভাগ্যচক্র বলে, না শুধুই ঘটনাচক্র? তবে হঠাৎ অনুভব করছি, আসলে কিছুই যেন আমরা নিজেরা করছি না, কোন একটা প্রবল শক্তি আমাদের কোনো এক পরিণামের দিকে এদিকে নিয়ে চলেছে।'

মালবিকার মুখে হালকা একটু ব্যঙ্গহাসি ফুটে ওঠে, 'এ কথাটা কিন্তু ঠাকুমা দিদিমাদের কথার সঙ্গে খুব তফাৎ হলো না।'

'হয়তো তাই। আমার অনুভবের মধ্যে যা আসছে তাই বললাম। মনে হচ্ছে আরো যেন প্রবল আর অনিবার্য কিছু আসছে, যাকে রোধ করবার ক্ষমতা আমার হাতে নেই। তাই পালাতে চাইছি।'

মালবিকার মুখের সেই ব্যঙ্গ হাসিটা মিলিয়ে যায়। মালবিকা শুকনো মুখে বলে, 'এ কথার মানে? কী আসবে?'

'জানি না! এমনি কেমন যেন মনে হচ্ছে। যেন আরো জটিল জালের মধ্যে পড়তে চলেছি আমি। যে ভবভূতি রায় জীবনের এতগুলো বছর শুধু হালকা হওয়ার স্রোতে ভেসে কাটিয়ে এলো, তার হঠাৎ এমন ভাবনা হচ্ছে কেন কে জানে! না মিস্ চৌধুরী, আমিই পালাই।'

মালবিকা আরো শুকনো গলায় বলে, 'পালিয়ে কি অনিবার্যের হাত এড়াতে পারবেন?'

'জানি না! ভয় হচ্ছে আমিই হয়তো শেষ পর্যন্ত আপনার অনিষ্টের কারণ হবো।'

মালবিকা হঠাৎ সোজাসুজি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে,—'হঠাৎ এমন ভয় দেখানো রহস্যময় কথা বলতে শুরু করলেন যে? শুনে মনে হচ্ছে কোনো অতীন্দ্রিয় শক্তির বলে আপনি অনাগত ভবিষ্যৎকে দেখতে পাচ্ছেন।'

ভবভূতি শান্ত গভীর গলায় বলে, 'আমার নিজেরই তাই মনে হচ্ছে।'

'হঠাৎ হঠাৎ মনে হয় আপনি একজন অভিনেতা—'

'আমার সম্পর্কে আপনার এতো রকম ধারণা হচ্ছে, শুনে মোহিত হয়ে যেতে হয়।'

মালবিকা সহসা বারান্দার সিঁড়ির ধাপে বসে পড়ে, মালবিকার গলাতেও হতাশার স্বর, আপনি আমায় কী ভাবছেন জানি না, কিন্তু কী করবো, কিছুতেই যেন আপনাকে বিশ্বাস করতে পারছি না। কেবলই মনে হচ্ছে আপনার সব কিছু বুঝি বানানো—'

ভবভূতি মৃদু হাসে। বলে, 'অথচ আমার এই মামাতো কাকাটি ছাড়া আর কিছুই আমার বানানো নয়! আসলে কী জানেন প্রথম নম্বরেই পিসির কাছে ম্যানেজ করতে গিয়ে বানাতে বসে—'

মালবিকা ম্রিয়মান গলায় বলে, 'সে দোষ তো আমারই। আমিই আপনাকে—'

ভবভূতি বলে, 'আচ্ছা, সেই শুরুটা তো বেশ মজা বলেই মনে হচ্ছিল। যেন একটা কৌতুক নাট্য মঞ্চস্থ করে দর্শকের ভূমিকায় আমোদ অনুভব করছিলাম। হঠাৎ নাটকটা সিরিয়াস হয়ে উঠলো কখন বলুন তো?'

মালবিকা মনে মনে বলে, 'কখন আর? যখন আপনার সেই লোকান্তরিত

পিতৃদেব অনুভূতি রায় মঞ্চে এসে অবতীর্ণ হলেন।....কিন্তু মনের কথা তো মনেই রাখতে হয়। মুখে যা বলতে হয় তাই বলে, 'এর উত্তর দিতে হলে আপনার কথাটাই রিপিট করতে হয়। ওই অদৃশ্য শক্তি—'

ভবভূতি ওর এই বসে পড়া শিথিল ভঙ্গীটার দিকে তাকিয়ে থাকে একটুক্ষণ, তারপর আস্তে বলে, 'তা' হলে আপনি কী করতে বলেন? সেই শক্তির হাতে আত্মসমর্পণ, না তার সঙ্গে লড়াই?'

মালবিকা উঠে পড়ে, এ আলোচনায় ইতি টানার ভঙ্গীতে ছোট্ট একটি হাই তুলে বলে, 'এখন আমি কিছুই বলতে পারছি না, দারুণ ঘুম পাচ্ছে। আপনার ওপর তো অর্ডার ছিল বিশ্রাম করবার।'

'পেরে উঠবো কিনা ভাবছি!....ধরুন আপনি ঘুম থেকে উঠে দেখলেন, মিসেস হালদারের গেষ্ট রুমটি ফাঁকা, গেষ্ট হাওয়া!'

মালবিকা ভুরুতে অপরূপ একটি ভঙ্গী করে বলে ওঠে. 'ধরবো এই কথা? তার মানে আমাকে মিসেস হালদারের জেরার মুখে নিক্ষেপ করে চলে যাবেন? যান, যদি ধর্মে হয়।'

আশ্চর্য!

এতো সব কথার পর মালবিকা কি আবার সেই কৌতুক নাট্যের ভূমিকাতেই ফিরে এলো?

বিশ্রাম কার কতটা হলো কে জানে! কে জানে মালবিকার সেই দারুণ ঘুম পাওয়াটা হাওয়ায় উড়ে গেল, না চোখ পেতে বসলো খানিকক্ষণ? আর পঙ্কজিনী তাঁর বয়সের প্রয়োজন অনুসারে বিশ্রাম করে নিলো কিনা।

মোট কথা, ঘণ্টা দেড়েক পরে ভবভূতি রায়কে বংশীদাসের পিছু পিছু পঙ্কজিনী হালদারের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াতে দেখা গেল।

পঙ্কজিনী বললেন, 'আসুন। আপনাকে ডেকে এনে কষ্ট দেওয়ার জন্যে খুব লজ্জিত হচ্ছি, আমার নিজেরই আপনার কাছে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু—'

এখন আবার যেন মনে হলো পঙ্কজিনীর কথাগুলো আলাদা আলাদা শব্দ জুড়ে তৈরি। যেন বড় বেশি ক্ষীণও।

ভবভূতি মনে মনে বললো, সেরেছে, এখন আবার এই যন্ত্রণা পোহানো! মুখে অবশ্য বললো, না না এ কী বলছেন? আপনি যাবেন কী বলুন?

পঙ্কজিনী বললেন, 'ঠিক বলছি, আপনি আমার অতিথি, আর অতিথি হচ্ছে

নারায়ণ তুল্য! তাঁকে সে সম্মান দেওয়া উচিত। কিন্তু হঠাৎ কেমন উইক ফীল করছি। আমার কখনও এরকম হয় না, অনেকেই বলেন, 'অবসন্নতা অনুভব করছেন', আমি কখনও ওই অবসাদটা অনুভব করিনি। আজই যে হঠাৎ কেন—'

ভবভূতি বলে, 'তা' এখন যদি কথা বলতে অসুবিধা বোধ করেন, এখন থাক্ না।'

'না। দরকারি কাজ ফেলে রাখা আমি উচিত মনে করি না। আমি বলছিলাম, বিবাহের দিন স্থির সম্পর্কে আপনারা নিজেরা কোনো আলোচনা করছেন না কি?

ভবভূতি অবশ্য এ আশঙ্কা করেই এসেছিল, তবু যেন চমকে ওঠে। বিনা ভূমিকায় এত স্পষ্ট আর সোজাসুজি প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না।

কিন্তু স্পষ্ট প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর পাবার জন্যে স্পষ্ট চোখে তাকিয়ে আছে পঙ্কজিনী হালদার, অতএব ইতস্তঃত করা চলে না, মাথা তুলে স্পষ্ট গলাতেই বলে, 'না, ঠিক সে রকম কোনো আলোচনা হয়নি।'

'আমার মনে হয়, এতোদিনে সেটা উচিত ছিলো—'

পঙ্কজিনী একটু থামেন, একটু যেন হাঁপানও, তারপর আবার নিজস্ব ভঙ্গীতে বলেন, 'দু' জনেরই বিবাহের বয়েস যথেষ্ট হয়েছে, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করবেন এটাই স্বাভাবিক।

ভবভূতি মৃদু গম্ভীর গলায় বলে, 'আসলে কী জানেন। অল্প বয়েস থেকেই জীবনটা আমার এমন ছন্নছাড়া, তাকে নিয়ে ভাববার অভ্যাসই জন্মায়নি।'

'ঠিক! বুঝতে পারছি আপনার অবস্থা! খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় তবে এও ঠিক, এই যে এতোবড়ো একটা পাওয়া পেয়ে গেছেন, এর থেকে তো সব শূন্যতাই পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এখন তো আর আপনি আপনার জীবনকে ছন্নছাড়া বলতে পারেন না। বলুন পারেন কি?'

ভবভূতি শক্ত মনের ছেলে, তবু কি একবার কেঁপে ওঠে না তার সেই মন?

সেই কাঁপা মনকে সংহত করে অকম্পিত গলায় বলে ভবভূতি, 'দেখুন আপনাকে তাহলে সত্যি কথাটাই বলি, মিস্ চৌধুরী বোধহয় এখনো মনস্থির করতে পারেন নি।'

'এ কী বলছেন আপনি?'

প্রায় আর্তস্বরে বলে ওঠেন পঙ্কজিনী, 'মনস্থির করতে পারেননি? আশ্চর্য,

পুরুষ ছেলেদের বোধ বুদ্ধির এতো অভাব হয়। খুকু যদি মনঃস্থির করতেই না পেরেছে, তো আপনাকে সঙ্গে নিয়ে আমার কাছে এলো কেন?'

ভবভূতি ভেবে পায় না এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবে। ভবভূতি মাথাটা একটু নীচু করে চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে থাকে।

পঙ্কজিনী হালদার একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বলে, 'তা' শুধু আপনাকে দোষ দেওয়া চলে না, এটা ছেলের স্বভাব ধর্ম। তাদের বিদ্যা বুদ্ধি যতই থাকুক, সাধারণ বোধ বুদ্ধির ঘরের জানালাগুলো বন্ধই থাকে, কেউ এসে খুলে না দিলে সে ঘর অন্ধকারই পড়ে থাকে।'

আমি বলছি, ওর 'মনঃস্থির' নিয়ে দ্বিধা করবার কোনো কারণ নেই আপনার।'

ভবভূতির হঠাৎ মনে হয়, সত্যিই তো, কেনই বা এমন দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছি আমি, ভাগ্য যদি যেচে এসে আমার দরজায় দাঁড়ায়, আমি সে দরজা খুলে দেব না?

ভবভূতি বলে বসে, 'ঠিক আছে, আপনিই তাহলে ওই স্থিরটা করে দিন।'

'আমি!'

পঙ্কজিনী মাথাটাকে উঁচু-নীচু করে নেড়ে বলেন, 'এটা আপনি বলতে পারেন, আমারই দায়িত্ব এটা। কিন্তু দেখুন আপনাদের উভয়েরই নিজস্ব একটা কর্মজীবন আছে, সেই জীবনের বাস্তব কিছু সুবিধা অসুবিধা আছে, কাজেই আপনাদেরই করে নিতে হবে এটা।'

ভবভূতির মনে পড়লো তার এক ঠাকুমা কথায় কথায় বলতেন, ডুবেছি না ডুবতে আছি—

কথাটার অর্থটা এখন হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে।

ভবভূতি সেই অর্থটাকে হৃদয়ে (খে বলে ওঠে, 'বেশ তাই হবে, ওঁর সঙ্গে আলোচনা করে—'

'আমার মনে হয় দেরী করাটা অর্থহীন। অকারণ শুধু আলস্যের বশে জীবনের কতকগুলো সোনার দিন হারাবেন কেন? জীবনের এই দিনগুলি বড় মূল্যবান ভবভূতিবাবু, বড় মূল্যবান! সবাই সেটা খেয়াল করে দেখে না। ভাবে অনেক টাকা রোজগার না করলে সুখে থাকা যাবে না, অতএব সুখের দিনের জন্যে ধৈর্য ধরে বসে থাকি। কী ভ্রান্ত ধারণা বলুন? আপনি বসে থাকলেন, কিন্তু সময় কি বসে থাকবে? সে কখন কোন্ ফাঁকে আপনাকে রিক্ত করে রেখে চলে যাবে জানতে পারবেন না, তারপর—'

ভবভূতি তাড়াতাড়ি বলে, 'আপনার বোধহয় কথা কইতে কষ্ট হচ্ছে।'

পঙ্কজিনী আস্তে বলেন, 'না, অন্য কষ্ট কিছু না, একটু টায়ার্ড ফীল করছি। ঠিক হয়ে যাবে। হ্যাঁ কী বলছিলাম? তারপর যখন আপনি আপনার সেই জমানো সুখটি হাতে তুলে নিয়ে তারিয়ে তারিয়ে ভোগ করতে বসতে চাইবেন, তখন দেখবেন উপভোগের ক্ষমতাই চলে গেছে আপনার।.....না না, আপনার কথা বলছি না, আপনার প্রকৃতির গঠনভঙ্গী আলাদা, আপনি জীবনশক্তিতে ভরপুর মানুষ। এমনি কথা দিয়ে বলছি, বেশিরভাগ লোকই এই ভুল করে।'

ভবভূতি নিজের মনের চেহারা দেখে অবাক না হয়ে পারে না। এই মহিলাটিকে কিছুতেই যেন আর 'বাতিকগ্রস্ত বুড়ি' ভেবে মনে মনেই নস্যাৎ করতে পারছে না। কেমন যেন সমীহ্ সমীহ্ ভাব আসছে। তাছাড়া এঁর সামনা সামনি বসলে 'হাল্কা' থাকারও কোনো উপায় নেই, যে হাল্কাটাই ছিল তার জীবন দর্শনের ধারা।.....না, পঙ্কজিনী হালদারের সামনে এলে 'সিরিয়াস' না হয়ে উপায় নেই।

ভবভূতি তাই সমীহের গলাতেই বলে, সত্যিই কি আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি আপনি এতো সব ভাবেন দেখে।'

'এসব তো আলাদা করে ভাবতে হয় না ভবভূতিবাবু, জীবনের অভিজ্ঞতাই আমাদের এ সব শিক্ষা দেয়, ভাবতে শেখায়।'

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠেন পঙ্কজিনী হালদার, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেন, বলেন, 'ঈ—স! পৌনে চারটে বেজে গেল। সাড়ে তিনটেয় আমার বরাবরে টী টাইম। বংশী, বংশী কী করছে? বংশী!...দয়া করে একটু ডেকে দেবেন ভবভূতিবাবু! আশ্চর্য! ওতো এ রকম করে না!'

এমন ব্যাকুল হন পঙ্কজিনী, মনে হতে পারে, ভয়ানক দরকারি নিয়মের কোনো ওষুধ খেতে ভুলে গিয়ে সময় উত্তীর্ণ করে ফেলেছেন।

কিন্তু ভবভূতিকে আর ডাকতে হল না, দরজার বাইরে বংশীকে দেখা গেল সন্তর্পণে চায়ের ট্রেটি বুকে ধরে দাঁড়িয়ে।

পঙ্কজিনী প্রায় তেমনি ব্যাকুল আর্তস্বরে বলেন, বংশী! তুমি কোথায় ছিলে?'

কাথাটা বংশী কানে শুনতে না পেলেও, মনে নিশ্চয়ই শুনতে পেলো, তাই বললো, 'ঘড়ি বন্ধ, টাইম মালুম হতে দেরি হয়ে গেল—বারান্দায় রাখছি। শুধু আপনার।'

পঙ্কজিনী বলেন, 'ভবভূতিবাবু আপনি এখন চা খাবেন না?'

ভবভূতি হেসে বলে, 'আমার খাওয়া সম্পর্কে কোনো সময়েই 'না' নেই।'

পঙ্কজিনী মৃদু হেসে বলেন, 'এখন চলছে, বয়েস একটু বেশি হলে চালাতে চেষ্টা করবেন না। কিন্তু বংশী তুমি কি কাজটা ঠিক করেছ? গেস্টকে জিগ্যেস পর্যন্ত না করে শুধু আমায়—

বংশী এ কথাব কোনো উত্তর দিল না।

বংশী নিজ মনে বললো, 'আসুন মা। দিদিমণি বলেছে এখন রোদ রয়েছে, এখন চা খাবে না, শুধু ঠাণ্ডা জল খেলো। সাড়ে চারটায় দিদিমণিদের দেব।'

'কিন্তু ভবভূতিবাবু?'

ভবভূতি এখন পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে চায়, তাই ভবভূতি বলে, 'তা না, আমারও সেই একই সময় হলে চলবে।'

'আমার চলে না', পঙ্কজিনী শান্ত গলায় বলেন, 'আমার এই পনেরো মিনিট দেরিতেই মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে?'

মাথা ভবভূতিরও ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে।

'আর আমার কবলে?'

বললো মালবিকা, 'জানেন, পিসি আমায় তখন বলে রেখেছে দু'জনে একত্রিত হয়ে পিসির সামনে বসে ভবিষ্যতের ছকটা এঁকে ফেলতে এবং ফাঁসির দিনটা স্থির করতে।'

ভবভূতি বলে, 'এখন বোধকরি আব আমাব দোষ দেবেন না?'

'দেব না তা' বলতে পারছি না।' বললো মালবিকা।

'আমি ঠিক করেছি স্রোতের মুখে তৃণখণ্ডের মত ভেসেই যাবো।'

'যান। আমি কাল কলকাতায় ফিরছি।'

'আমার পিসির বাড়ি কেন, আপনার বাবার শিষ্যার বাড়িতে—'

'মনে হচ্ছে আমার বাবাকে আপনি হিংসে করতে শুরু করেছেন।'

'হ্যাঁ করছি। অস্বীকার করবো না।'

ভবভূতি জোর গলায় হেসে ওঠে।

মালবিকা গম্ভীর মুখে বলে, 'আপনি হাসছেন, কিন্তু আমি অনুভব করছি ওই ঈশ্বর হয়ে যাওয়া অনুভূতিবাবুই সমস্ত পরিস্থিতিটা কেমন গোলমেলে করে তুললেন।'

'পরিস্থিতিটা গোলমেলেই হয়ে গেছে তাই না?'

'আপনার কি মনে হচ্ছে জানি না, আমার তো তাই মনে হচ্ছে। আমার কিছু ভাল লাগছে না।'

ভবভূতি মালবিকার আরক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে মৃদু হেসে বলে, 'এ পর্যন্ত অনেকবার শুনলাম কথাটা—'

'কিছুই শোনেন নি', মালবিকার স্বর তীব্র।

'শুধু ভাল লাগছে না নয়, আমার খুব খারাপ লাগছে, যাচ্ছেতাই রকমের বিশ্রী লাগছে।'

ভবভূতি তেমনি মৃদু হেসে বলে, 'একজন মহিলা কতো অবলীলায় কতো অনায়াসেই একজন হতভাগ্য পুরুষকে অপমান করতে পারেন।'

'অপমান? এর মধ্যে আবার অপমানের প্রশ্ন এলো কোথা থেকে।'

'খোলা চোখে দেখলেই বুঝতে পারবেন।'

মালবিকা আরো তীক্ষ্ণ স্বরে বলে, 'চোখ কান আমার খোলাই আছে। তবে কথা হচ্ছে পরশু আপনার সঙ্গে জীবনে প্রথম দেখা হয়েছে, আর আজই আপনার গলায় মালা দেবার জন্যে উৎসাহবোধ না করলেই যদি সেটাতে মহিলা কর্তৃক পুরুষ-জাতিকে অপমান বলে ধরা হয়, তো হোক তাই। এতে সমস্ত মহিলা সমাজকে আপনি যদি কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চান, করান।'

কথাগুলো বলে তরতর করে এগিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলো মালবিকা!

কিন্তু পঙ্কজিনী হালদারের সামনে তীক্ষ্ণই বা হতে পারলো কই তীব্রই বা হতে পারলো কই? তরতরিয়ে চলে যাওয়ার ক্ষমতাই বা সংগ্রহ করতে পারলো কই?

পঙ্কজিনী যখন বললেন, 'ভবভূতিবাবুর সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে, তুমি তখন ঘুমোচ্ছিলে বলে, একত্রে কথা হলো না। তুমি বড়বেশি ঘুমকাতুরে খুকু! একটা সিরিয়াস আলোচনা হবার কথা রয়েছে, অথচ তুমি ঘুমিয়ে থাকলে। তা যাক, ভবভূতিবাবুর ইচ্ছে *দিনস্থিরটা* আমিই করি। একজন ভদ্র মানুষের ঠিক যেমন ইচ্ছেটি হওয়ার কথা। হি ইজ এ গুড্ ম্যান! ভেরি গুড্ ম্যান! তবে কথা এই, ব্যাপারটা তোমাদের সুবিধে-অসুবিধে নিয়ে। এখন তো তোমার এই *গ্রীষ্মের ছুটিটা চলেই গেল, ওনারও—ক'দিন ছুটি নিয়ে এসেছেন* ভবভূতিবাবু?'

মালবিকা মাথা নেড়ে বলে, 'জানি না।'

পঙ্কজিনী যেন আহত হন।

কথার স্বরে সেটা প্রকাশও পায়। বলেন, 'ভেরি ব্যাড্। আমি তোমায় অনেকদিন পরে দেখছি খুকু, যত দেখছি ছেলেমানুষী দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি ওঁর সম্পর্কে সব কিছুই তোমায় জানতে হবে, বুঝতে হবে?

মালবিকা মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে বলে, 'এখন থেকে কেন?'

কী আর বলবে? কী বলে ওঁর হাত থেকে পার পাবে?

পঙ্কজিনী দৃঢ়স্বরে বলেন, 'হ্যাঁ এখন থেকেই দরকার! বিবাহের আগে শুধু মন দেওয়া-নেওয়া শেষ কথা নয় খুকু, মন জানাজানিটা বিশেষ দরকারী পরস্পরের ইচ্ছের, পছন্দের, রুচির, নীতিবোধের এক কথায় সব কিছুর মধ্যে মিল আছে কিনা দেখতে হবে, না থাকলে অ্যাড্জাস্ট্ করে নিতে হবে।'

মালবিকা গম্ভীরভাবে বলে, 'যদি সেটা সম্ভব না হয়?'

'ওটা আবার কেমন কথা খুকু! সম্ভব না হয় মানে? সম্ভব তো করতেই হবে, নইলে জীবন সুখের হবে কী করে? অসম্ভব হবার কথা তোমাদের অন্তত এখন আর ওঠে না। তোমরা তোমাদের প্রেমের শক্তিতে সেটা সম্ভব করে তুলতে পারবে। তাছাড়া ভবভূতিবাবুর মত ছেলেব সঙ্গে অ্যাড্জাস্টমেণ্ট না হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে। আসল কথা, ভালবাসার ব্যাপারে মেয়েদের দায়িত্ব অনেক বেশি। পুরুষছেলে শুধু ভালবেসে ফেলেই খালাস, মেয়েদেরই দেখতে হয় সেটা কেমন ভাবে রক্ষা করতে হয়, কেমন ভাবে সুন্দর করে তুলতে হয়, কেমন ভাবে আরো গভীর করে তুলতে হয়। তার প্রধান উপায় হচ্ছে, তুমি কোন সময় ওঁর সম্পর্কে উদাসীন থাকবে না, ওঁর কোনো ব্যাপারেই 'জানি না' বলবে না, কিন্তু সেটা ওঁকে প্রশ্ন করে ব্যস্ত করে নয়, শুধু মনতার সঙ্গে, খোঁজ নিয়ে।....থাক্, কদিন ছুটি সেটা আমিই জেনে নেবো। তোমায় শুধু তোমার সুবিধে অসুবিধেগুলো দেখে ঠিক করতে হবে দিনটা।'

না, ঠিক্রে উঠতে পারলো না মালবিকা। শুধু বললো, 'আচ্ছা ঠিক আছে! কিন্তু মানুষ কতো অসহায়! ভবিষ্যৎটা তার কাছে কতো অ-দৃশ্য!

রাত্রে আহারের সময় বংশী এসে ঘোষণা করলো, 'গেষ্টবাবু ঘরে নেই।'

পঙ্কজিনী ফ্যাকাসে মুখে আরো ফ্যাকাসে করে বলেন, সে কী?' ডিনার টাইমে কোথায় যেতে পারেন?'

বংশী নিজ মনে বলে চলে, 'ঘরে নেই, বাগানে নেই, বাইরে ইদিক উদিক দেখলাম কোথাও নেই।'

পঙ্কজিনী মালবিকার দিকে তাকিয়ে ঈষৎ কঠোর দৃষ্টিপাত করে বলেন, 'খুকু, এ বিষয়েও বোধহয় তুমি কিছু জানো না?'

খুকু মরিয়া হয়ে বলে ওঠে, 'সন্ধ্যের দিকে তো একবার বলেছিলেন, ঝর্ণাটা দেখে এলে হয়! তা' এতো রাত অবধি—'

'এটাও আমার কাছে খুবই অদ্ভুত লাগছে খুকু, ঝর্ণা দেখতে যাবেন উনি একা, সেটা তুমি সমর্থন করলে? আর রাত্রে ঝর্ণা দেখা?'

খুকু নিজের সেই 'প্রথম মিথ্যা'র কথাটা স্মরণ করে। খুকু কোনো এক অদৃশ্য দেওয়া নিজের মনের মাথাটা ঠুকতে থাকে, আর খুকু বাইরে হালকা গলায় বলে, 'বাহাদুরী দেখানো আর কী। কী করে জানবো বল এখনো ঘুরছেন। যাই বলো পিসি, এটি হচ্ছে স্থান মাহাত্ম্য। তোমার ওখানে এসে ভদ্রলোক বেজায় বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন। এ রকম খিদে, এতো চেয়ে চেয়ে খাওয়া, এমন খামখেয়াল ছিল না বাপু।'

পঙ্কজিনী হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যান, আস্তে বলেন, 'তুমি হয়তো খুব ভুল বলনি খুকু! জায়গাটায় যাদুই আছে।'

'আচ্ছা একটু বেরিয়ে দেখছি—' বলে পিসিকে আর বিরুক্তির অবকাশ না দিয়ে মালবিকা তরতরিয়ে বাগানে নেবে কাঠের গেট খুলে বেরিয়ে যায়। জ্যোৎস্না ভরা আকাশ, অসুবিধে কিছুই নেই।

এসব জায়গায় এমন রাস্তায় শূন্য একখানা চলতি সাইকেল রিকশা দেখতে পাওয়ার আশা দুরাশা, তবু হঠাৎ সেই দুর্লভ বস্তুটা চোখে পড়ে গেল মালবিকার। এই সময় যেমন শেষ ট্রেনটা যায়, তেমনি বিপরীত দিকের কোথা থেকে যেন একটা ট্রেন একবার আধমিনিটের জন্যে বুড়ি ছুঁয়ে যায়, কদাচ দু'চারটে লোক নামে, তার আশাতেই ছুটছে লোকটা।

মালবিকা যেন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে গিয়ে লোকটাকে থামিয়ে গাড়িটায় চড়ে বসে বললো, 'স্টেশন।'

বললো। এমনভাবে বললো, যেন ঊর্দ্ধশ্বাসে গিয়ে ট্রেন ধরতে চায়।

অথচ কেন এমন বললো নিজেই জানে না। তবু যেন নিশ্চিত জানছে স্টেশনে পৌঁছেই সেই সর্বনাশা লোকটাকে দেখতে পাওয়া যাবে, যে আর

কয়েক মিনিট পরেই ওইখানে দুরন্ত দৈত্যের মত ছুটে আসা লৌহযানটার মধ্যে লাফিয়ে উঠে পড়ে চিরকালের মত হারিয়ে যাবার জন্যে পালিয়ে এসেছে।

মালবিকা ওকে পালাতে দিতে পারে না।

তাই মালবিকা মনশ্চক্ষে যে দৃশ্যটা দেখতে দেখতে ছুটে আসছিলো, সেটাই দেখতে পেলো?

ভবভূতি স্টেশনের একমেবাদ্বিতীয়াং ছোট্ট পান সিগারেটের দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট কিনছিলো, পেছন থেকে জামার পিঠটায় টান অনুভব করে চমকে ফিরে তাকালো।

কিন্তু না, ভবভুতির চোখের তারায় বিদ্রূপের ছায়া ছিলো না। ভবভূতির ঠোঁটের কোণায় অহঙ্কারের হাসিও নয়।

বরং বলা যায় বিস্ময়ের ছাপ উঠেছিল ওর চোখে।

মালবিকা চাপা আক্রোশের গলায় গর্জন করে ওঠে, 'না বলে পালিয়ে এসেছেন মানে?'

ভবভূতি শান্ত গলায় বলে, 'পালিয়ে? তা বোধহয় তাই।'

'ন্যাকামো রাখুন! চলুন। রিকশাটাকে ছাড়িনি।'

'চলুন।'

'হ্যাঁ! হ্যাঁ আমাকে বাঘের মুখে এগিয়ে দিয়ে কাপুরুষের মত পালিয়ে আসতে লজ্জা করলো না আপনার?'

'আমি আপনাকে বাঁচাবার আর কোনো উপায় তো পেলাম না মিস চৌধুরী।'

'থাক যথেষ্ট হয়েছে, আর একটি কথা নয়।'

প্রায় টেনেই নিয়ে গিয়ে রিকশায় ঠেলে তুলে দিয়ে নিজে উঠে পাশে বসে পড়ে।

বসেই বলে, 'মনে রাখবেন আপনি ঝর্ণা দেখতে বেরিয়ে এতোক্ষণ আত্মহারা হয়ে ঝর্ণাতলায় বসে থেকে, দেরী হয়ে গেছে বলে রিকশা করে ফিরছিলেন, আমি বাইরে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছিলাম তাই দেখতে পেয়ে রিকশায় উঠে চলে আসছি—'

ভবভূতি একটু মৃদু নিঃশ্বাসের মত মৃদু হাসি হেসে বলে, এতো সব মনে রাখতে হবে?'

'হবে।'

'তারপর?'

তারপর সাজানো ডিনারের টেবিলে গিয়ে বসতে হবে।'

'তারপর?'

'তারপর মিসেস হালদারের বাড়ির বেষ্ট এবং গেষ্ট রুমের পালঙ্কে ঘুমোতে হবে।'

রিকশাটাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যত তাড়াতাড়ি পারে ছুটতে, বখশীস মিলবে। অতএব তার চেষ্টার ত্রুটি নেই।

উঁচুনীচু অসান পাথুরে পথে বারে বারেই ঝাঁকুনি লাগছে, লাগছে পরস্পরের গায়ে গায়ে ধাক্কা। কিন্তু সে ধাক্কা কি শুধু গায়ে লেগেই গড়িয়ে পড়ছে গা থেকে?

অবশ করে দিচ্ছে না শুধু শরীরকে নয়, মনকেও?

আর মালবিকা নামের এক মেয়েস্কুলের কড়া দিদিমণি কি প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা আর আশা করছে না একটা কিছু অঘটন ঘটার? মুহূর্তে মুহূর্তে তার মনের ভঙ্গী বদলাচ্ছিলো না? কখনো আশায় শিথিল, কখনো আশঙ্কায় কঠিন। কিন্তু অঘটন ঘটলো না।

ভবভূতি নামের লোকটা যে হঠাৎ মাত্রা হারিয়ে ফেলবার ভয়ে সারাক্ষণই নিজেকে শক্ত রাখলো কঠোর পরিশ্রমে।

তাই ভবভূতি একটু হেসে বললো, 'আর ঘুমের পর?'

মালবিকা ওই আশা আশঙ্কার দোলা থেকে বাস্তবের মাটিতে পা রেখে বললো, 'তারপর ব্রেকফাষ্ট।'

'অতঃপর স্নান, তারপর লাঞ্চ, তারপর মিসেস হালদারের উপদেশাবীল, কেমন?'

'তাই।'

'এই রুটিনে ক'দিন চলতে হবে?'

'যতদিন না ছুটি ফুরোবে।'

'ছুটি? আমি যে কোনো কাজকর্ম করি এবং তার থেকে ছুটি নিয়ে এসেছি, এসব কথা বলেছি আপনাকে?'

'না বললেও, এটা ভাবাই স্বাভাবিক যে করে ভদ্রমত একটা কিছু, যার থেকে ছুটি টুটি নিয়েই তবেই বেড়াতে বেরোতে হয়।'

ভবভূতি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'আশ্চর্য! আমরা কেউ কারুর ঠিকমত পরিচয় জানিনা—'

মালবিকা তীক্ষ্ণ হয়। 'আমায় জেনেছেন। পিসিই কি যথেষ্ট পরিচয় নয়?'

'তা বটে।' বলে হেসে ওঠে ভবভূতি।

নির্জন রাস্তায় খাপছাড়া লাগে ওই হঠাৎ শব্দটা।

রিকশাওলাটা যদিও স্রেফ্ একটা বুদ্ধুর মত, তবু সেও মনে মনে একটু হাসে।

মিসেস হালদারের জীবনে বহুকালের মধ্যে এমন অনিয়ম ঘটেনি, রাত সাড়েন'টা পর্যন্ত না খেয়ে বসে থাকা।

মালবিকা এটা আশঙ্কা করেনি।

মালবিকা নিশ্চিত ভেবেছিল, উনি যথানিয়মে খেয়ে বিছানায় গেছেন, শুধু হয়তো জেগে আছেন, উদ্বেগের জন্যে।

কিন্তু কাঠের গেট ঠেলে ঢুকেই দৃশ্যটা দেখে হৃৎপিণ্ড ধ্বক করে উঠলো মালবিকার। সঙ্গে সঙ্গে মালবিকা চাপা গলায় 'আমি পয়সা নিয়ে বেরোইনি, ভাড়াটা মেটান' বলে এগিয়ে এসে বসে খোলা গলায় বলে উঠলো, 'ও পিসি, যা ভেবেছি তাই? তুমি বসে আছো তো? ইস্! নির্ঘাৎ শরীর খারাপ হবে তোমার। এই তোমার গেষ্টবাবুর কাণ্ড শোনো—বাবু ঝর্ণা দেখতে গিয়ে জ্যোৎস্নালোকে ঝর্ণাতলায় এমন জ্ঞান হারিয়ে বসেছিলেন যে, হাতের ঘড়িটাও দেখতে মনে পড়েনি।'

পঙ্কজিনী অবাক গলায় বলেন, 'তুমি কি ওঁকে ঝর্ণতলায় খুঁজতে গিয়েছিলে?'

'এ মা!'

মালবিকা কিশোরী মেয়ের মত চপল হাসি হেসে ওঠে বলে, 'কি যে বল পিসি! রাস্তায় একটু এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম, দেখি রিকশা করে আসছেন বাবু ঠুনঠুনিয়ে। বিবেচনাটা দেখো—'

ততক্ষণে ভবভূতি চলে এসেছে, বারান্দায় উঠেছে।

শেষ কথাটা শুনে খুব লজ্জিত গলায় বলে, 'বাস্তবিক আমার খুব অন্যায় হয়ে গিয়েছে মিসেস হালদার। কিন্তু এমন অপূর্ব সৌন্দর্যময় দৃশ্য! উঠে আসতে ইচ্ছে করে না।'

মিসেস হালদার ক্লান্ত গলায় বলেন, 'তা' ঠিক বলেছেন ভবভূতিবাবু! উঠে আসতে ইচ্ছে করে না, কিন্তু রাতে জায়গাটা নিরাপদ নয়।....খুব চিন্তিত হচ্ছিলাম।'

'সত্যিই আমার এত খারাপ লাগছে—'

পঙ্কজিনী ওই অনুতাপ বাণীর দিকে কান না দিয়ে অন্যমনস্ক গলায় বলেন, 'এই রকম উদ্বিগ্ন একদিন তোমার বাবাও করেছিলেন। উঃ সে কী অবস্থা!'

একটু থেমে বলেন, 'সেইদিনই ওঁর এখানে ডিনার খাবার কথা ছিলো, কারণ কলকাতা থেকে একজন বিশিষ্ট সেতার-বাদক এসেছিলেন পাড়ার ভবসিন্ধুবাবুর বাড়িতে, তাঁকে এবং ভবসিন্ধুবাবুকে ডেকেছিলাম। সেই সূত্রে— মানে একজন অভিভাবক থাকাটা শোভন এই হিসেবে ওঁকেও বলেছিলাম।....আর ওনার কিনা সেই দিনই পূর্ণিমার ঝর্ণা দেখতে ইচ্ছে জেগে গেল। ব্যস ঠিক তোমার মত, উঠে আসতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। ওঃ সে গেছে একদিন। এই দুই ভদ্রলোক তৈরী খাবার ফেলে লাঠি আর লণ্ঠন নিয়ে বেরোলেন বংশীও গেল। আর আমি ভয়ে পাথর হয়ে বসে আছি।...অথচ এ রকম অনিয়ম করার লোক তিনি ছিলেন না।'

'পিসি খাওয়া শুরু করো।'

'হ্যাঁ! তোমারাও এসো। বংশী, তুমি আমায় মাত্র একটা রুটি দাও।'

ভবভূতি সত্যি দুঃখের গলায় বলে, 'নিজের ওপর আমার এতো রাগ হচ্ছে! আমার জন্যে আপনার খাওয়া হলো না!'

'ওতে কিছু না। এমনিতেই কতদিন আমি—আপনি যে সুস্থ শরীরে চলে এসেছেন, এটাই ঈশ্বরের করুণা।'

'উঃ কাল কী দারুণ ভাবে ম্যানেজ করা। মনে হচ্ছে আপনাতে আমাতে একটা 'নাট্য-পার্টি' খুললে মন্দ হয় না—'

হেসে হেসে বলে ভবভূতি, 'উভয়ের মধ্যেই অভিনয় প্রতিভা বেশ বেশি পরিমাণেই রয়েছে এবং অনুশীলনের দ্বারা দিনে দিনে উৎকর্ষ বাড়ছে—'

তখন বেলা প্রায় দশটা, ভবভূতি সকালবেলায় চা না খেয়ে বেরিয়েছিল, একটু আগে ফিরেছে।

ফিরে আর কোথায় বসবে, বারান্দার এই বেতের চেয়ারে ছাড়া? যেখানে আর একটা চেয়ারে বসে আছে বাড়ির মালিকের ভাইঝি।

গতকাল রাত্রে সেই ঘটনার পর আর দেখা হয়নি, কারণ খুব ভোরে উঠে কোথায় যেন বেরিয়ে গিয়েছিল ভবভূতি।

ফিরলো এই এখন।

মালবিকা নিরুত্তাপ গলায় বললো, 'তবু ভাল যে ফিরলেন। আমি তো ধরে নিয়েছিলাম গতকাল রাত্রের অসমাপ্ত কাজটা আজ সমাপ্ত করতে বেরিয়ে পড়েছেন।'

মালবিকার কণ্ঠে উত্তাপ নেই, আছে শুধু ঠোঁটের কোণায় একটু ব্যঙ্গ হাসি।

ভবভূতি বললো, 'একবার সে লোভ যে হয়নি তা নয়, কিন্তু আবার আপনাকে বাঘের মুখে ফেলে যাবো? বিবেকে বাধলো।' তারপরই হেসে হেসে বললো, 'যদিও ক্রমশঃই দেখছি ভয় পাবার আর কিছু নেই, সবই ম্যানেজ করে ফেলা যাচ্ছে। আপনাতে আমাতে একটা 'নাট্য-পার্টি' খুললে মন্দ হয় না—'

মালবিকা গম্ভীর গলায় বলে, তা অবশ্য মন্দ হয় না। এতে যখন বিবেক আহত হচ্ছে না—'

ভবভূতি মালবিকার রাগ-রাগ মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে, এ রাগ আর কিছুর নয়! স্রেফ, সকালে না বলে চলে যাওয়ার।'

কিন্তু কী আর করা।

এতো দেরী হবে তা ঠিক ভাবেনি। ঘুরতে ঘুরতে চলে গিয়েছিল অনেকটা দূরে, ফেরার সময় কোনো যানবাহনের দেখা মেলেনি।

ভবভূতি হেসে ফেলে বলে, 'রাগটা দেখছি বেশ উচ্চগ্রামেই উঠেছে—'

'কোনো একজন সুস্থ অ্যাডাল্ট ব্যক্তি বাচ্চা-টাচ্চার মত কাজ করলে বোধহয় রাগ হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।'

'কাজটা খুব বাজে হয়ে গেছে তাই না?'

'আপনার নীতিতে কী বলে জানি না, তবে আমাদের নীতিতে বলে, কোনো গৃহস্থ বাড়িতে থাকলে সকালে চা খাওয়ার একটা দায়িত্ব থাকা উচিত। এটা কলকাতা শহর নয় যে, পথে বেরোলেই সব কিছু হাতের কাছে মিলে যাবে। এতোখানি বেলা অবধি—'

ভবভূতি প্রায় হৈ-হৈ করে বলে ওঠে, 'আরে সেজন্যে ভাববেন না, সে আমি প্রায় কলম্বাসের মত একটা আবিষ্কার করে ফেলেছি। অপ্রত্যাশিত জায়গায় এক চায়ের দোকান। দু'ফুট বাই তিন ফুট একটা ছাউনি। তার মধ্যে

চা সিগারেট পান। কী ফাইন চা! একেবারে তাজা ভৈঁসার সদ্যদোহা খাঁটি কাঁচা দুধে প্রস্তুত—'

'চমৎকার ! সে চা নিশ্চয়ই মহিষ মহিষ গন্ধ বিতরণ করছে।'

মালবিকার এই তীব্র উক্তিতে জোর হেসে ওঠে ভবভূতি। অনেকক্ষণ হাসে।

হাসি থামলে মালবিকা বলে, 'সন্দেহ হচ্ছে অনুভূতি রায়ের ছেলের ওপর পিসি ক্রমশঃ আস্থা হারাচ্ছে।'

ভবভূতি হাসি থামিয়ে বলে, 'তা হারাতে পারেন। খুব বিরক্ত হয়েছেন না?'

বিরক্ত? না তা ঠিক নয়, সন্দেহ! হঠাৎ দেখলাম একটা ড্রয়ার খুলে রাজ্যের পুরনো কাগজপত্র টেনে বার করে তার থেকে একটা ফটো অ্যালবাম ওলটাচ্ছে। আমি গিয়ে দাঁড়াতেই সেকালের টাইপের একটা ব্লাউজ সুটপরা বছর পাঁচ-ছয়ের বাচ্চা ছেলের রঙ জ্বলে যাওয়া ফটো বার করে বলে কিনা, 'আচ্ছা খুকু, দেখ তো এই ছবির সঙ্গে বর্তমান কারুর চেহারার সাদৃশ্য পাচ্ছো কিনা—'

ভবভূতি সচকিত হয়ে কী বলতে যাচ্ছিলো, হঠাৎ দেখলো বংশী ছুটে আসছে।

বুড়ো মানুষের ছুটে আসাটা দেখতে কষ্টকর, ওরা তাকিয়ে দেখে বংশীর চোখ বিস্ফারিত, ভঙ্গী উত্তেজিত, কথা বলতে হাঁপালো, দিদিমনি শীগগিব আসুন, মেমসাহেব কেমন করছেন!'

মা কেমন করছেন!

এ আবার কেমন ভাষা?

এ ভাষার পিছনেই তো থাকে একটা ভয়াবহতার ইঙ্গিত!

মালবিকা ছুটে যেতে যেতে বলে, 'কেমন মানে?'

'বুঝতে পারছি না। আপনারা এসে দেখুন দিদিমনি। কী হবে?'

ওরা এসে দেখলো—

খাটের ধারের দিকে শুয়ে রয়েছেন পঙ্কজিনী, চোখ বোঁজা, চোখের কোণ দিয়ে জল গড়াচ্ছে! এ জল দুঃখের না শারীরিক কষ্টের?

পঙ্কজিনীর শাড়ির আঁচল পিন আঁটা, তাই লুটোচ্ছে না, শুধু একখানা হাত খাটের ধার থেকে শূন্যে ঝুলছে। রোগা রক্তশূন্য হাত। দৃশ্যটা এমন কিছু ভয়াবহ নয়, যে কোন কারণেই একটু অসুস্থ হয়ে পড়লে মানুষ এভাবে শুয়ে পড়ে, তবু ঘরে ঢুকেই মালবিকার মনে হলো, এ ছবি আসন্ন মৃত্যুর ছবি!

বুকটা ধ্বকধ্বক করে উঠলো। খাটের ধারে বসে পড়লো পায়ের কাছে। মালবিকারও ইচ্ছে হলো ওইভাবে শুয়ে পড়ে। নিজেকে ছেড়ে দিয়ে।

কিন্তু এ ইচ্ছেকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না। অথচ আঙ্গুলটাও নাড়তে পারছে না। মালবিকার মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না।

ওই নিমীলিত-নয়নার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ভেবে পাচ্ছে না মালবিকা, তার জন্য এটা তোলা ছিল কেন?

বসে থাকতে থাকতে শুনতে পেল একটি স্থির গম্ভীর গলা, 'বংশী, তোমাদের এখানে ডাক্তার নেই?'

বংশীর মুখ ভয়ার্ত, বংশী ঠক ঠক করে কাঁপছে, আর আশ্চর্য, বংশী শুনতে পেলো, কথা বললো। বললো, 'আছেন। ইষ্টিশানের ধারে।'

'পাড়ায় চেনা জানা কাউকে একটু খবর দিতে পারবে? বলগে ইনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন—কেউ এসে পড়লে আমি ডাক্তারকে ডাকতে যেতে পারি?'

বংশী বোধহয় এটা শুনতে পেলো না, কাতর গলায় বললো, 'দাদাবাবু, মা বাঁচবেন তো?'

বংশীকে এর আগে মিসেস হালদার সম্পর্কে 'মা' বলতে শোনো যায়নি। এখন শোনা গেল। তার মানে বংশীর যেন আর এখন সেই 'টিপ-টপেব' দায়িত্ব নেই।

বংশী এখন মেমসাহেব না বলে মা বলবে। বংশী এখন ডুকরে কেঁদে উঠবে মনে হচ্ছে।

মালবিকারও কি সব কিছুর দায়িত্ব ফুরিয়ে গেল? ওই দস্যুটার হাতে নিজের সব কর্মভার তুলে দিয়ে মালবিকা শুধু নিষ্পলকে তাকিয়ে থাকবে?

এ এমন একটি অবস্থা, যেন বোঝা যায় না কী করবার আছে, কিছু করবার আছে কি না। অথচ কিছু যেন করতে হবে।

মালবিকা খাট থেকে নেমে এদিক ওদিক তাকিয়ে একখানা খবরের কাগজ তুলে আস্তে আস্তে মাথার কাছে বাতাস করতে চেষ্টা করে। যদিও এ চেষ্টার কোনো মানে হয় না।

ঘরের মধ্যে এ জানালা ও জানালা দিয়ে এলোমেলো বাতাস বইছে। খাটের উপর ঢাকা বেড-কভারের কোণটা লটপট করে একই ভাবে উড়ছে, উড়ছে দরজা,জানালার পর্দা, পঙ্কজিনীর কপালের ওপরকাব ঝুরো কয়েকগাছা চুল।

চা সিগারেট পান। কী ফাইন চা! একেবারে তাজা ভৈঁসার সদ্যদোহা খাঁটি কাঁচা দুধে প্রস্তুত—'

'চমৎকার ! সে চা নিশ্চয়ই মহিষ মহিষ গন্ধ বিতরণ করছে।'

মালবিকার এই তীব্র উক্তিতে জোর হেসে ওঠে ভবভূতি। অনেকক্ষণ হাসে।

হাসি থামলে মালবিকা বলে, 'সন্দেহ হচ্ছে অনুভূতি রায়ের ছেলের ওপর পিসি ক্রমশঃ আস্থা হারাচ্ছে।'

ভবভূতি হাসি থামিয়ে বলে, 'তা হারাতে পারেন। খুব বিরক্ত হয়েছেন না?'

বিরক্ত? না তা ঠিক নয়, সন্দেহ! হঠাৎ দেখলাম একটা ড্রয়ার খুলে রাজ্যের পুরনো কাগজপত্র টেনে বার করে তার থেকে একটা ফটো অ্যালবাম ওলটাচ্ছে। আমি গিয়ে দাঁড়াতেই সেকালের টাইপের একটা ব্লাউজ সুটপরা বছর পাঁচ-ছয়ের বাচ্চা ছেলের রঙ জ্বলে যাওয়া ফটো বার করে বলে কিনা, 'আচ্ছা খুকু, দেখ তো এই ছবির সঙ্গে বর্তমান কারুর চেহারার সাদৃশ্য পাচ্ছো কিনা—'

ভবভূতি সচকিত হয়ে কী বলতে যাচ্ছিলো, হঠাৎ দেখলো বংশী ছুটে আসছে।

বুড়ো মানুষের ছুটে আসাটা দেখতে কষ্টকর, ওরা তাকিয়ে দেখে বংশীর চোখ বিস্ফারিত, ভঙ্গী উত্তেজিত, কথা বলতে হাঁপালো, দিদিমনি শীগগিব আসুন, মেমসাহেব কেমন করছেন!'

. মা কেমন করছেন!

এ আবার কেমন ভাষা?

এ ভাষার পিছনেই তো থাকে একটা ভয়াবহতার ইঙ্গিত!

মালবিকা ছুটে যেতে যেতে বলে, 'কেমন মানে?'

'বুঝতে পারছি না। আপনারা এসে দেখুন দিদিমনি। কী হবে?'

ওরা এসে দেখলো—

খাটের ধারের দিকে শুয়ে রয়েছেন পঙ্কজিনী, চোখ বোঁজা, চোখের কোণ দিয়ে জল গড়াচ্ছে! এ জল দুঃখের না শারীরিক কষ্টের?

পঙ্কজিনীর শাড়ির আঁচল পিন আঁটা, তাই লুটোচ্ছে না, শুধু একখানা হাত খাটের ধার থেকে শূন্যে ঝুলছে। রোগা রক্তশূন্য হাত। দৃশ্যটা এমন কিছু ভয়াবহ নয়, যে কোন কারণেই একটু অসুস্থ হয়ে পড়লে মানুষ এভাবে শুয়ে পড়ে, তবু ঘরে ঢুকেই মালবিকার মনে হলো, এ ছবি আসন্ন মৃত্যুর ছবি!

বুকটা ধ্বকধ্বক করে উঠলো। খাটের ধারে বসে পড়লো পায়ের কাছে। মালবিকারও ইচ্ছে হলো ওইভাবে শুয়ে পড়ে। নিজেকে ছেড়ে দিয়ে।

কিন্তু এ ইচ্ছেকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না। অথচ আঙুলটাও নাড়তে পারছে না। মালবিকার মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না।

ওই নিমীলিত-নয়নার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ভেবে পাচ্ছে না মালবিকা, তার জন্য এটা তোলা ছিল কেন?

বসে থাকতে থাকতে শুনতে পেল একটি স্থির গম্ভীর গলা, 'বংশী, তোমাদের এখানে ডাক্তার নেই?'

বংশীর মুখ ভয়ার্ত, বংশী ঠক ঠক করে কাঁপছে, আর আশ্চর্য, বংশী শুনতে পেলো, কথা বললো। বললো, 'আছেন। ইষ্টিশানের ধারে।'

'পাড়ায় চেনা জানা কাউকে একটু খবর দিতে পারবে? বলগে ইনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন—কেউ এসে পড়লে আমি ডাক্তারকে ডাকতে যেতে পারি?'

বংশী বোধহয় এটা শুনতে পেলো না, কাতর গলায় বললো, 'দাদাবাবু, মা বাঁচবেন তো?'

বংশীকে এর আগে মিসেস হালদার সম্পর্কে 'মা' বলতে শোনো যায়নি। এখন শোনা গেল। তার মানে বংশীর যেন আর এখন সেই 'টিপ-টপেব' দায়িত্ব নেই।

বংশী এখন মেমসাহেব না বলে মা বলবে। বংশী এখন ডুকরে কেঁদে উঠবে মনে হচ্ছে।

মালবিকারও কি সব কিছুর দায়িত্ব ফুরিয়ে গেল? ওই দস্যুটার হাতে নিজের সব কর্মভার তুলে দিয়ে মালবিকা শুধু নিষ্পলকে তাকিয়ে থাকবে?

এ এমন একটি অবস্থা, যেন বোঝা যায় না কী করবার আছে, কিছু করবার আছে কি না। অথচ কিছু যেন করতে হবে।

মালবিকা খাট থেকে নেমে এদিক ওদিক তাকিয়ে একখানা খবরের কাগজ তুলে আস্তে আস্তে মাথার কাছে বাতাস করতে চেষ্টা করে। যদিও এ চেষ্টার কোনো মানে হয় না।

ঘরের মধ্যে এ জানালা ও জানালা দিয়ে এলোমেলো বাতাস বইছে। খাটের উপর ঢাকা বেড-কভারের কোণটা লটপট করে একই ভাবে উড়ছে, উড়ছে দরজা জানালার পর্দা, পঙ্কজিনীর কপালের ওপরকার ঝুরো কয়েকগাছা চুল।

রোদের সময়ের এই হাওয়াটা গরম গরম, তাই দরজা বন্ধ করে দেওয়া নিয়ম পঙ্কজিনীর। বংশীর ওপর সে নির্দেশ দেওয়া আছে।

কিন্তু বংশী আজ নিয়মের শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে এসে যেন একটা আজনা শূন্যে এসে দাঁড়িয়েছে।

বংশীর মুখে সেই শূন্যতার ছাপ। বংশী সব এটিকেট বিসর্জন দিয়ে বলে উঠেছে, 'মা বাঁচবেন তো?'

ভবভূতি শান্ত গলায় বলে, 'বাঁচবেন না কেন?' না বাঁচবার কি হয়েছে? রোদে বেরিয়ে ছিলেন—হঠাৎ কী রকম শরীর খারাপ হয়ে গেছে। ডাক্তার ডাকা তো দরকার।'

'মা তো রোজই বেরোন দাদাবাবু—'

'রোজ সহ্য হয়, একদিন হলো না। ওসব কথা থাক্ বংশী। ডাক্তারের চেষ্টা করতে হবে। তুমি কোনোদিন গিয়েছো?'

বংশী আস্তে মাথা নাড়ে।

'মেমসাহেব যান। আমার অসুখ করলে ওষুধ নিয়ে আসেন।'

'আর ওঁর অসুখ করলে?'

'সেও উনি নিজেই নিয়ে আসেন।'

আঃ বংশী! বেশি অসুখ করলে? তখনও কি উনি নিজে নিয়ে আসেন?'

বংশী ভাঙা ভাঙা গলায় বলে, 'বেশি অসুখ তো করে না। আমি তো কোনোদিন দেখিনি।'

আশ্চর্য! বংশী এখন যেন কথা শুনতে পাচ্ছে। উত্তেজনায় আর ভয়ে ওর বিকল যন্ত্রটা কি ঠিক হয়ে গেল?

'তা' তুমি তো চিরকালই দেখছো বংশী, এতক্ষণে কথা বলে মালবিকা, 'তুমি তো বরাবরই আছো?'

'তা' আছি। মেমসাহেবও এলেন, আমিও এলাম। তার আগে একটা লোক ছিল মাস তিনেকের জন্যে।'

'এর মধ্যে একবারও বেশি অসুখ করেনি পিসিমার?'

বংশী আস্তে মাথা নাড়ে।

মালবিকা মনে মনে বলে, আর কিছু না, আমার ভাগ্য। কোনো এক কুগ্রহকে সামনে নিয়ে আমি বাসা থেকে বেরিয়েছিলাম।'

'বংশী এ ঘরে বেশি কথা না বলাই ভালো। যাও তো তুমি কাউকে ডেকে আনো। ওনার সঙ্গে বেশি আলাপ ছিল, এমন কাউকে—'

'ওনার তো বিশ্বসুদ্ধু লোকের সঙ্গেই আলাপ।'

'তা' তাই যাও বংশী, একটু তাড়াতাড়ি।'

বংশী চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন ঘর থেকে প্রাণের সাড়াটুকু মিলিয়ে গেল। এখন ওই স্থির হয়ে থাকা ক্ষীণ হালকা দেহখানার আশেপাশে যেন মৃত্যুর পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

এই প্রখর রৌদ্রালোকেও যেন অলক্ষিতে কারা সব ঘরের মধ্যে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে, তাদের নিঃশ্বাসের ভার পড়ছে এই দুরন্ত হাওয়ার ওপর, তাদের পায়ের মৃদু খস্ খস্ আওয়াজ উঠছে মেঝে থেকে।

ভবভূতি ব্যগ্রভাবে বলে, 'মিস রায়, কেবলমাত্র বংশীর ভরসায় বসে থাকা সম্ভব হচ্ছে না, আমি একবার বেরিয়ে দেখি। ডাক্তার একজন কাউকে পাওয়া বিশেষ দরকার হচ্ছে।'

'আপনি বেরিয়ে যাবেন?'

মালবিকা হঠাৎ নেহাৎ গাঁইয়ামেয়ের মত ভবভূতির বাহুমূল চেপে ধরে বলে ওঠে, 'আপনি আমায় একা রেখে যাবেন না। ভীষণ ভয় করছে আমায়—'

'দুর্বল হয়ে কোন লাভ নেই মিস রায়। এভাবে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা অসম্ভব হচ্ছে।'

'কিন্তু—' মালবিকার গলা কেঁপে ওঠে, বসে যায়, আপনার কী মনে হচ্ছে ডাক্তার ডাকার প্রয়োজন আছে এখনও?'

'কী আশ্চর্য! আপনি যে বংশীর ওপর যাচ্ছেন। মানুষ কত কারণেই তো সেন্সলেস হয়ে যায়।'

মালবিকা তেমনি গলায় বলে, 'আমার মনে হচ্ছে—মনে হচ্ছে এ সেন্স, আর ফিরে আসবে না। ভবভূতি ওর কাঁধে একটা হাত রেখে বলে, 'মিস রায়, মনে হচ্ছিল আপনি খুব সবল শক্ত, দেখছি ভুল ভাবা হয়েছে।'

'আমি ভাবতে পারছি না, এমন একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি কী জন্যে হবে।'

'হঠাৎ হঠাৎ অদ্ভুত অদ্ভুত পরিস্থিতি দিয়েই তো আমাদের জীবন গড়া মিস রায়। সারা জীবনের কথাই ভেবে দেখুন।.....নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগের মধ্যে, মানে যেমনটি প্রত্যাশা করে থাকি আমরা, ক'দিন কাটে?...অদ্ভুত পরিস্থিতি,

অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতি, এরাই আমাদের ঠেলে ঠেলে নিয়ে যায়, আমাদের পরমায়ুর দিন কমিয়ে আনে, আর বয়েস বাড়িয়ে দেয়।'

বংশী এলো, পিছনে একটি বিধবা ভদ্রমহিলা! স্থির চোখে একবার সারা দৃশ্যটি অবলোকান করে বলেন, 'কখন হল এমন?'

বংশী করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। বংশীর চোখ দিয়ে জল ঝরছে। 'কিছু জানি না দত্ত মেমসাহেব! কিছু জানি না। সকালে যেমন বেরোন তেমনি বেরিয়েছিলেন—'

'হ্যাঁ আমার বাসাতেও গিয়েছিলেন—

'সে তো যাবেনই। সকল বাড়িতেই তো ঘুরে আসেন নিত্যদিন। ব্যতিক্রম হয় না একটি দিনের জন্যে। ফিরে এসে যেমন চা খান খেয়েছেন, তারপরে তো আর বংশী জানে না কিছু। চানের জন্য ডাকতে এসে দেখছি ডাকলে সাড়া নেই—' বংশী ডুকরে কেঁদে ওঠে।

মহিলাটি বলেন, 'তুমিই ভাইঝি বুঝি?'

মালবিকা মাথা নেড়ে সায় দেয়।

'বলেছিলেন ভাইঝি এসেছে—'

মহিলাটি ভবভূতিকে একবার অবলোকন করলেন।

চোখ এড়ালো না। তবু ভবভূতি সহজ সপ্রতিভ গলায় বলে, 'আচ্ছা আপনি তো এসে গেছেন, আমি একবার ডাক্তারের সন্ধানে যাই। আমি তো এখানের কিছুই জানি না—নামটা ঠিকানাটা যদি বলে দেন।'

মহিলাটি আরও একবার ভবভূতির আপাদমস্তক অবলোকন করে নিয়ে বলেন, ডাক্তার তো এখানে মাত্র ওই একটিই। ডাক্তার মান্না। ডাক্তার ভালো, তবে লোক সুবিধের নয়। ভিজিট দিয়ে তবে আনতে হয়।'

'ভিজিট দিয়ে? রোগী না দেখেই?'

'তাইতো। ওই জন্যে খুব বদনাম। কিন্তু ওঁকেই ডাকতে হয়, উপায় তো নেই। চারটি টাকা হাতে নেবেন, তবে বাড়ি থেকে বেরোবেন।

'ঠিক আছে।' ভবভূতি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে, 'আচ্ছা আপনি তো আছেন একটু—'

মিসেস দত্ত বলেন, 'কোন ওষুধ পড়েনি?'

মালবিকা শুকনো মুখে বলে, 'আমরা কী ওষুধ দেব?'

'হুঁ। তবে আশ্চর্য্যি বটে। একটু আগে এই মানুষ পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে এলো, আর এক্ষুণি.. চায়ের সঙ্গে কী খেয়েছিলেন?'

মালবিকা বংশীর দিকে তাকায়।

বংশী বলে, 'যেমন খান ঠিক তাই—'

মিসেস দত্ত তীক্ষ্ণ গলায় মালবিকাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'তোমরা খাওনি ওঁর সঙ্গে? উনি একা খেয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'কেন বল তো?'

এই অনর্থক কথাগুলি উনি কেন বলছেন বুঝতে পারে না মালবিকা।

পঙ্কজিনী যখন চা খেয়েছিলেন, তখন একা খেয়েছিলেন কি তাঁর সঙ্গে আর কেউ খেয়েছিলেন, এই পরম তথ্যটুকু জেনে ওঁর লাভটা কি?

অথচ যে রকম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন উত্তরের প্রত্যাশায়, যেন এটাই তাঁর কাছে একটা মস্ত দরকারি কথা।'

মালবিকা বলে, 'এমনি।'

মিসেস দত্ত এবার অন্য পয়েন্টে যান, 'তোমরা, মানে তুমি আর ওই ছেলেটি? তোমরা কখন খেয়েছিলে?'

'কী আশ্চর্য। এটা নিয়ে ভাবছেন কেন?'

'ভাবনাটা এসে যাচ্ছে বলেই ভাবছি। ছেলেটি কে?'

মালবিকা এবার আত্মস্থ হয়। শান্ত গলায় বলে, 'আমার বন্ধু।'

'ওঃ! মিসেস হালদারও তাই বলছিলেন, ভাইঝির সঙ্গে ভাইঝির এক বন্ধু এসেছে। আমি ভেবেছিলাম তোমার কোনো সহপাঠিনী।'

মালবিকা চুপ করেই থাকে।

'ছেলেটি তোমার সঙ্গে এসেছে?'

'হ্যাঁ।'

'কলকাতায় থাকে বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'কতদিনের আলাপ?'

মালবিকা উঠে দাঁড়িয়ে জানলার পর্দাটা টেনে দিয়ে আসে, কারণ তেরছা ভাবে রোদ এসে পঙ্কজিনীর পায়ের ওপর পড়েছিল।

মালবিকা তারপর ঘুরে দাঁড়ায়। স্থির গলায় বলে, 'এসব কথা তো পরে হতে পারে মিসেস দত্ত!'

মিসেস দত্ত বোধহয় একটু চমকে যান। বোধহয় এরকম কথার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। মুখটি ভারি করে বলেন, 'ভুল হয়ে গিয়েছিল। বুঝতে পারিনি।....আচ্ছা বংশী, এখন যাচ্ছি আমি। ডাক্তার এলে আমায় ডেকো।'

*   *   *   *

ভবভূতি যখন ডাক্তার নিয়ে ফিরলো, তখন কিন্তু লোকে ঘর ভরে গেছে। এই মৃতকল্প দেশটায় যে এতগুলো লোক ছিল, তা এদের ধারণা ছিল না।

এখন—পঙ্কজিনীর ভুরুটা মাঝে মাঝে একটু কুঁচকে উঠছে, নাকের পাশ দুটো একটু একটু ফুলে উঠছে। পঙ্কজিনী যে পুরোপুরি মারা যাননি, এইটুকু প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

এই এতগুলো লোকের উপস্থিতিই কি পঙ্কজিনীকে চৈতন্যহীনতার গভীর গহ্বর থেকে একটুখানি টেনে তুলে আনতে পেরেছে?

এতোগুলি মেয়ে-পুরুষ, এঁদের উদ্বেগ উত্তেজনা, আক্ষেপ বেদনা বিস্ময় সন্দেহ, সবই তো প্রশ্ন হয়েই নিক্ষিপ্ত হয়েছে!

সে প্রশ্ন মৃদুও নয় নেহাৎ।

কারণ মানুষ মাত্রেরই বোধহয় এই একটি ধারণা থাকে লোকটা যখন অজ্ঞানই হয়ে গেছে, তখন আর ওর কানের কাছে ঢাক পিটোতেই বা বাধা কি?

মালবিকা শরাহত শায়িত ভীষ্মের মত অবস্থায় যন্ত্রণা-ব্যাকুল চোখে কেবল দরজায় তাকিয়ে আছে কখন ওর রক্ষাকর্তা এসে পড়বে।

এঁদের অনেকের কণ্ঠেই একটি প্রচ্ছন্ন সন্দেহ। মালবিকা ভেবে পাচ্ছে না এমন সন্দেহের সুর কেন?

প্রত্যেকেই যেন জেরার মধ্য দিয়ে কোনো একটি ভয়ঙ্কর নিগূঢ় তথ্য টেনে বার করে আনতে চান।

যেন জেরার মুখে অসতর্কতার মুহূর্তে বলে ফেলবে মালবিকা সেই কথাটি। আর তাতেই ওঁরা জেনে ফেলবেন যে মানুষটা এই ঘণ্টা কয়েক আগে পায়ে হেঁটে নিত্য নিয়মে তাঁদের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন, এখনো যাঁর বেঁটে ছাতাটির ছায়া সকলের চোখের কোণে ভাসছে, সেই মানুষ হঠাৎ এমন ভাবে—

প্রথমে তো এঁরা এসে ধরেই নিয়েছিলেন শেষ হয়ে গেছেন মিসেস হালদার।

. আশ্চর্য মজা এই, মিসেস হালদার নামের মানুষটি যে এই ক্ষুদ্র শহরটিতে সকলের খুব একটা প্রিয় ছিলেন তা নয়, তবু অনেকখানি যে ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

হয়তো প্রিয় হতে পারেননি তাঁর অনাকর্ষণীয় বাকভঙ্গীতে, আর নীতি নিয়মের অতি নিষ্ঠায়, তবু 'মিসেস হালদার' যেন সকলের একটা অভ্যাস। যে অভ্যাস মজ্জায় গিয়ে মিশে থাকে।

মিসেস হালদার এ শহরের সকলের সঙ্গে সকলের যোগসূত্র।

উনিই তো প্রতিটি বাড়ির খবর প্রতিটি বাড়িতে সরবরাহ করার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন।

পরচর্চা করতেন না মিসেস হালদার, পরনিন্দাও না। মিসেস হালদার শুধু সকলের খবর নিতেন আর দিতেন।

তবে যা অশোভন, যা সভ্যতা বহির্ভূত তা চোখে পড়ে গেলে পঙ্কজিনী সেটি না বলে থাকতে পারতেন না।

কেউ বেলা অবধি ঘুমোচ্ছে এটি চোখে পড়লে পঙ্কজিনী বলতেন, 'খুব খারাপ, খুব খারাপ।'

কেউ এলোমেলো ভাবে মাটিতে চায়ের সরঞ্জাম ছড়িয়ে মেঝেয় বসে চা খাচ্ছে দেখলে কুপিত হতেন মিসেস হালদার। বলতেন, 'জীবনে সৌষ্ঠব আনতে কত আর খরচ? প্রয়োজন শুধু রুচির।'

এমন মানুষ বড় একটা কারো প্রিয় হয় না। তবু ওই যা বললাম, মিসেস হালদার এই শহরের প্রতিটি বাসিন্দার মজ্জাগত অভ্যাস।

তাই তাঁরা শোনা মাত্রই যে যেমন ছিলেন চলে এসেছেন।

এবং মৃত ভেবেই প্রশ্ন করছেন, 'কখন এমন হলো?'

কিন্তু সকলের প্রত্যাশায় ছাই দিয়ে, মিসেস হালদারের 'মৃতদেহে' সামান্য স্পন্দন দেখা দিয়ে জানিয়ে দিল পুরোপুরি মারা যাননি তিনি।

জীবনে বোধকরি কারো কাছে এতখানি কৃতজ্ঞ হয়নি মালবিকা, আজ পঙ্কজিনীর কাছে যতটা হলো!

*　　*　　*　　*

ডাক্তার এলেন। আবার শুরু হলো জেরা। আবার সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি।

কখন এমন হলো, কখন কি খেয়েছিলেন, কারো সঙ্গে কোনো কথান্তর হয়েছিল কিনা, কোনো মানসিক উত্তেজনার কারণ ঘটেছিল কিনা, অথবা দুঃখের বেদনার। আর সকলেরই যেন ভবভূতির প্রতি একটি সন্দেহ কণ্টকিত সপ্রশ্ন দৃষ্টি। এ কে? এ কেন? একে তো কোনোদিন দেখিনি? কী সম্পর্ক এর মিসেস

হালদারের সঙ্গে? এর আসার সঙ্গে সঙ্গেই বা চিরসুস্থ পঙ্কজিনী হালদারের এমন অবস্থা হয় কেন? 'কেউ কোনোদিন ওঁকে অসুস্থ হতে দেখিনি।'

বলছেন সবাই আক্ষেপের সুরে। 'সত্যি মিসেস হালদার অসময়ে বিছানায় এ যেন ভাবাই যায় না—'

অতঃপর এ আলোচনা চলতে লাগলো—আদৌ কোনো সময় ওঁকে কেউ শোয়া অবস্থায় দেখেছেন কি না।

না, কেউ মনে করতে পারে না।

সেই মানুষ কিনা হঠাৎ অমন ভাবে—'আচ্ছা ডাক্তার মান্না, আপনার কি মনে হয় ফুড পয়জন গোছের? তাতেও হঠাৎ সেন্সলেস হতে পারে মানুষ। মানে শরীরে একটা বিষক্রিয়ার মত হয়—'

হঠাৎ ভবভূতির গম্ভীর কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়, 'মিসেস হালদারের মৃত্যুতে কারো কোনো সুবিধে হতে পারে, এমন সন্দেহ হচ্ছে আপনাদের?'

'মানে? তার মানে? মানে কী এর?'

অনেকগুলো কণ্ঠ তীব্র প্রশ্নে ভবভূতির কথার মানে জানতে চায়।

কিন্তু ডাক্তার মান্না সহসা বলে ওঠেন, 'আপনারা দয়া করে যদি ঘরের ভীড়টা একটু—মিস রায়, আপনি একটু গরম জলের ব্যবস্থা করুন, একটা ইন্‌জেক্‌শান দিতে হবে।'

সবাই চলে গেলেন। ভীড় হতে কে চায়। অপমানিত হতে কার ভাল লাগে?

ওই ওনার 'আপনার লোকটি' যদি এসে না পড়তো আর মিসেস হালদারের এমন অসুখ করতো, পাড়াসুদ্ধ সকলে দেখিয়ে দিতো নিঃসহায় প্রতিবেশিনীকে রোগে বিপদে কিভাবে দেখত হয়।

পালা করেই শুধু নয়, পাল্লা দিয়ে সেবা করতেন সবাই।

কিন্তু কারো কোনো মহিমাই বিকশিত হবার সুযোগ পেল না। মিসেস হালদারের 'আপনার লোক' এসেছেন!

আর ওই ছেলেটা? 'ছেলেটা'ই বা কেন, লোকটা বলা উচিত। বয়েস নেহাৎ কম নয়। ওটি রীতিমত সন্দেহজনক।

ভাইঝিটিও তো যথেষ্ট ধাড়ি হয়েছে। কে জানে কেমন?

পথে যেতে যেতে এ বাড়ি ও বাড়ির মধ্যে কানাকানি, তাকাতাকি, বলাবলির সূত্রে সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয়ে ওঠে।

তবে মিসেস হালদার শেষ রক্ষা করলেন না, আবার চোখ মেলে তাকালেন।

চোখ মেলে না তাকালে এঁরা পুলিশে খবর না দিয়ে ছাড়তেন না। এবং এই দুটি সন্দেহজনক নরনারীকে তাদের হাতে সমর্পণ করে দিয়ে ন্যায় ধর্মনীতির মান রক্ষা করতেন।

আশ্চর্য! এসে মনে হলো মারা গেছেন, মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। আবার সেই মানুষ চোখ খুললো।

তা সত্যি, আবার সেই মানুষ চোখ খুলবেন তা কি ভাবতে পেরেছিল এই মানুষ দুটোও?

পঙ্কজিনী চোখ খুলেছিলেন, কথাও বলেছিলেন অস্পষ্ট স্বরে। এরা বুঝতে পারলো না।

মালবিকা ব্যাকুল হয়ে বললো, 'বংশী, দ্যাখ তো বুঝতে পারিস কিনা।'

কিন্তু বংশীর কানের দরজা যে অনেকদিন আগেই বন্ধ হয়ে গেছে।

ভবভূতি খুব কাছে গিয়ে কান পেতে বললো, 'ঠিক বুঝতে পারছি না, মনে হলো বলছেন 'কালো খাতা।'

'কালো খাতা?'

মৃত্যুকালে কোন কালো খাতার কথা মনে এলো পঙ্কজিনীর? চিত্রগুপ্তের কি? মালবিকা ব্যাকুল হয়ে বললো, 'পিসিমা কিছু বলবে? পিসিমা? পিসিমা!

যেন কোনো এক অতল গভীর থেকে উঠে এলেন পঙ্কজিনী, বললেন, 'বিয়ে।'

ভবভূতি চেঁচিয়ে বললো, 'হ্যাঁ বিয়ে। আপনি ভাল হয়ে উঠে বিয়ে দেবেন।'

পঙ্কজিনী কি কথাটা বুঝতে পারলেন। তা নইলে ঠোঁটের কোণে একটু কুঞ্চন ফুটে উঠলো কেন?

পঙ্কজিনী আবার বললেন, 'কালো খাতা।'

এবারের উচ্চারণ একটু স্পষ্ট।

ভবভূতি জোরে বললো, 'হ্যাঁ কালো খাতা। কোথায়?'

পঙ্কজিনী চোখ বুজলেন। কথা বললেন না।

শুধু হাতটা তুলতে চেষ্টা করলেন। মালবিকা মাথাটা নীচু করে হাতটা মাথায় ঠেকালো।

মনে হল পঙ্কজিনীর চোখে যেন একটু প্রসন্নতা ফুটে উঠলো।

ভবভূতির দিকে কেমন প্রত্যাশার চোখে তাকালেন।

ভবভূতিও এগিয়ে এসে মাথাটা নীচু করলো। পঙ্কজিনী বিড়বিড় করে কি

যেন বললেন, তারপর একটা জোর নিঃশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারণ করলেন 'সেই দেরাজ।'

শেষরাত্রে মারা গেলেন পঙ্কজিনী হালদার।

এ শহরের চিরবাসিন্দা।

কতো 'কুটির', কতো 'লজ', কতো 'নিলয়', কতো 'আলয়', একদা জ্বলজ্বল করেছে, ঝকঝক করেছে, আবার কোথায় তলিয়ে গেছে উদয় অস্তের এক প্রত্যক্ষ খেলা বয়ে গেছে এই জায়গাটার উপর দিয়ে।

পঙ্কজিনী হালদারই শুধু এর ব্যতিক্রম। মিসেস হালদারের কুটিরে কোনোদিন উদয়ও ছিল না, কোনোদিন মধ্যাহ্ন সূর্যের উজ্জ্বল ভাতিও ছিল না, আবার কোনদিন তেমন ভাবে অস্তমিতও হয়নি।

তিনিই এ শহরের বর্তমানকালের মধ্যে সর্ব পুরাতন বাসিন্দা ছিলেন। এই মৃত্যু এমন কিছু বিস্ময়কর হতো না, যদি সবাই মনে রাখত যে তাঁর বয়স হয়েছিল।

মিসেস হালদারের প্রায় সত্তর বছর বয়স হয়েছিল। মিসেস হালদারের হঠাৎ কোন একদিন 'ডাক' আসতে পারে, এটাই ছিল স্বাভাবিক।

এই শহরের প্রকৃতি যেমন ঋতুতে ঋতুতে একই রূপ রস গন্ধ স্পর্শের স্বাদ বয়ে আনে, দেখবার লোক থাকুক না থাকুক পোড়ো বাড়ির মধ্যেও ফুলগাছ ফুলে ভরে যায়, সবুজের সমারোহে গাছেরা সজীব হয়ে ওঠে, বাতাসে সিমুল ফুলের বক্ষ বিদারণ করে তুলো ওড়ে রেণু রেণু করে, পলাশে কৃষ্ণচূড়ায় আগুন জ্বলে, আমের মুকুল আর লেবু ফুলের গন্ধ জানিয়ে যায় আমি এলাম, তেমনি প্রকৃতির এই অনাহত ধারার মতই মিসেস হালদার সকালে উঠে বেঁটে ছাতাটি মাথায় দিয়ে প্রত্যেকটি বাড়িতে হাজিরে দেবেন। পিন আঁটা শাড়ি আর বকলস আঁটা জুতো, পুরো হাতা ব্লাউস আর বাঁকা সিঁথে কাটা চুল, সবটা মিলিয়ে মিসেস হালদারের এই অপরিবর্তনীয় মূর্তিটি অবিনশ্বর থাকবে এই ছিল সকলের প্রত্যাশা।

তবু হঠাৎ একদিন মারা গেলেও কেউ এতো বিচলিত হতো না।

কিন্তু এ কী?

এ যে কোথাকার কে দুটো অসৎ ছেলেমেয়ে মিসেস হালদার নামের মানুষটার অনাহত ছন্দটিকে ভেঙেচুরে ছড়িয়ে দিলো, এতোদিনের কাছের মানুষগুলো তার টুকরোটুকুও কুড়িয়ে নিয়ে দেখতে পেল না।

সকালবেলা, ঠিক যে সময় মিসেস হালদার প্রত্যেকটি বাড়িতে বাড়িতে উঁকি দিয়ে একই কথা উচ্চারণ করে কুশল প্রশ্ন করতেন, আজ ঠিক সেই সময়েই প্রত্যেকটি বাড়িতে একই খবর এসে আছড়ে পড়লো।

কাল মনে হয়েছিল সামলে উঠলেন। নাঃ তা নয়।

শেষ রাত্রে মারা গেছেন মিসেস পঙ্কজিনী হালদার।

'কি, আমি আর কতদিন থাকবো?'

কোনো এক সময় প্রশ্ন করলো ভবভূতি, 'আপনি না হয় স্কুলে ছুটি নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু আমি তো আসিনি। আমার তো আর দেরি করলে মুস্কিল হয়ে যাবে।'

মালবিকা বোধহয় এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না।

মালবিকা যেন নিজেকে এলিয়ে দিয়ে পরম নির্ভরতার রাজ্যে বাস করছিলো, তাই মালবিকা অবাক হয়ে তাকালো। ভবভূতি যেন এই অবাক অভিযোগের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতেই মাথাটা নিচু করে বললো, 'বুঝতে পারছি আপনার অবস্থা। কিন্তু—'

মালবিকা শান্ত গলায় বললো, 'বুঝতে পারছেন?'

পঙ্কজিনীর ঘরের পিছনের সেই বাগানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলো ওরা।

সর্বদাই তো বাড়িতে এখন লোকের আনাগোনা।

পঙ্কজিনীর প্রতিবেশীরা পঙ্কজিনীকে আবার বেঁচে উঠতে দেখে যখন খেলা ভেস্তে যাওয়ার মনোভাব নিয়ে চলে গিয়েছিলেন, তখন সকলেই যেন অদৃশ্য এই অধিবেশনে অলিখিত এক চুক্তি পত্রে সই করে ফেলেছিলেন—দূর দূর, ও বাড়ির গেটের ওপারে আব নয়। মিসেস হালদারের আপনার লোকেরা এসেছে, আমাদের আর দায়িত্বই বা কিসের?

কিন্তু আবার যখন একটা 'হাত-তাস' পেলেন এঁরা, পেলেন রঙের তাস, তখন ফের খেলায় নামলেন। তখন দৃশ্যমান এক অধিবেশনে, যেটা মিসেস দত্তর 'কুটিরে' সংঘটিত হলো, তাতে স্থির হয়েছে, না, গেটের ওপারের অধিকার তারা ছাড়বেন। তাঁদের এতো দিনের প্রতিবেশীদের দাবিটাও কিছু ফেলনা নয়।

তাঁরা এতোজন থাকতে হঠাৎ দুটো খুনে এসে মিসেস হালদারের চিরদিনের সত্তাটাকে কবলিত করে ফেলবে, মিসেস হালদারের যথাসর্বস্ব কুক্ষিগত করবে, এটা তাঁরা কিছুতেই হতে দেবেন না। মিসেস হালদারের কি আছে না আছে,

তাঁর কোন্ আয় থেকে দিন চলে, এসব ছিল মিসেস হালদারের প্রতিবেশীদের কাছে এক পরম কৌতূহল, যে কৌতূহলের নিবৃত্তির কোন উপায় ছিল না। পঙ্কজিনী এই জাতীয় কৌতূহলকে ঘৃণার চক্ষে দেখতেন। অন্য কেউ অন্য কারো সম্পর্কে এরকম কোনো কৌতূহল প্রকাশ করে ফেলেছে দেখলে পঙ্কজিনী মেয়ে স্কুলের মিষ্ট্রেসের ছাপ মুখে এঁকে বলতেন, 'এটা কিন্তু আপনাদের ঠিক হচ্ছে না। না না এটি খুব অসঙ্গত। কারো ব্যক্তিগত জীবনের অন্দরে উঁকি মারবার চেষ্টাটা গর্হিত, সভ্যতা বহির্ভূত। অপরের সম্পর্কে এতো কৌতূহল থাকবে কেন? কৌতূহলী হবার জন্যে প্রকৃতির ভাণ্ডারে অনেক জিনিস আছে, তাতে হোন। গাছে কিভাবে পাতা গজায়, কুঁড়ি কিভাবে ফোটে, কোন্ ঋতুতে ফুল হয়, প্রজাপতি কখন ওড়ে, পাখিরা কেমন করে ক্যালেণ্ডারের তারিখের হিসেব রেখে এদেশ থেকে অন্য দেশে যায় আসে, এসবে কৌতূহলী হোন, দেখবেন আর এক জাতের দরজা খুলে যাবে আপনার চোখের সামনে।'

পঙ্কজিনী হালদারের এমন একটি ব্যক্তিত্ব ছিলো যে, সরাসরি তাঁর মুখের উপর কোন প্রতিবাদ কেউ করে উঠতে পারতো না, তাই চুপ করে যেতো, কিন্তু আড়ালে বলতে ছাড়তো না, হ্যাঁ, সব্বাই তোমার মত নিষ্কর্মা! খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তাই বসে বসে প্রজাপতির পাখার রং দেখতে যাবে, গাছে কেমন করে পাতা গজায়, তাই দেখবে! তোমার বাবা অখণ্ড অবসর, তুমি পারো।

কিন্তু এখনকার কথা আলাদা। এখন অন্যের জীবনের অন্দরে উঁকি দেওয়ার অপরাধে কেউ শাসন করতে আসছে না—অতএব ওঁরা এই জটিল রহস্যভেদের পুণ্যব্রত নেবেন। ওই বদ ছেলে মেয়ে দুটোর স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে ছাড়বেন।

তাই আনাগোনাটা অব্যাহত রেখেছেন।

তাছাড়া ছুতোও তো রয়েছে।

এই শহরের চির-বাসিন্দা বধিবা পঙ্কজিনী হালদারের শেষকৃত্যটি সুন্দরভাবে উদ্‌যাপিত করতে হবে না? সন্তান নেই ওঁর, দায়িত্ব তো শহরের বাসিন্দাদেরই। উড়ে এসে জুড়ে বসা এই ভাইঝিটা, আসল না নকল তাই বা কে জানে? অনেকদিন আগে এখানে ছিলো বটে একটা ফ্রক পরা মেয়ে, ভাইঝি না ভগ্নী, তারপর আর কই? মনে তো পড়ে না। দুটো জালিয়াৎ মেয়েপুরুষ হঠাৎ একটা 'পরিচয়' সাজিয়ে এসে উদয় হলো, আর দুটো দিনও কাটলো না, বুড়ি খতম হয়ে গেল!

অসহ্য নয়?

এটা নীরবে মেনে নেওয়াও পাপ। বিরক্ত হয়ে আসা-যাওয়া বন্ধ করলে আর ঢোকা মুস্কিল হবে। অনবরত আসা যাওয়াই ঠিক, পথটা সোজা থাকবে।

কিন্তু পঙ্কজিনীর শেষকৃত্যটা হবে কী পদ্ধতিতে?

উনি কি হিন্দু ছিলেন? না ব্রাহ্ম? এ প্রশ্ন ভবভূতির মনেও রয়েছে। বারবারই ভাবছে জিগ্যেস করে মালবিকাকে, কিন্তু কেমন যেন আটকাচ্ছে।

এখন ভাবলো আজ নিশ্চয় জিগ্যেস করে নেবে?

মালবিকা যখন বললো, 'বুঝতে পারছেন?' তখন ভবভূতি একটু গম্ভীর হাসি হাসলো। বললো, 'এর উত্তর—কথা সাজিয়ে গুছিয়ে হয় না। কিন্তু চাকরীর প্রশ্নটা যে বড় বিঁধছে—'

'তাহলে যান।'

'ওটা তো রাগের কথা।'

'রাগ কেন, এমনিই বলছি। সত্যিই তো, আপনি কি আমার জন্যে সব খোয়াবেন? এখানে তো দেখছি অনেক শুভানুধ্যায়ী রয়েছেন, আমার যা হোক হবেই। আপনি যান। তবে—' মালবিকা একটু হাসলো।

'তবে কী?'

'মানে আপনি আবার হঠাৎ চলে গেলে এনাদের সন্দেহ ঘনীভূত হবে। এমনিতেই তো সন্দেহ করেছেন, আমরা দু'জন দুর্বৃত্ত, মিথ্যা পরিচয় নিয়ে এসে বৃদ্ধা মহিলাকে ঠকাতে বসেছিলাম, আর শেষ পর্যন্ত—' মালবিকা চুপ করে যায়। ওর চোখ দুটো জলে ভরে আসে।

ওর অসমাপ্ত কথা ওই অশ্রুবিন্দু দুটিতেই কথা সমাপ্তির চেহারা নেয়।

ভবভূতি বলে, 'আপনিও এটা ধরতে পেরেছেন?'

'না পারবার কিছু নেই। ওঁরা তো গোপন করতে চাইছেন না। আমার তো মনে হয় ওঁরা আমাদের পুলিসের হাতে সমর্পণের তালে আছেন। এর মাঝখানে আপনি আবার হঠাৎ হাওয়া হয়ে গেলে—'

ভবভূতি হাসলো, 'একেবার হাতে হাতে প্রমাণ, তাই না? বিষয়টা ভাবাবার। আপনি একা পড়ে গেলে কী যে হাল করবেন ওঁরা আপনার। স্রেফ ধরে নেবেন, আমার হাত দিয়ে মালপত্র চালান করে দিয়ে আপনি সাধু সাজছেন। নাঃ অন্ততঃ শ্রাদ্ধের আগে চলে যাওয়া চলবে না। আচ্ছা কোন্ মতে হবে কাজটা? উনি হিন্দু ছিলেন না ব্রাহ্ম?'

কিন্তু সে কথা কি মালবিকাই জানে ছাই?

বাড়িতে তো কোনো ঠাকুর দেবতার ছবি দেখা যায় না, কোনোখানে লক্ষ্মীর ঘটও পাতা নেই, কোনো বাবা মহারাজের ছবি। 'ঠাকুরে'র ছবির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের।

তবে।

ব্রাহ্মও হতে পারেন।

মালবিকা বলে, 'এটা আমারও জানা নেই। এঁদের জিজ্ঞেস করবো?'

'সর্বনাশ! তাহলে তো সন্দেহ আরো 'ঘনীভূত'! জিজ্ঞেস করা মানেই ধরা পড়ে যাওয়া—আপনি ওঁর সম্পর্কে কিছুই জানেন না।'

'ঠিক আছে।'

মালবিকা হঠাৎ দৃঢ় স্বরে বলে, 'ধরে নেবে উনি ব্রাহ্মই ছিলেন ওঁর চাল-চলন, সাজ-পোষাক সব কিছুই ওই দিকে সাক্ষ্য দেয়।'

ভবভূতি সেই জানলাটার দিকে তাকালো।

ক'দিন আগে যেখানটায় দাঁড়িয়ে পঙ্কজিনী বলেছিলেন, 'পাতা ছিঁড়োনা, পাতা ছিঁড়োনা, ওদেরও লাগে।'

ভবভূতি মালবিকার দিকে তাকিয়ে বললো, 'তা তো হলো, এখন ভাবছি ওঁর ভাইঝির বিয়েটা কোন্ মতে হবে। হিন্দু মতে, না ব্রাহ্ম মতে?'

মালবিকা গাছের পাতা ছিঁড়তে গিয়ে হাতটা সরিয়ে নেয়।

মালবিকাও জানলাটার দিকে তাকায়, যেন ওখানটায় কার উপস্থিতি রয়েছে।

মালবিকা তারপর বলে, 'ও ভাবনাটা কি আপাততঃ খুব জরুরী?'

'জরুরী নয় বলছেন?'

'এই মুহূর্তে নয়।'

আবার একটু হেসে বলে, 'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, সবই স্থির, শুধু পদ্ধতিটার মতামত নিয়েই প্রশ্ন।'

ভবভূতি মালবিকার মুখের রেখায় কোন লেখা পাঠ করে কে জানে। আস্তে বলে, 'আপনি যে এখনো যথেষ্ট দ্বিধাগ্রস্ত, তা জানি, কিন্তু আমার কাছে একটা জিনিস খুব বড়ো হয়ে আছে। আমি মিসেস হালদারের শেষ শয্যায় স্পষ্ট প্রতিজ্ঞা করেছিলাম।'

মালবিকা বলে ওঠে, 'আচ্ছা ওটা পরে ভাবলেও চলবে! এখন বলুন আপনি তাহলে চলে যাচ্ছেন না?'

'যাচ্ছি না।'

তারপর এই ক'দিন ধরে যে কথাটা মনের মধ্যে পাক খাচ্ছিল সেই কথাটাই বলে ফেলে। বলে, আচ্ছা আপনি একটা কথা শুনেছিলেন? খুব অস্পষ্ট হলেও—উনি দুটো কথা উচ্চারণ করেছিলেন, 'কালো খাতা', আর 'সেই দেরাজ!'

মনে ছিলো বৈকি মালবিকার। তারও কেবলই মনে হচ্ছিল, কী সেই খাতা, কোন্ দেরাজে আছে?

'মনে আছে।'

'আপনার কি মনে হয় ওটা মৃত্যু-কালের অর্থহীন ভুল কথা?'

'আমার কিছু মনে হয় না।'

'একবার দেখলেও হয়।'

মালবিকা বলে, 'দেরাজ তো শুধু ওই ঘরেই রয়েছে, ওইটা দেখলেই ভুল ঠিক বোঝা যাবে।' মালবিকার স্বরে যেন কিছুটা ঔদাসীন্য, কিছুটা আলস্য।

অথচ মালবিকার সমস্ত আগ্রহ, সমস্ত চিন্তা চেতনা ওই শব্দটার দিকেই ধাবিত হচ্ছে। এই দণ্ডেই দেখতে গেলেই বুঝি ভালো হয়। তবু সম্ভ্রমের একটা দায় আছে। বয়স্কের একটা লজ্জা আছে। কৌতূহলটা যেন দুর্বলতার চিহ্ন।

কৌতূহলকে বাইরে প্রকাশ হতে দেওয়াটা গ্রাম্য, অনাগ্রহটা আভিজাত্য।

ভবভূতিও তাই দারুণ ইচ্ছে সত্ত্বেও বলে ফেলে না 'চলুন না এখনই দেখে আসি!'

ভবভূতি বরং ওই দেখাটাকে আরো দূরে ঠেলে দেয়।

'আজ্ঞা, কাজকর্ম মিটে যাক, সব কিছুই তো দেখতে হবে আপনাকে!'

মালবিকা জানলার নীচে দেওয়ালের ধারের একটা টিপির উপর বসে পড়ে হতাশ গলায় বলে, 'আমি একথা ভাবতেও পারছি না যে সব কিছুই আমাকে দেখতে হবে। এই বাড়ি, এই সাজানো সংসার কি গতি হবে এর? আপনারও তো আপনার ঠাকুমার নামের বাড়িটি দেখাই হলো না।'

ভবভূতি বলে, 'সত্যি যাওয়াটা দরকার ছিলো।'

ভবভূতির কেমন একটা সন্দেহ ঢুকেছে মনে, সেদিন সকালে যে পঙ্কজিনীকে ভবভূতি তার বাড়ি থেকে বেরোতে দেখেছিল, কী যেন হাতে নিয়ে, সে কী ওই খাতা। মনের সন্দেহ তো প্রকাশ করা চলে না।

অতএব একখানি অদৃশ্য 'কালো খাতা' দু'জনের মনের মধ্যে ছায়া ফেলে

বসে থাকে, আর দু'জনেরই মনের মধ্যে একই ইচ্ছা লালিত হতে থাকে। তীব্র ইচ্ছা।

.সে ইচ্ছাপূরণ তাদেরই হাতে, এই মুহূর্তেই হতে পারে পূরণ, অথচ আত্মসম্ভ্রমের দায়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকা।

*　　　*　　　*　　　*

'ওঁর কাজটা তাহ'লে ব্রাহ্মমতেই হবে?'

মিসেস দত্ত তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করেন, 'উনি ব্রাহ্ম ছিলেন, এটা তুমি ঠিক জানো?'

মালবিকার প্রস্তুতি আছে, তাই সে অবলীলায় বলে, 'ব্রাহ্মধর্মে অনুরাগী ছিলেন জানি।'

'তা' শুধু অনুরাগী হলেই তো হয় না?'

মালবিকা বলে, 'আমার কাছে হয়।'

মিসেস দত্ত নয়, এসেছেন অনেকেই দল বেঁধে।

এখানে একটি 'সমাজ মন্দির' আছে যাঁরা উক্ত সমাজের তাঁরা মাঝে মাঝে সেই মন্দিরে সমবেত হয়ে উপাসনায় যোগ দেন। তাঁদেরই একজন জেনে এসেছেন পঙ্কজিনী হালদারের ওই ঘোড়েল ভাইঝিটির ধুরন্ধর বন্ধুটি নাকি 'সমাজে' গিয়ে আচার্যের অনুসন্ধান করেছিল।

ওঁরা ঠিক করলেন এই একটা উপলক্ষে জিজ্ঞাসাবাদ করা যায়।

মালবিকা বললো, 'আমার কাছে নয়।'

সঙ্গে সঙ্গে মিসেস দত্ত, মিসেস চক্রবর্তী, মিসেস মিত্তির, পরিমলবাবু, জীবনবাবু সকলেই যেন অবহিত হয়ে বসলেন।

মিসেস মিত্তির বললেন, 'শুধু তোমার কাছে হলেই তো হবে না। মিসেস হালদারের স্বামীর বংশের কেউ এলে সঠিক বোঝা যেতো। তাঁদের কাউকে খবর দেওয়া হয়নি?'

মালবিকা অসতর্কে একটা ফাঁদে পা দেয়। বলে ফেলে. 'পিসির শ্বশুরবাড়িতে কে আছে না আছে, আদৌ আছে কিনা আমার জানা নেই।'

সে কী? তুমি তো আপন মনে নিজেকে মিসেস হালদারের ওয়ারিশান *ভাবছো, কিন্তু হঠাৎ যদি যথার্থ কোনো ওয়ারিশান এসে হাজির হয়? তখন কি* করবে?'

'আমি নিজেকে কোনো কিছুই ভাবছি না। কাজটা মিটে গেলেই আমি চলে যাবো।'

'চলে তো যাবেই। এখানে আর কে পড়ে থাকে? এ হচ্ছে কবরের দেশ। তা হলেও মিসেস হালদারের মৃত্যু সংবাদ শুনে ওঁর কোনো নিকট আত্মীয় এসে পড়লো না, এমনকি পারলৌকিক কাজ উপলক্ষেও নয়, এটা আশ্চয বৈকি!'

মালবিকা গম্ভীরভাবে বলে, 'শুধু আশ্চর্য নয়, সন্দেহজনকও, তাই নয় কি?'

ও বাবা এ যে সর্বনেশে মেয়ে।

অস্ফুট একটা গুঞ্জন ধ্বনি ছড়িয়ে পড়লো ঘরের বাতাসে।

মিসেস দত্তর দিকেই তাকালো সবাই। কারণ উনিই হচ্ছেন সব থেকে ডাকাবুকো, আর সব থেকে নিকট প্রতিবেশিনী।

উনি দুটো ভুরুকে নাকের ওপর জড়ো করে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলেন, 'সন্দেহের কথা কি বললে মিস চৌধুরী?'

'নতুন কিছু তো বলিনি মিসেস দত্ত!' মালবিকা শান্তভাবে বলে, 'আপনারা যা ভাবছেন, সেটাই বললাম।'

'ওঃ। আমরা কী ভাবছি, সেটা তুমি জেনে ফেলেছো? থট্‌রীডিং জানো বুঝি?'

'ওটা না জানলেও চলে। অন্যে কি ভাবছে, বুঝতে অসুবিধে লাগে না, যদি সে ভাবনাটা বেশ স্পষ্ট হয়। এই শহর সুদ্ধ সকলেই তো আপনারা ভাবছেন, আমি স্রেফ্ একজন জালিয়াৎ মেয়ে, মিথ্যা পরিচয় দিয়ে এসে আপনাদের বিশেষ প্রিয় নিরীহ প্রতিবেশিনীকে খুন করিয়ে ওঁর সব বিষয়-সম্পত্তির দখল করে ফেলে পালাবার তাল করছি।....কাজের সহকারী হিসেবে আর এক দুর্বৃত্তকে নিয়ে এসেছি সঙ্গে, ওই ভবভূতি রায়কে। ভাবছেন না এসব?'

ওনারা রীতিমত অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন।

এ যে একেবারে উল্টো হয়ে গেল. কোথায় ওঁরাই সরাসরি আক্রমণ করে বসবেন, তা নয়, আক্রমণটা তাঁদের উপরেই এলো।

তবে মিসেস দত্ত শক্ত মেয়ে, ঘাবড়াবার পাত্রী নয়। তাই ধীর ভাবে বলেন, 'ঘটনাটা যদি অন্যের ব্যাপারে ঘটতো মিস চৌধুরী, আর তুমি তার দর্শক হতে, তোমারও কি সন্দেহ হতে পারতো না? উনি আমাদের কাছে প্রতিদিন আসেন, কোনোদিন জানাননি, তাঁর ভাইঝি আসছে, এবং সঙ্গে তার বাগদত্তা স্বামী আসছে, অথচ তোমরা সেই পরিচয় নিয়ে এসে দাঁড়ালে, আরো দুটো রাত কাটাতে হলো না, উনি হঠাৎ এমন রহস্যজনকভাবে মারা গেলেন। একদিনের জন্যে আমরা মিসেস হালদারের শরীর অসুস্থ দেখিনি।'

'মিসেস দত্ত' কোমরে গোঁজা রুমাল টেনে নিয়ে চোখের কোণে ঠেকালেন।

বাগদত্তা স্বামী শব্দটার উপর বোধকরি ইচ্ছে করেই বিশেষ জোর দিয়েছেন মিসেস দত্ত।

উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ কটাক্ষে ওই মেয়ের মুখের দিকেও তাকিয়েছেন।

ঠিক তাই।

যা ভেবেছিলাম তাই।

কথাটা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়ের মুখখানি যেন সাদা হয়ে গেল। মনের মধ্যে যে বেশ আলোড়ন উঠেছে, তা বোঝা যাচ্ছে। যতই চোর-জোচ্চোর হোক, মেয়ে মানুষ তো!

অবশ্য এ মেয়ে যে মিসেস হালদারের ভাইঝি নয়, তা জোর করে বলা যায় না। মিসেস হালদারের ঘরের টেবিলে এর ছবি আছে মনে হয়। পাঠাতো মাঝে মাঝে।

কিন্তু সত্যি হলেই যে মন্দ হবে না তার কোনো মানে নেই? মন্দ লোকের প্ররোচনায় পড়েও তো মেয়েমানুষ কত অকাণ্ড কুকাণ্ড করে ফেলতে পারে?

আমি যেন মাকড়শার মতো আপন সৃষ্ট এক অমোঘ জালে পড়ে গেছি, এর থেকে উদ্ধারের আশা নেই আমার। এই কথাটাই ভাবছিলো মালবিকা ওই 'বাগদত্ত স্বামী' কথাটা কানে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে।

আমি ওর সাহায্য সহায়তা ব্যতীত কিছুই করতে পারি না, ও চলে যাবে ভাবলে দিশেহারা হচ্ছি, ওর উপরই সমস্ত নির্ভরতাটি রাখছি, অথচ এমন কথা কিছুতেই মনে করতে পারছি না, এই দণ্ডে আমি ওর গলায় মালা দিই।

আমার এই দ্বিধা ও বুঝতে পারছে, তবু ও আমাকে ত্যাগ করে চলে যেতে পারছে না। এ কী এক ফাঁস জালে আটকে পড়লাম আমি!

আমি আমার স্কুল, আমার ছাত্রীকুল, আমার পোজিশান, সবকিছু যেন বেমালুম ভুলে যাচ্ছি। আমার ভূমিকা এখন এক অসহায়া নারী, যে নারী কোনো এক পুরুষের সাহায্য ছাড়া চলতে ভয় পায়।

এটা হচ্ছে শুধু লোকের এই ভুল ধারণার ফল থেকে।

আমার প্রাচীনপন্থী পিসি আমার সঙ্গে একটি ছেলেকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেটিকে আমার ভাবী স্বামী ভেবে নিয়ে আমার মাথাটি খেলেন, আরও মাথা

খেলেন তার বাপের সঙ্গে ওনার যৌবনকালের মধুর সম্পর্ক আবিষ্কার করে এবং শেষবেশ সম্পূর্ণ খেয়ে বসলেন, এই অদ্ভুত ঘটনাটি ঘটিয়ে।

পিসি, হঠাৎ মরে গিয়ে তুমি আমার কী সর্বনাশটাই করলে! তুমি মরে না গেলে তো সেইদিনই ওকে ভাগাতাম আমি, বলতাম ওর কাজ আছে। তারপর কে কার কড়ি ধরতো!

মালবিকা হঠাৎ যেন চমকে ওঠে।

আচ্ছা এখনই বা সেটা হবে না কেন? এরা এই সব অজ্ঞাত অপরিচিতের দল, যা খুশি ভেবে বসে থাকুক না, যতো খুশী ভুল ধারণা নিয়ে, এখান থেকে চলে যাওয়া মাত্রই তো আমি স্বাধীন। এমন কোনো দলিল নেই যে ওই ভবভূতি রায়ের গলায় মালা আমায় দিতেই হবে।

এটা ভেবে মালবিকা যেন বড় স্বস্তি পেলো?

মালবিকা নিজের পায়ে দাঁড়াবার বল পেলো।

বললো, 'একদিনও অসুস্থ না হয়েও মানুষ হঠাৎ একদিন মারা যেতে পারে মিসেস দত্ত, কারণ মৃত্যুটা এমন একটা অবধারিত সত্য যে, কিছুতেই বলা যাবে না, উনি কোনোদিনই অসুস্থ হতেন না বলে কোনোদিনই মারা যাবেন না। বুঝতে পারছি আমার পিসি আপনাদের খুবই প্রিয় ছিলেন, তবু আপনাদের এই ভাবনাটা কি একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না? ঠিক আছে, আপনারা যদি আমাকে মিসেস হালদারের 'জাল ভাইঝি' প্রতিপন্ন করতে শেষ অবধি মামলা লড়তে চান, ডাকুন, পুলিশ টুলিশ।

মালবিকা একটু হাসলো, 'তবে জানেন তো, প্রতিপন্ন করতে অনেক প্রমাণ-ট্রমানের দরকার। পিসির অ্যালবামে আমার জন্মাবধি সব বয়সের ফটো আছে, প্রতি বছরেই পাঠিয়েছি, সেটা নাকচ করতে পারবেন বলে কি মনে হয়? বাড়িতে আমার কাছে পিসির তাড়া তাড়া চিঠি আছে সেগুলোও 'জাল' বলে প্রমাণ করতে পারবেন কি?'

ওঁরা পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করেন।

'পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া' শব্দটার মধ্যে যে একটি রোমাঞ্চময় স্বাদ ছিল, সেটা তো আর থাকতে চাইছে না, ঝরে পড়ে যেতে চাইছে। শেষ পর্যন্ত মামলা লড়া।

ওরে বাবা!

কার কী দায়?

মিসেস দত্ত বেজার গলায় বলেন, 'এতো কথা যে তুমি কেন বলছো এতেই আশ্চর্য লাগছে। এ কথা আমরা কেউ বলতে যাইনি তুমি আসল না নকল। তবে হ্যাঁ, ওঁর এরকম আকস্মিক বিয়োগ আমাদের এই শহরের সকলকেই বিচলিত করেছে। উনি যে আমাদের কতোখানি ছিলেন, সে কথা তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা বৃথা, বৃথা চেষ্টা করতেও চাই না, আমরা শুধু—এইটুকুই চাইছি. ওঁর কাজটি ভালভাবে হোক, যাতে ওঁর আত্মা শান্তি লাভ করে।'

রুমালটা আর একবার ব্যবহার করে উঠে পড়লেন মিসেস দত্ত। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আরো সকলে। সদলবলে যেতে যেতে ওঁরা মন্তব্যে মন্তব্যে এই সিদ্ধান্তে স্থির করলেন, মেয়েটা জাল না হলেও মন্দ চরিত্র! স্বভাব-চরিত্র ভালো হলে কোনো কুমারী মেয়ে এতো দুঁদে হয় না। ওই উদ্ধত উন্নাসিক লোকটারই ওর পৃষ্ঠবল।

এ থেকেই বোঝা যায় ওঁরা মিসেস হালদারকে ভালবাসতেন। হঠাৎ মৃত্যু এসে তাঁকে চিলের মতো ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, এটা একটা দারুণ দুঃখের, তার উপর উড়ে এসে জুড়ে বসা এই ছেলেটা মেয়েটা সেই মৃত্যুটাকেও যেন ছোঁ মেরে কেড়ে নিলো। এই শহরসুদ্ধ লোক যেটা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে পারতো।

সবটাই ঝিমিয়ে গেল।

পরদিন সন্ধ্যায় উপাসনা সভায় এলেন বটে কেউ কেউ, তবে কথাটি কইলেন না।

অনেকে এলেনও না।

কে জানে পঙ্কজিনী হালদারের আত্মা এতে অতৃপ্ত রয়ে গেল কিনা। এদের নিয়েই তো থাকতেন তিনি। অথবা নিজেকে নিয়েই থাকতেন, এরা সেই থাকার উপকরণ মাত্র।

উপাসনা অন্তে যখন পঙ্কজিনী হালদারের ফুলের মালা পরা ছবিখানি বারান্দা থেকে তুলে এনে তাঁর খাটের উপর বসিয়ে দেওয়া হলো, তখন মালবিকা অবাক হয়ে তাকিয়ে ভাবতে লাগলো, কী অদ্ভুত! কী আশ্চর্য! পিসির জন্যে আমার এতো কষ্ট হচ্ছে!

আচ্ছা যদি আমি কলকাতায় বসে কোনো প্রকারে খবরটা পেতাম? তাহ'লে কি এতো কষ্ট হতো? এত শূন্যতাবোধ আসতো?

আসলে আমাদের ভালোবাসাটা যতোখানি মনের, বোধহয় ঠিক ততোখানিই চোখের।

ভাবনাটা সুতোর রীলের মতো খুলে খুলে ছড়িয়ে যাচ্ছে, আর অজ্ঞাতে অসতর্কে সেই লোকটার উপর গিয়েই আছড়ে পড়ছে, যাকে নিয়ে মালবিকার মনে বহু বিতর্ক।

ও চোখের সামনে আছে বলেই আমি মনে মনে এতো আঁকড়াচ্ছি ওকে। ওটা নেহাৎই চোখের কারসাজি।

'উঠুন। খাবেন চলুন?'

ভবভূতি এসে কাছে দাঁড়ালো। 'বংশী বেচারীকে এবার ছুটি দেওয়া দরকার! ও আর পারবে না।'

কিন্তু পারছিনা বললেই বা ছাড়ে কে?

পৃথিবী, যতোক্ষণ তার দেনা শোধ না করছো, ছাড়বে না। আর যে মুহূর্তে সেটা শোধ হয়ে যাবে, অবহেলায় ঔদাসিন্যে ঠেলে ফেলে দেবে তোমাকে। আর মনেও রাখবে না। কিন্তু ঋণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত নয়।

বংশীর সেই ঋণ এখনো শোধ হয়নি। বংশীকে এখনো এই হালদার কুটিরে পড়ে থাকতে হবে সব কিছু আগলে।

মালবিকা বলে রেখেছে, 'তুমি যতোদিন বেঁচে আছো বংশীদা ততোদিনই এই বাড়ির আস্তিত্ব। তুমি মরে গেলেই ওই সব কুটির আর লজ, নিবাস আর ভবনের মত পড়ে পড়ে মাটি হবে।'

বংশী সজল নেত্রে বলেছে, থাকতেই হবে বংশীকে। হালদার মেম সাহেবের এই বাড়ী রক্ষা করার দায়িত্ব বংশীরই দায়।

কেন দায়, কিসের দায়, তা জানে না বংশী। শুধু থাকতেই হবে এইটুকু তার জানা।

তবু বংশী কেঁদে পড়েছিল, 'সব জিনিসপত্তর আপনি নিয়ে যান দিদিমণি, আমি শুধু এই বাড়ি আর বাগান নিয়ে পড়ে থাকবো। ওসব আমি সামলাতে পারবো না।'

কিন্তু 'নিয়ে যাও' বলাটা যতো সোজা, করাটা ততো নয় নিশ্চয়।

মালবিকা বালিশ থেকে মুখ তুললো। আস্তে বললো, 'আমার কিন্তু মোটেই খেতে ইচ্ছে নেই। আপনি খেয়ে নিয়ে—'

'আমারও আদৌ খিদে নেই, আমি শুতে যাচ্ছি—'

ভবভূতি গলা তুলে বললো, 'বংশী শোনো, আমার আজ খিদে নেই, তোমার দিদিমণিরও না।.তুমি বরং—'

অবশ্য এটুকু গলা তোলা বংশীর কানের পর্দা ভেদ করতে পারে না। বংশীর অতএব সাড়া মেলো না।

মালবিকাই খাট থেকে নেমে পড়ে শাড়ির আঁচলটা গোছাতে গোছাতে বলে, 'আচ্ছা, আপনি আমার সঙ্গে এরকম শত্রুতা করছেন কেন?'

ভবভূতি নিজের কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে, 'ভাগ্য! আপনার অথবা আমার।'

'উঃ কী কুক্ষণেই আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল! চলুন।'

'কিন্তু আমার যে আদৌ—'

'বাজে কথা রাখুন। এক্ষুণি আপনি আমায় কি বলে ডাকতে এসেছিলেন?....আমার খেতে ইচ্ছে নেই, অতএব আপনিও শুতে চললেন। তার মানে এই ভাবেই আপনি আমায় চিরকাল জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাবেন।'

ভবভূতি মালবিকার উত্তেজিত মুখের দিকে তাকায়। ভবভূতির তো আহত হবার কথা? অথবা অপমানিত?

অথচ ভবভূতির সারা মুখে আলো ফুটে ওঠে।

ভবভূতি বলে, 'চিরকালের প্রতিশ্রুতি পেয়ে গেলে, স্বভাবটা বদলাবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'হ্যাঁ স্বভাব আবার বদলাবে। কথায় আছে না, স্বভাব যায় না মলে—চলুন। এই বংশীদা খেতে দাও, খুব খিদে পেয়েছে।'

খাওয়ার পরে সেই বারান্দাটায় এসে বসলো ওরা। যেখানে ঘণ্টা কয়েক আগে উপাসনা হয়ে গেছে। এখনো যেন ধূপের গন্ধ রয়েছে। ভবভূতি আস্তে বলে, 'কিছু ভাবছি না তাই, হঠাৎ একটু ভাবলে কী, অবাকই লাগছে। আমি যেন এ বাড়িরই কেউ, যেন চিরকালই এই ভাবে এ বাড়িতে খাচ্ছি, শুচ্ছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি। অথচ কে আমি এখানকার, কে ছিলেন আমার পঙ্কজিনী হালদার। কোন্ অধিকারের বলে আমি তার শবদাহ করতে গেলাম?'

মালবিকা অন্ধকার বাগানের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলে, 'হয়তো

আপনার বাবা অনুভূতি রায়ের কোনো গূঢ় ইচ্ছাতেই এটা হ'লো। তিনি পিসিকে ভালবাসতেন।'

হঠাৎ একটা স্তব্ধতা নামলো।

অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা কইলো না।

তারপর মালবিকা বললো, 'আপনার বাড়িটা তো দেখতে যাওয়া হলো না। কাল সকালে গেলে হয়।'

আপনি যাবেন?'

'গেলে হয়?'

'ভাবছি সেই কালো খাতাটার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়াও একটা কাজ ছিল।'

মালবিকা ম্লান গলায় বলে, 'অনেকবারই ভাবছি, কিন্তু পিসির চাবি-টাবি নিয়ে ওঁর বাক্স দেরাজ খুলবো ভাবতেই কেমন লাগছে। নিজেকে চোর চোর মনে হবে।'

ভবভূতি বলে, 'তা ঠিক। তবে চলে যাবার আগে একবার সব কিছু দেখে শুনে ঘরে চাবি-টাবি লাগিয়ে তবে তো যেতে হবে আপনাকে।'

মালবিকা সামনের বেতের টেবিলটার উপর আঙুলের টোকা দিতে দিতে বলে, 'কলকাতার জীবনটা যেন অদ্ভুত রকম ঝাপসা হয়ে গেছে। নিজের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলছি যে। বিশ্বাস হচ্ছে না আবার গিয়ে ঠিক মতো করতে পারবো।'

ভবভূতি সহসা ওর টেবিলে রাখা হাতটার ওপর নিজের হাতটা রেখে ব্যগ্র গলায় বলে, ঠিক আগের মতো আর কী করে হবে মালবিকা? তারপর তো অন্য এক নতুন ছন্দে জীবনকে গাঁথতে হবে।'

মালবিকা মাথাটা নীচু করে সেই যুগল হাতের উপর রেখে কেঁদে ফেলে বলে, 'পিসি কেন ততোদিন পর্যন্ত থাকলো না। পিসির জন্যে আমার ভীষণ মন কেমন করছে।'

মৃত্যু অশৌচের সীমাবদ্ধ দিনরাত্রিগুলো যেন একটা আতঙ্কের আড়ষ্টতা নিয়ে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সেই আড়ষ্ট আচ্ছন্নতার মধ্যে মনে পড়েনি মালবিকা নামের একটা যুবতী মেয়ে এ বাড়িতে একা রাত্রি যাপন করছে, পাশের ঘরে এক অনাত্মীয় যুবককে ঠাঁই দিয়ে।

একা পিসির ঘরে শুতে ভয় ভয় করছে, সে ঘরে চাবি বন্ধ করে দিয়ে মাঝখানে ছোট সরু ঘরটায় শুয়েছে মালবিকা। এই ঘরটা 'অতিথি'র ঘরের গায়ে। সে ঘরটার মাঝখানে দরজাও আছে একটা।

দরজাটা অবশ্য ব্যবহার হতো না, মিসেস হালদার ওই দরজাটা বন্ধ করে তার সামনে একটা পুরনো আলমারী চাপিয়ে রেখেছিলেন। উনি এই ঘরটাকে বাতিল বাক্স-আলমারী, আলনা, টেবিল রাখাবার কাজে ব্যবহার করতেন। এ ঘরে উনি শাড়িটাড়ি বদলাতে আসতেন, যাকে উনি 'ড্রেস' করা বলতেন।

এ ঘরে এই বাতিলের ভাঁড়ারে সরু চৌকীটায় শুয়ে পড়তে তেমন ভয় করে না। দরজা ভাল করে বন্ধ করে শোয়া যায়।

কিন্তু জগতে কি শুধুই ভূতের ভয়, চোরের ভয়, সাপ খোপের ভয়? আর কোনো ভয় নেই?

অথচ মালবিকা নামের যুবতী মেয়েটা সেই অন্য ভয়টা সম্পর্কে যেন অচেতন থেকেছিল। যেন চেতনায় ছিল—

সদ্যমৃত পঙ্কজিনী হালদারের উপস্থিতির অনুভূতিটা কোথাও হারিয়ে যায়নি। যেন তিনি তাঁর নীতিজ্ঞানের শুচিতা নিয়ে এইখানেই কোথাও অবস্থান করছেন। যেন হঠাৎ কোনো সময় সেই তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে কাটা কাটা উচ্চারণে বলে উঠবেন, 'না না, ওঠা ঠিক নয়!'

আজ এখন হঠাৎ যেন সেই উপস্থিতির অনুভূতিটা হারিয়ে যাচ্ছে। যেন আর কোনো দিনই কোনোখান থেকে হঠাৎ কথা কয়ে উঠবেন না পঙ্কজিনী।

কেন?

আজ উপাসনার মধ্যে যখন বারবার পঙ্কজিনী দেবীর আত্মার মুক্তি কামনা করা হচ্ছিলো, তখন কি এই হালদার কুটিরে ঘুরে বেড়ানো সেই আত্মা লজ্জিত হচ্ছিলো? মনে করছিলো, আর এখানে ঘুরে বেড়ানো শোভন নয়। তাই ক্ষুণ্ন হয়ে চলে গেলে পৃথিবীর দিকে পিঠ ফিরিয়ে?

নাহলে আজ কেন হঠাৎ ভয় ভয় করছে? আজ কেন মনে পড়ছে মালবিকার, এই নির্জন বাড়িতে শুধু সে আর একটা অজানা পরিচয় যুবক পাশাপাশি ঘরে রাত্রি যাপন করছে। আর মনে পড়ছে বলেই বুঝতে পারছে, মিসেস দত্ত এবং আরো মিসেসদের চোখে এ দৃশ্য কতো কটু ঠেকেছে। ওঁরা কি এটাকে মালবিকার অজ্ঞানতা ভাবছেন? না দুঃসাহস?

না কি মালবিকাকে ওঁরা খরচের খাতার মেয়ে বলে ধরে নিয়েছেন?

বারান্দা থেকে উঠে এসে শুতে আসার সময় আজই প্রথম 'লোক লোচন' সম্পর্কে চেতনা এলো মালবিকার, চেতনা এলো ভয়ের।

ভয়! ভয়! যেন একটা গভীর গহ্বরে তলিয়ে যাবে সে। কেউ কোথাও নেই তাকে রক্ষা করবার।

দরজাটায় ছিটকিনি লাগিয়ে দিয়েও একটা অদ্ভুত কাজ করলো মালবিকা, ভারী একটা ট্রাঙ্ক কোণের দিক থেকে টেনে এনে ঠেলতে ঠেলতে দরজার মুখে চেপে বসিয়ে রাখলো।

কিন্তু কার কাছ থেকে আত্মরক্ষা করতে চাইছে মালবিকা? আততায়ীর আক্রমণ কি বাইরে থেকে হানা দেবে? না ভেতর থেকে ধাক্কা দেবে?

ট্রাঙ্কটা সরিয়ে বিছানায় বসে পড়ে হাঁপাতে থাকে মালবিকা, আর অবাক হয়ে ভাবে, কী আশ্চর্য! এই কটা দিন আমি এতো নির্ভয়ে ছিলাম কি করে?

সেই ভয়ঙ্কর রাতটা কেটে গেল? অথচ কিছুই ঘটলো না।

গভীর রাতের দিকে কখন কোন্ মুহূর্তে ঘুম এসে গিয়েছিল, সে ঘুমটা ভাঙলো যাকে বলে ঊষার প্রাক্কালে।

জানলা দরজা সব আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধ ছিল, হঠাৎ গরম লেগেই ঘুম ভেঙেছে? নইলে মালবিকা তো কখনো এতো ভোরে ওঠার মেয়ে নয়।

তাড়াতাড়ি উঠে বাগানের দিকের জানলাটা খুলে দিলো মালবিকা, সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক মিষ্টি হাওয়া এসে শুধু শরীর নয়, মনটাও যেন জুড়িয়ে দিলো। মালবিকা যেন অবাক হয়ে বাগানে ছড়িয়ে পড়া মৃদু আলোর আভাসটুকুর দিকে তাকিয়ে থাকলো।

কিসের আলো এটা?

আসন্ন সূর্যের মৃদু পদধ্বনির আভাস? না কৃষ্ণপক্ষের ছায়া ছায়া জ্যোৎস্নার শেষাবশেষ? টেবিলের উপর খুলে রাখা হাত ঘড়িটাকে জানলার ধারে নিয়ে গিয়ে দেখে বুঝলো, ভোরেরই আভাস, তবে তার সঙ্গে ওই জ্যোৎস্নার শেষটুকুও মিশিয়ে রয়েছে। যেন ও 'যাই যাই' করেও যেতে পারছে না।

ঘড়িটা মুঠোর মধ্যে চাপাই থাকলো, জানলার সামনে দাঁড়িয়ে রইলো মালবিকা।

একেই বোধহয় বলে ব্রাহ্মমুহূর্ত। এই সময় একাগ্রচিত্তে কিছু ভাবলে নাকি সেই ভাবনার বস্তু অনুভূতিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মালবিকা তেমনভাবে কিছু ভাববে?

মালবিকা কি পিসিমাকে ভেবে ভেবে সামনে এনে দাঁড় করাবে? বলবে, 'পিসি, তোমার এই ঘরবাড়ি, জিনিসপত্র, এসব নিয়ে আমি কী করবো বলে দাও।'

মালবিকা ওই ভোরের আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সত্যিই কোনো অনুজ্ঞার প্রত্যাশা করছিলো, মালবিকার মধ্যে ঘুম আর জাগার একটা আচ্ছন্ন ভাব।

হঠাৎ আকাশের পৃষ্ঠপট থেকে চোখ নামিয়ে সে দৃষ্টি মাটিতে ফেলতেই চমকে উঠলো মালবিকা।

ওখানে কে ঘুরছে? ওই হাস্নুহানার ঝাড়টার নীচে? ক্ষুদ্র যে ফুলগুলির বা ফুলের গাছগুলির, মাদকতাময় মিষ্ট গন্ধ সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত আবিষ্ট করে রাখে, অথচ সকালের আলোয় কোথায় যায় হারিয়ে।

মালবিকা স্থির চোখে তাকিয়ে রইলো ব্রাহ্মমুহূর্তের যা কাজ তা সে করেছে নাকি?

মালবিকা দেখতে পেলো সেই ছায়া ওই ঝড়ের পাপ থেকে সরে গিয়ে হেঁটে চলেছে। যে চলেছে তার মাথাটা ঝুঁকে থাকা, পিঠটা একটু কুঁজো মত।

তবু, পিসি যদি আসে, সে তো নিজের মূর্তিতেই আসবে? পিসি তো ওই ছায়া মূর্তিটার সিকিও নয়। দেখতে দেখতেই ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কর্তব্যনিষ্ঠ সূর্যদেবের কুড়েমি নেই।

ও এতো ভোরে বাগানে কেন?

ভাবলো মালবিকা।

ও কি জানে আমি এই ছোট্ট সরু ঘরটায় শুতে এসেছি।

ও কি এই এখনই ঘর থেকে বেরিয়ে নেমে এসেছে? না, সারারাত ঘুরছে? এই বয়সে এরকম উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম কেন?

মালবিকা ভাবলো, আমি জানলা থেকে সরে যাই, নইলে ও হয়তো ভেবে বসবে আমি ওকেই দেখছি।

ভাবলো কিন্তু নড়লো না।

ওই ছায়াটা আসলে মধ্যবর্তী কেয়ারিকরা রাস্তাটুকুর উপর দিয়ে হাঁটাচলা করছে।

আচ্ছা, হঠাৎ যদি কথা কয়ে ওঠে ও?

কথা কয়েই উঠবে।

ছায়াটা এই দিকেই আসছে।

মালবিকা তো তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধ করে সরে আসতে পারতো?

মালবিকা বিদ্যুতের শক খাওয়ার মত দাঁড়িয়েই রইলো কেন?

রইলো বলেই না ছায়াটা এগিয়ে এলো, বললো, এতো ভোরে জেগে উঠেছেন?'

মালবিকা আস্তে বললো, 'আপনিও তো উঠেছেন।'

'আমি? মানে, আমি তো বলতে গেলে সারারাত ঘুমোই নি।'

'কেন?'

'কি জানি! ঘুম এলো না।'

মালবিকা মনে মনে বললো, তার মানে তোমারও আমার দশা হয়েছিল।

ভবভূতি একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। যেন নিঃশব্দ নির্জন কোনো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দর্শন করছে।

মালবিকাও তো রইলো তেমনি স্থির সৌন্দর্যের মূর্তি নিয়ে।

ভবভূতি একটু পরে বললো, 'ঝরণা দেখতে যাবেন?'

'ঝরণা?'

'হ্যাঁ, এখানের বিখ্যাত জলপ্রপাত। রীতিমত একটি নামকরা ব্যাপার! শুনতে পাই এখন আর তেমন নেই। যাবেন তো ভোরে ভোরেই বেরিয়ে পড়া হোক। ফেরার সময় আমার পিতামহীর নামাঙ্কিত সেই কুটিরটি দেখে আসা যাবে। পথেই তো পড়বে।'

ওরা যে পথটা ধরে চলতে শুরু করলো, সেদিকে বাড়ি-টাড়ি কম, যা-ও আছে তাও পোড়া বাড়ি। এ দেশের পেটেন্ট রূপ।

যদিও গরম কাল, তবু ভোরের দিকে একটা ঠাণ্ডা ভাব আছে। মালবিকা একটা পাতলা স্কার্ফ গায়ে গিয়েছে, মালবিকাকে ওইটার জন্যেই বোধহয় বেশ নম্র নম্র দেখাচ্ছে। মালবিকার চিবুকের গঠনে যে বেশ একটু সৌকুমার্য আছে, তা যেন এই আজই প্রথম আবিষ্কার করলো ভবভূতি!

'ঝরণা এখান থেকে কতো দূর?'

'বেশি না, এই তো সেদিন ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ঘুরে এলাম।'

'হাঁটা যাবে?'

ভবভূতি হেসে ফেলে বলে, 'পারলে যাবে, না পারলে যাবে না।'

'তার থেকে বরং আপনার বাড়িটাই আগে দেখি।'

'রোদ উঠলে হাঁটতে কষ্ট হবে।'

'একই ব্যাপার। একবার তো রোদ লাগবেই। মালবিকা বলে, 'সেটা কত দূর?'

'সেটা?'

ভবভূতি হাসলো, 'অনে—ক দূর।' তারপর বললো, 'ওই তো।'

মালবিকা চমকে তাকালো! দু'খানা বাড়ি পরেই।

'এ অনুপমা কুটির।'

এ বাড়ির গেট লোহার নয়, কাঁছের, কিন্তু বেশ মজবুত। হয়তো মেরামত হয়, মাঝে মাঝে। যথারীতি তার গা বেয়ে ওঠা মাধবীলতার তোরণে ফুলের গাছ। লালে ছেয়ে গেছে। রোদ না উঠলে জবার পুরো ফোটাটা বাকি থাকে, তাই তেমন চোখ ধাঁধাচ্ছে না।

পকেট থেকে চাবি বের করে গেট খুললো ভবভূতি।

মালবিকা দাঁড়িয়ে পড়ে বললো, 'কী আশ্চর্য! ঠিক ও বাড়িরই ছাঁচ। একেবারে এক প্ল্যান দুটো বাড়ির।'

ভবভূতি বললো, 'এখানে এ রকম মিল হয়তো অনেকই আছে।'

'তবু খুব অবাক লাগছে। ঠিক তেমনি সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে আসা—'

ভবভূতি গম্ভীর হাস্যে বলে, 'দু'বাড়ির মালিকের মধ্যে যে সৌহার্দ্য ছিলো, এটা তারই পরিচয় বহন করছে।'

ভবভূতি ঘরের তালা খুললো, 'কী ভাগ্যি যে খুললো। আমি ভাবছিলাম হয়তো বিশ্বাসঘাতকতা করবে।'

'এতোদিনের চাবি আপনার কাছে ছিল?'

'আমার কাছে?'

ভবভূতি মাথা নেড়ে বলে, 'মোটেই না। একদিন একটা পুরনো আলমারি গোছাতে গোছাতে, অর্থাৎ জঞ্জালমুক্ত করতে করতে, হঠাৎ দেখি একটা কৌটায় একটা চাবির রিং। এই তিন-চারটি চাবিসুদ্ধ। কৌটোটার মধ্যে একটু কাগজে লেখা রয়েছে 'অনুপমা কুটিরের চাবি।' তার সঙ্গেই বাড়ির 'দলিল'। বলবো কি, মনটা এতো খুশী লাগলো! তৎক্ষণাৎ ঠিক করে ফেললাম, দু'এক দিনের জন্যে গিয়ে 'অনুপমা কুটির' থেকে মুক্ত হবো। বরাবর জানা ছিল এখানে একটা বাড়ি আছে, অথচ কাজে লাগছে না, ব্যবহারে লাগছে না—কে জানতো পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়াবে!'

মালবিকা বললো, 'হয়তো অনুপমা কুটিরের অভিশাপে আপনি ওর ভার থেকে মুক্ত হতে চাইছেন—'

ঘরের তালা খোলার পর আরো দুটো বাড়ি সাদৃশ্য ততো চোখে পড়লো না। ঘরের সাজ-সজ্জা তো আর পঙ্কজিনী হালদারের ঘরের মতো নয়।

পর্দাবিহীন জানলাগুলো চেপেচুপে বন্ধ করা, ঘরের একটা দেওয়ালের ধারে একখানা সরু চৌকী, তার মুখোমুখি দেওয়ালে একখানা দাগ ধরা আয়না ঝুলছে, তার নীচে তে-ঠেঙে একটা টেবিল, তার গায়ে দুটো ড্রয়ার। ও কোণে একটা টুল।

'এই ঘরটায় বোধহয় অনুভূতি রায় বাস করতেন, নিঃসঙ্গ বিহঙ্গের মতো।'

বলে উঠলো ভবভূতি।

মালবিকা বললো, 'বাবার সম্পর্কে এভাবে বলছেন কেন?'

মালবিকার কণ্ঠে ভর্ৎসনার সুর। ভবভূতি কিন্তু লজ্জিত হলো না, বললো, 'এখন আমি তাঁকে আলাদা পরিপ্রেক্ষিতে দেখছি।'

'আচ্ছা এই ড্রয়ারটায় কি আছে? চাবি আছে?'

মালবিকার কথায় ভবভূতি ড্রয়ার দুটো টেনে দেখতে গেলো, খুলে গেলো। আশ্চর্য! একটাতে পুরুষের প্রয়োজনীয় প্রসাধনের একটি সেট। মলিন বিবর্ণ, ধুলি ধূসিরিত, তবু আছে সব। চিরুণী, শেভিং সেট, তেলের শিশি, ক্রীম, আরো কী সব খুঁটিনাটি। তার মানে শেষ পর্যন্ত সব গুছিয়ে রাখা ছিল।

অন্য ড্রয়ারটায় কিছু কাগজপত্র। ঝুরো ঝুরো, হলদেটে, পোকায় জীর্ণ।

'বন্ধ করুন, দেখে খুব খারাপ লাগছে।'

মালবিকা সেই ধূলোভর্তি চৌকাটায় বসে পড়ে হাতাশ গলায় বলে, 'হালদার কুটিরেরও একদিন এই অবস্থা ঘটবে।'

ভবভূতি একটু তাকিয়ে মৃদু গম্ভীর হাস্যে বলে, 'ইহ সংসারের পরমতম সত্যই তো এই। আচ্ছা ও ঘরটা দেখি।'

'ও ঘর' মানে হালদার কুটিরের যেটি 'গেষ্ট রুম।'

এ ঘরটা অপেক্ষাকৃত ভালো।

এ ঘরে একখানা খাট আছে, একটা জীর্ণ মলিন ইজিচেয়ার আছে, একটা বেঁকে ত্রিভঙ্গ হয়ে যাওয়া কাঁচের আলমারিতে কিছু পুতুল খেলনার ধ্বংসাবশেষ আছে এবং দেয়ালের ধারে ওর থেকেই কিছুটা শ্রী-যুক্ত একটা দেরাজ আছে।

'এ ঘরটা তাহলে কার ছিল?'

বললো মালবিকা।

ভবভূতি চারদিক তাকিয়ে বললো, 'অনুভূতি রায় যখন বিপত্নীক হননি, এটা বোধহয় ওঁর তখনকার ঘর। ওই দেয়ালে তার পরিচয় ঝুলছে।'

মালবিকা এগিয়ে গেল।

মালবিকা ঘাড় উঁচু করে নিরীক্ষণ করে দেখলো, দেয়ালে যে ফটোখানা ঝুলছে তার ধূলি আবরণের নীচে দুটি নরনারীর আবছা আভাস।

'আপনার মা-বাবার ছবি?'

'তাই মনে হচ্ছে!'

'পেড়ে দেখুন না।'

ভবভূতি ওর দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলে, 'দেখে কি হবে? ওই মহিলাটি আমার মা কিনা বুঝতে পারবো না। বাড়িতে কোনো ছবি নেই।'

'আপনি আপনার মাকে দেখেন নি?'

'দেখেছি নিশ্চয়ই। কিন্তু সেই স্মৃতি বিশ্বাসঘাতক!'

'বাড়িতে কোনো কিছু ছবি নেই?'

'না।'

'আশ্চর্য তো!'

'আশ্চর্যের কী আছে? সেকালের কত মেয়েরই এমন নেই।'

মালবিকা হঠাৎ বলে ওঠে, 'আচ্ছা ওই দেরাজাটার মধ্যে সেই কালো খাতাটা নেই তো?'

ভবভূতি চমকে উঠলো।

ভবভূতি যেন শিউরেই উঠলো। বলে ফেললো, 'কে বললে আছে?'

'আহা আছে তাতো বলছি না। বলছি নেই তো?'

ভবভূতি চমকে ওঠার জন্যে লজ্জা পেয়েই বোধহয় তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'আচ্ছা দেখা যাক। এর বোধহয় চাবি আছে রিঙে।'

তারপর ভবভূতি দু'তিনটে চাবি বদলেই চটপট দেরাজটা খুলে ফেলে।

'দেখুন দেখুন এতে কী?'

মালবিকা প্রায় চেঁচিয়েই উঠে। অথচ চেঁচিয়ে ওঠবার মতো কিছুই ছিল না। একদা যদি কোনো মহিলা বাস করে থেকে থাকেন এখানে, তাঁর পরিত্যক্ত দু'চারখানা শাড়িজামা পড়ে থাকা কী এমন আশ্চর্যের? তবু প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো মালবিকা।

'আপনার মার শাড়ি।'

ভবভূতি একটু উদাস হাসি হেসে বলে, 'তাই হবে হয়তো।'

আচ্ছা আপনার খুব অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে না?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আমার কিন্তু হচ্ছে। খুব যেন একটা ব্যাকুলতা বোধ করছি।'

'কেন বলুন তো?'

ভবভূতি জানলার ধাপটায় ফুঁ দিয়ে ধুলো উড়িয়ে বসে পড়ে বলে, 'কী হচ্ছে?'

'কি জানি। মনে হচ্ছে যেন কারুর অতৃপ্ত আত্মার দীর্ঘ নিঃশ্বাস জমা হয়ে আছে এই ঘরে, ওই দেরাজে, জিনিস-পত্রে।'

ভবভূতি উঠে পড়ে।

মালবিকার কাঁধের উপর একটা হাত রেখে বলে, 'চলুন বাইরে যাই। এই ভূতুড়ে ঘরে থাকবার দরকার নেই।'

মালবিকা অসহায়ভাবে চলে আসে ভবভূতির সঙ্গে।

ভবভূতি দরজাটা আবার চাবি বন্ধ করতে যাচ্ছিলো, মালবিকা জরুরি দরকারের গলায় বলে, 'বন্ধ করবেন না।'

'কেন? কেন আবার কী করবেন?'

'দেরাজের মধ্যেটা তো দেখা হলো না।'

'কী আর দেখবেন? ওই তো কিছু বিবর্ণ হয়ে যাওয়া কাপড়জামা—'

'ওর নীচে তো সেই খাতাটা থাকতে পারে!'

ভবভূতি একটু গভীর হাসি হেসে বলে, 'আমার বিশ্বাস, সে খাতা কোনখানেই নেই, রোগীর প্রলাপের মধ্যেই ছিলো শুধু।'

আপনার বিশ্বাসের সঙ্গে আমার বিশ্বাসের মিল হচ্ছে না।

'ঠিক আছে, দেখুন!'

ভারী দেরাজটা আবার খুলে দেয় ভবভূতি।

'দেখুন।'

মালবিকা ভয়ের গলায় বলে, 'না না, আপনি দেখুন। আপনার মা'র জিনিস—'

তলা অবধি দেখা হলো।

কিছু না।

একেবারে সব নীচে একখানা পুরনো তোয়ালে পাতা, তারও তলায় দু'একখানা পোস্টকার্ডের চিঠি, একটা হিসেবের খাতা, কয়েকটা নেহাৎ সাধারণ চুলের কাঁটা।

মালবিকা বলে, 'চিঠিগুলো পড়লে হয়তো বুঝতে পারতেন কার—'

ভবভূতি হেসে ফেলে বলে, 'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমরা যেন টিকটিকি পুলিশ, কোনো চুরির কিনারা করতে এসেছি।'

মালবিকা বলে, 'শুনে হাসবেন না, আমার যেন সেই রকমই মনে হচ্ছে। কেন বলুন তো?'

ভবভূতি বলে, 'বাইরে বেরিয়ে পড়ুন, বলছি তারপর?'

বেরিয়ে এলো এবার দরজার তালা লাগিয়ে, গেটে তালা লাগিয়ে। বাইরের বাতাসে নিঃশ্বাস নিলো বুকটান করে।

ভবভূতি বললো, 'পোড়ো বাড়িতে টাড়িতে ওরকম হওয়া স্বাভাবিক। বদ্ধ বাতাসের মধ্যে একটা গা ছমছমে ভাব থাকে। তাছাড়া ওই সব ব্যবহার করা জিনিসটিনিস দেখে—'

ভবভূতি হাসে, 'আরে কে জানে বাড়িটা সত্যিই এখন ভূতুড়ে হয়ে গেছে কিনা। তা নইলে চোরটোরই বা আসে না কেন? চোরে তো এসব নিয়ে যেতে পারতো!...না, বেশি বলবো না, আপনি আবার ভয় পাবেন।'

মালবিকা লজ্জা পেলো।

বলে উঠলো, 'আহা আমি যে একটা বাচ্চা! ওই যা বললেন, বদ্ধ বাতাস একটু খারাপ লাগছিল।...চোর আসেনি তা ভাববেন না। তারা যা নেবার ঠিকই নিয়ে গেছে। বাড়িতে বাসন বলতে কিছু দেখলেন? বিছানাপত্র? সে সবের চিহ্ন মাত্র নেই।'

'আপনাদের মেয়েদেরই ওই টিকটিকি পুলিশে লাগিয়ে দেওয়া উচিত। এটা আমার মোটেই গোচরে আসতো না। কিন্তু কাপড়-টাপড়গুলোই বা—'

'ওটা খুব সম্ভব খুলতে পারেনি।'

'চলুন এবার চটপট ঝরণার দিকে যাওয়া যাক। যদিও রোদ উঠে যাচ্ছে।' বললো ভবভূতি।

মালবিকা দাঁড়িয়ে পড়ে বললো, 'আজকে ঝরণা দেখতে না গেলে হয় না?'

ভবভূতি একটু থেমে গিয়ে মালবিকার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'কেন হবে না? খুব হয়। কোনোদিনই না গেলেও হয়।'

'আপনি রাগ করছেন?'

'কেন? রাগ করতে যাবো কেন? আসলে ঝরণাও এমন কিছু আহামরি নেই আর।'

'আচ্ছা, যাকগে দেখেই ফিরি।'

'উঁহু! 'না' যখন হয়ে গেছে, তখন 'না'। একবারে পাকাপাকি—না।'

অতএব বাড়ি ফেরার পথই শ্রেয়।

'আচ্ছা কাল রাত্রে অতো ট্রাঙ্ক বাক্সো নিয়ে নাড়ানাড়ি করছিলেন কেন বলুন তো?'

মালবিকার মুখটা সহসা সাদা হয়ে যায়। মালবিকা চকিত গলায় বলে, 'কে বললো?'

'ও কী? আপনার কী হলো? সব কিছুতেই ভূত দেখছেন কেন?'

'আহা! যতো সব বাজে কথা!'

'বাজে বলে ওড়াচ্ছেন, কিন্তু আসলে আপনি কোনো কিছুতে ভয় পাচ্ছেন। সেই ভয়টাই ছোঁয়াচে অসুখের মত সব কিছুতে ছড়িয়ে পড়ছে। দরজায় ট্রাঙ্ক চাপিয়ে রাখতে হয়েছিল কাব ভয়ে?'

মালবিকা স্পষ্ট পরিষ্কার গলায় বললো, 'নিজের!'

'বলছো? নিজেই বললে?'

ভবভূতি ওব পিঠে একটা হাত রেখে বলে, 'তুমি' বলে ফেললাম বিনা পারমিশানে।'

ভবভূতি পথ চলতে চলতে কোনো একটা বুনো ফুলের গাছ থেকে একগোছা হালকা রেশমের মত ফুল তুলে মালবিকার খোঁপায় গুঁজে দিয়ে বলে, 'এইটা রইলো।'

মালবিকা ওই চুলের ফুলটাকে নিয়ে হঠাৎ ভারী ব্যস্ত হয়ে উঠলো। মাথা নীচু করে সেটাকে ভালো করে চুলে আটকাতে বসলো।

ভবভূতি বললো, 'কথার জবাব দেওয়া হলো না যে? তাহলে কি ধরে নিতে হবে—রাগ?'

'আপনি' 'তুমি' বাদ দেওয়া এই কথার কৌশলে হেসে ফেললো মালবিকা। বললো, 'জবাবের কী আছে? কোন্‌টাই বা পারমিশান নিয়ে হচ্ছে। বিনা পারমিশানে তো অনেক কিছুই চালাচ্ছেন।'

ভবভূতি দাঁড়িয়ে পড়লো। কৌতুকের হাসি মুখে মেখে বললো, 'তাই না

কি? আমি তো সেটা বুঝতে পারিনি। আচ্ছা বলো তো একে একে, বিনা অনুমতিতে কী কী অপরাধ সংঘটিত হয়েছে এই হতভাগা ভবভূতি রায়ের দ্বারা?'

'জানিনা। অপরাধ সংঘটনের জন্যে অনুমতি লাগে না। চলুন ভীষণ রোগ হয়ে যাচ্ছে—'

ভবভূতি বললো, 'চলো, শুধু এই রাস্তা থেকেই নয়, এই দেশটা থেকেও। আর বসে থাকা পাগলের কাজ হবে।'

মালবিকা একটি গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'স্বয়ং বিধাতাপুরুষও মাঝে মাঝে পাগলের মতো কাজ করে বসেন কিনা, মানুষকেও তাই তাঁর খাপে খাপ্ খাওয়াতে—'

ভবভূতিও একটা নিঃশ্বাস ফেললো! বললো, 'হঠাৎ কী মনে হলো জানো? আমরা যেই গিয়ে গেট ঠেলে ঢুকবো, বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে থাকা একটি সাদা কাপড় পরা মানুষ বলে উঠবে, এতো দেরী হলো কেন তোমাদের? এতো দেরী?'

মালবিকা অবাক চোখে তাকিয়ে বললে, 'আশ্চর্য!'

'আশ্চর্য? কী আশ্চর্য?'

আমারও ঠিক এইমাত্র ওই কথাই মনে হচ্ছিলো। যেন দেখতে পাবো, যেন বলে উঠবেন, 'খুকু, এ তোমার ভারী অন্যায়! চা-টা না খেতে দিয়ে ওঁকে এই রোদে—'

আস্তে গেট খুলে ঢুকলো দুজনে, চকিতে একবার বারান্দায় চোখ বুলিয়ে নিলো, দেখতে পেলো শূন্য চেয়ারটা যেন ঘোষণা করছে ওর মালিক নেই, মালিক আর কোনোদিনই আসবে না।

মনে হচ্ছিলো এখান থেকে যাওয়াটা বুঝি খুব একটা জটিল ব্যাপার হবে, বুঝি তার জন্যে লাগবে অনেক খাটুনি অনেক ব্যবস্থা।

কিন্তু প্রস্তুত হতে গিয়ে দেখলো, কিছুই করবার নেই।

ভবভূতির সঙ্গের ছোট্র সুটকেসটা গোছাতে দু'মিনিট লাগলো, মালবিকার অপেক্ষাকৃত বড় সুটকেসটা গুছিয়ে নিতে কয়েক মিনিট।

ক্লিষ্ট-ক্লান্ত বংশী আস্তে আস্তে সবই একত্র করে রেখে গেছে, মালবিকার যেখানে যা ছিলো। শাড়ি, জামা, রুমাল, তোয়ালে, মায় সেই ঐতিহাসিক ওয়াটার বট্‌লটাও!

যার সূত্রে ভবভূতি নামের ওই লোকটা হঠাৎ মালবিকার জীবনের সঙ্গে এমন জড়িয়ে গেলো যে বিশ্বাস হচ্ছে না, কোনোদিন ও মালবিকার জীবনে ছিলো না।

বংশী সম্পর্কে এরা ভাবতে বসেছিল, কী করবে ও? দেশে চলে যাবে, না মালবিকাই সঙ্গে নিয়ে যাবে ওকে?

কিন্তু কানে-খাটো, জীর্ণদেহ, মন্থরগতি বংশী, ওদের ভাবনাকে নস্যাৎ করে দিলো।

বললো, আমি আবার কোথায় যাবো দিদিমণি? আমার কি আর কোথাও যাবার যো আছে?

কেন জো নেই, সে প্রশ্ন ওঠে না।

মিসেস হালদারের এই বাড়িটা ছেড়ে বংশীর কোথাও যাবার জো নেই, এ হচ্ছে শেষ কথা।

বংশীকে তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই বাড়ির তদারকী করতে হবে।

বংশীকে যথানিয়মে ভোরবেলায় উঠতে হবে, বাড়িখানাকে ধুয়েমুছে সাফ্ করতে হবে, বাগানে ছড়িয়ে পড়ে থাকা প্রতিটি শুকনো পাতা কুড়িয়ে ফেলে দিতে হবে, বাড়ির সমস্ত আসবাবপত্রগুলি ঝাড়ন দিয়ে মুছে মুছে ধূলো শূন্য করতে হবে। বংশীকে হালদার মেমসাহেবের খাটের বিছানাটি সব সময় টান টান করে পেতে রাখতে হবে, আর সপ্তাহে একদিন করে সাবান কেচে ফর্সা করতে হবে।

বংশীকে বাগানের আর টবের সমস্ত গাছগুলিকে জল দিয়ে দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, গেটের কব্জায় মাঝে মাঝে তেল দিয়ে ঠিক রাখতে হবে। বংশীকে দেখতে হবে জানলা দরজার কোথাও উঁই ধরছে কিনা, দেওয়ালে ঝুলকালি হচ্ছে কিনা।

বংশীকে সকালবেলা বাড়ির সব জানলাগুলি খুলে দিতে হবে, রোদ চড়া হয়ে উঠলেই বন্ধ করে ফেলতে হবে।

আর বংশীকে দুটি বেলা যথা নির্দিষ্ট সময়ে বারান্দায় বেতের টেবিলের উপর চায়ের সরঞ্জামগুলি সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখতে হবে, হাতে বোনা লেসের ঢাকনি ঢাকা দিয়ে।

শুধু পাত্রগুলো থাকবে বংশীর হৃদয়টার মতোই খাঁ খাঁ করা শূন্য।

শূন্যহৃদয় বংশী সেই শূন্য পাত্রগুলির সামনে এককোণে বসে বসে ভাববে,

মারা যাওয়ার ঠিক আগের দিন হঠাৎ ঘড়ি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হালদার মেমসাহেবের চা খেতে দেরী হয়েছিলো!

চা খেতে একটু দেরী হয়ে গেলে মাথা ঝিম্‌ঝিম করতো মেমসাহেবের, কে বলতে পারে সেই মাথা ঝিম্‌ঝিমিটাই মৃত্যুকে ডেকে আনলো কিনা।

এই ক'দিনের মধ্যে কতবারই যে বংশী ঘড়িটার কাছে গিয়ে মাথা খুঁড়েছে।

এ স্টেশনে গোলমাল হট্টগোল কিছুই নেই, হাওড়া স্টেশনের দেশের লোকের পক্ষে একে স্টেশন বলতেই হাসি পাবে, তবু ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার পর ওদের মনে হলো যেন অনেক যুদ্ধ শেষে এইবার শিবিরে এসে ঢুকলো।

জীবনের উপর দিয়ে কী প্রবল ঝড় বয়ে গেলো! যেন জীবনের মূল পর্যন্ত আমূল বদলে গেলো। অথচ ভাবতে অবাক লাগছে, সেদিনের সেই দুজনে একই রেলগাড়িতে চাপার দিন থেকে আজকের মধ্যে মাত্র সতেরোটা দিন-রাত্রি চলে গেছে। মনে হচ্ছে যেন কতো সুদীর্ঘকাল কেটে গেছে।

'আবার সেই রেল গাড়ির একই কামরায়—'

বললো মালবিকা।

ভবভূতি হেসে বললে, 'আবার সেই জ্বালাতন।'

'তাইতো!'

এবার ওরা ফার্স্ট ক্লাশ একটা কামরায় উঠেছে।

ভবভূতিই বলেছে, 'এই সুদীর্ঘকাল ধরে অনেক দুঃখ, অনেক ক্লেশ, অনেক কর্মের, অনেক ধর্মের ইতিহাস পার হয়ে আজ এইখানে এসে দাঁড়িয়েছি, আজ আমাদের দাবি রয়েছে একটু আরাম করবার।'

'করুন আরাম!'

বলেছিল মালবিকা, প্রতিবাদ করেনি অকারণ বেশি খরচার জন্য। হয়তো মনে মনে ভেবেছে, মুখে কিছু বলেনি।

এখন ভাবছে ভাগ্যিস ভবভূতি বুদ্ধিটা করলো।

কয়েকটা মাত্র টাকার বিনিময়ে এই নিরঙ্কুশ রাজ্য-পাটটি পাওয়া গেল।

এ কামরায় ওরা দুজন ব্যতীত আর কেউ নেই।

'এমন হয় না—' মালবিকা বললো, 'আমার ভাগ্য।'

'আমাদের'—না বলে আমারই বললো।

কিন্তু দুর্লভ সুযোগটুকু কি ওরা কাজে লাগাতে পারছে?

পারলে—কই, ওদের মুখে প্রেমের কথা কই?

ওরা তো একেবারে সাদামাঠা কথা কইছে।

'বংশীটার জন্যে এতো কষ্ট লাগছিল! বেচারী এমন ভাবে গেট ধরে দাঁড়িয়েছিল!'

বললো ভবভূতি, যেন চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছে দৃশ্যটা।

দেখছে—

বংশীর মুখে কথা নেই, বংশীর চোখেও জল নেই। বংশী ওদের ঠিকমতো খাইয়ে টাইয়ে দিয়েছে, বংশী একটাও অভিযোগ বাণী উচ্চারণ করেনি।

বংশী শুধু বলেছিল, যতোদিন এ শরীরে প্রাণ থাকবে, ততোদিন হালদার মেম সাহেবের একটি সুতোও এদিক ওদিক হবে না।'

বংশীই ওদের হাতে একগোছা কাগজ পত্রের বাণ্ডিল তুলে দিয়েছিল।

বলেছিল, 'এই অবধি বুকে করে আগলে রেখেছিলাম দিদিমণি, এবার তুমি তোমার নিজের সংসার পাততে যাচ্ছো, স্থিতু হয়ে বসবে, তোমার হাতে তুলে দিলাম।'

ভবভূতি বলেছিল, 'কিন্তু বিয়েটা তো তোমার দেখা দরকার বংশী।'

বংশী কপালে হাত ঠেকিয়েছিল, 'সে আর এ ভাগ্যে হবে না দাদাবাবু।'

'কিন্তু এসব কাগজ-পত্র কিসের রে বংশী? তোর কাছেই থাকতো না কি?'

মালবিকার কথার জবাবে বংশী বললো, 'কিসের তা তোমরাই ভালো বুঝবে দিদিমণি? মুখ্যু বংশীর কী ক্ষ্যামতা যে বলে কিসের সেই 'কাল' দিনে, যখন মেমসাহেবকে ডেকে ডেকে সাড়া না পেয়ে আপনাদের ডাকতে ছুটলাম, তখন দেখলাম, মেমসাহেবের বিছানায় এ সব ছড়ানো। মনে হলো যেন সব বার টার করে হিসেব নিকেশ করতে বসেছিলেন। ভেতরে ভেতরে বোধহয় টের পেয়েছিলেন।....মুখ্যু বংশী আর কিছু না বুঝুক, জিনিসটা দরকারী তা বুঝেছিল দিদিমণি, তাই সব গুটিয়ে পাটিয়ে তুলে রেখে তোমাদের ডাকতে গিয়েছিলাম।...ওঁর একখানা খাতাকে আমি চিনি, মাসে মাসে ওটাকে নিয়ে বেরিয়ে যেতেন মেমসাহেব, কোথা থেকে যেন টাকাকড়ি নিয়ে আসতেন ওটা দেখিয়ে।'

ব্যাঙ্কের পাস-বইটাকে আলাদা করে দেখিয়েছিল বংশী।

ভবভূতিকে দিতে আসছিল বংশী, ভবভূতি বলেছিল, 'আমাকে কেন বাবা, আমি কে? তোমার দিদিমণিকে দাও।'

তখন বংশী তার হাসি ভুলে যাওয়া মলিন মুখে একটু হেসে বলেছিল, 'দুইয়ে' আর তফাৎ কী দাদাবাবু? একজনকে দিলেই দু'জনকে দেওয়া।'

এরা কতো সহজ হিসেবের মধ্যে মনকে পরিচালনা করে!

ভেবেছিল ভবভূতি।

পঙ্কজিনী হালদারের এই সুন্দর সভ্যভব্য ভাবে থাকা বাবদ যে ব্যয় হতো, তার আয়টার হিসেব পাওয়া গেল।

অনেক কিছুর শেয়ার ছিল পঙ্কজিনীর, তার খবর মিলছে। গেঞ্জির কলের, কাপড়ের কলের, চিনির কলের। এর থেকে একটা উপস্বত্বের নিয়মিত ব্যবস্থা ছিল।

পঙ্কজিনীর কোনো হিতৈষী ব্যক্তি যে এসব করিয়ে দিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

আর এক হিতৈষী ব্যক্তি বংশী এসবের মর্ম বুঝে তাড়াতাড়ি তুলে ফেলেছিল। সবগুলোকেই অল্প-বিস্তর চেনে বংশী!

কিন্তু ওইটাকে কোনোদিন দেখেনি বংশী। ওই মোটাসোটা সুন্দর খাতাখানাকে।

কালো কাপড়ে বাঁধাই।

কী অদ্ভুত লেগেছিল ওদের! ওরা যখন সেই 'কালো খাতা' শব্দটাকে 'ভুল বকা' খাতায় ফেলে দিতে বাধ্য হয়েছে কোথাও খুঁজে না পেয়ে, তখন কিনা সে খাতা 'বংশী' নামের তুচ্ছ মানুষটার ভাঙা টিনের প্যাঁটরায় ভরা ছিল।

মুখে যতোই বলুক বংশী, সে তাড়াতাড়ি ওসব তুলে রেখেছিল, পাড়ার পাঁচজন আসবে, ডাক্তার বদ্যি আসবে, কোথাকার জিনিস কোথায় ছিটকে যাবে এই ভয়ে, কিন্তু আসল কথাটি যে তা' নয়, সে কথা এরা বুঝেছিল বৈকি। বংশী এদের প্রতিই সন্দেহশীল ছিল। কে বলতে পারে, মেমসাহেব অচৈতন্য অবস্থার সুযোগে এরা কিছু হাতিয়ে ফেলবে কি না।

তার থেকে বংশীর কাছেই থাক। মেমসাহেবের যখন চৈতন্য ফিরবে, তখন তাঁর হাতে তুলে দেবে বংশী। বলবে, 'এই ন্যান আপনার কাগজপত্তর। ছড়িয়ে মড়িয়ে একাকার করে জ্ঞান হারিয়ে পড়েছিলেন!'

বংশী একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হাসবে।

কিন্তু সেই হারিয়ে যাওয়া চৈতন্য যখন আর ফিরে পেলেন না মিসেস

হালদার নামের চিরসচেতন মানুষটি, তখন বংশীর আর কী উপায় থাকলো?

আত্মপ্রসাদের হাসি হাসবার আর মুখ থাকলো কোথায় বংশীর?

তাছাড়া এদের হাতে দেবে না তো কি দত্ত মেমসাহেব অথবা ঘোষ, বোস, মল্লিক সাহেবদের হাতে তুলে দিতে যাবে?

এতো তবু হালদার মেমসাহেবের আপন লোক। রক্তের সম্পর্ক। হয়তো বংশী এখন সেই দিনের আশায় দিন গুনবে, যেদিন কোনো এক অদৃশ্যলোকে গিয়ে হাত জোড় করে বলতে পারবে,—'মেমসাহেব! মুখ্যু বংশী, এছাড়া আর কী করতে পারতো?'

এখন ট্রেন চলছে।

এখনো গাড়িতে আর কেউ ওঠেনি।

মালবিকা সুটকেস খুলে সেই ঐতিহাসিক কালো খাতাকে টেনে বার করলো।

মৃদু হেসে বললো, 'আমার কিন্তু মলাট খুলতেই ভয় করছে—'

'তোমার তো সব কিছুতেই ভয়...তুমিই পড়োনা আগে। তোমার পিসিমার কি গোপন ডায়েরী—'

মালবিকা ওর দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে মৃদু হেসে বললো, 'আপনারও সমান ভাগ, এই দেখুন—'

প্রথম পৃষ্ঠা খুলে সামনে ধরলো ভবভূতির।

পরপর দুটি নাম লেখা রয়েছে, দুজনের হাতের অক্ষরে।

শ্রীমতী পঙ্কজিনী হালদার।

শ্রীভবভূতি রায়।

'তার মানে আপনারও সমান শেয়ার।'

'আচ্ছা তোমার শেয়ারটা তুমি আগে তুলে নাও—'

হাসলো ভবভূতি।

মালবিকা লেখায় চোখ রাখলো—

সন তেরশো একুশ সাল। ষোলই জ্যৈষ্ঠ। গত কয়েকদিন লিখিবার অবকাশ পাই নাই। হালদার সাহেব গত হলেন।....এখন আমার পরিচয়, হালদার সাহেবের বিধবা, এই মাত্র।...কিন্তু এই কী আমার সত্য পরিচয়? যদি সত্য হয়,

তবে আমি ভাঙিয়া পড়িতেছি না কেন? আমার মনে হইতেছে না কেন, সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হইয়া গেল? কেন মনে হইতেছে না আজ হইতে আমার সব ফুরাইল? সকলের যা হয় আমার তা' হইল না কেন?

সাতাশে আষাঢ়।

স্বামীর বন্ধু অনেক থাকে, আছেও, কিন্তু শ্রীযুক্ত অনুভূতি রায়ের সহিত কাহারও তুলনা হয়? এই এক আশ্চর্য মানুষ দেখিলাম।

অনুভূতি রায় আমার হৃদয়ের অনেক অজানা অনুভূতির স্বাদ চিনাইয়াছেন! কাহাকেও দেখিবামাত্র যে হৃদয়ে এমন আলো জ্বলিয়া উঠিতে পারে, একথা কে কবে জানিত?

কাহাকেও দেখিলে যে সমস্ত শরীর মন পূজার ফুলের মত পবিত্র হইয়া উঠিতে পারে, এ কথা কে কবে ভাবিয়াছে?

কিন্তু আমার কি পাপ হইতেছে? আমি বিধবা, আমার এই আনন্দ, এই ব্যাকুলতা, ইহা কি পরপুরুষের প্রতি আসক্তির পর্যায়ে পড়ে না?

কিন্তু আমি কি করিব?

উনিই তো আমার বল ভরসা। উনি না দেখিলে একা বিধবা, এই টাকার রাশি লইয়া কি করিতাম?....অনুভূতিবাবুর হাতে সব তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি।

জানি আমার যাহাতে মঙ্গল, তিনি তাহাই করিবেন।....যাই, বোধহয় তিনি আসিলেন। বাহিরে দরজায় শব্দ হইল।

'এ শব্দ শুধু ওই তুচ্ছ কাঠের দরজাটাই নয়।'

মালবিকা মুখ তুলে বলে, 'আশ্চর্য! ঠিক এ রকমটি ভাবিনি।'

'বৃহস্পতিবার, ফাল্গুন। আজ কি তারিখ মনে নাই। আজকাল যেন কিছুই মনে থাকে না, সবই কেমন ছায়া ছায়া ভাসা ভাসা। এরূপ কেন হয় বুঝিতে পারি না। কোন কিছু মনে পড়াইতে হইলে অনেকক্ষণ ভাবিতে হয়।...

অনুভূতিবাবু বলেন, একটি বড় শোকের পর এরকম হয় বা হইতে পারে। কিন্তু? হ্যাঁ, কিন্তু ভাবিতেছি সত্যই কি আমার খুব বেশি একটি শোক হইয়াছে? কই তেমন তো বুঝিতে পারি না। অল্প বয়সে আমি আমার এক মামার মৃত্যু দেখিয়াছিলাম, অর্থাৎ মামীর শোক দেখিতে হইয়াছিল। কী দুরন্ত সেই শোক!

মামী প্রতিদিন মাথা কুটিতেন, বুক চাপড়াইতেন এবং চিৎকার করিয়া

কাঁদিতেন, দেখিয়া আমি দারুণ ভয় পাইতাম। কই আমি তো কোনোদিন তেমন তীব্র যন্ত্রণা বোধ করি নাই। আমি কি তাহা হইলে আমার মামীর ন্যায় সতী নই?

কিন্তু যন্ত্রণাবোধ না আসিলে আমি কি করিব? হালদার সাহেবের জন্য যে অভাব বোধ করিব, তাহার হেতু কোথায়? তাঁহার সহিত আমার কতটুকু সম্পর্ক ছিল? তিনি তো সর্বদাই নিজ কাজকর্ম ব্যবসা ইত্যাদি লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। আমার সঙ্গী বলিতে আমার পিতৃগৃহ হইতে আসা আমাকে শৈশব কালে 'মানুষ করা' দাসী সুরবালা। সুরবালাকে আমি দিদি ডাকি। সে একাধারে আমার সেবিকা, পালিকা, আবার অভিভাবিকা।

তবে সুরবালা ইদানীং সর্বদা বিরক্তি প্রকাশ করে এবং দেশে চলিয়া যাইতে চাহে। আসল কারণ, সে অনুভূতিবাবুকে দেখিতে পারে না। ওঁকে আসিতে দেখিলেই আড়ালে আসিয়া গজগজ করে, 'এ্যাখনো উনি অ্যাতো আসে ক্যানো? যার সাথে বন্ধুতাই ছেলো তিনি তো আর নাই, এ্যাখোন কিসের সুবাদে? বেধবা মেয়েছেলের কাছে ওর অ্যাতো কী কাজ? অনুভূতিবাবু যে কত কাজের ভার মাথায় লইয়াছেন, তাহা ওই মূর্খ বৃদ্ধাকে কী বুঝাইব? আমার স্বামীর যে ব্যবসা-বাণিজ্যের জাল চারিদিকে জড়ানো ছিলো, তাহা গুটাইয়া তুলিয়া সব টাকা আমার হাতে তুলিয়া দিবার ইচ্ছা বা ক্ষমতা আর কাহার হইত? পিতা নাই, ভ্রাতা থাকিয়াও নাই, পতিকুলের দূর সম্পর্কের যাহারা আছে তাহারা তো হালদার সাহেবের প্রতি চিরদিন বিরূপ। আমাকে বিবাহ করাই এই বিরূপতার কারণ। আমি বিদুষী আমি বয়স্থা, আমি সুন্দরী এবং আমি লজ্জাবতী লতা নহি, এতোগুলি দোষসম্পন্না কন্যা বিবাহ করিয়া আমার স্বামী আত্মীয় সমাজে পতিত হইয়াছিলেন। অতএব তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সেই স্ত্রীকে কেহ 'দেখিবে' এ আশা বাতুলতা।

তাছাড়া—

আমি দেখিয়াছি হালদার সাহেব টাকা কড়ির ব্যাপারে জগতে কাহাকেও বিশ্বাস করিত না, বাদে অনুভূতিবাবু। বলিতেন, 'ওই একমাত্র লোক, যে একটি পাই পয়সাও এদিক ওদিক করিবে না।'

তবে?

আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আর কোনো আত্মীয়ের শরণাপন্ন হইতে যাইব? তিনি আমার পরম বিশ্বাস ভাজন হিতৈষী বন্ধু।

অনুভূতিবাবু বলেন, আমার মতো বয়সের একজন বিধবার কলিকাতা শহরে একা একটি বাড়িতে বাস করা নিরাপদও নয়, সম্ভবও নয়। সঙ্গত তো নয়ই। অতএব উনি আমার কলিকাতার বাড়িটি বিক্রয় করিয়া দিয়া কোনো *মফস্বল জায়গায়, যেখানে ভালো পরিবেশ ও সম্ভ্রান্ত প্রতিবেশীর বাস, সেখানে* একটি বাড়ি করিয়া দিবার মনস্থ করিয়াছেন। সেখানে একা স্ত্রীলোকের থাকার অসুবিধা নাই। এমন অনেকেই থাকেন। জায়গাটি নির্বাচিতই আছে।

অনুভূতিবাবুর সাঁওতাল পরগণার কোনো শহরে নিজের একটি জমি আছে, হালদার সাহেবের সহিত পরামর্শ ছিলো তিনিও একটু জমি সংগ্রহ করিয়া দুই বন্ধুতে একই জায়গায় এক একটি বিশ্রাম নিকেতন নির্মাণ করিবেন। হালদার সাহেবের ইচ্ছানুযায়ী কাজই হইবে। জমি সেইখানেই কেনা হইয়াছে।'

আশ্বিন, ১৩২২ রবিবার।

আজ অনুভূতিবাবু বলিয়া গেলেন, একত্রে দুইখানি বাড়িই শুরু হইয়াছিল, এবং দুইখানিই শেষ হইয়াছে! এখন আমার কলিকাতার চাটিবাটি তুলিয়া চলিয়া যাওয়ার ওয়াস্তা।

শুনিয়া পর্যন্ত প্রাণের মধ্যে আনন্দের সহিত একটি বিষাদের সুর বাজিতেছে। আনন্দ এই কারণে, এই নিত্য পরিচিত বৈচিত্র্যহীন জায়গা হইতে একটি নতুন জায়গায় যাইব, সেখানে নাকি ছবির মতো নতুন বাড়ি, সামনে বাগান এবং প্রতিবেশীরা সকলেই সুরুচি সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত। সেখানে একজন মহিলাকে একা থাকিতে দেখিলেও কেহ সেটিকে নিন্দার বিষয় বলিয়া মনে করে না, যাহা এখানে করে, করিতেছে।

কিন্তু—

বিষাদের কারণ এই, সেখানে তো অনুভূতিবাবুকে এভাবে প্রতিদিন দেখিতে পাইবে না। তাঁহার কলিকাতায় কাজকর্ম, চাকরী-বাকরী, স্ত্রী পুত্র পরিবার সবকিছুই। হয়তো মাঝেমধ্যে ছুটিছাটায় তিনি তাঁহার মাতৃ-নামাঙ্কিত 'অনুপমা কুটিরে' বেড়াইতে চাইবেন। আমার মাসিক ব্যয়ের জন্য তিনি নানাবিধ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, যাহাতে হালদার সাহেবের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতেই তাঁহার বিধবা পত্নীর আজীবন ভরণপোষণ সম্ভব হয়। এত কে করত?

আমার আর অভিযোগের কিছুই নাই। তবু কেন জানি না মন বিষণ্ণ হইয়া পড়িতেছে। নিজেকে সহায়হীনা মনে হইতেছে।'

অনুভূতিবাবুর স্ত্রী শুনিয়াছি অত্যন্ত গোপন স্বভাবের মহিলা, তিনি এই

একই স্থানে দুইজনেরই বাড়ি নির্মাণের সংবাদে না কি এত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন যে, মনে হয় অনুভূতিবাবুকে সেখানে মাঝে মধ্যে যাইতে দেখিলেও রাগারাগি করিবেন!.... অথচ যাইলে তো তিনি আলাদা বাড়িতেই থাকিবেন?

'আশ্বিন' বুধবার।

আজ একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল। বলিতে গেলে আমার জীবনে একটা ঝড় বহিয়া গেল। আমি তো স্বপ্নেও ভাবি নাই এমন একটা ঘটনা ঘটিতে পারে। আজ আমার বাড়িতে অনুভূতিবাবুর স্ত্রী আসিয়াছিলেন। বেলা তখন তিনটা, দেখি একজন লম্বা চওড়া চেহারার সুন্দরী মহিলা আসিয়া উপস্থিত। জীবনে কখনো তাঁহাকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না, তবু কী আশ্চর্য সেই মনই বলিয়া উঠিল, ইনি বোধহয় অনুভূতিবাবুর স্ত্রী! কেন এমন হইল জানি না!

তবু আমি অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিলাম!

তিনি ক্রুদ্ধ গলায় বলিয়া উঠিলেন, 'আপনি সেই বিখ্যাত মিসেস হালদার?'

আমি আরো অবাক হইলাম। আমি আবার 'বিখ্যাত' হইলাম কিসে?

কখনই বা হইলাম?

মহিলাটি বিদ্রূপের গলায় কহিলেন, 'ওই তো রোগা পাকাটি, চড়াই পাখির মতো চেহারা এতই এতো আকর্যণ!'

আমার আর সন্দেহ রহিল না। কিন্তু ছিঃ ছিঃ এ কি কথা! লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাইল।

তথাপি কোনো কঠিন উত্তর না দিয়া কহিলাম, 'বসুন।'

মহিলাটি আরো তিক্ত গলায় কহিলেন, 'আমি এখানে বসতে আসিনি। জানতে এসেছি তুমি একা যাবে, না সেই শয়তানও তোমার সঙ্গে যাবে? তো বোলো তাকে—'

ভদ্রমহিলা রাগে হাঁফাইতে থাকিলেন।

প্রথম আলাপে 'তুমি' শুনিয়া আমি যারপরনাই দুঃখিত হইলাম। তাছাড়া— কথাবার্তায় কী রূঢ় ও রুক্ষভঙ্গী। অপমান করিবার সঙ্কল্প লইয়াই আসিয়াছেন, এ কথা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

আমি দুঃখিত হইলাম কিন্তু নিজের আপমানের জন্য নহে, দুঃখিত হইলাম অনুভূতিবাবুর ভাগ্য দেখিয়া।

অমন দেবোপম চরিত্রের মানুষের এই স্ত্রী! এই রূঢ়, রুক্ষ, কটুভাষিণী মহিলাটি!'

খাতাখানার পাতা উল্টে যাচ্ছিলো মালবিকা, ভবভূতিও যে কখন খুব কাছাকাছি সরে এসে সেই পাতায় চোখ ফেলেছিল, মালবিকা টের পায়নি!

টের পায়নি ভবভূতির বাহুমূল মালবিকার বাহুমূলে ঠেকেছে, ভবভূতির উত্তপ্ত নিঃশ্বাস মালবিকার গায়ে এসে লাগছে।

টের পেলো তখন, যখন ভবভূতি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বেজার গলায় বলে উঠলো, 'ভীষণ টায়ার্ড লাগছে, আমি একটু শুয়ে পড়ছি।'

'শুয়ে পড়ছেন!'

মালবিকা অবাক হলো।

ভবভূতি বললো, 'হুঁ! কম ধকল তো গেল না শরীরের ওপর দিয়ে।' এই কথাটা আরো বিরক্ত সুরের। মালবিকা আহত হলো, আপমানিত হলো।

ভবভূতির কণ্ঠে যেন এই সুরই ধ্বনিত হলো, এতো ধকল সইবার দায় তার ছিলো না, কর্তব্যও ছিলো না, কেবলমাত্র মালবিকার জন্যেই—

মালবিকা গম্ভীরভাবে বললো, 'তা বটে !'

কিন্তু ভবভূতি বোধহয় সেটা শুনতে পেলো না, ততক্ষণে লাফিয়ে আপার বার্থে উঠে লম্বা হয়েছে। মালবিকার মনে পড়লো না অনুভূতি রায়ের স্ত্রী ভবভূতির মা। পঙ্কজিনী হালদার তাঁর সম্পর্কে যে উক্তিগুলি করেছেন, তা' সহ্য করা শক্ত ভবভূতির পক্ষে।

মালবিকার এতোক্ষণ ধরে মনে হচ্ছিলো দু'জনে পাশাপাশি বসে একই খাতার পৃষ্ঠায় চোখ ফেলে যেন একটি পুরনো স্টাইলে লেখা প্রেমের গল্প পড়ছিলো, হঠাৎ ভবভূতি সেই সুখের আমেজটি নষ্ট করে দিলো।

মালবিকা মুখটা কঠিন করে পাতা উল্টে যেতে লাগলো।

আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গেই ভালো লাগাটা যেন কোথায় হারিয়ে গেলো। লেখাগুলো এখন খুব একঘেয়ে আর সেকেলে সেকেলে গাঁইয়া গোছের বলে মনে হচ্ছে। এ সেই সেকেলের 'সতীত্ব' বোধ। যে বোধ মনের চিন্তাটুকুকে পর্যন্ত নীতিপাঠের ছাঁচে রাখতে না পারলে নিজেকে পরম পাপী বলে ভাবতে শুরু করে। পাতার পর পাতা এই একই অভিব্যক্তি। আর দু'এক পাতা পড়ার পরই মালবিকা বাকি পাতাগুলো ফরফরিয়ে উড়িয়ে দেখে।

আর সেই উল্টোনোর ফলে খাতার মধ্যে থেকে খসে পড়ে আলগা এক গোছা কাগজ।

খাতার পাতার মত লাইন টানা নয়, শাদা ফুলস্ক্যাপ সাইজের কাগজ ভাঁজ করে চেপে রাখা ছিল খাতার পাতার খাঁজে।

এ লেখা অন্যের হাতের। পুরুষালী ছাঁদের।

কার লেখা?

মিস্টার হালদারের? না খাতাখানা অপর অংশীদারের?

পঙ্কজিনী হালদারের নামের নীচে যার নাম লেখা ছিলো।.....ভাঁজটা খুলে চোখ ফেললো মালবিকা।

এই লেখাগুলির মধ্যে সাল তারিখের বালাই নেই, মনে হয় কোনো পারম্পর্যও নেই। একটা পাতায় লেখা—

'জীবন ক্রমশঃই জটিল হয়ে উঠছে।..... হেমলতা যে এমন অমূলক একটা বিষয় নিয়ে এমন সন্দেহে জর্জরিত হবে, তা' কে ভেবেছিল? অথচ হেমলতা আগে এমন কর্তব্য বুদ্ধিহীন অবুঝ ছিলো না। কিন্তু এই একটা জায়গায় সে যেন বিবেক, বিবেচনা, কর্তব্য, মানবিকতা, সব বোধশূন্য হয়ে হিংস্র আর কুটিল হয়ে উঠেছে।

কিন্তু আমি নিরুপায়।

হেমলতা আমাকে যার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করতে নির্বন্ধ প্রকাশ করে, আমার তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবার উপায় নেই। অন্ততঃ কর্তব্যের সম্পর্ক।... আমার প্রতি চিরবিশ্বস্ত বন্ধুর মৃত্যুশয্যায় আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে শপথ করেছি, যতোদিন আমার দেহে প্রাণ থাকবে, তার বিধবা স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার নেবো। অর্থেও নয় কেবল মাত্র সামর্থ্যে। অর্থের অপ্রাচুর্য নেই তার।

এই শপথের কথা আমি হেমলতাকে বারবার বলেছি, তবু সে কটু কথা বলে, নীচ সন্দেহে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করে। আপন বুদ্ধির দোষে তার এই কষ্ট। আমার কিছু করার নেই। আমাকে আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শপথ রক্ষা করে চলতে হবে।..'

আর একটা জায়গায় লেখা—

'এই কুটিল পৃথিবীতে এমন সরল সুন্দর পবিত্র মেয়েও থাকে।...জ্যোতিষের মৃত্যুর আগে পযন্ত কোনোদিন বুঝতে পারিনি তার স্ত্রী কী আশ্চর্য সুন্দর প্রকৃতির! একেই বোধহয় বলে দেবীর মত মেয়ে।

মিসেস হালদারের নাম যে পঙ্কজিনী সে কথাও আমি হালদারের মৃত্যুর পর

জানলাম। হালদার আমাদের সামনে কৌতুকছলে ডাকতো 'মিসেস।' কখনো বা ডাকতো কর্ত্রীঠাকুরাণী'।

এখন কাগজপত্রে স্বাক্ষর দিতে দেখলাম শ্রীমতী পঙ্কজিনী হালদার।

হাতের লেখাটি কী সুন্দর!

যেন প্রতিটি অক্ষরের উপর নিপুণতা আর নিষ্ঠার ছাপ। মানুষটি যেমন পরিচ্ছন্ন পরিষ্কার নিখুঁত, হাতের লেখাটিও তেমনি!...

মিসেস হালদারের কলকাতায় উপস্থিতি আর উচিত বোধ করছি না। গতকাল নাকি হেমলতা গিয়ে এক কাণ্ড করে এসেছে।.....মিসেস হালদার অবশ্য নিজে কোনো কথাই বলেননি, তবু তাঁর মুখ চোখের চেহারা আর কণ্ঠস্বরের কম্পন দেখে বুঝতে দেরি হল না, হেমলতা যথেষ্ট গালিগালাজ করে এসেছে।

....

বাড়িটি তো তৈরি হয়ে গেছে, আর বিলম্বে কাজ নেই।....জ্যোতিষের সঙ্গে পরামর্শ ছিলো দুই বন্ধুতে একই প্ল্যানে বাড়ি করবো। তাই করা হয়েছে। হয়তো তার আত্মা এতে সুখী হবে।

....

হেমলতা আমায় শুধু নিজের মাথার দিব্যি দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, আমাদের গৃহদেবতার নামে দিব্যি দিয়ে বসে আছে।

তার এক গোঁ, মিসেস হালদারের সঙ্গে আমার যাওয়া হবে না। কিন্তু এই দিব্যি দিলে তার মান রাখা কেমন করে সম্ভব? নতুন দেশে এবং অপরিচিত পরিবেশে পঙ্কজিনী দেবীর মত সরলা মেয়েকে একেবারে একা পাঠিয়ে দেবে এটা কি সম্ভব?

তাঁকে সেখানে সকলের সঙ্গে পরিচিত করে প্রতিষ্ঠিত করে আসা পর্যন্তও তো দেখতেই হবে। এতে যদি আমার ওপর গৃহদেবতার কোপ পড়ে পড়ুক।...ডাক্তাররা বলেন, বেশি বয়েস পর্যন্ত সন্তান না হওয়াই হেমলতার এই রুক্ষ মেজাজের কারণ। ওর নিজস্ব অনেক উদ্ভট ধারণা আছে। ওর মতে আমার মন ওর প্রতি সম্পূর্ণ ভালবাসা পূর্ণ নয় এবং ওর সন্তান না হওয়ার সেটাই কারণ।

হেমলতাকে যে কেমন করে বোঝানো যাবে তার সমস্ত ধারণাই অমূলক, আমার সর্বান্তঃকরণ তার প্রতিই নিবদ্ধ! কেবলমাত্র কর্তব্য আর বিবেক এই দুটিকে আমি নিজের কাছে রেখেছি, তার চরণে বন্ধক দিতে রাজী নই।

এই অরাজীটাকেই হেমলতা অপ্রেম ভাবে।

ভাবুক।

আমার কিছু করার নেই।

আমাকে যেতেই হবে ওখানে মিসেস হালদারকে নিয়ে।....তাছাড়া সম্প্রতি ওখানকার একটি অভ্রের খনির শেয়ার কিনে বসেছি, তার জন্যও তো মাঝে মাঝে যাওয়া দরকার।'

অভ্রের খনির শেয়ার!.....মালবিকার ঠোঁটের কোণে একটু সূক্ষ্ম হাসি ফুটে ওঠে।

মালবিকা তার নিজের পিসির ডায়েরীর থেকেও অনুভূতি রায়ের ডায়েরীর ভাষায় আকৃষ্ট হচ্ছিলো বেশি।

তাই মন দিচ্ছিলো বেশি।

'অভ্রের খনির শেয়ার' পড়ে মালবিকার মুখে যে সূক্ষ্ম হাসির রেখাটুকু ফুটে উঠলো, সেটুকু অনেকক্ষণ থাকলো।

মানুষ নিজের সম্পর্কে কী অন্ধ!

হঠাৎ এই অভ্রের খনির শেয়ার কিনে বসার পিছনে কোনো মনস্তত্ত্ব কাজ করেছে, সে কথা ভদ্রলোক নিজে বিন্দুমাত্রও টের পাননি।

নিতান্ত নিকটজনই মানুষের দর্পণ স্বরূপ, কিন্তু সেই দর্পণের ছায়াকে মানুষ নিজের বলে মানতে রাজী হয় না, দর্পণটাকে ভুল বলে অস্বীকার করে।... জেনে বুঝে নয়, না বুঝে না জেনে। কারণ চোখ যে বাইরের দিকে খোলা। মহৎ চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এই জন্যই দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী করতে উপদেশ দেন আত্মানুসন্ধানের। নিজের প্রতি দৃষ্টি ফেলো, নিজেকে জানো, নিজেকে বোঝো।

অন্ধতার আবরণ উন্মোচন করো, উন্মোচন করো আত্মমোহের আবরণ। দেখতে পাবে তোমার প্রকৃত রূপ কী! তোমার চিন্তা চেতনা লক্ষ্য কোন্ মুখী!

মালবিকা হাসলো, হায়! বেচারী অবোধ ভদ্রলোক। তুমি তোমার হৃদয়ের গভীর এবং ব্যাকুল প্রেমটিকে বন্ধু পত্নীর প্রতি কর্তব্য অথবা মুমূর্যু বন্ধুর কাছে দেওয়া শপথের আনুগত্য ভেবে পরম সন্তোষে কাটাচ্ছো, আর তোমার সামনের স্বচ্ছ দর্পণ হেমলতা রায়কে ভুল বলে ভর্ৎসনা করছো!...জানোনা তুমি নিজেকে নিজে কতো ঠকাচ্ছো! মালবিকা হঠাৎ চোখ তুলে সামনের আপার বার্থের দিকে তাকালো।

ভবভূতি বোধহয় চোখ বুজে শুয়ে আছে, ঘুমোচ্ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

ও নিজেকে খুব ক্লান্ত বলে ঘোষণা করছে, অথচ ও নিজে টের পায়নি, ওর ওই ক্লান্তিটা হঠাৎ এসে হাজির হলো কেন?

খাতাটা মুড়ে রেখে অনেকক্ষণ জানলার বাইরে তাকিয়ে রইলো মালবিকা।

আর ওর হঠাৎই মনে হলো, এই খাতাখানা না পাওয়া গেলেই বুঝি ভালো হতো।

এখন ওই অনুভূতি রায়ের জবানবন্দীটা মালবিকাকে বেশ টানছে।

কেন টানছে? স্বচ্ছন্দ ভাষার জন্যে? না ভদ্রলোকের ওই নিজের সম্পর্কে অজ্ঞানতার জন্যে? বেশ কৌতুক কৌতুক লাগছে।

মালবিকা আবার খাতা খুলে সেই ভাঁজকরা কাগজগুলো টেনে বার করে চোখের সামনে মেলে ধরলো।

সাল তারিখ না থাকলেও বোঝা যাচ্ছে এ লেখা অনেক দিন পরের।...

খাপছাড়া ভাবেই লেখা রয়েছে—'ডাক্তারদের মন্তব্য ভুল!...এই তো, এতো দিন পরে হেমলতা তো মা হয়েছে। চাঁদের মত একটি পুত্র-সন্তান তার কোল জুড়ে রয়েছে! কিন্তু কই, হেমলতার মেজাজ তো ভালো হলো না?'

হেমলতার এক মাসি অনেক দৈব-টৈব করেছিলেন হেমলতার জন্যে, মাদুলী কবচে বোঝাই করে দিয়েছিলেন হেমলতাকে, তখন কিন্তু কোনোই কাজ হয়নি সে সবে।

আর তারপর—যখন হেমলতা রাগ করে বিতৃষ্ণার বসে সে সব খুলে ফেলে দিয়েছে, ঠাকুর-দেবতা সম্পর্কে অনাস্থা প্রকাশ করেছে, তখন আকস্মিক এই আবির্ভাব! কখন যে কী হয়!

কিন্তু যে সময়েই হোক, হয়েছে তো?

তবে কেন এখনো হেমলতার মনে সুখ নেই?

হেমলতার নিজের মনের মধ্যে অশান্তির আগুন, আর সেই আগুনে নিজে দগ্ধাচ্ছে, অপরকেও দগ্ধে মারছে। আমার যে ওই অভ্রের খনি থেকে অনেক আয় উন্নতি হচ্ছে, এতেও যেন ওর আক্রোশ! কোনো সময় বিষম বিরক্ত হয়, কোনো সময় বা অবিশ্বাস করে। মনে করে সবই আমার বানানো কথা, বারবার ওখানে যাবার একটা কারণ দর্শাতে হবে তো?......এ কী অদ্ভুত কল্পনার দৌড়!

মালবিকার মুখে আবার একটু সূক্ষ্ম হাসি ফুটে ওঠে। আবার মনে মনে বলে, হায় অবোধ শিশু!

একটা পৃষ্ঠায় অনেকটা লেখা কাটা। একেবারে কালি ধেবড়ে নিখুঁত করে কাটা, যাতে কেউ না বুঝতে পারে। কিন্তু কার দায়? কে দেখতে যাচ্ছে?

কাটাকুটির পর লেখা—'হেমলতা এবার আমার সঙ্গে যেতে চাইছে। তার মানে নিজে সরেজমিনে তদন্ত করে দেখে আসতে চায়। দেখুক গিয়ে। আমার কি!.... তবে একটা ভয়, বাড়ি চড়াও হয়ে গিয়ে আবার মিসেস হালদারকে না আপমান করে বসে।.....আর ভয়—পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে নিজের নীচ মনের সন্দেহটি না বিস্তৃত-ভাবে বিস্তার করতে চেষ্টা করে।

(মানুষ মাত্রেই অপরের নিন্দা কলঙ্কের খবরে উৎফুল্ল হয়, দু'দশজন বাদে অবশ্য, যেমন পঙ্কজিনী দেবী! উনি আরও নিন্দা শুনলে যেন মর্মাহত হন।) কাজেই হেমলতার চেষ্টা সফল হয়ে যেতে পারে। তবু তাকে নিয়ে যেতেই হবে। 'না' করবার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই।

পড়তে একটু অসুবিধে হচ্ছিলো মালবিকার। একেই তো লেখার ধরণ দ্রুত অস্পষ্ট, আর ধারাবাহিকতা ছিন্ন, আবার—এ পৃষ্ঠার লেখার শেষ ও পৃষ্ঠার কোণে, ও পৃষ্ঠার লেখার শুরু এ পৃষ্ঠার মাথার উপর।

কিন্তু না পড়ে তো থাকতে পারে না?

একটি শিশু-পুত্রের আবির্ভাব ঘটেছে এদের জীবনে।.....সন্দেহ নেই সেই শিশু চারটিই আজকের এই সজুব সতেজ তরুটি।

মালবিকার মুখ আকর্ষণীয় লাগছে অনুভূতি রায়ের খণ্ড বিচ্ছিন্ন অনুভূতিগুলির প্রকাশ চেষ্টা। এর থেকে যেন আবিষ্কার করে ফেলবে উপরে ঘুমের ভান করে থাকা এই মানুষটার একেবারে মূল বনেদ। মানুষটা যেন একটা কাটা ঘুড়ির মত মালবিকার জীবনে এসে পড়েছে। মালবিকা এখন সেই ঘুড়ির সঙ্গে লাগানো সুতোটা হাতে পেয়ে গেছে।

ওর ভালো লাগেনি।

ও তাই বেজার মুখে উঠে গিয়ে শুয়ে পড়েছে। কিন্তু কেন?

এই রকম কোনোভাবে যদি মালবিকার নিজের শৈশবের কালকে হাতে পেয়ে যেতো মালবিকা, পরম আগ্রহেই তো দেখতে চাইতো।......মালবিকার বালিকা বয়সের অনেক ছবি আছে, সেগুলি কোনো কোনো সময় দেখে মালবিকা, খুবই মজা লাগে।

ন্যাড়া মাথা ফ্রক পরা একটা মেয়ে, ঝুমরো চুলে মুখ ঢাকা শুধু জাঙ্গিয়া পরা

একটা ক্ষুদে মেয়ে, সাতটা ঝালরের থাক দেওয়া ইয়া ফুলো ফাঁপা ঘাগরা পরা একটা মেয়ে, এরা সবাই মালবিকা, ভাবলে মজা লাগবে না?

কিন্তু পাতাগুলো উল্টেপাল্টে পড়তে পড়তে হঠাৎ একটা জায়গায় চোখ আটকে গিয়ে যখন চক্ষুস্থির হয়ে গেল, তখন বুঝতে পারলো মালবিকা, ভবভূতি নামে ব্যক্তিটির বিরক্তির কারণটা কোথায়? কেন সে আপন শৈশবের পৃষ্ঠা উদঘাটিত হবার আশঙ্কায় উত্তেজিত?

উত্তেজিতই।

ভবভূতির ওই আপার বার্থে লাফিয়ে ওঠার, সময় সে উত্তেজনার প্রকাশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো।

তাছাড়া—এতোক্ষণে খেয়াল হলো মালবিকার, তার কাছে তার বিধবা পিসির যৌবনকালের হৃদয়বেগের খবর যে-কৌতুক বহন করে আনছিলো, ভবভূতির কাছে তার বাবার হৃদয়াবেগের খবর সে কৌতুক বহন করে আনতে পারে না। কারণ সেটা লজ্জার। কারণ তার বাবা ব্যাচিলার বা বিপত্নীক নয়।

পঙ্কজিনী হালদার যদি বিধবা যুবতী না হতেন, তা'হলে কি মালবিকার এমন মজা লাগতো?.... মজা এই অর্থে, মালবিকা দেখতে পাচ্ছিলো এই দুটি অবোধ নরনারী, যারা একটি অসামাজিক প্রেমের শিকার হয়ে মরেছে, তারা নিজেরা টের পাচ্ছে না যে তারা নিহত।

ভবভূতির প্রশ্ন স্বতন্ত্র।

এখানে ভবভূতির মার যে ভূমিকা রয়েছে, সেটা কম অস্বস্তির নয় তাঁর ছেলের পক্ষে।

তাই তার ঘুমের ভান।

কিন্তু মালবিকা কি করে একা একা এমন ভয়াবহ একটা ঘটনার সংবাদে অবিচলিত থেকে ওই লোকটাকে ঘুমুতে দেবে?

ওর সঙ্গেই না মালবিকার জীবন বাঁধা পড়ে যেতে চলেছে? ওর হাত থেকে তো আর নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার উপায় নেই মালবিকার।

তবে মালবিকা কি করে চেঁচিয়ে বলে না উঠে পারবে, শুনছেন? ভবভূতিবাবু! আপনার. মা সুইসাইড করেছিলেন?

গাড়ির কামরায় তৃতীয় ব্যক্তি নেই তাই রক্ষা।

নচেৎ মালবিকার এই স্পষ্ট উচ্চারণের প্রায় আর্তনাদ নতুন কি বিপদ ডেকে আনতো কে জানে।

ভবভূতি এ আর্তনাদে উঠে বসলো।

লম্বা মানুষ, সোজা হয়ে বসার প্রশ্ন নেই ওখানে, ঘাড়টা নীচু করেই বসতে হয়েছে। উঠে বসে রুক্ষ গলায় বলে উঠলো, 'আপনার এই কাজটা কেমন হচ্ছে জানেন? যেন অপরের ঘরে আড়ি পাতার মত।'

মালবিকা ওর পেশী শক্ত হয়ে ওঠা মুখটার দিকে তাকিয়ে দেখে।

এর আগে ভবভূতি সমানেই মালবিকাকে 'তুমি' করে করে বলেছে।

মালবিকা শান্ত গলায় বলে, 'তার মানে?'

'মানে আবার বোঝবার কী আছে?' ভবভূতির তেমনি তিক্ত গলা, অন্যের ডায়েরী পড়া, আর অন্যের ঘরে আড়ি পাতা, একই।'

খাতাটার কথা পিসি নিজেই উল্লেখ করেছিলেন।'

'হয়তো ওটার কথা ভেবে ব্যাকুলতা বোধ করেছিলেন। হয়তো ওটাকে নষ্ট করে ফেলতে অনুরোধ জানাতে চেয়েছিলেন।

মালবিকা তেমনি শান্ত গলায় বলে, 'হয়তো দিয়ে কোনো বাস্তব যুক্তিতে আসা যায় না।.....আমাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো গোপনীয়তা, কোনো লুকোচুরি থাকাটা তো বাঞ্ছনায়ও নয়।'

ভবভূতি নেমে আসে।

বসে পড়ে সীটে।

বেশ উত্তেজিত গলায় বলে, 'বিয়ে করবার আগে পরস্পরের বাপ-মার যৌবনকালের খবর নেওয়াটা আমি কম্পালসারি মনে করি না। দৈবক্রমে এই একটা হতচ্ছাড়া খাতা আপনার হাতে এসে পড়ে গেছে বলেই না বাঞ্ছনীয় অবাঞ্ছনীয় প্রশ্ন?'

'এসে যাওয়াটা হয়তো ঈশ্বরের নির্দেশ।'

মালবিকা তার স্পষ্ট পরিষ্কার বড় বড় চোখ দুটি তুলে তাকায়, 'আপনিও তো দৈবক্রমেই আমার জীবনে এসে পড়েছেন।'

ভবভূতি ওই চোখের দিকে তাকায়।

ভবভূতির মুখের পেশীর কাঠিন্যটা একটু শিথিল হয়ে আসে।

আস্তে বলে, 'সেইটুকুই পরম সত্য হয়ে থাকুক না। কী দরকার তার বেশিতে? অনুভূতি রায় আর পঙ্কজিনী হালদার নিশ্চিন্তে ঘুমোন না তাঁদের কবরের মধ্যে, হেমলতা দেবী ছটফটিয়ে বেড়ান আত্মঘাতীদের জন্যে যদি কোনো নরক সেখানে, তাতে তোমার আমার কী এসে যায় মালবিকা?'

মালবিকা গম্ভীর ভাবে বলে, 'কিছু এসে যাবে, একথা তো বলিনি আমি। আমি শুধু সব কিছুতেই একটা অদৃশ্য চক্রের খেলা দেখতে পাচ্ছি। আপনার সঙ্গে দেখা হওয়াটা তার মধ্যে প্রধান।.....পিসির আকস্মিক মৃত্যু আর একটি, সেটা না হলে এই উদ্‌ঘাটনও হতো না—'

ভবভূতি মলিন উদাস গলায় বলে, 'আমার মা যে সুইসাইড করেছিলেন, তা আমি জানতাম না।'

'জানতেন না?'

মালবিকা প্রায় অবিশ্বাসের সুরে বলে, 'কী বলছেন?'

'নিতান্ত ছেলেবেলার কথা। আমায় কেউ বলেনি।'

'এযাবৎ কালের মধ্যে কেউ কোনোদিনও না?'

'স্পষ্ট করে কেউ না।'

ভবভূতি অন্যমনস্ক গলায় বলে, 'তবু মিথ্যে বলবো না, প্রথম প্রথম আমার যেন ওই মৃত্যুটাকে একটা রহস্যাচ্ছন্ন ঘটনার মতই লাগতো। মনে হতো যেন আমায় কেউ ঠিক কথাটা বলছে না। পরে ও নিয়ে আর মাথা ঘামাইনি, ব্যাপারটাকে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলেছি।'

মালবিকা আস্তে মাথা নেড়ে বলে, 'আমি হয়তো এক্ষুনি সেটা পারবো না।'

ভবভূতির মুখের রেখা আবার যেন কঠিন হয়ে ওঠে।

ভবভূতি নির্লিপ্ত গলায় বলে, 'তাহলে ধরে নিতে হবে, ওই কালো খাতাখানা আমাদের জীবনে একটা কালো ছায়া হয়ে উঠতে পারে? আমাদের মিলনে প্রতিবন্ধক ঘটাতে পারে?'

মালবিকা বলে, 'আমি তো তা' বলিনি। আমি শুধু বলতে চাইছি, অতীতটাকে জানলে ক্ষতি কি?'

'যে অতীত মৃত, যারা ওই একদার ইতিহাসের পাত্রপাত্রী তারাও সবাই মৃত, সেই অতীতকে জেনে লাভই বা কী?'

মালবিকা আবার খাতাখানার মধ্যে আলাদা কাগজগুলো ভাঁজ করে রাখছিলো, কারণ গাড়ি একটা স্টেশনের কাছাকাছি এসে গেছে, এখানে চা খেতে হবে। গাড়ির গতি মন্থর হয়ে এসেছে।

মালবিকার কণ্ঠেও মন্থরতার আভাস।

'সব অতীতই মৃত। এব ইতিহাসের পাত্রপাত্রীরাই মৃত। তবু লোকে তাকে জানতে চায়।'

ভবভূতি মালবিকার মুখে একটা দৃঢ়তার ছাপ দেখতে পায়। যে দৃঢ়তা প্রথম প্রথম দেখেছে এবং ইদানীং আর একেবারেই দেখছিলো না। ইদানীং মালবিকার মুখে যেন একটা আত্মসমর্পিতের কোমলতা ধরা পড়তো।

ভবভূতি বললো, 'এ বিষয়ে পরে কথা হবে, আগে গলাটা ভিজিয়ে নিই।'

গাড়ি স্টেশনে এসে লাগলো, থেমে গেল।

মালবিকা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলো। এ সেই স্টেশন, যে স্টেশনে ভবভূতি মালবিকার ওয়াটার বট্‌লের জলটুকু শেষ করে ফেলে আবার সেটাকে ভরতে নেমেছিল।

মালবিকা যেন দেখতে পেলো, জলের বেতলের স্ট্র্যাপটা কাঁধে ঝুলিয়ে আর খাবারের ঠোঙা হাতে নিয়ে ছুটতে ছুটতে ট্রেনের দরজার দিকে এগিয়ে আসছে ভবভূতি নামের লোকটা। কিন্তু সে কোন্ ভবভূতি?

'নামছেন?'

মালবিকা প্রশ্ন করলো!

ভবভূতি নামতে নামতে বললো, 'বাঃ! চা খেতে হবে না?'

'এক মুহূর্তে মনের অবস্থার আকাশ-পাতাল পরিবর্তন ঘটে গেল—'এ ধরনের কথা আগে শোনা থাকলেও মুহূর্তে আকাশ-পাতাল পরিবর্তনটা এমন ভাবে নিজের উপলব্ধিতে আসতে পারে, এ ধারণা হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে প্লাটফরমে পা দেবার আগে মুহূর্তেও জানতো না মালবিকা।

কিন্তু ঘটে গেল সেই ঘটনাটা।

সেই আকাশ-পাতাল ওলট-পালট পরিবর্তন।

প্লাটফরমে পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই মালবিকার মনে হলো সে যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে উঠলো। আর সেই ঘুমটা ছিলো কোনো মাদক-বস্তুর নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকার মত। এখন হঠাৎ জেগে শক্ত মাটির ওপর দাঁড়িয়েছে।

এই তো মালবিকার চির চেনা ভূমি।

এখানে মালবিকা কার তোয়াক্কা রাখতে যাবে? কার সাধ্যই বা হবে মালবিকার ওপর খবরদারি করতে আসবার?

মালবিকা না 'মধ্য কলিকাতা গার্লস স্কুলে'র প্রতিষ্ঠাত্রী প্রধানা শিক্ষিকা 'মিস চৌধুরী'? যে মিস্ চৌধুরীর নামে শুধু ছাত্রীরা কেন দিদিমণিরাও ভয় খায়।

না, মালবিকা মোটেই কারো সঙ্গে কটু ব্যবহার করে না, মালবিকা রাগীও নয়, তবু সবাই ওকে ভয় করে।

ভয় করে ওর ব্যক্তিত্বকে।

ভয় করে ওর স্বল্পভাষী প্রকৃতিকে। ভয় করে ওর মুখের গড়নের গাম্ভীর্যকে। আবার ভালবাসতেও ছাড়ে না। সমীহর সঙ্গে যে এক ধরনের ভালবাসা গড়ে ওঠে সে ভালবাসা আছে সকলের মালবিকার প্রতি।

যেন কী এক ঘুমের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে মালবিকা এতগুলো দিন তার এই সত্তাকে ভুলে গিয়ে নির্ভরশীল একটা লতার ভূমিকায় এলিয়ে পড়েছিল। ক্ষমার অযোগ্য এই দুর্বলতা।

এই চেনা মাটিতে পা দিয়েই মালবিকা হঠাৎ তার 'আমি'কে ফিরে পেলো, যেটা হারিয়ে গিয়েছিল অকস্মাতের একটা ঝোড়ো হাওয়ায়।

কিছুক্ষণ আগেও তো মালবিকা সেই 'আমি'কে হারিয়ে ফেলা ভূমিকাতেই ছিল। যখন ওই ছদ্মবেশী মায়াদস্যু স্টেশনে নেবে খাবার নিয়ে এলো, নিয়ে এলো চা আর জল। স্টেশনটাকে মালবিকার মনে পড়ছে কিনা জিগ্যেস করলো, অবাঞ্ছিত এক কালো খাতার বিরক্তি ভুলে।

তখন মালবিকা গভীর চোখে তাকিয়েছিল, গভীর গলায় কথা বলেছিল।

ওর জলের বোতলটাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিল মৃদু হেসে।

তখন মালবিকার চিত্তের এই নিশ্চিন্ততা ছিলো, ভবভূতি সঙ্গে আছে। অতএব হাওড়া স্টেশনে নেমে অসুবিধে হবে না কিছু।

কিন্তু এখন এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, কাকে আবার দরকার? একটা কুলির মাথায় জিনিসপত্র চাপিয়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে পড়ার ওয়াস্তা। ট্যাক্সিতে চাপবে, 'মধ্য কলিকাতা গার্লস স্কুলে'র ঠিকানাটা বলে দেবে, আরামে সিটে পিঠ ঠেকিয়ে পৌঁছে যাবে।

সেখানে সবাই হৈ হৈ করে উঠবে মালবিকাকে দেখে, কারণ মালবিকা খবর না দিয়ে আসছে। কিন্তু তাতে কি? নিজের জায়গায় খবর দিলাম, আর না দিলাম।

মালবিকার বাবার যে একটা বাড়ি ছিল, সেটার প্রায় সবটাতেই স্কুল বসিয়েছে মালবিকা। মাত্র দু'একখানা ঘর নিজের জন্যে রেখেছে, নিজে থাকতে এবং সাবেক কালের আসবাবপত্রগুলো ভরে রাখতে।

মালবিকার সঙ্গে ঘরে একজন দিদিমণি ছিলেন কিছুদিন, কিন্তু উভয়পক্ষই অসুবিধে বোধ করলেন। কারণ উভয়েই স্বাধীনচিত্ত।

অবশ্য মেয়ে মাত্রেরই চিত্ত রহস্য ওই।

তারা দু'জনে একসঙ্গে থাকার সুবিধে বোধ করে না। তার এলাকায় সে একমেবাদ্বিতীয়ম্ হয়ে। এক আকাশে দুই সূর্যের সহাবস্থান? না না মোটেই না। নিরুপায় হয়ে থাকতে হলে ক্লিষ্ট হয়েই থাকে।

এখন মালবিকার সঙ্গিনী বলতে একটি আধাবুড়ি পরিচারিকা। যে মালবিকার স্টাইলে শাড়ি পরতে চেষ্টা করে না, মালবিকার স্টাইলে চুল আঁচড়ায় না, আর মালবিকার থেকে দামী চটি কিনে পরে বেড়ায় না। একটি তরুণী পরিচারিকাকে ওই অপরাধেই বিদায় দিয়েছিল মালবিকা।

বুড়ি নিয়ে ওর অসুবিধে আছে অনেক, তবু ওটাকেই ও সুবিধে মনে করে। একন হঠাৎ নিজ সত্তায় ফিরে আসা মালবিকা ভবভূতির সঙ্গ ও সাহায্যটাই অসুবিধে বলে মনে করলো, নিজের ভার নিজে নেওয়াই সুবিধে মনে হলো তার।

স্কুল পর্যন্ত ওকে নিয়ে যাওয়া, একটা গভীর সন্দেহের প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া বৈ তো নয়! সেটা অস্বস্তিকর।

ভবভূতি কুলির মাথায় নজর রেখে তাড়াতাড়ি এগোচ্ছিলো, মালবিকাও তাড়াতাড়ি হেঁটে কাছে পৌঁছে গেল এবং নিতান্ত নিকটে এসে গিয়ে যা বলে উঠলো, তা' তার নিজের কানেই যেন খট্ করে বাজলো। কিন্তু বলাটা তো হয়েই গেছে!

বলেছে—'আচ্ছা তাহলে নমস্কার!'

ভবভূতি কুলির মাথার কথা ভুলে গিয়ে ওর মুখের দিকে চোখ ফেললো। কেমন একটা অভিব্যক্তিশূন্য গলায় বললো, 'এবার তাহলে আমার ছুটি।'

মালবিকা তো আর মর্যাদায় হারবে না?

মৃদু হেসে বললো, 'হ্যাঁ অনেক তো করলেন আমার জন্যে, কম দিন আপনার স্কন্ধে চাপিনি। এবার তো চেনা জগত, নিজেই পেয়ে যাবো।'

ভবভূতি বললো, 'ঠিক আছে? চলুন। ট্যাক্সির জন্যেও কি নিজেই লাইন দেবেন?'

মালবিকা একটু হাসির চেষ্টা করে বলে, 'আপনি কি রাগ করলেন না কি?'

'কী আশ্চর্য! কেন? ভারমুক্ত হতে পারাটা তো আরামের ব্যাপার। 'এই.....এই'—কুলি ব্যাটা আবার অত দৌড় মারছে কেন?'

কুলিটা যে সত্যিই কোনো বাড়তি স্পীডে দৌড় মারছিলো তা' নয়,

কুলিজনোচিত ভাবেই যাচ্ছিলো, তবু এই কথাটা বলেই দ্রুত এগিয়ে গেল ভবভূতি।

ট্যাক্সির জন্যে লাইন অবশ্য মালবিকাকে দিতে দিলো না। ভবভূতি, কিন্তু ওই একই ট্যাক্সিতে নিজের গন্তব্যস্থলেও যেতে রাজী হলো না। যদিও একই পথে পড়তো। এড়িয়ে গিয়ে বললো, 'নাঃ একবার অফিসটায় ঘুরে যেতে হবে।'

'আহা সে কি ওই মালপত্তর নিয়ে?' মালপত্তর আর কি? এই তো ছোট একটা সুটকেস।'

কথাটা সত্যি। মাত্র দু'তিন দিনের জন্যে বেরিয়েছিল ভবভূতি সামান্য কিছু জিনিস নিয়ে। স্বভাবটা শৌখিন বলে জামা-টামা দুটো বেশি নিয়েছিল।

মালবিকা বললো, 'আমার কিন্তু মনে হচ্ছে আপনি রেগে রয়েছেন।'

ভবভূতি বললো, 'থাকলে হোটেলের ভাত কিছু বেশি খাবো।'

'আপনি হোটেলে খাবেন?'

ভবভূতি একটু হেসে বললো, 'তাছাড়া কোন্ মাতা, কন্যা, ভগ্নী, জায়া আমার জন্য প্রস্তুত অন্ন নিয়ে বসে আছে এখন?'

মালবিকার একটা খেয়াল হলো খুব আশ্চর্য একটা ঘটনা ঘটে গেছে। এতোদিন এক সঙ্গে থাকলো তারা, অথচ ভবভূতির পারিবারিক জীবন সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না সে। জিজ্ঞেস যে করেনি কোনোদিন তাও ঠিক নয়, তবে ভবভূতি যেন এড়িয়ে গেছে, বিশদ বলতে চায়নি। ভবভূতি কিন্তু মালবিকা সম্পর্কে সব তথ্যই জেনে ফেলেছে। এমন কি মালবিকার স্কুলের দিদিমণিদের রূপ, গুণ, মেজাজ, কর্ম-ক্ষমতা অথবা কর্ম-অক্ষমতা সবকিছু সম্পর্কেই।

কথাটা মনে হতেই আবার কঠিন হয়ে গেল মালবিকা। কী ভূতেই পেয়ে রেখেছিল তাকে, তাই ওই সব গল্প করেছে।

স্বভাব ছাড়া কাজই করেছে।

গুটিয়ে নিলো নিজেকে, বললো, 'ঠিক আছে। আপনার যা সুবিধে।'

আর যে মুহূর্তে গাড়িটা ছেড়ে দিল, আর ভবভূতি নামের মানুষটা জনারণ্যে মিশিয়ে গেল, সেই মুহূর্তে মনে পড়লো মালবিকার, ওর ঠিকানাটা নেওয়া হয়নি.

এখন কি মালবিকা আবার তার মুখ্যু মনটার হাহাকারকে সমর্থন করবে?

নাঃ করবে না।

মালবিকা ভাবলো, ও তো আমার ঠিকানা জানে। দেখা করবার দরকার বোধ করলে আসবেই অবশ্য।

আসবেই।

না এসে পারবে না কি?

ও যা গায়ে-পড়া, ও নির্ঘাৎ স্কুলে এসে এসে মালবিকাকেই খেলো করবে। মালবিকাকে শক্ত হতে হবে।

সঙ্কল্পটা নেবার পর হাহাকারটা যেন ফিকে হয়ে গেল, বরং নিজেকে বেশ ঝঞ্ঝাটমুক্ত হালকা মনে হলো। স্কুলের কথা ভাবতে লাগলো তখন।

'দিদিমণি তাহলে এলে?'

তরু সহাস্যে বলে, 'বাবা আমরা যেন জলের মাছ ডাঙ্গায় ছিলুম। ক' দিনের জন্যে গিয়ে—'

মালবিকা বলে, 'আমি তো একমাসের ছুটি নিয়ে গিয়েছিলাম বরং তার আগেই চলে এসেছি। হঠাৎ আমার সম্বন্ধে এমন হালছাড়া হয়ে যাচ্ছিলি কেন?'

তরু অপ্রতিভ ভাবে বলে, 'না তা কি বলছি? তবে গেলে পিসির কাছে আদর খেতে, তা কপালে সইলো না। পিসিই—'

'ঠিক বলেছিস তরু! আমার কপালে সুখ সয় না,' মালবিকা বলে, 'কিন্তু তোকে কে এতো খবর দিলো?'

'ওই ওনারাই বলাবলি করছ্যালো! কেরাণীবাবু, নমিতা দিদিমণি—'

আবার সেই কেরাণীবাবু আর নমিতা দিদিমণি?

মালবিকার মাথাটার মধ্যে যেন দপ্ করে জ্বলে ওঠে।

ওই দুটো অসম আসনের মানুষের যখন তখন আড়ালে আবডালে দেখা সাক্ষাৎ, সুযোগ পেলেই কথাবার্তা, এগুলো দু'চক্ষের বিষ দেখে মালবিকা। এ নিয়ে একদিন কেরাণীবাবুকে একটু সমঝেও দিয়েছিল, কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।

মালবিকা ভাবলো আমার অনুপস্থিতিতে খুব চালিয়েছেন বোধহয়। দেখাচ্ছি মজা। আমার স্কুলে এসব শিথিলতা চলবে না। তরুর মুখে চোখে যেন উল্লাসের দীপ্তি।

তরু আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, মালবিকা থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলো,

'এখন কোনো কথা নয় তরু! চুপচাপ চলে গিয়ে চায়ের ব্যবস্থা করোগে, আমি স্নানটা করে আসি।'

কিন্তু স্নান করে আসার অবকাশে যে মালবিকার জন্যে এমন একখানি বিস্ময়ের উপহার অপেক্ষা করছিলো তা' কে জানতো?

স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে ঘরে পা দিয়েই দেখলো মালবিকা, নমিতা বসে রয়েছে তার ঘরে। জানালার দিকে মুখ করে একটা বেতের মোড়ার ওপর।

নমিতার পরনে একখানা গাঢ় খয়েরি রঙা জরিপাড় টাঙ্গাইল শাড়ি। ব্যাপার কি! ক্লাশ নেই নাকি ওর?

মালবিকার স্কুলে তো দিদিমণিদেরও একটা বাঁধা বরাদ্দর সাজ। মেয়েদের সাদা স্কার্ট নীল বর্ডার, আর দিদিমণিদের সাদা শাড়ি, নীল বর্ডার। মেয়েরা নিয়মের কাঠগড়ায় বাঁধা থেকে একটুও শৌখিন পোষাক পরতো পারবে না, আর তাদের শিক্ষিকারা যথেচ্ছ রঙের ঢেউ তুলে সিল্ক রেশমের পাখনা উড়িয়ে শিক্ষাদান করতে আসবেন, এটা মালবিকার পছন্দ নয়।

এ নিয়ে অবশ্য দিদিমণি মহলে অসন্তোষের গুঞ্জন উঠেছে, তবে মেনেও নিয়েছেন সবাই।

উপায় কী?

চাকরি বলে কথা।

যার চাকার দাঁতে সব খোঁচ খোঁচ ঘসে প্লেন-হয়ে যায়।

অতএব দিদিমণিরা একই একঘেয়ে ড্রেসে আসতে বাধ্য হন মালবিকার স্কুলে।

মালবিকা বলতে যাচ্ছিল, 'কী ব্যাপার নমিতা স্কুল নেই আজ?' বলতে গিয়েও থমকালো, আজ বোধহয় কিসের একটা ছুটি আছে। মুসলমানদের কোনো বিশেষ পরব-টরব হবে।

তা'হলে স্কুলেই বা আসার কী দরকার ছিল নমিতার? কিছু আর না বলে শুধু বললো, 'নমিতা যে? কী খবর?'

নমিতা ততক্ষণ উঠে এসে হেঁট হয়ে মালবিকার পায়ের কাছে একটু হেঁট হয়ে বলে ওঠে, 'আপনাকে প্রণাম করতে এসেছি মালবিকাদি—'

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম-টনাম পছন্দ করে না মালবিকা। তাই সকলেই ওই আলগোছে সারতে বাধ্য হয়!

নমিতার উপর মন প্রসন্ন ছিল না। তবু মালবিকা একটু হেসে বললো, 'তা' আমি হঠাৎ প্রণম্য হয়ে উঠলাম কেন?'

নমিতা মুখ তুলে দাঁড়িয়ে একটু লাজুক হাসি হাসলো, আর তখনই ওই 'কেন'টার উত্তর পেয়ে গেল মালবিকা।

নমিতার সিঁথিটা জুড়ে লাল টকটকে সিঁদুরের রেখা, নমিতার কপালে লুডোর ঘুঁটির মত বড় একটা টকটকে টিপ!

মালবিকার হঠাৎ মনে হলো নমিতা যেন মালবিকাকে টেক্কা মেরে জিতে গিয়ে সেই বিজয় গৌরবের চিহ্নটা কপালে সেঁটে অহঙ্কার করে দেখাতে এসেছে। যেন বলতে চাইছে, 'তেলি হাত ফসকে গেলি!' কেনই বা এমন মনে হলো?

হয়তো ভিতরে ভিতরে অনুভবে এলো মালবিকার, নমিতাকে 'মজা' দেখাবার অধিকারটা খর্ব হয়ে গেছে তার, তাই একটা অপমানের জ্বালা গায়ে উত্তাপ ছড়ালো। মালবিকা একটু বিদ্রূপের গলায় বলে উঠলো, 'বাঃ নমিতা তো দেখছি খুব করিৎকর্মা মেয়ে! এতোটা হাই জাম্প!'

নমিতা এটাকে পরিহাস ভাবলেও, মালবিকার কথার সুরটায় বিস্মিত না হয়ে পারলো না। তবু নম্র গলাতেই বললো, 'হঠাৎই হয়ে গেল!'

মালবিকা বললো, 'হুঁ! সে তো দেখতেই পাচ্ছি। বরটি কে? আমাদের কেরাণীবাবু নয় তো?' নমিতার আর নম্র থাকা চললো না।

ফস করে চোখের কোণে আগুনের ঝিলিক খেলে গেল তার। গলার স্বরেও তার ছোঁয়াচ লাগলো, 'পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ কেরাণী আছে মালবিকাদি, সেইটাই তাদের একমাত্র পরিচয় নয়। তাদের একটা নাম থাকে!'

মালবিকার মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল।

বললো, 'বিয়ে হয়ে তোমার হজম শক্তিটা কমে গেছে দেখছি, সামান্য একটু ঠাট্টা হজম করবার ক্ষমতা নেই। যাক বিয়ে হয়েছে দেখে খুশী হলাম। আজ খুব টায়ার্ড আছি, পরে কথা হবে কেমন?'

'কথার আর কী আছে মালবিকাদি?'

বলে চলে গেল নমিতা।

আর ও চলে যাওয়ার পর নজরে এলো মালবিকার টেবিলে একটা সন্দেশের বাক্স।

নতুন বিয়ে হওয়ার খুশিতে সন্দেশের বাক্স হাতে নিয়ে প্রণাম করতে এসেছিল নমিতা।

মালবিকা বুঝতে পারলো না কেন মালবিকা এমন অভদ্র ব্যবহার করলো।

মালবিকাকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে ভবভূতি আর একটা ট্যাক্সির জন্যে চেষ্টা করছিল, কে ডাকলো পিছন থেকে।

চমকে তাকিয়ে দেখতে পেলো অনিমেষ।

গাড়িটাকে ব্রেক কসে জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে ডাকছে, 'এই ভবভূতি, উঠে আয়।'

ভবভূতি তাকিয়ে দেখলো।

অনিমেষের চেহারাটা প্রায় বদলে গেছে, চাঁচাছোলা মুখটা কেমন ফুলো ফুলো হয়ে গেছে, ধারালো মুখটা মোটা মোটা লাগছে, আর মুখের রঙটা লালচে দেখাচ্ছে!

হতভাগা বোধহয় ড্রিঙ্ক-ট্রিঙ্ক করছে। ভাবলো ভবভূতি।

মুখে বললো, 'উঠে আসা যাবে না, সঙ্গে মালপত্র।'

'আরে সে তো দেখতেই পাচ্ছি। এমন কিছু না।'

বলে নেমে এসে গাড়ির দরজা খুলে ধরলো অনিমেষ।

'আঃ এসব কেন করতে যাচ্ছিস।' ভবভূতি বললো, 'পরে তোর সঙ্গে দেখা করবো খ'ন। এখন যেখানে যাচ্ছিস যা।'

অনিমেষ বললো, 'তোর সঙ্গে দেখা হবার জন্যে মরে যাচ্ছি না। ট্যাক্সির জন্যে অনন্তকাল দাঁড়িয়ে থাকবি বলেই—মিস করিস না, উঠে আয়।....কী? অমন অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলি যে? জীবন্ত কোনো 'লাগেজ' আছেটাছে নাকি কোথাও?'

ভবভূতি মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলো, মিনিট কয়েক আগে অনিমেষের এসে না পড়ার জন্যে। বললো, 'স্বপ্ন দেখছিস?'

'অনিমেষ ঘোষাল স্বপ্নটপ্নর ধার ধারে না। তোকে দেখেই বরং মনে হলো, এই প্রখর দিবালোকে জনারণ্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখছিস! এমন হাঁ করে শূন্য পানে তাকিয়ে ছিলি, মনে হচ্ছিলো যেন এইমাত্র সামনে দিয়ে কার শাড়ির আঁচলের রেস মিশিয়ে গেল।'

ভবভূতি চমকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো, আগে থেকে দেখছিল নাকি? এখন ন্যাকামো করছ?

ঠিক তা' মনে হলো না।

'বেশি বকবক করিসনে—' বলে গাড়িতে উঠেই পড়লো ভবভূতি। আর সত্যি বলতে, যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। এখন কিছুটা সময় নিজেকে ছেড়ে দিয়ে বসে থাকা যাবে।

কিন্তু নিশ্চিন্তে বসে থাকা কি যাবে?

বক্তা অনিমেষ কি দেবে তা থাকতে?

'কোথায় গিয়েছিলি?'

স্ট্র্যাণ্ড রোডের অকথ্য এবং বিচিত্র বস্তুর ভীড়ের মাঝখান দিয়ে অবলীলায় গা বাঁচিয়ে চলতে চলতে প্রশ্ন করে অনিমেষ।

কেন কে জানে ভবভূতি সত্য গোপন করলো। বললো, 'কোথাও নয়? আমার তো টো টো কোম্পানীরই চাকরি।'

'সেই চাকরিই করছিস?'

'তা' ছাড়া কি আশা করছিস!'

'কেন, আর কিছু করা যায় না? ভালো কিছু?'

'ভালো?'

ভবভূতি হেসে উঠে বলে, 'ও জিনিসটা তো তোমাদের মত ভাগ্যবানদের জন্যে।'

অনিমেষ দার্শনিকের গলায় বলে, 'ঠাট্টা করছিস? করে নে। তবে ভাগ্যবান হয়ে জন্মাইনি রে ভবভূতি, ভগীরথের গঙ্গা আনার মত ভাগ্যকে আকাশ থেকে নামিয়ে আনতে হয়েছে।'

ভবভূতি বললো, 'আরে ব্যস! তুই যে আবার মেয়েদের মতো অভিমান শিখেছিস। এ রোগ তো ছিল না তোর।'

অনিমেষ উদাস ভাবে বলে, 'সাধে হইনি রে! অনেক দুঃখেই হয়েছি। ঈশ্বরের ইচ্ছেয় নতুন বিজনেসটায় টু পাইস হচ্ছে, কিন্তু অমনি হচ্ছে? অমনি হয়েছে, অনেক রক্তকে ঘর্ম করতে হয়েছে, তবেই না হয়েছে! অথচ দ্যাখ্ বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সকলের ধারণা এ সবই মুফতে হয়েছে, স্রেফ 'লাক'-এর ব্যাপার। যখন অসময়ে বাপ মরে গিয়ে কাকার গলগ্রহ হলাম, তখন কেউ তাকিয়ে দেখেনি, যখন সেই কাকারাও দূর-ছাই করে রাস্তায় বার করে দিয়েছিল, তখনও কেউ দেখতে পায়নি, এখন সবাই হতভাগা অনিমেষ ঘোষালের ভাগ্য দেখতে পাচ্ছে।

ভবভূতি গম্ভীর ভাবে বলে, 'আমাকে মাপ কর ভাই!'

অনিমেষ হঠাৎ হেসে ওঠে, 'আরে দূর, ও এমনি বলে ফেললাম। মনটা আজ তেমন ভালো নেই, তাই—'

'কেন? কী হলো?' বিজনেসে লোকসান?'

'বিজনেসে? তা'ও বলতে পারিস।' অনিমেষ সাবধানে গাড়িটাকে মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, 'একটা মেয়ে বড় দাগা দিয়েছে—'

'মেয়ে!' ভবভূতি মৃদু হেসে বলে, 'তাতে আর আশ্চর্য কী? পুরুষ জাতটাকে দাগা দেবার জন্যেই তো ওদের জন্ম।'

অনিমেষ ঘাড় ঘুরিয়ে ক্ষুব্ধ গলায় বলে, 'হেসে হেসে বলছিস! দাগা কখনো পাসনি কি না—'

ভবভূতি বলে, 'একেবারে কখনো পাইনি এমনই বা ধরে নিচ্ছিস কেন?'

অনিমেষ বলে, 'হুঁ! তাহলে আমার অনুমান ভুল নয়! মুখ দেখেই সন্দেহ হচ্ছিল, যেন এই মাত্তরই কে দাগা দিয়ে চলে গেল—'

'খুব বুঝেছো। এখন গাড়িটা থামাও। আমার ওই মোড়ে ছেড়ে দিয়ে চলে যাও—'

'তার মানে? ওখানে কি?'

'আছে দরকার।'

'আরে বাবা রেখে দে তোর দরকার। বাড়িতে মালপত্তর রেখে চল আমার সঙ্গে, কোথাও ঢুকে পড়ে কিছু খাওয়া যাক, আর দুটো সুখ দুঃখের কথা হোক।'

কিছু খাওয়ার প্রয়োজন যে অনুভব করছিল না ভবভূতি তা' নয়, কিন্তু এখন ওই বকবকানি তার ভালো লাগছিলো না। তবু বন্ধুর-সহৃদয়তা নিয়ে ডাকতে—বললো—'চল তবে!' মালপত্তর আর কি, ওই তো একটা ছোট সুটকেস আর এই এ্যাটাচিটা, থাকুক সঙ্গে।'

একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে খাবারের অর্ডার দিয়ে অনিমেষ বলে, 'এবার শুনি তোর দাগা খাওয়ার কাহিনীটা—'

'এই সেরেছে, খেয়েছি একথা কে বললো?'

'বলতে হয় না। মুখ দেখেই বুঝেছি।'

'বাজে কথা রাখ্, তোর কথাটাই বল বরং।

অনিমেষ হতাশ গলায় বললো, 'আমার আর কিই বা শুনবি, প্রেমও নয় ভালবাসাও নয়, স্রেফ অপমান।'

'অপমান!'

'হুঁ। জানিস, মনে মনে প্রতিজ্ঞা ছিল জীবনে প্রতিষ্ঠিত না হলে বিয়ে করবো না, মেয়েমানুষের দিক মাড়াবো না। তাই প্রতিষ্ঠিত হবার তালেই ঘুরে মরছি। তোদের শুভেচ্ছায় হলোও মন্দ নয়। বাড়ি হয়েছে, গাড়ি হয়েছে, ব্যাঙ্কেও টু

পাইস রাখতে পেরেছি। মনে হলো এবার বিয়ে করা যায়। লোক লাগালাম কনে খুঁজতে, কাগজে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হলো, জোগাড় হলো মেয়ে।...তোকে বলবো কি ভাই, সে যে কি মেয়ে, যেন ফুটন্ত গোলাপ! বাপের অবস্থা অবশ্য ভাল নয়, তাতে কি? আমিই অবস্থা ভাল করে দিতে পারি, সে হিন্টও দিলাম। বাপটা যেন হাতে চাঁদ পেল। কিন্তু জানিস, মেয়েটা নাকি বাপকে একখানি চরমপত্তর দিয়ে বাড়ি থেকে কেটে পড়েছে।'

'কেটে পড়েছে?' ভবভূতি বলে, 'তার মানে কিছু ইতিহাস ছিল—'

'না রে ভাই! তাহলে তো সান্ত্বনা ছিল। চলে গেছে মাসির বাড়ি। লিখে গেচে—'আমার থেকে বয়সে আঠারো বছরের বড় একটা লোককে বিয়ে করতে পারবো না।'

'তাই না কি?'

'তাইতো দেখছি।'

গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে যেতে যেতে অনিমেষ একটু পরে বলে ওঠে, 'কেন মিথ্যে অফিস অফিস করে র‍্যালা তুলছিস, এতোদিনে যদি গেছে তো এই একটা বেলাও যাক। তাতে তোর অফিস ডকে উঠবে না।'

'অফিস উঠবে না, আমিই ডকে উঠবো। ফর নাথিং একটা জায়গায় দেরী হয়ে গেলো কতোগুলো দিন।'

ছেড়ে দে। জীবনের সব দিনগুলোই ফর নাথিং বরবাদ হয়ে যায় বুঝলি? মনে কর আজও তুই কলকাতার বাইরে আছিস।'

'করলাম মনে, তারপর?'

'তারপর আমি যেখানে নিয়ে যাবো, সেখান যাবি।'

'তুই যদি জাহান্নামে নিয়ে যেতে চাস?'

অনিমেষ গম্ভীর ভাবে বলে, 'আমার সম্বন্ধে তোমাদের বোধহয় এই রকমই ধারণা? যেহেতু আমি একটু ড্রিঙ্ক-ফিঙ্ক করি, কেমন?'

ভবভূতি হতাশ ভাবে বলে, 'তুই এখনো সেই রকম ছিঁচ কাঁদুনে আছিস দেখছি। একটুতে মানের কানা খসে যায়। পৃথিবীর হাটে এতো চরে বেড়ালি, এতো পয়সাকড়ি করলি, স্বভাব বদলালো না? আমি কিছু ভেবে বলিনি বাবা! নে, যেখানে নিয়ে যাবার ইচ্ছে নিয়ে চল।'

তাই নিয়ে গেলো অনিমেষ।

যেখানে ইচ্ছে হলো।

সেই ইচ্ছের জায়গাটা হচ্ছে অনিমেষের নিজেরই বাড়ি। নতুন ঝকঝকে যে বাড়িটা তৈরি করেছে অনিমেষ অনেক খরচ করে। আর সাজিয়েছে আরো খরচ করে।

প্রায় সেই 'এই বিশ্বমাঝে যেখানে যা সাজে' গোছের সাজসজ্জা। কিন্তু কী লাভ যদি সবাই না দেখলো?

ভবভূতিকে নিয়ে এসে বসিয়েই চাকরকে ডেকে দুজনকে ভাত দেবার অর্ডার করলো।

এবং ভবভূতি স্নানটানের অজুহাত তুলতে, তাকে জোর করে নিয়ে ঠেলে পুরে দিলো নিজের অতি শৌখীন স্নানের ঘরে।

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ভবভূতি একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো, ভবভূতির একটা গভীর কালো বৃহৎ ইঁদারার কথা মনে পড়ে গেলো। যার সঙ্গে মিশে আছে একজোড়া গভীর কালো চোখের দৃষ্টি! যার মধ্যে শীতল হবার আহ্বান।

আশ্চর্য! কী করে মুহূর্তে সব কিছু পাল্টে গেলো!

তবে কি সত্যিই সেই দেশটায় যাদু আছে? যাদু আছে সেই নীচু বারান্দাওয়ালা ছোট বাংলোখানায়? তাই অনুভূতি রায়ও বলতেন, 'আপনার এখানটায় বসলে, পৃথিবী ভুলে যেতে হয় মিসেস হালদার!'

আমিই ব্যবহারটা ভালো করিনি—ভাবলো ভবভূতি। আমি অকারণ রুক্ষতা প্রকাশ করেছি। দূর অতীতের হেমলতা রায়চৌধুরী নামের এক মহিলা কোনো তীব্র জ্বালায় আত্মহত্যা করেছিলেন, এই খবরটা যদি মালবিকা চৌধুরী নামের মেয়েটা জেনেই ফেলে, কী এসে যায় ভবভূতি রায়ের? অথবা ভবভূতির তখন মনে হয়েছে, অনেক কিছু ক্ষতি হয়ে গেলো ওর। তাই অমন অদ্ভুত ব্যবহার করে বসলো মালবিকার সঙ্গে।

মালবিকার তো এতে অভিমান হতেই পারে। হতে পারে ক্ষোভ দুঃখ অপমান।

ভাবী স্বামীর পরিবারের কিছু না জেনে একেবারে অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়তে কোন্ মেয়ে চায়?

তবু মালবিকা তাই করতে চেয়েছিলো।

হঠাৎ যদি তার হাতে এমন একটা কিছু এসেই গেলো, যাতে সে ওই 'ভবিষ্যৎ'-টার অতীত দেখতে পাবে, কৌতূহলী হবে না?

ভবভূতি সেই কৌতূহলকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখলো।

অথচ—মালবিকার কাছে পঙ্কজিনী হালদার যেমন স্পষ্ট সত্য, ভবভূতির কাছে কি তেমন স্পষ্ট সত্য অনুভূতি রায়চৌধুরী আর হেমলতা রায়চৌধুরী?

ভবভূতি তো পরিচয়ের প্রধান চিহ্ন পদবীটাকেই কেটে ছেঁটে ছোট করে তাঁদের থেকে পৃথক করে নিয়েছে।

ভবভূতির যেন এতোদিন পরে হঠাৎই চোখে পড়লো, ভবভূতি তার পদবীর যে অংশটা বাহুল্য বোধ বর্জন করেছে, মালবিকার সেইটাই সব। আশ্চর্য, এতোদিন মনে পড়েনি কেন? মালবিকা চৌধুরী!

পুরো নামটা মনে মনে একবার উচ্চারণ করতেই হঠাৎ ভারী মন কেমন করে উঠলো ভবভূতির।... ভাবলো, কী একটা গাঁয়ের মতো কাজ করে এলাম আমি?

আজই এক্ষুণিই চলে যেতে হবে ওর কাছে।

ভবভূতি আবার সেই ইঁদারার কালো জলটা দেখতে পেলো। জলটা অনেক গভীরে, অনেকখানিটা দড়ি নামিয়ে তবে জল তুলতে হয়।

সঙ্কল্পে স্থির থেকে ভবভূতি ভারী একটা শান্তি পেলো, সাওয়ারটা খুলে দিয়ে তার জলধারার নীচে মাথা পাতলো।

'বৌয়ের গোছাবার জন্যে তো কিছুই রাখিসনি দেখছি—'

শুকনো তোয়ালেয় ঘাড় মুছতে মুছতে এসে বলে উঠলো ভবভূতি, 'নিজেই সবকিছু করে রেখেছিল। বৌ কি করবে?'

অনিমেষ যদি তেমন বাকচতুর হতো, হয়তো বলতো , ভরা কলসী উপুড় করে দিয়ে আবার ভরবে, সাজানো ঘর ছড়িয়ে ফেলে আবার সাজাবে।'

কিন্তু শেয়ার মার্কেটে ঘুরে ঘুরে ভোঁতা হয়ে যাওয়া অনিমেষ ওসব কথা বলতে জানে না, অতএব যা জানে তাই বললো।

মুখটা করুণ করে বললো, 'দেখলি তো ভাই? সব গুছিয়ে সিংহাসন পেতে রেখে ডেকেছিলাম, তাও তাকিয়ে দেখলো না। কয়েকটা বছর আগে পৃথিবীতে এসেছি বলে আমার দাম কমে গেলো? সব কিছু মিথ্যা হয়ে গেলো?

অনিমেষের মুখটা দেখে মায়া হলেও ভিতরে ভিতরে হাসি পাচ্ছিলো

ভবভূতির। কোনো দামই কমতো না, কোনো আয়োজনই মিথ্যে হতো না বাবা, বুড়ো দামড়া তুই যদি নিজের বয়সের উপযুক্ত একটা মেয়েকে বিয়ে করতে চাইতিস। তা না, তুই একখানি অষ্টাদশী তাজা গোলাপের দিকে হাত বাড়াতে গেলি।

পৃথিবীতে যে যতো আগে এসেছে, তার ততো দাম কমে যাচ্ছে। এটাই পৃথিবীর নিয়ম। আগে আসা মানেই তো পুরনো হয়ে যাওয়া।

কিন্তু মনে যাই ভাবুক, মুখে তো কিছু বলতে হবে? তাই হেসে বলে, 'সব মেয়েই তো আর তোমার ওই তাজা গোলাপটির মতো বোকা নয়? বাড়ি, গাড়ি, শাড়ি, গহনা ডানলোপিলোর গদি, পোর্সিলেনের বাথটব, ষোলো বাই ষোলো বাথরুম! এ সবের মর্ম বোঝবার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ের অভাব নেই। একটু বড়সড় বৌ খোঁজ।'

'আর চেষ্টা করতে ইচ্ছে করছে না।' অনিমেষ আরো দুঃখী গলায় বলে, 'মনটা কেমন ভেঙে গেছে। বড়বয়সের মেয়ের কথা বলেছে আমায় অনেকে, কিন্তু ভাই একটা তিরিশ-বত্রিশ বছরের মেয়েকে কি 'কনে বলে ভাবা যায়?'

ভবভূতি মনে মনে বলে ওঠে, কেন ভাবা যাবে না, খুব যায়। এই তো আমিই তো এখনই ভাবছি। তাকে হারাবার ভয়ে হাহাকার উঠছে প্রাণে।

মুখে বলে, 'দ্যাখ্ অনিমেষ, সেটা নির্ভর করে তার প্রকৃতির ওপর। ত্রিশ-বত্রিশেও আকর্ষণীয়া এমন মেয়ে নেই ভেবেছিস?'

অনিমেষ বলে, 'বলছিস?'

'বলছি তো।'

অনিমেষ ওর হাতটা চেপে ধরে বলে, 'তেমন মেয়ে আছে তোর জানা?'

ভবভূতি কৌতুকের ঝোঁকে হঠাৎ অসতর্ক হয়। হেসে ফেলে বলে, 'আছে, কিন্তু অপরকে বিলিয়ে দেবার জন্যে নয়!'

অনিমেষ চট করে কথাটার মানে ধরতে পারে না।

অনিমেষ একটুক্ষণ বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার পরই হৈ হৈ করে ওঠে, 'ওঃ বটে! ডুবে ডুবে জল খাওয়া চলছে তাহলে আর এতোক্ষণ চেপে যাওয়া হচ্ছিলো? তখনই সন্দেহ হলো, যেন কার হারিয়ে যাওয়া আঁচলের আভাসের দিকে তাকিয়ে আছিস ফ্যাল ফ্যাল করে।....বল শুনি বিবরণ। জীবনে তো কখনো জানলাম না 'প্রেম' জিনিসটা কী, পরের মুখেই ঝাল খাই। বল,

"সে কী জাতি কী নাম ধরে, কোথায় বসতি করে। কতোদিন ধরে চলছে প্রেমের খেলা?'

'ওরে বাস্। তুই যে ফোয়ারা ছুটিয়ে দিলি। তা ঘটক ডেকে কনে খুঁজে মরছিস কেন বাবা! প্রেমেই কর না একটা?'

অনিমেষ নিষ্প্রভ গলায় বলে, 'ও জিনিস কি আর 'করবো' বলে তাল ঠুকে করা যায় ভাই? ভাগ্যে সয়ে গেলে আসে। হঠাৎই আসে।'

ভবভূতি একটু সচকিত হলো, ভবভূতির মনে হলো, অনিমেষটাকে যতো গবেট ভাবছিলাম ঠিক ততোটা তো নয়!'

ভাগ্যে এসে গেলে আসে।

বড়ো খাঁটি কথা বলেছে।

ভবভূতি তার প্রমাণ। ভবভূতির এতোখানি বয়েস পর্যন্ত যা আসেনি, তা এসে গোলা হঠাৎই।

তরুণ যৌবনের দিনগুলি হৈ হৈ করে কাটিয়ে দিয়ে পরিণত যৌবনের এই স্থির শান্ত ঘাটে এসে এ কী অস্থিরতা?

বন্ধুর ভালোবাসা, বন্ধুর যত্ন, বন্ধুর আতিথ্য, এগুলো যেন বন্ধন মনে হচ্ছে, এখুনি চলে যেতে ইচ্ছে করছে, ইচ্ছা করছে ছুটে কাছে গিয়ে বলে, 'মালবিকা, তখন আমি একটা বর্বরের মতো কাজ করেছি। আমায় ক্ষমা করো। তোমার ভালোবাসা দিয়ে আমার মনকে মালিন্যমুক্ত করে নাও।'

কিন্তু এখনি যাওয়া চলছে না, বড়ো শক্ত পাল্লায় পড়ে গেছে। খুব ভালো করে খাইয়ে তবে ছাড়বে অনিমেষ, তার আগে কিছুতেই নয়।

খেতে বসে অনিমেষ আবার হেসে হেসে বলে, 'কই তোর রোমান্সের কাহিনী শোনা! কতোদিন চালাচ্ছিস?'

ভবভূতি মুখ তুলে হিসেব করে বলে, 'কতোদিন? সাড়ে সতেরো দিন।'

অনিমেষ বিশ্বাস করে না, মনে করে ভবভূতি ধাপ্পা দিচ্ছে, নয়তো ইয়ার্কি মারছে। কিন্তু ভবভূতি বলে, 'সত্যিই ভাই, সাড়ে সতের দিন আগে আমি তাকে চোখে দেখিনি, তার নাম শুনিনি। অথচ এখন মনে হচ্ছে সেই মহিলাটি ব্যতীত জীবনটা অর্থহীন।

অনিমেষ খুব সন্তর্পণে একটু নিশ্বাঃস ফেলে, 'এ রকমও হয় তাহলে?'

'হলো তো—'

'লাকী ম্যান! তা' শুভ কাজটি হচ্ছে কবে?'

'দিনস্থির করলেই হলো।'

'করে ফেল বাবা! আর কতো বুড়োবি? এখন মাঝে মাঝে কী মনে হয় জানিস? আমি বোধহয় ভুল 'ওয়ে'তে চলে এসেছি, 'অবস্থা ফিরিয়ে বিয়ে করবো!' মূর্খের ভাবনা। অবস্থা তুমি যখন হোক ফেরাতে পারো!' কিন্তু বয়েসটাকে কি ফেরাতে পারবে? আসল কথা বয়েসটাও তো একটা সম্পদ!'

ভবভূতির মনে হলো, ঠিক বলেছে অনিমেষ।

একটা করে দিন চলে যাওয়া মানে অনেকটা করে লোকসান।

কিন্তু সেদিন আর যাওয়া হলো না ভবভূতির। আশ্চর্যের আর লজ্জার কথা,—'খেয়ে উঠে পাঁচ মিনিট বসে যা' বন্ধুর এই নির্দেশ মানতে গিয়ে সোফায় আধশোয়া হয়ে বসে এমন ঘুম ঘুমিয়ে পড়লো, ভাঙতে একেবারে সন্ধ্যে পার হয়ে গেলো। এ সময় আর মেয়ে স্কুলের চৌকাঠ-ডিঙাতে পারা যায় না।

ভবভূতির মনে হলো, যেন বহুদিনের জমানো ক্লান্তি গ্রাস করে বসেছিলো তাকে।

তারপর মনে পড়লো, ভোরের গাড়ি ধরতে হবে বলে খুব বেশি ভোরে জেগে ওঠা হয়েছিলো আজ।

আজ সকালেও পঙ্কজিনী হালদারের গেস্টরুমের বিছানায় বসে আলস্য ভেঙেছে ভবভূতি, আর এখন মনে হচ্ছে সে যেন কতোদিনের কথা, যেন বহু যুগের আগের ঘটনা।

এমন মনে হচ্ছে কেন?

'মালবিকা' নামের একটা সত্তা যা নাকি সাড়ে সতেরো দিন ভবভূতিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো, সে আজ ভবভূতিকে 'মুক্তি দিয়ে যাচ্ছি' বলে ঘোষণা করে গেছে বলেই কি?

ভবভূতি ভাবলো, কাল গিয়ে বলবো—মালবিকা, মুক্তি দিলেই তো হলো না। কে চায় তোমার এই মুক্তি?

নমিতার সঙ্গে এতো খারাপ ব্যবহার আমি কেন করলাম?

স্তব্ধ হয়ে বসে ভাবতে লাগলো মালবিকা, নমিতার কপালেই প্রকাণ্ড লাল টিপটা আর সিঁথির জ্বলজ্বলে সিঁদুরটা দেখেই আমার মেজাজটা জ্বলে গেল কেন?

কেরাণীবাবুর সঙ্গে নমিতার নৈকাট্য বিরক্তিকর হাওয়ার পিছনে তবু যুক্তি আছে, কারণ সেখানে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নীতির প্রশ্ন আছে, কিন্তু নববিবাহিতার গৌরবোজ্জ্বল মুখ নিয়ে যখন এসে দাঁড়ালো নমিতা তখন তো সে প্রশ্ন নেই।

টেবিলে রাখা ওই সন্দেশের বাক্সটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজেকে ভারী ক্ষুদ্র আর নীচ মনে হলো মালবিকার। মালবিকা অনুভব করলো, নমিতাকে সে ঈর্ষা করছে।

যে গৌরবোজ্জ্বল সজ্জায় উদ্‌ভাসিত হয়ে পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়াবার জন্য মালবিকা স্পন্দিত হচ্ছিলো, কম্পিত হচ্ছিলো, সেই মূর্তিতে এসে দাঁড়ালো নমিতা। আর মালবিকার আসন্ন গল্পটি ভ্রষ্ট হয়ে গেলো। গেলো কিনা তুচ্ছ আর 'অকারণ' এক কারণে!

কী দরকার ছিলো মালবিকার রেল গাড়িতে উঠেই সেই অপয়া খাতাটাকে নিয়ে পড়তে বসায়?

মালবিকা তো এই যাত্রা পথটি আবেগ-মধুর করে তুলতে পারতো কয়েকদিন আগের সেই যাত্রা পথটির স্মৃতিচারণে?

মালবিকা তা করলো না, মালবিকা একটা মৃত স্মৃতি রোমন্থনকে তুলে নিয়ে এলো পুরনো কবর থেকে। মালবিকা সেই কবরে তার সদ্যজাগ্রত ভালবাসার সুখটিকে নিক্ষেপ করলো। মালবিকা অনায়াসে বললো, 'আচ্ছা নমস্কার!'

পঙ্কজিনী হালদারের তরুণী ভ্রাতুষ্পুত্রী মালবিকা এক মুহূর্তে 'মধ্য কলিকাতা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে'র মধ্যবয়সী হেড্‌মিস্ট্রেস হয়ে গেলো।

'দিদিমণি, আপনাকে দুটো সন্দেশ দিই?'

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো তরু। নমিতার সঙ্গে মালবিকার রুক্ষ ব্যবহারের কারণটা বুঝতে না পারলেও, তার কুশ্রীতাটা বুঝতে পেরেছে তরু। তরু তাতে মর্মাহত হয়েছে, এবং আশঙ্কা করছে দিদিমণি ওই বাক্সর সন্দেশের এক টুকরোও মুখে না দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে কিনা।

কিন্তু সেটা জিজ্ঞেস করাও তো মুস্কিল! যদি বা অন্যমনস্ক হয়ে খেয়ে ফেলতো, খাবে কিনা জিজ্ঞেস করতে গেলে তো উল্টৈ উৎপত্তি হবে।

তাই তরু দেবো কিনা জিজ্ঞেস না করে বুদ্ধি খাটিয়ে বললো, দুটো দেব কিনা!

মালবিকা চমকে উঠলো।

প্রথমেই বলতে গেলো, 'একটাও খাবো না'—তারপই সেই শ্রীহীন কুশ্রীতাটা নজরে এলো। প্রতিক্রিয়ায় তাড়াতাড়ি বলে বসলো, 'দুটো ছেড়ে চারটে দিলেও মেরে নিতে পারবো তরু, যা খিদে পেয়েছে দারুণ! তাছাড়া নমিতার বিয়ের সন্দেশ!'

তরু মনে মনে লজ্জিত হলো, ভাবলো, শুধু শুধু আমি ওই মানুষকে নিন্দে করছিলাম! আহা শোকাতপ হয়ে এসেছে—

তাড়াতাড়ি সত্যিই চারটে সন্দেশ ওর প্লেটে চাপিয়ে দিয়ে নিয়ে এলো চায়ের কাপ।

মালবিকা হাসলো। দুটো সন্দেশ তুলে ওর হাতে দিয়ে বললো, 'নমিতাকে বলিস তরু, সন্দেশ খুব ভলো।'

তারপর আর একটু যোগ করলো, 'খুব ভোরবেলায় বেরিয়েছি, চানটান হয়নি। তখন এতো খারাপ লাগছিলো, কোনো কথাই বলা হলো না ওকে—'

এটা আর কিছুই না, তরু মারফৎ কৈফয়ৎ আর ক্ষমা চাওয়াটি নমিতার কাছে পৌঁছে দেওয়া।

এখন একটু শান্তি লাগছে।

একটা রূঢ় ব্যবহারের ত্রুটি খানিকটা পুরণ করে নেওয়া গেলো।

কিন্তু আর একটা অহেতুক রূঢ়তার ত্রুটি? সেটা পূরণ করে নেবার উপায় কথায়?

না, কোনো উপায় নেই।

মূর্খ মালবিকা তার প্রেমাস্পদের ঠিকানা জানে না।

'দিদিমণি, অবেলায় ভাত খাবে, না দুখানা রুটি করে দেবো?'

জিজ্ঞেস করলো তরু, কারণ বেশি বেলা হয়ে গেলে ভাত খেতে চায় না মালবিকা।

এখন মালবিকা রুটির প্রসঙ্গে শিউরে উঠে বললো, 'পাগল হয়েছিস? আর কিছু খাবো না, তুই নিশ্চিন্তি হয়ে ঘুমোগে যা। আমিও একটু বিশ্রাম করি।'

অর্থাৎ 'তুমি বিদায় হও হে হিতৈষিণী।'

এখন মালবিকা শোবে, এখন মালবিকা মনের সিন্ধুকটা তন্ন তন্ন করে দেখবে, কোথায় কোনো ঠিকানা জমা আছে কিনা।

অনেকক্ষণ ভাবতে ভাবতে হতাশ হয়ে গিয়েছিলো। হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠে

পড়লো মালবিকা। যে নাকি নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছে। এই শহরের জনারণ্যে হারিয়ে যেতে দিয়েছে তার প্রিয়জনকে।

আচ্ছা, ওই খাতাখানার ভিতরে কোথাও কোনো কোণে থাকতে পারে না অনুভূতি রায়ের ঠিকানা? সেই ঠিকানাকে অবলম্বন করে পাওয়া যেতে পারে না অনুভূতি রায়ের ছেলের হদিস?

সুটকেস খুলে খাতাটা নিতে গিয়ে অবাক হয়ে গেল মালবিকা, খাতাটা নেই।

অথচ মালবিকার স্পষ্ট মনে রয়েছে, যখন পড়তে বিরক্তি লাগছিল, সুটকেসটা খুলে শাড়িটাড়ির ওপরেই রেখে দিয়েছিল। কোথায় গেল সে খাতা?

অধীর হয়ে বাক্সের ভিতরের জিনিসগুলো লণ্ড ভণ্ড করে ফেললো, তচনচ করে ফেললো, শেষে গুম্ হয়ে বসে থাকলো।

একটুখানি আগে হৃদয়ে যে ব্যাকুলতার বাঁশিটি বাজছিলো, যে কোমল মাধুর্যে হৃদয় নম্র নত হয়ে একটি সমর্পণের মন্ত্রে লুটিয়ে পড়তে চাইছিলো, আর সকল অপরাধ নিজের দিকে চাপিয়ে চাপিয়ে ভারাক্রান্ত হচ্ছিলো, সেই মন কঠিন হয়ে উঠলো একটা ক্রুর সন্দেহে।

সন্দেহ?

না নিশ্চিত?

নিশ্চিতই। আর কী হতে পারে?

আর কী হওয়া সম্ভব?

কী নীচতা!

কী ক্ষুদ্রতা! কী মানসিক দৈন্য!

ঈশ্বর! তুমি মালবিকাকে রক্ষা করেছো। এই লোকের কাছে নিজের উৎসর্গ করতে বসেছিলো মালবিকা।

ভয়ানক একটা যন্ত্রণায় অনেকক্ষণ ছটফট করতে লাগলো মালবিকা তারপর আস্তে আস্তে শান্ত হতে চেষ্টা করলো। বার বার বলতে লাগলো, 'ঈশ্বর, তোমার কতো দয়া!'

শুধু একটা 'হায় হায়' ভাব রয়ে গেলো মনের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত পড়া হয়নি খাতাটা। কে জানে আরো কী ছিলো শেষের দিকে! যার থেকে ওই ছদ্মবেশী লোকটার ছদ্মবেশের অন্তরালে আসল চেহারাটা আবিষ্কার করা যেতো।

অনিমেষ ছাড়লো না, গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এলো, বললো, 'দে ভাই, একটু করতে দে। তুই প্রিয়া দর্শনে যাচ্ছিস, এ ভেবেও মনের মধ্যে সিরসিরে দখ্‌নে হাওয়া বইছে!'

ভবভূতি হেসে বললো, 'আজকালের মধ্যেই তোর একটা বিয়ের দরকার। নচেৎ বাউরা হয়ে যাবি।'

অনিমেষ বললো, 'না রে! চোখের সামনে জলজ্যান্ত একটা প্রেমে পড়া লোক দেখে হঠাৎ মনটা যেন কেমন করে উঠেছে।'

মালবিকার স্কুলের সামনে দিয়ে গেলো, 'কনগ্যাচুলেশান!'

ভবভূতি গান গাইতে জানে না, তবু যেন মনের মধ্যে গান গুন-গুনিয়ে উঠছে।

ভারী মজা লাগছে স্কুলটার সামনে এসে।

এ পথে কত এসেছে গিয়েছে, কতোবারই এই 'মধ্য কলিকাতা বালিকা বিদ্যালয়ে'র বিল্ডিংটা দেখেছে, কে ভেবেছিলো, এই ইঁটকাঠের অন্তরালে ভবভূতির নিয়তি অবস্থিত।

এখন সন্ধ্যা হয় হয়, এখন স্কুলবাড়ি নিস্তব্ধ, গায়ে যত ইচ্ছে জল ঢেলে কিছুটা স্নিগ্ধ হয়ে, হালকা পাতলা একটা শাড়ি ব্লাউস গায়ে চাপিয়ে চায়ের পেয়ালাটা নিয়ে বসেছিলো মালবিকা। আর ভাগ্যের রহস্য নিরূপণ করার চেষ্টা করছিলো!.....মালবিকার জীবনের উপর মাত্র দিন কয়েকের একটা ঘটনাপিণ্ড যেন আছড়ে পড়ে মালবিকার অতীতের সঙ্গে বর্তমানকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে গেল, যোগসূত্র ছিন্ন করে দিয়ে গেল ভবিষ্যতের রেখার সঙ্গে।

এখন আর ওটা অনেকগুলো দিনরাত্রির সমষ্টিতে গড়া জীবনের একটা অংশ নয়, ওর প্রতিটি দিনরাত্রিকে তুলে ধরে বিষণ্ন নিঃশ্বাসের সঙ্গে দেখতে ইচ্ছেও করবে না, ও শুধু জীবনের খানিকটা অংশের উপর একটা পাথরের চাঁইয়ের মত বসে থাকবে নিঃশ্বাস আটকে দিয়ে।

ভাবতে চেষ্টা করছে, ভয়ানক একটা বিপদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে গেছি, আবার আমি 'আমার আমি' তো স্থির হয়ে বসি, কিন্তু হচ্ছে না, ওই পাষাণভারটা কিছুতেই অতীতের ছেঁড়া সুতোটাকে কুড়িয়ে এনে বর্তমানের জালের সঙ্গে জুড়ে নিতে পারছে না, যে জালটা বুনতে বুনতে এগিয়ে নিয়ে যাবে নিজেকে, সেই পুরনো ছাঁচে!

না, বিয়ে করবার কল্পনা ছিলো না মালবিকার, স্বাধীনতা খর্ব করে কারো ইচ্ছের তলায় ইচ্ছে মিশিয়ে চলার কথা ভাবতেই পারতো না সে, হঠাৎ যেন একটা কুটিল গ্রহ মালবিকার সব কিছু উল্টে পাল্টে দিয়ে অবশেষে মালবিকাকে আছাড় মেরে ফেলে দিয়ে চলে গেল।

বহু সাধনায় গড়া এই স্কুলটাকেও আজ যেন অর্থহীন মনে হচ্ছে। কী এসে যায়, যদি মালবিকা এই বোঝা নামিয়ে রেখে হালকা হয়ে একদিন সামান্য কয়েকটা জিনিস নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ট্রেনে চেপে বসে, আর তারপর সেই কাঠের গেটওয়ালা বাড়িটার সামনে গিয়ে নামে, ঠুং ঠুং সাইকেল রিকশায় চেপে?

হালদার কুটিরের মোহময় শান্ত শান্তি, যা পঙ্কজিনী হালদার নামের এক অসম্পূর্ণ অশান্ত আত্মাকে শান্তি দিয়েছিলো, দিয়েছিলো সম্পূর্ণতা, তা পঙ্কজিনীর উত্তরাধিকারিণী মালবিকা চৌধুরীকে দিতে পারবে না?

এক অনাহৃত প্রকৃতির গভীর নির্জনতায় তলিয়ে গিয়ে শুধু নিজেকে নিয়ে থাকারও যে একটা মদির নেশা আছে, তা তো নিজের চোখেই দেখে এসেছে মালবিকা।

মালবিকা ভাবতে চেষ্টা করছিলো, স্কুলটাকে সতিাই নিজের হাত থেকে নামিয়ে অন্য কারুর হাতে সমর্পণ করতে কী করতে হয়, এই সময় তরু এলো, বললো, 'দিদি, একজন ভদ্রলোক এসেছেন দেখা করতে।'

মালবিকার বুকটা ধড়াস করে উঠলো।

মালবিকার মনে হলো আর কেউ নয়, সে-ই। সঙ্গে সঙ্গে মনটা কঠিন হয়ে উঠলো। সেই কাঠিন্য নিয়ে বললো, 'বলগে উনি এখন বিশ্রাম করছেন, দেখা হবে না।'

তরু এমন অনাসৃষ্টি কথায় রাজী হলো না। তরু খুঁত খুঁত করে বললো, 'ভালো ভদ্দর লোক, ভালো জামা জুতো পরা—'

'ভালো জামা জুতো পরলেই ভালো ভদ্রলোক হবে তার মানে নেই তরু, যা বলছি করো।'

তরু জানে এর ওপর কথা নেই।

যাই মলিন ভাবে চলে গেলো।

আর তখনই মনে এলো মালবিকার, নামটা জিগ্যেস করতে বলা উচিত ছিলো। অন্য কেউও হতে পারে।

কিন্তু তখন তরু চলে গেছে।

মালবিকা সেই মুহূর্তে ভয়ানক একটা অস্থিরতা অনুভব করলো। এই অস্থিরতার কারণও ঠিক করে ফেললো। যদি আর কেউ হয়, মালবিকার ভদ্রতার অভাবকে সমালোচনা করতে পারে। যেটা একজন শিক্ষয়িত্রীর পক্ষে ক্ষতিকর।..যে স্কুলটাকে তুলে দেবার, অথবা হাত থেকে ফেলে দেবাব চিন্তা করছিলো এতোক্ষণ, হঠাৎ তার শুভাশুভটা ভয়ানক জরুরি মনে হলো মালবিকার।

অবশ্য সবই কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার।

মালবিকা তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো।

তরু ভদ্রলোককে বিদায় করবার আগেই যাতে বসবার ঘরে পৌঁছানো যায়।

চটিটা পায়ে গলিয়ে পাতলা শাড়ির আঁচলটা সামনে টেনে নিয়ে বাইরের দিকের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েই থমকে গিয়ে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলো।

অথচ এই আশঙ্কাটাই তো ছিলো ষোলো আনা।

ভবভূতি দরাজ গলায় বলে উঠলো, 'প্রথম কথা, একটু চা খাবো।' বললো প্রায় তরুকে লক্ষ্য করেই।

অর্থাৎ ওই অবান্তর লোকটাকে চোখের সামনে থেকে সরানো দরকার।

তরু ভাবলো, দেখেছো, এই চেনা-জানা মানুষটাকে কিনা না বুঝে ভাগাচ্ছিলো দিদি, তাই তাড়াতাড়ি 'এই যে' বলে চলে যেতে গেলো। হঠাৎ তার কানের উপর বোমা পড়লো।

সেই বোমার শব্দটা এই—'থাক্ তরু, চায়ের এখন অসুবিধে আছে।'

তরু অস্ফুটে কী একটা বলে আস্তে সরে গেলো। গিয়ে কি জানি কাকে স্মরণ করে কপালে দুই হাত তুলে বললো 'নমস্কার।'

ভবভূতি কিন্তু হাসলো!

কারণ বোমাটা এতই অবিশ্বাস্য যে, মনে হওয়া স্বাভাবিক ওটা খেলার বোমা।

ভবভূতি তাই হেসে ফেলে বললো, 'দারুণ চটে গেছো মনে হচ্ছে—'

মালবিকা স্থির গলায় বললো, 'অনুগ্রহ করে আমায় 'আপনি' করে কথা বলবেন না।'

ভবভূতি তবুও এই ঘটনার মধ্যে কৌতুক রসের সন্ধান পেলো। তাই আবারও বললো, 'সত্যি রাগ করতেই পারো, কাল এমন বোকার মত কাজ করলাম—'

মালবিকার চোখের কোণে আগুন জ্বলে উঠলো।

আবার এই ছদ্মবেশী অসৎ লোকটা মালবিকার উপর জাল বিস্তার করতে চাইছে। কে জানে মালবিকা নামের ভূতগ্রস্ত মানুষটা আবারও সেই জালে পড়তে যাবে কিনা।

যদি অনন্তকাল থেকে মেয়েদেরই শুধু বদনাম 'মোহিনী' বলে, 'মায়াবিনী' বলে।

মায়াবী পুরুষ হয় না? না হলে, আবহমান কাল থেকে কোটি কোটি মেয়ে পথভ্রষ্ট হয় কিসের আকর্ষণে? কিসের মোহে শ্রেয়কে হারিয়ে বসে, বিয়ের ফুল তুলে মালা গেঁথে গলায় দেয়?

পুরুষের মোহিনী মায়া বুঝি মেয়েদের থেকে অনেক বেশি। পুরুষ যেমন ভাবে অনুতপ্তের ভান করতে পারে, মেয়েরা বুঝি তেমন পারে না। মেয়েরা ওই ভানের কাছে পরাজিত হয়।

কিন্তু মালবিকা হবে না।

মালবিকা যথেষ্ট বোকামী করেছে, আর করবে না।

মালবিকা তাই আরো নির্মম গলায় বলে, দেখুন, ছদ্মবেশ যতই নিখুঁত হোক, একদিন তা' ধরা পড়েই, মুখের মুখোস সব সময় এঁটে রাখা যায় না।'

'মালবিকা, কী বলছো তুমি?'

'যা বলছি, তা' আপনি বুঝতে পারছেন না তা' নয়, কিন্তু আপনার মুখোসটা যতই নিখুঁত হোক, আমার চোখে গোড়া থেকেই ধরা পড়েছে. তবে যাক, আপনার পারিবারিক কলঙ্কের কাহিনী সেই খাতাখানাকে সরিয়ে ফেলে ভালোই করেছেন। ও আপনার কাছেই থাক্ আমার কোনো কাজে আসবে না।'

ভবভূতি খুব শান্ত গলায় বলে, 'মালবিকা, তোমার কোথাও কোনোখানে একটা বিরাট ভুল হচ্ছে।'

মালবিকা মুখ ফিরিয়ে বলে, 'হচ্ছে নয়, হয়েছে। বিরাট ভুল হয়েছে সেদিন আপনাকে নিয়ে গিয়ে ইঁদারার ঠাণ্ডাজল দেখিয়ে দেওয়া। বিরাট ভুল হয়েছিলো পঙ্কজিনী হালদারের গেষ্টরুমে সম্ভ্রান্ত অতিথির মত থাকতে দেওয়া, আর বিরাট ভুল হয়েছিলো তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যুর পর প্রতিবেশীদের সন্দেহকে উড়িয়ে দিয়ে যেখানে সন্দেহের প্রয়োজন ছিলো, সেখানে সেটা না করা।'

কথাটা বলে ফেলে অবাক হয়ে যায় মালবিকা। এটা সে কী বলে বসলো? এমন ভয়ঙ্কর কথাটা কোথায় তৈরী হচ্ছিলো? মুহূর্তের জন্য যে কথা মনের

কোণেও উঁকি মারেনি, সেকথা এমন স্পষ্ট একখানা চেহারা নিয়ে দাঁড়ালো কী করে?

মালবিকা নিজের জিভের এই ক্রুর শত্রুতায় অবাক হয়ে গেলো।....

মদের নেশা নাকি মানুষের মুখ দিয়ে যা তা বলিয়ে নেয়।

কটু কথার নেশাও কি তাই? এইভাবেই মানুষকে যা নয় তাই বলিয়ে নেয়?

ভবভূতির মুখটায় কোনো যন্ত্রণার রেখা ফুটে ওঠেনি। না, কোনো অভিব্যক্তিই নয়, কংক্রীটে গড়া মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে ভবভূতি।

নেশাচ্ছন্ন মালবিকা কী বলছে, তাও যেন তার কোথাও সাড়া তুলছে না।

মালবিকা যখন চেয়ারে বসে পড়ে হাঁপাচ্ছে, তখন কথা বললো ভবভূতি।

বললো, 'কিন্তু সময় চলে যায়নি মালবিকা দেবী, এখনো আপনি আপনার পিসিমার মৃত্যুর জন্য দায়ী তার গেষ্টের নামে কেস করতে পারেন। তাতে আপনার সেই প্রতিবেশীনীরা ঠিকই সাক্ষ্য দেবে। এবং এটা প্রতিপন্ন করা শক্ত হবে না, ডাক্তারকে ঘুষ খাইয়ে তাড়াতাড়ি লাশ জ্বালিয়ে ফেলা হয়েছিলো...আরো বেশি ঘুষ পেলে ডাক্তার নিজেই দিতে পারে সাক্ষ্য।....আর আপনি? সেও প্রমাণ করা শক্ত হবে না।

আপনাকে খুন করে ফেলবার ভয় দেখিয়ে অনুগত করিয়ে রেখেছিলাম।...

'এখন বুঝতে পারছি, আপনি প্রথম থেকেই যে আমাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছিলেন, সেটা ঠাট্টা নয়!'

ভবভূতি একটু হাসলো, বললো, 'অবশ্য আমার জীবনেই সবটাই আমার কাছে ঠাট্টা। যাক্ তাহলে গুড্‌বাই! জানি না সেই অভিশপ্ত খাতাখানায় কী কঠিন কথা লেখা ছিলো, যাতে করে আপনাকে এতো কঠিন করে তুলেছে। পারেন তো আপনার জীবন গ্রন্থ থেকে এই দুঃখের, লজ্জার, পরিতাপের আর কলঙ্কের অধ্যায়টি ছিঁড়ে ফেলে দেবেন।'

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ভবভূতি।

মালবিকা তাকিয়ে থাকলো সেই দিকে, সাড়াহীন মানুষের মতো।

বলতে চেষ্টা করলো, 'তরু, দরজাটা বন্ধ করে দাও।' পারলো না। করিডোরের ওই দরজাটা বন্ধ করে দিলে এই অফিসরুম সমেত মালবিকার বসবাসের অংশটা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়। অন্য দিদিমণিরা আড়ালে হেসে হেসে বলে, 'প্রোটেকটেড্ এরিয়া।

কিন্তু এখন ওই প্রোটেকশনটা দেবার কথা বলে উঠতে পারছে না মালবিকা। মালবিকাকে 'বোবা'য় পেয়েছে।'

মালবিকার দেহটাকেও যেন কেউ এই চেহারাটার সঙ্গে স্ক্রু দিয়ে এঁটে দিয়েছে, নইলে মালবিকার প্রাণটার সঙ্গে তো চলেই যেতে পারতো দেহটা। বলতে পারতো, 'খুব রাগ হয়েছে, এখন চলুন তো! চা না খেয়ে কেমন চলে যান দেখি! কেমন চলে যান 'গুড্‌বাই' করে!'

কিন্তু হলো না সেটা।

কোনো কুটিল শক্তিধারী অদৃশ্য ব্যক্তি মালবিকার কথা বলার ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে, নিয়েছে উঠে দাঁড়াবার।

তরু সন্ধ্যার আলো জ্বেলে দিয়ে গেল একটু আগে। তরু আর আসবে না এদিকে, কিছু অনুমান করছে সে।

কিন্তু ও কী? ও কে? দীর্ঘছাদের মানুষটা আবার দরজায় কেন? মালবিকার মাথাকোটার বাসনার প্রবল শক্তি তাহলে ওই মূর্তির ছায়াকে মালবিকার দরজায় এনে দাঁড় করিয়েছে। ওকি সত্যি, না ছায়া?

ছায়ামূর্তিটা আস্ত অবয়ব নিয়ে এগিয়ে এলো ঘরের মধ্যে, একটি শীতল ধাতব গলায় বললো, 'গুড্‌বাই করে চলে যাওয়াটা উচিত হয়নি আমার—'

মালবিকার মনের মধ্যে একটা প্রবল ভূমিকম্পের আলোড়ন ওঠে, মালবিকা উদ্বেলিত হয়। ওই আলোড়নে মালবিকার বুকের মধ্যে ঝনঝনিয়ে একটা বন্য বাজনা বেজে ওঠে, সেই বাজনা মালবিকাকে ঠেলে নিয়ে যেতে চায় টেবিল চেয়ার উল্টিয়ে দরজার কাছে পৌঁছে মালবিকাকে আছড়ে ফেলে দিতে চায় ওই চলে গিয়ে ফিরে আসা ক্ষমাপ্রার্থী লোকটার বুকের উপর!....মালবিকা দাঁড়িয়ে ওঠে।

হে ঈশ্বর, মালবিকাকে এই দুর্বলতা থেকে রক্ষা করো!

মালবিকা টেবিলের কোণটা ধরে নিজেকে সামলায়।

তা' মালবিকার ঈশ্বরের ক্ষমতা আছে বলতে হবে। মালবিকাকে দুর্বলতা প্রকাশের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যেই বোধহয় পরিস্থিতির মোড় এমন ঘুরিয়ে দিলেন যে, মালবিকা আবার পাথর হয়ে গেলো।

যে ক্ষমা চাইছিলো, সে তার কথা শেষ করলো এই ভাবে—'আমাকে যখন

চোর এবং হত্যাকারী বলে সন্দেহ হয়েছে আপনার, তখন পুলিশে ধরিয়ে দিন? প্রমাণ সংগ্রহ করে শাস্তি দেওয়ান? কেন ছেড়ে দেবেন?'

এতক্ষণে মালবিকা কথা বলতে পারে। বলে, 'এই কথাটা বলবার জন্যে আপনি আবার ঘুরে এলেন?'

ভবভূতি বললো, 'হ্যাঁ সেটাই উচিত মনে হলো আমার।'

'আপনার উচিত বোধের জন্য ধন্যবাদ। আপনার জন্যে শাস্তির দরকার নেই, ইচ্ছে করলেই আপনি একজন ধর্মগুরুর পোষ্ট নিতে পারেন। দেশের উপকার হবে।'

'আমার দিক থেকে যা করার করতে চাইছি। আপনি অনায়াসেই কেস করতে পারেন।'

বাজনাটা থেমে গেছে, ঝাঁপিয়ে পড়বার দুরন্ত ইচ্ছাটা গরম রক্ত হয়ে সমস্ত মুখটা দিয়ে ফেটে পড়তে চাইছে, মালবিকা সেই ফেটে পড়া গলায় বলে, 'আপনি কি চান আপনাকে চলে যেতে বাধ্য করবে? আপনার নতুন অভিসন্ধিটা কী?'

হঠাৎ ভবভূতির মুখে একটু হাসি ফুটে ওঠে, হাসি, কিন্তু ম্লান বিষণ্ণ।

ভবভূতি সেই বিষণ্ণ হাসি মুখে বলে, 'ঠিকই ধরেছো মালবিকা, নতুন একটা অভিসন্ধি নিয়েই এই কথাটা সজিয়ে এনেছিলাম। চলে গিয়ে মনে হলো, কী পাগলের মত কাণ্ড করছি দু'জনে! আমরা কি অবোধ শিশু? তাই তুচ্ছ একটা খাতা নিয়ে ঝগড়া করে 'জন্মের আড়ি' করে দিতে চাইছি? কিন্তু চলে গিয়ে এক্ষুণি ফিরে এসে আর কি বলা যায়, ক্ষমা চাইতে এলাম ঝগড়া মেটাতে এলাম? তাই তোমায় রাগিয়ে কাজটা সিদ্ধি করতে এসেছিলাম। দেখছি ভুলই হয়েছে। এবার সত্যিই চলে যাচ্ছি।.....তবু বলে যাই যদি তোমারও কোনোদিন হঠাৎ মনে হয়, এই আড়ি করে দেওয়া খেলাটা কী ছেলেমানুষীই হয়েছে, তাহলে একবার একটু ডাক দিও, ঠিক চলে আসবো? মান করে বসে থাকবো না।'

এবার সত্যিই চলে যায়।

নিশ্চিত, চিরকালের মতো।

মালবিকা যেমন একথাও বলে উঠতে পারেনি, 'আবার আপনি আমায় 'তুমি' করে কথা বলছ কেন?' তেমনি বলে উঠতে পারলো না, 'ডাকটা দেবো কেমন করে? আমি কি আপনার ঠিকানা জানি?'

জানে না তো। ভবভূতি নামের ওই যাদুকর লোকটার ঠিকানা জানে না বলেই না মালবিকা—

সেদিনও জানতো না, আজও জানলো না। আর আগেও কোনদিন জানেনি। কারণ যখনই ও সামনে এসে দাঁড়ায়, যেন যাদুমন্ত্রের প্রভাবে সব কিছু ভুলিয়ে দেয়।...তখন যেন আর মনে হয় না পৃথিবীতে আর কোনো কাজ আছে, কোনো দরকার আছে, আর ওকে অনেক কিছু বলবার আছে।

ওর উপস্থিতির সময়টুকুও যেন সমস্ত জগৎকে ভুলিয়ে দেয়।

কিন্তু তারপর?

তারপর শুধু শূন্যতা।

নীরেট গভীর অবিচ্ছিন্ন একটা শূন্যতা।

তরু রাতে কী খাবার হবে জানতে ডাকতে এসে দেখলো সেই ভাবেই বসে আছে মালবিকা। যেন ওর আর কিছুই করার নেই, ওর জীবনের সব কাজ ফুরিয়ে গেছে।

বোকা হোক, মুখ্যু হোক, তবু তরু মেয়েমানুষ। তরুর বুঝতে দেরী হয় না আছে ব্যাপার! ঘটেছে কিছু!

তারপর মনে মনে বলে, গেল তো চলে! অহঙ্কারী মেয়েছেলের এই দশাই ঘটে। দেখছি তো এ যাবৎ কী ডাঁট! কী অহঙ্কার!

অনিমেষ, বাড়ি ফিরে দেখলো, 'ভবভূতি তার ঘরে বসে।

অনিমেষ লাফিয়ে উঠে বললো, 'মহারাজ এইখানে? আর আমি শালা ফেরার সময় ফের তোমায় তুলে আনবো বলে মহারাণী দরজা থেকে ফিরে এলাম।'

ভবভূতি অবাক হয়ে বললো, 'তার মানে?'

'মানে তো কিছু না ভাই, আসার তো পথেই পড়বে, ভাবলাম তোকে গাড়িতে তুলে নিয়ে তোর বাড়ির দরজায় ছেড়ে দিয়ে চলে আসবো। পাছে তাড়াতাড়ি গিয়ে পড়লে গাল দিস, তাই বরং একটু ঘুরে ফিরে দেরী করে গেলাম। ওমা, দারোয়ানটা বললো কি না, 'বাবু তো চলা গিয়া! এক দফে চলা গিয়া, ফিন আয়া, থোড়া টাইম বাদ ফিন্ চলা গিয়া!' মাথা মুণ্ডু বুঝলাম না, বললাম ভিতরে খবর দাও। খবর দিতে একটি, কী বলবে, ইয়ে হ্যাঁ

পরিচারিকা এসে বললেন, 'দিদিমণির মাথা ধরেছে, ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে আছেন, দেখা হবে না।'...আমি বাবা ঘাবড়ে মাবড়ে পালিয়ে এলাম! মেয়েস্কুলে তো সবই দিদিমণির ব্যাপার, কাকে ডাকতে কাকে ডাকবে! তা' ব্যাপারটা কী? ঝগড়া বাধিয়ে চলে এসেছিস নাকি? ওদিকে ট্যাবলেট, এদিকে মুখ দেখে মনে হচ্ছে এই মাত্তর পরিবারকে পুড়িয়ে শ্মশান থেকে ফিরেছিস! তাজ্জব বনে যাচ্ছি।

ভবভূতি এই অনর্গল কথার শেষে হাসির মত করে বলে, 'তাহলেই বোঝো প্রেমে পড়ার কী ঠ্যালা!'

অনিমেষ সোফায় বসে পড়ে বলে, 'এই বুড়ো বয়সেও এই সব?'

ভবভূতি আর একটু হাসে, 'ব্যাধির লক্ষণ কি বয়েসে তফাৎ হয়? ম্যালেরিয়া জ্বরে তুই আমিও কাঁপবো, বাচ্চা বুড়োও কাঁপবে।'

অনিমেষ উদাস ভাবে বলে, 'হবে। ওসব তোর বিজনেস তুই বুঝিস্। আমি আর নাক গলিয়ে কী করবো? গিয়েছিলাম অবশ্য একটু আশা করেই, যদি দর্শন ঘটে, তা' 'ভাগ্যে না থাকলে যা হয়। দাসী এসে ট্যাবলেট শুনিয়ে গেলো। যাগগে মরুক গে, একটু কফি খাওয়া যাক আয়।'

তারপর?

তারপর ধূসর শূন্যতা।

শুধু 'মধ্য কলিকাতা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে'র বড় দিদিমণির কঠিন মেজাজ দিনে দিনে আরও কঠিন হতে থাকে, স্কুলের নিয়মের কড়াকড়ি আরো কড়া হতে থাকে, এবং তাঁর কণ্ঠস্বরের লালিত্য অন্তর্হিত হতে হতে চেহারার লালিত্য লাবণ্যও ক্রমশঃ অন্তর্হিত থাকে।

কিন্তু শুধু একটা ঠিকানা না জানার জন্যে এমন ঘটনা ঘটে, এর চাইতে হাস্যকর আর কী আছে?

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া যায় না 'হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশে'র কলমে?

'ভবভূতি রায় আপনার ঠিকানা জানান, মিস চৌধুরী।

অথবা—'ভবভূতি রায়, ঠিকানা জানা না থাকায় অসুবিধা বোধ করছি—মিস চৌধুরী।'

'মিস চৌধুরী'টা লিখতে যদি অস্বস্তি হয়, 'পোষ্ট বক্স নম্বর'ও দেওয়া যায়,

যার জন্যে দেওয়া সে ঠিকই বুঝবে। সে বিজ্ঞাপনের ভাষা হয়তো একটু অন্য রকম করতে হবে।

তবে যা লিখতে যায়, বোকাটে মনে হয়, এই যা অসুবিধে। ভবভূতি রায় ব্যতীত জগতের আর কেউ যাতে বুঝতে না পারে, এমন একটা ভাষা তো লিখতে হবে?

মাথাধরা ছেড়ে উঠে বসেই তো মালবিকারও প্রথমে মনে হয়েছিলো, কী একটা ছেলেমানুষীই করা হলো। ভবভূতির সেই কথাটা বারবার মনে পড়ে লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করছিলো, 'আমরা যেন দুটো বাচ্চা, তাই একখানা খাতা নিয়ে ঝগড়া করে 'জন্মের আড়ি করে বসছি।'

মালবিকাই তো আসল ঝগড়াটে, কী না সে বলেছে ভবভূতি রায় নামের মানুষটাকে! তবু সে বলে গেছে, 'ডাক দিলেই চলে আসবো, মান করে বসে থাকবো না।'

ডাক দেবার জন্যেই মালবিকা কলম নিয়ে বসে ওই বিজ্ঞাপনের মুসাবিদা করছিলো। কিন্তু আর করতে হলো না, আর করা গেলো না, আর করার প্রশ্ন নেই।

যোগাযোগের যে দরজাটা খুলে ফেলবার জন্যে হাত বাড়িয়েছিলো মালবিকা, সে দরজাকে আড়াল করে দাঁড়ালো সেই খাতা।

অভিশপ্ত কালো খাতা।

হ্যাঁ, খাতাখানা পাওয়া গিয়েছিল বৈকি! চুরি তো আর যায়নি সত্যি। শুধু কয়েকটা দিন চোখের আড়ালে পড়েছিলো। তরুই হারিয়েছিলো, তরুই এনে দিলো।

ব্যাপারটা হাস্যকর।

সেদিন মালবিকার ফিরে আসার দিন, ওর রেলগাড়ি থেকে নিয়ে আসা সুটকেসটা থেকে কাপড়-চোপড় বার করে গোছাবার সময় দু' তিনটে শাড়ি ময়লা দেখে ধোবার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলো তরু।

তারপর—তারপর একদিন তরু হাসতে হাসতে এসে বললো, 'কাণ্ড দেখুন দিদিমণি! ময়লা শাড়ির সঙ্গে আপনার এই খাতাখানাও ধোবার বাড়ি চলে গেছলো। কে জানে বাবা শাড়ির ভাঁজে খাতা বই আছে, গোছা সুদ্ধু নামিয়ে দিয়েছি, সে মুখপোড়াও তেমনিই নিয়ে গেছে। আজ এই ধোয়া কাপড়ের সঙ্গে দিয়ে গেলো।... কী ভাগ্যি, তুলে রেখেছিলো! কাপড়ের সঙ্গে

ভাঁটিতে চড়েনি, কি গাধাটার পেটে যায়নি। কাপড় কাগজ সব চিবোয় ওরা দিদি!'

মালবিকা নিতান্ত নির্বোধের মত তাকিয়ে থেকেছিলো ওর দিকে। ভাঁটিতে যেতো পারতো, একটা জানোয়ারের পেটে চলে যেতে পারতো!

কী ক্ষতি হতো ওটা ওই ভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে?

গেলে তো মালবিকা জানতে পারতো না কোন সর্বনেশে কথা লেখা আছে ওতে! কী মারাত্মক নিষেধের শপথ! আর জানতে পারতো না অহেতুক সন্দেহে কী নির্লজ্জ আর কটু কঠোর কথা উচ্চারণ করেছে মালবিকা একটা ভদ্র মার্জিত মনের কাছে!

মালবিকা যদি এখন তরুকে তাড়িয়ে দেয়, খাতাটাকে আগুনে ফেলে দেয়, তবু সেই ভয়ঙ্কর লাইনগুলো তো ভুলতে পারবে না কোনোদিন। ভুলতে পারবে না নিজের নির্লজ্জতা। এর চিরদিন মালবিকার সুখের শান্তির আর ভালবাসার ঘরে বিষের ছোবল হবেন।

ভবভূতি রায়ের মা যদি আত্মঘাতী হবার কালে অভিশাপ দিয়ে গিয়ে থাকেন, তাঁর সন্তান কখনো যদি ওই পঙ্কজিনী হালদারের সঙ্গে কোনো সূত্রে যোগসূত্র স্থাপন করতে চায়, তো মাতৃহত্যার পাপে পাপী হবে, তাহলে?

মালবিকা কি ওই খাতাখানা পুড়িয়ে সেই কথাটা পুড়িয়ে ফেলতে পারবে? ওই অভিশাপকে নস্যাৎ করে দিয়ে তাঁর সেই সন্তানের সঙ্গে সুখে সংসার পাততে পারবে?

তা হয় না।

তা হতে পারে না।

অতএব ধূসর হয়ে যাক দিনরাত্রি, রুক্ষ হোক মেজাজ, দ্রুত বুড়িয়ে আসুক মন, আর যন্ত্রণা থাকুক সঙ্গের সাথী!

কারণ মালবিকার জীবনগ্রন্থ থেকে জীবনের এই অধ্যায়টাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া যাবে না।

—o—

জীবন স্বাদ

বদলী করে দিয়েছে, নতুন অফিসের কর্মভার গ্রহণের তারিখ নির্দেশ করে দিয়েছে, দেয়নি শুধু বাসার আশ্বাস।

বাঙালীর ছেলে পাঞ্জাব-সীমান্তের একটি মফঃস্বল শহরে, যেখানে অন্তত তিনশো মাইলের মধ্যে কোনও আত্মীয়ের ছায়া মাত্র নেই, সেখানে হঠাৎ গিয়ে পড়ে যথাসময়ে কাজে যোগ দেবার অসুবিধেটা কতদূর সেকথা বোঝাবার দায় সরকারের নয়।

চাকরি নেবার সময় বণ্ডে সই করনি তুমি, যে কোন জায়গায় যেতে প্রস্তুত? মনে নেই সেকথা?

সরকার কি বণ্ডে সই করেছিল, যখন যে দেশে পাঠাবে তোমাকে, তোমার জন্যে ঘর সাজিয়ে রাখবে? তুমি তো নেহাৎ চুনোপুঁটি না হও চিংড়ি চিতলের চাইতে বেশিও নও। বলে কত রুই-কাতলাই বদলী হয়ে পরের বাসায় নাক গুঁজে থেকে দিন কাটাচ্ছে, কাপড়ের তাঁবুতে স্ত্রী-পুত্র পরিবার নিয়ে সংসার পেতে বসেছে।

তবু তো তুমি প্রভাত গোস্বামী, ঝাড়া হাত-পা মানুষ। না স্ত্রী, না পুত্র, না ডোয়ো, না ঢাকনা। একটা সুটকেস, একটা বেডিং, একটা জলের কুঁজো, একটা টিফিন কেরিয়ার, সর্বসাকুল্যে এইতো তোমার সম্পত্তি। এতেই ভাবনায় অস্থির?

তা সত্যি বলতে প্রভাত একটু বেশি ভাবছে। তার কারণ এ যাবৎ নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নেওয়ার অবস্থা ওর কখনো ঘটেনি। হওয়ার দেশের বাড়িতে বাড়ির ছোটছেলের প্রাপ্য পাওনা পুরোদস্তুর ভোগ করেছে, চাকরির প্রথম কালটা কাটিয়ে এসেছে লক্ষ্ণৌতে কাকার বাড়ি। কাকাই চাকরির জোগাড়দার। তিনি কি অফিসে, কি বাসাতে সদাসতর্ক দৃষ্টি রেখে আসছিলেন ভাইপোর সুবিধে স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে। কিন্তু বিধি হলো বাদী।

বদলীর অর্ডার এলো।

প্রভাতের মা অবশ্য খবরটা শুনে ভেবে ঠিক করে ফেললেন, এ নিশ্চয় ছোট বৌয়ের কারসাজি, বরকে বলে কয়ে ভাসুরপোর বদলীর অর্ডার বার করিয়ে দিয়েছে, কারণ—

কারণ আর নতুন কি, বলাই বাহুল্য। পর নিয়ে ঘর করায় অনিচ্ছে। কিন্তু আসলে তা নয়।

খুড়ি বরং চেষ্টা করছিলেন, সামনে পুজোর ছুটিতে নিজের বিয়ের যুগ্যি বোনঝিটিকে নিজের কাছে আনিয়ে নেবেন, এবং অদূর ভবিষ্যতে দিদির কাছে ঘটকী বিদায় আদায় করবেন।

কিন্তু হলো না।

জগতের বহুবিধ সাধু ইচ্ছের মত সে ইচ্ছেটা আপাততঃ মুলতুবি রাখতে বাধ্য হতে হলো তাঁকে! বদলিটা পুজো পর্যন্তও ঠেকানো গেল না। পুজোর ছুটিতে চলে আসবার জন্যে বারবার অনুরোধ জানিয়ে কাকা-কাকী বিদায় দিলেন। প্রভাত সেই বিষণ্ণ আর্দ্রতার ছোঁয়ার সঙ্গে নিজের অসহায়তার ভয়াবহতা মিশিয়ে চিত্তকে বেশ ঘনতমসায় আবৃত করে গাড়িতে উঠলো।

আর বেচারা হতভাগ্যের ভাগ্যে, সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হয়ে গেল প্রবল বর্ষণ।

সারারাত্রি ঠায় জেগে কাটিয়ে দিলো প্রভাত, বন্ধ কামরার মধ্যে বৃষ্টির শব্দের প্রচণ্ডতা অনুভব করতে করতে। গাড়িতে আরও তিনজন আরোহী ছিলেন, তাঁদের প্রতি ঈর্ষা কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে প্রভাত নিশ্চিত হলো আর যাই হোক, ওরা কেউ বদলী হয়ে যাচ্ছে না!

তবে বৃষ্টির আওয়াজ একটু উপকার করলো প্রভাতের। তিন দিন থেকে তিনটি নাকের আওয়াজ তার কর্ণকুহরকে শিহরিত করতে ততটা পেরে উঠলো না।

কানের থেকে মনটাই তার কাছে প্রধান হয়ে রইলো।

স্টেশনে যখন নামলো প্রভাত, তখন বৃষ্টি নেই, কিন্তু শেলেট পাথরের মত আকাশের নিচে পৃথিবীটা যেন শোকগ্রস্তের মত জড় পুঁটুলি হয়ে পড়ে আছে।

ভেবেছিল কুলিও পাওয়া যাবে কিনা। কিন্তু আশঙ্কা অমূলক, কুলি যথারীতি গাড়ি থামবার আগেই গাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে প্রভাতের অনুমতি ব্যতিরেকেই তার জিনিসপত্র টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে ফেললো এবং কোথায় যাবেন ও গাড়ি হবে কিনা শুধিয়ে মুখপানে তাকিয়ে রইলো।

আর ঠিক এই মুহূর্তে—এই ভয়াবহ সঙ্গীন মুহূর্তে ঘটে গেল এক অদ্ভুত অঘটন।

সেই অঘটনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ প্রভাতকে স্বীকার করতেই হলো কলিতে

ভগবান নেই ; এটা ভুল সিদ্ধান্ত। ভগবান আছেন এবং আর্তের আকুল আবেদন তাঁর কানে এক আধ ক্ষেত্রেও অন্তত পৌঁছোয়।

আর পৌঁছোলে আর্তত্রাণকল্পে দূতও পাঠান তিনি।

সেই দূত হিসাবে এসে দাঁড়ালেন একটি আধাবয়সী ভদ্রলোক, ও অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, একটি রীতিমত রূপসী তরুণী।

খুব সম্ভব পিতা-কন্যা।

প্রভাতের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক দরাজ গলায় বলে উঠলেন, 'কোথায় উঠবেন?'

প্রভাত প্রথমটা থতমত খেলো। এমনি পরিচিত ভঙ্গীতে যিনি প্রশ্ন করলেন, তিনি পূর্ব পরিচিত কিনা স্মরণ করতে চেষ্টা করলো, তারপর সচকিত হলো। পরিচিত নয়। কিন্তু একটি রূপসী তরুণীর সামনে বুদ্ধু ব'লে চুপ করে থাকার লজ্জা বহন করা চলে না। তাই মৃদু হেসে বললে, 'ঠিক এই মুহূর্তে নিজেকেই ওই প্রশ্ন করছিলাম।'

'বুঝেছি!' সবজান্তার ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে ভদ্রলোক কন্যার দিকে দৃষ্টিপাত করে হেসে বলেন, 'বলিনি তোকে? মুখ দেখেই বুঝেছি বাসার ব্যবস্থা হয়নি। নতুন বদলী হয়ে এলেন বোধহয়? ওপরওলাদের আক্কেল দেখছেন তো? বদলী করেই খালাস। সে ওঠে কোথায়, খায় কি, তার দায়িত্ব নেই। পাঁচ বছর ধরে শুনেছি মশাই, গর্ভমেণ্ট কোয়ার্টস তৈরি হলে। তা সে শোনাই সার। ছেলেবেলায় শুনতাম আঠারো মাসে বচ্ছর, এখন দেখছি ছাব্বিশ মাসে—'

ভদ্রলোকের কথার মাঝখানে ফাঁক পাওয়া সম্বন্ধে হতাশ হয়ে, ফাঁকটা একরকম করে নিয়েই বলে ওঠে প্রভাত, 'তা আপনি তো এখানকার সব জানেন শোনেন। বলুন দিকি, সুবিধে মত কোনও মেস বা হোটেল পাওয়া যেতে—'

'বিলক্ষণ! বিলক্ষণ! আমি তবে নাহোক আপনাকে দাঁড় করিয়ে সময় নষ্ট করছি কেন? মল্লিকা, শোন্! কথা শোন্ ভদ্রলোকের! আমার নিজের আস্তানা থাকতে আমি সন্ধান দিতে যাবো কোথায় মেস আছে, কোথায় হোটেল আছে। চলুন চলুন, এই গরীবের গরীবখানায় গিয়ে উঠুন তো। তারপর বুঝবেন থাকতে পারবেন কি না পারবেন।'

প্রভাত ব্যাকুল স্বরে বলে, 'না না সে কি, আপনার বাড়িতে গিয়ে উৎপাত করবো কেন, আপনি শুধু যদি—'

'আহা-হা, উৎপাত কি! এ তো আমার ভাগ্য। আপনাদের মত অতিথি পাওয়া পরম ভাগ্য! আজ ভালো লোকের মুখ দেখে উঠেছিলাম মল্লিকা, কি বলিস? চলুন চলুন, এই যে গরীবের একখানা হাঁটুভাঙা পুষ্পরথও আছে।'

অদূরে অবস্থিত একটি টাঙার দিকে চোখ পড়ে প্রভাতের। ভদ্রলোক কুলিটাকে চোখের ইসারা করেন এবং মুহূর্তে সে কর্তব্য পালন করে। আর প্রভাত এক নজরে দেখে এইটুকু অবশ্য অনুভবই করে, গাড়ির ব্যাপারে ভদ্রলোক অতি বিনয়ী নয়। গাড়িটা হাঁটুভাঙাই বটে।

সেই গাড়িতেই যখন ভদ্রলোক প্রভাতকে উঠিয়ে দিয়ে সকন্যা নিজে উঠে পড়েন, তখন প্রভাত সভয়ে না বলে পারে না, 'ভেঙে যাবে নাতো?'

আশপাশ সচকিত করে হেসে ওঠেন ভদ্রলোক। হাসির দাপটে দুলে দুলে বলেন, 'না মশাই' সে ভয় নেই, দেখতে যেমনই হোক ভেতর মজবুত।'

'কিন্তু আপনি ওদিকে কেন?' প্রভাত তারস্বরে প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, 'আপনি এদিকে আসুন। আমিই কোচম্যানের পাশে—'

কিন্তু ততক্ষণে বিশ্রী একটা ঝাঁকুনি নিয়ে গাড়ি চলতে শুরু করেছে।

ভদ্রলোক ওদিক থেকে বলেন, 'না মশাই' আমার আবার উল্টোদিকে ছুটলে মাথা ঘোরে।'

অতএব পরিস্থিতিটা হলো এই, টাঙার পিছনের সিটে প্রভাত আর মল্লিকা। প্রতি মুহূর্তে ঝাঁকুনি খেতে খেতে আর পরস্পরের গায়ে ধাক্কা লাগাতে লাগাতে উল্টোমুখো ছুটতে লাগলো তারাই দু'জনে।

যতটা সম্ভব সঙ্কুচিত হয়েও প্রভাত সেই দুরূহ অবস্থা থেকে আত্মরক্ষায় সক্ষম হলো না, আর মনে মনে বলতে বলতে গেল, মাথা ঘোরাবার ব্যবস্থাটা তাহলে আমার জন্যেই বহাল হলো!

এও ভাবলো, ভদ্রলোক বাঙলাদেশ থেকে বহুদূরে আত্মীয়-সমাজের বাইরে থাকেন বলেই এমন মুক্তচিত্ত!

যাই হোক, আপাতত যে 'প্রবাসে বাঙালী' লাভ হলো, এ বহু-জন্মের ভাগ্য। অন্তত আজকের মত মালপত্র রেখে অফিসটা তো দর্শন করে আসা যাবে। তারপর কালই একটা কোনো ব্যবস্থা করে নিতে হবে! সরকারী অফিস যখন আছে, মেস বোর্ডিং কোথাও না কোথাও যাবেই জুটে।

আবার ভাবলো, এ যুগেও তা হলে এ-রকম অতিথিবৎসল লোক থাকে!

ভদ্রলোক যদি একা হতেন, হয়তো প্রভাত কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত হতো, হয়তো

ভাবতো এতই বা আগ্রহ কেন? মতলব খারাপ নয় তো? কোনো গুণ্ডার আড্ডায় তুলে নিয়ে গিয়ে টাকাকড়ি কেড়ে নেবে না তো!

কিন্তু সকল সন্দেহ মুক করে দিয়েছে মল্লিকার উপস্থিতি।

বুঝে ফেলেছে, আর কিছুই নয়, বাঙালী হীন দেশে বাঙালী পাগলা লোক!

কিন্তু মেয়েটা একটাও কথা কয়নি কেন? বোবা না কি? বাপ তো বারবার ডেকে ডেকে সালিশ মানছেন। যার জন্যে নামটা জানা হয়ে গেছে। বোবাকে কি কেউ ডেকে কথা কয়?

প্রভাত একবার চেষ্টা করে দেখবে না কি? আচ্ছা কী কথা বলা চলে? এখানের আবহাওয়া? কতদিন এদেশে আছেন। না কি আপনাদের বাসা আর কতদূরে?

আলাপ জমাতে গেলে ভদ্রলোক বিরক্ত হবেন? নাঃ, তা নিশ্চয়ই নয়। মেয়েকে যখন এভাবে বসতে দিয়ে নিজে নিশ্চিন্ত হয়ে সোজামুখে ছুটছেন, তখন মাথার পিছনে কান খাড়া করে রেখেছেন বলে মনে হয় না।

ত্রিভঙ্গঠামে হলেও টাঙাটি ছুটছিল ভালোই।

দু'পাশে নীচু জমি, সেখানে সবুজের সমারোহ, মাঝখানে সরু আলরাস্তা চড়াই উৎরাইয়ের বৈচিত্র্যে লোভনীয়। ক্ষণে ক্ষণে ঝাঁকুনি!

তা সেটা অস্বস্তিকর হলেও তেমন, বিরক্তিকর তো কই ঠেকছে না! অনেকক্ষণ চলার পর, প্রভাত যখন অনুমান করছে লোকালয়ের বাইরে চলে এসেছে, তখন দূর থেকে কয়েকটা ছোট ছোট কটেজ দেখা গেল। ওদেরই একটা নিশ্চয়ই! প্রভাত এবার মনের জোর সংগ্রহ করে ধাঁ করে বলে ফেললো, 'আর বেশিদূর আছে নাকি?'

মল্লিকা চমকালো না।

বরং মনে হলো যেন একটা কোনো প্রশ্নের জন্যেই প্রস্তুতই হচ্ছিল। কারণ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলো, 'ওই তো দেখা যাচ্ছে।'

কথা বাড়াবার জন্যই বলে প্রভাত, 'ওদের মধ্যে কোন্‌টা?'

'সবগুলোই।'

'সবগুলো!'

'হ্যাঁ। তাও তো কুলিয়ে উঠছে না, আরও বাড়ি তৈরির কথা হচ্ছে।'

বিস্ময় বোধ না করে পারে না প্রভাত।

পরিবার বড় হলে বাড়ি বড় করে তৈরি করে লোকে, আলাদা আলাদা কটেজ, এটা কি রকম! তবু বলে, খুব বড় জয়েন্ট ফ্যামিলি বুঝি?

হঠাৎ মল্লিকা অনুচ্চ একটু হেসে ওঠে। ঘাড়টা একটু ফিরিয়ে সামনে-ছোটা ভদ্রলোককে একবার দেখে নেয়, তারপর বলে, 'এখনো পর্যন্ত বুঝতে পারেন নি। কী ছেলেমানুষ আপনি?'

বুঝতে পারবে!

কী বুঝতে পারবে প্রভাত!

ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না কোন্‌দিক থেকে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। মল্লিকাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করতেও লজ্জা করছে। তাই ওই কটেজগুলোর মধ্যেই বোধগম্য কিছু আছে কিনা দেখবার জন্যে অনবরত ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে থাকে।

বেশিক্ষণ অবশ্য সন্দেহদোলায় দুলতে হলো না। টাঙাটা ঝড়া করে থেমে গেল এবং ভদ্রলোক নেমে পড়ে বললেন, 'এই যে এসে গেছি। সাবধানে নামুন প্রভাতবাবু।'

প্রভাতবাবু।

নাম জানাজানিটা কখন হলো? প্রভাত সবিস্ময়ে বলে, 'আমার নামটা জানলে কি করে?'

'কি করে?' একটু হেসে বললেন, 'হাত দেখে। সুটকেসের ওপর টিকিট এঁটে রেখে নিজেই ভুলে যাচ্ছেন মশাই? আসুন, এই গরীবের গরীবখানা। এই সামনের ছোট্টখানি নিয়ে সরু করেছিলাম। আপনাদের পাঁচজনের কল্যাণে আশেপাশে আস্তে আস্তে—সাবধানে! পাথরটার উপর পা দিয়ে আসুন। সারারাত বৃষ্টি পড়ে কাদা—মল্লিকা, তুই গণেশকে পাঠিয়ে দিগে যা। জিনিসপত্রগুলো নামিয়ে নিক। প্রভাতবাবু সাবধান, শুধু এই পাতা পাথরের ওপর দিয়ে—সাবধানে পা টিপেটিপে এসে প্রথম কটেজটার সামনে দাঁড়ায় প্রভাত, আর সাইন বোর্ডটা চোখে পড়ে।

আরাম কুঞ্জ। সম্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য মডারেট চার্জে আহার ও বাসস্থান। প্রোঃ এন্ কে চ্যাটার্জি!

কী বোঝা উচিত ছিল, এতক্ষণে বুঝতে পারে প্রভাত। জলের মত পরিষ্কার।

লোকালয়ের বাইরে বহু বিস্তৃত জমি নিয়ে চ্যাটার্জির 'আরাম কুঞ্জ।'

ঘরের পিছনে বারান্দা। সরু একফালির তবু তাতেই দু'খানি বেতের চেয়ার, একটি ছোট টেবিল।

চায়ের ট্রেটা চাকরেই দিয়ে যায়, তবে তত্ত্বাবধানে আসে মল্লিকাই। হেসে একটা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে বলে, 'এতক্ষণে বুঝেছেন বোধ হয়?'

নতুন বাড়ি, ছবির মত সাজানো ঘর, পিছনের এই বারান্দা থেকে যতদূর চোখ পড়ে, উন্মুক্ত প্রান্তর। প্রান্তরের সীমায় আকাশের কোলে পাহাড়ের নীলরেখা। মেঘমেদুর আকাশের বিষণ্ণতা কেটে আলোর আভাস উঁকি দিচ্ছে। সৌন্দর্য মোহগ্রস্ত প্রভাত এতক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল সেইদিকে, চা এবং মল্লিকা, দুটোর চাঞ্চল্যে চোখ ফিরিয়ে হেসে বলে, 'একটু একটু।'

'আপনি একটু বেশি সরল।'

'তার চাইতে বলুন না কেন, একটু বেশি নির্বোধ!'

'বলাটা ভদ্রতা নয়, এই যা।'

'কিন্তু কি করে জানব বলুন? ভাবলাম প্রবাসে বাঙালী—'

মল্লিকা হেসে ওঠে।

প্রভাত ভাবে, ঠোঁটে রঙের প্রলেপ বলেই কি দাঁতগুলো অত সাদা দেখাচ্ছে? কিন্তু তাতে সাদাই দেখাবে, অমন মুক্তোর মত নিখুঁত গঠনভঙ্গী হবে?

'জায়গাটা বড় সুন্দর!'

'হ্যাঁ!' মল্লিকা ঈষৎ হাসির সঙ্গে বলে, নামটা যখন আরাম কুঞ্জ! কিন্তু হাসির সঙ্গে মুখটা এমন কঠিন হয়ে ওঠে কেন ওর?

'বাস্তবিক সার্থকনামা। কিন্তু আমাকে তো এখুনি বেরোতে হবে। আমার অফিসটা কতদূরে , উত্তরে কি দক্ষিণে, পূর্বে কি পশ্চিমে কিছুই জানি না। এখানের ব্যবস্থাটাই-বা কিরম হবে—মানে আপনার বাবাকে তো আর দেখতে পাচ্ছি না।'

'পাবেনও না! মল্লিকা হেসে ওঠে, 'ওই একবার যা স্টেশনে দর্শনের সৌভাগ্য। আবার গেছেন লোক ধরতে—কিন্তু উনি আমার বাবা নয়, মামা।'

প্রভাত যেন একটু বিমূঢ় হয়ে পড়ে।

ভদ্রলোক তাহলে স্রেফ হোটেলের আড়কাঠি। আর এই সুসজ্জিতা সুবেশা রূপসী তরুণী তার মেয়ে না হলেও ভাগ্নি।

তবে আসল মালিক বোধ হয় এর বাবা।

শালাকে লাগিয়ে রেখেছেন লোক ধরে আনতে। কিন্তু সারাক্ষণ লোক কোথায়? ট্রেন তো আর বারবার আসে না।

সেই সন্দেহই ব্যক্ত করে প্রভাত।

মল্লিকা বলে, 'ওসব অনেক সিক্রেট? বুঝবেন না।'

'তা না হয় বুঝলাম না। কিন্তু এখানে থাকার কি চার্জ কি রকম, এখান থেকে অফিস যাওয়া সম্ভব কিনা, এগুলো তো বুঝতে হবে।'

'আমার কাছে সবই জানতে পারেন।'

'আপনিই কর্ণধার?'

মল্লিকা হঠাৎ চোখ খুলে কেমন যেন একরকম করে তাকালো। তারপর বললো, 'দেখশোনা করি। চা টা খান। এখনি তো বেরোবেন বলছেন। ভাত—'

'না না, ওসব কিছু না। এই এতবড় ব্রেসফাস্ট করে আবার ভাত! চার্জটা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নাহলে ঠিক স্বস্তি পাচ্ছিল না।'

মল্লিকা হেসে ওঠে।

'আচ্ছা ভীতু লোক তো আপনি! মারাত্মক কিছু একটা নয়! চলুন দেখাইগে খাতাপত্তর।'

চার্জ? না এমন কিছু মারাত্মক সত্যিই নয়।

ব্যবস্থার তুলনায় তো নয়ই।

ব্যবস্থা যে এত উত্তম হতে পারে, এটা প্রভাতের ধারণার মধ্যেই ছিল না। 'আরাম কুঞ্জে'র শুধু যে নিজস্ব একটা টাঙ্গা আছে তাই নয়, একখানা জীপও আছে। এবং সেই জীপখানা বোর্ডারদের জন্যে সর্বদা খাটে, নিয়ে যায় শহরের মধ্যস্থলে, অফিস পাড়ায়, কর্মকেন্দ্র।

'নইলে আপনারা গরীবের আস্তানায় থাকবেন কেন? এ আপনার গিয়ে খোলা বাতাসটাও পেলেন, আবার কাজকর্মেরও অসুবিধে হলো না—'

প্রোঃ এন্ কে চ্যাটার্জি বলেন, আপনার আশীর্বাদে যিনি একবার পায়ের ধুলো দিয়েছেন, তিনি বারে বারে পায়ের ধুলো দেন।'

হ্যাঁ, চ্যাটার্জির দর্শন আর একবার মিলেছে।

কোনও রকম অসুবিধা হচ্ছে কিনা জানবার জন্যে এসেছেন। বারে বারে প্রশ্ন করছেন।

প্রভাত হেসে বলে, অসুবিধে কি মশাই, বরং সুবিধাটাই এত বেশি হয়ে যাচ্ছে, যে ভয় হচ্ছে, এরপর আর কোথাও—'

'এরপর আর কোথাও মানে—' হাঁ হাঁ করে ওঠেন চ্যাটার্জি, 'আবার কোথায় যাবেন? নিজের ঘরবাড়ির মতন থাকবেন। ওই জন্যেই টানা লম্বা ঘর দালান না করে ছোট ছোট কটেজ করা।'

প্রভাত কুণ্ঠিত হাস্যে বলে, 'কিন্তু এই পাণ্ডববর্জিত দেশে এত লোক আসে?'

'বলেন কি মশাই?'

হা হা করে হেসে ওঠেন ভদ্রলোক, 'দেখতে নিরীহ হলে কি হবে, জায়গাটা কতবড় বিজনেস ঘাঁটি? অবিশ্যি একদিক থেকে বলছেন ঠিকই, বাঙ্গালী কমই আসেন। মানে, বিজনেসের ব্যাপারে তো বুঝতেই পারছেন?'

'কতদিন আছেন আপনি এখানে?'

'ওঃ, সে কি আজ? রাগ করে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিলাম। বলেছিলাম 'ধুত্তোর বাংলাদেশ! তারপর কোথা দিয়ে যে কি হলো? এখানেই।'

'দেশে আর কখনো যাননি?'

চ্যাটার্জি একবারক তীব্র কটাক্ষে প্রভাতের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেন। নিছক সরল কৌতূহল, না আর কিছু?

নাঃ, সরল বলেই মনে হচ্ছে।

বোকা প্যাটার্নের ছেলেটা!

বলেন, 'গিয়েছিলাম! একবার বাপ মরতে গিয়েছিলাম, আর একবার বিধবা বোনটা মরতে বাচ্চা ভাগ্নিটিকে কুড়িয়ে নিয়ে চলে এসেছি, ব্যস! সেই অবধি।'

প্রভাত হাসে, 'কিন্তু এমন নিখুঁত বাঙালী রয়ে গেছেন কী করে বলুন তো? এতদিন বাইরে থাকলে লোকে তো—'

'বলেন, কি মশাই, বাঙালীর ছেলে, বাঙালী থাকবো না? যাক্ তাহলে অসুবিধে কিছু নেই?'

'না না, মোটেই না, আপনার বোর্ডিংয়ের নামকরণ সার্থক!'

চ্যাটার্জি একটু মিষ্টি-মধুর হাসেন, 'হাঁ' সকলেই অনুগ্রহ করে ওকথা বলে থাকেন। ক্রমশই বুঝবেন, কেন নিজের এত গৌরব করলো চ্যাটার্জি। এ তল্লাটে 'আরাম কুঞ্জ' বললে চিনবে না এমন লোক নেই। আর ওই যা বললাম, একবার যিনি পায়ের ধুলো দিয়েছেন—

প্রভাত সসঙ্কোচে বলে, 'কিন্তু আমাকে যে এখানে স্থায়ী ভাবে থাকতে হবে। মানে যতদিন না ফের বদলি হচ্ছি।'

'কি আশ্চর্য! থাকবেন তার চিন্তার কি আছে?' চ্যাটার্জি মুচকে হাসেন, 'দেখবেন, এখান থেকে আর বদলি হতেই চাইবেন না। তবে শুনুন—চ্যাটার্জি চুপি চুপি বলেন, 'স্থায়ী বোর্ডারদের চার্জ অনেক কম! ব্যবসা করছি বলে তো

আর আক্কেলের মাথা খেয়ে বসিনি মশাই, বিবেচনাটা আছে। দেখবেন ক্রমশঃ চ্যাটার্জির বিবেচনার ত্রুটি পাবেন না।'

'স্থায়ী বোর্ডারদের চার্জ অনেক কম—' এই আশ্বাস বাণীটি হৃদয় মধুবর্ষণ করে থাকে।—হৃষ্টচিত্তে প্যাড্ টেনে নিয়ে চিঠি লিখতে বসে প্রভাত।

মাকে লেখে, কাকাকে লেখে।

মাকে লেখে—'মা তোমাদের কাছ থেকে আরও অনেক দূরে চলে এসেছি। আসবার সময় মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। অজানা জায়গা—কোথায় থাকবো, কিরবো। কিন্তু ভাগ্যক্রমে স্টেশন থেকেই ব্যবস্থা হয়ে গেল। একটি বাঙালীর হোটেল পেয়েছি, বাঙালী রান্নাও খেলাম। ঘর নতুন, সুন্দর সাজানো, বাড়িটি ছবির মতন, আর জায়গাটা এত চমৎকার যে ইচ্ছে হচ্ছে তোমাদের সকলকেই দেখাই। ঘরের পিছনের বাবান্দায় বসলে যতদূর চোখ চলে, যাকে বলে মুক্ত প্রান্তর, আর তার ওপারে পাহাড়। পরে আবার চিঠি দেবো।

ইতি—

প্রভাত।

কাকাকে লিখলো, 'কাকা, তোমাদের কাছ থেকে এসে মন কেমন করছে, একথা লিখতে গেলে ছেলেমানুষী, তাই আর লিখলাম না। থাকার খুব ভাল ব্যবস্থা হয়ে গেছে। পরে আবার চিঠি দিচ্ছি। তুমি ও কাকিমা প্রণাম জেনো। আমার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থেকো। কাকীমাকে বলো, জায়গাটা খুব সুন্দর!

ইতি—

প্রভাত।

দু'জনকেই জানাতে উদ্যত হচ্ছিল, মল্লিকার মত একটি মেয়েকে এরকম জায়গায় দেখতে পাওয়ার বিস্ময় বোধটা, কিন্তু কিছুতেই ভাষাটা ঠিকমত মনে এলো না। ভাবলো, যাকগে, কী আর এমন একটা খবর।

ভাবলো কিন্তু সেই, 'কী আর এমনটা'ই মনের মধ্যে একটা খবরের মত কানাকানি করতে থাকলো!

সত্যি, আশ্চর্য! এ ধরনের বাঙালী পরিবার পরিচালিত হোটেল, এখানে দেখতে পাওয়া অভাবনীয়। পুরীতে কাশীতে রাঁচিতে এখানে সেখানে দেখেছে প্রভাত, যতটুকু যা বেড়িয়েছে। অথচ ঠিক এ রকমটি কিন্তু দেখেনি। পাঞ্জাবের এই দূর সীমান্তে, শহর ছাড়ানো নির্জনতায়!

কিন্তু রাত্রে যেন নির্জনতাটা তেমন নির্জন রইলো না।

সারাদিনের ক্লান্তি আর গত রাত্রের ট্রেনের রাত্রি জাগরণ দুটো মিলিয়ে প্রভাতকে তাড়াতাড়ি বিছানা নেবার প্রেরণা দিচ্ছিল, তাই গণেশকে ডেকে প্রশ্ন করলো এখন খেতে পাওয়া যাবে কিনা।

গণেশ মৃদু হেসে জানালো, এখানে পাওয়া যাবে কিনা বলে কোনও কথা নেই। রাত দুটো তিনটেতেও লোক আসে, খাওয়া দাওয়া করে।

প্রভাত সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে, 'অতরাত্রে লোক? তখনও কোনো ট্রেন আসে নাকি?'

গণেশ একটু ব্যঞ্জনাময় হাসি হেসে বলে, ট্রেন আসে কিনা জানি না বাবু। লোক আসে তাই জানি। তেমন হলে, আমাদের তো আর রাতে ঘুমোবার জো থাকে না। শীতের রাতে হী হী করতে করতে—'

'ওরে বাবা! এখানের শীত! প্রভাত পুনঃ প্রশ্ন করে, তুমি তো বাঙালী?'

'তা হবে!'

তা হবে?

কৌতুক অনুভব করে প্রভাত গণেশের কথায়। বলে তা হবে মানে? নিজে কোন্ দেশের লোক জানো না?'

'জানার কি দরকার বাবু! ভূতের আবার জন্মদিন! আপনার খাবার আনছি।'

প্রভাত ভাবলো খাবার কি গণেশই আনবে? অন্তত তার সঙ্গে আর কেউ আসবে না?

নাঃ, এলোও না।

গণেশ এলো। তার সঙ্গে একজন অবাঙ্গালী বয়।

পরিষ্কার কাঁচের পাত্রে, পরিষ্কার ন্যাপকিন। আহার্য্যের সুবাসে যেন ক্ষিদে বেড়ে ওঠে প্রভাতের।

কাকার বাড়িতে নিত্য ডাল রুটির ব্যবস্থার পরই এই রাজকীয় আয়োজনটা প্রভাতকে একটু ঔদারক মনে হতে পারে, কিন্তু সত্য অস্বীকার করে লাভ নেই।

তবু খেতে খেতে একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে যেতে লাগলো প্রভাত ইচ্ছে করে একটু দেরী করে খেতে লাগলো। যদি তদ্বির কারিণী একবার এসে উদয় হয়।

না।

প্রভাতের আশা সফল হলো না।

অদৃশ্য একটা কর্মজগতের উপর কেমন একটা সূক্ষ্ম ঈর্ষা অনুভব করলো প্রভাত। এত কাজ! বাব্বাঃ?

বিছানায় পড়তে না পড়তেই ঘুম আসবার কথা, কিন্তু কিছুতেই যেন সে ঘুমটা আসছে না। উঁকি দিয়েই পালিয়ে যাচ্ছে।

কত রকমের শব্দ।

কত জুতোর শব্দ, কত কথার শব্দ, কত গ্লাস প্লেট পেয়ালার ঠুং ঠাং শব্দ....কত লোক আসে এখানে? আর আসে কি রাত্রেই বেশি?

কেন?

অচেনা পরিবেশে রাত্রির এই মুখরতায় একটু যেন ভয় ভয় করলো প্রভাতের, গা-টা শির্ শির্ করে উঠলো তাড়াতাড়ি উঠে দেখলো ছিটকানি লাগিয়েছে কিনা।

তারপর ঘড়ি দেখলো।

মাত্র এগারোটা।

তখন লজ্জা করলো প্রভাতের।

নিজে সন্ধ্যা আটটায় শুয়ে পড়েছে বলেই মনে করছে, কি না জানি গভীর রাত। এই সময় লোকজন বেশি হওয়াই তো স্বাভাবিক।

পাখী সারাদিন আকাশে ওড়ে কিন্তু সন্ধ্যায় নীড়ে ফেরে!

এইসব বিজনেস-ম্যানেরা সারাদিন অর্থের ধান্ধায় কোথায় খায়, কোথায় থাকে, কিন্তু রাত্রে আস্তানায় ফেরে, খায়-দায় আড্ডা জমায়! মদই কি আর না খায়? ভাবলো প্রভাত।

আমাদের বিবেচনাশীল প্রোপাইটার মশাই অবশ্যই সে ব্যবস্থা রেখেছেন।— আবার ভয় হলো।

কেউ মাতাল-টাতাল হয়ে গোলমাল করবে না তো?

মাতালের বড় ভয় প্রভাতের।

কিন্তু না।

শব্দ ক্রমশঃ কমে এলো, ঘুমিয়ে পড়লো প্রভাত।

পরদিন চায়ের টেবিলে মল্লিকার আবির্ভাব। গত কালকের মত প্রসাধনমণ্ডিত নয়।

একটু যেন ঢিলেঢালা। সদ্য স্নান করেছে, খোলা ভিজে চুল।

প্রভাতের মনে হলো এ আরও অনেক মনোরম।

কাল ভেবেছিল রূপসী। আজ ভাবলো সুন্দরী।

কাল মনে করেছিল মনোহর। আজ মনে করলো মনোরম।

বয়সের ধর্ম, প্রভাত একটু অভিমান দেখালো। 'কাল তো আর আপনার দর্শনই মিললো না।'

মল্লিকা দুটো চেয়ারের একটা চেয়ার টেনে বসলো। মধুর হাসি হেসে বললো, 'দেবীদর্শন এত সুলভ নাকি?'

'হ্যাঁ, তাই ভেবেই মনকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম। আর আজও প্রত্যাশার পাত্র উপুড় করে রেখেছিলাম।'

'উঃ কী কাব্যিক কথা। চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল?'

'চোখ ঠাণ্ডা হলে, চা চুলোয় গেলেও ক্ষতি হয় না।'

'মল্লিকার মুখটা সহসা একটু কঠিন হয়ে ওঠে। চাঁচাছোলা টানটান মুখটায় এই সামান্য পরিবর্তনটাই চোখে পড়ে।

সেই কঠিন মুখে বলে মল্লিকা, 'কমবয়সী মেয়ে দেখলেই কি এরকম কাব্যি জেগে ওঠে আপনার?'

মুহূর্তে অবশ্য প্রভাতের মুখও গম্ভীর হয়ে যায়। চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিয়ে সে বলে 'ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন!'

'রাগ হয়ে গেল?'

'রাগ নয়, চৈতন্য।'

'অত চৈতন্যদেব না হলেও ক্ষতি নেই। আমি শুধু একটু কৌতূহল প্রকাশ করেছি। কারণ কি জানেন? আমি আপনাকে সাধারণ পুরুষদের থেকে আলাদা ভেবেছিলাম।'

প্রভাত এবার চোখ তুলে তাকায়।

একটি বদ্ধ গভীর দৃষ্টি ফেলে বলে, 'হয়ত আপনার ধারণা ভুল ছিল না। এটা ব্যতিক্রম। কিংবা হয়তো আমি নিজেই নিজেকে জানতাম না। কোন অনাত্মীয় মেয়ের সঙ্গে আলাপের সুযোগও তো আসেনি কখনো।'

'ওঃ বুঝেছি!' মল্লিকা হেসে ওঠে, একেবারে গৃহপোষ্য। তাই সোনা কি রঙ চিনতে শেখেননি এখনো।

'তার মানে?'

'মানে নেই। কান, খেয়ে ফেলুন।'

'কিন্তু দেখুন সকালে এত খাওয়া। এখুনি তো আবার অফিস যেতে হবে ভাত খেয়ে—;

'না তো!' মল্লিকা বিস্মিত দৃষ্টিতে বলে, তাই অভ্যাস নাকি আপনার? কাল যে বললেন—ইয়ে, আমরা তো আপনার লাঞ্চটা টিফিন ক্যারিয়ারে ভরে জিপে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি।'

'বলেন কি! এ যে ধারণার অতীত।

'কেন?'

'বাঃ। বাড়িতেও তো এমন ব্যবস্থা সব সময় হয়ে উঠে না।'

মল্লিকা হঠাৎ একটা দুষ্টুহাসি হেসে বলে, 'বাড়িতে বউ নেই বোধহয়? বুড়ো মা পিসিকে দিয়ে আর কত—'

প্রভাতের মুখে একটা পরিহাসের কথা আসছিল। মুখে আসছিল—'বৌ তো কোনখানেই নেই।' কিন্তু মল্লিকার ক্ষণপূর্বের কাঠিন্য মনে করে বললো না।

শুধু বললো, 'নাঃ, আপনাদের ব্যবস্থা সত্যিই ভালো।'

শুনে সুখী হলাম। কিন্তু উত্তরটা পাইনি।

'উত্তর? কিসের উত্তর?'

'ঘরে বৌ আছে কিনা?'

'জেনে আপনার লাভ?'

'লাভ? আপনি বুঝি প্রতিটি কথাও খরচ করেন লাভ-লোকসানের হিসেব কষে?'

'তা পৃথিবীর নিয়ম তো তাই।'

'হুঁ। পৃথিবীর নিয়মটা খুব শিখে ফেলেছেন দেখছি। কাল তো সন্ধ্যাবেলাই শয্যাশ্রয় করলেন। নতুন জায়গায় ঘুম হয়েছিল?'

প্রভাত হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়েছিল সেই উদার উন্মুক্ত প্রান্তরের দিকে। আজ আর মেঘলা নেই। সকালের নির্মল আলোয় ঝকঝক করছে। মল্লিকার প্রশ্নে সচকিত হয়ে বলে, 'ঘুম? সত্যি বলতে প্রথম দিকটায় কিছুতেই ঘুম আসছিল না। এত রকম শব্দ?'

'শব্দ? কিসের শব্দ?'

একটু যেন উত্তেজিত দেখায় মল্লিকাকে। প্রভাত বিস্ময় বোধ করে হেসে ওঠে, 'ভয় পাবার কিছু নেই, বাঘের গর্জনের শব্দ নয়। মানুষের পায়ের, বাসনপত্রের টুকরো কথায়—'

'আর কিছু নয়?' মল্লিকার দৃষ্টি প্রখর হয়ে ওঠে।

প্রভাত ভাবে, মেয়েটার তো মুহূর্তে মুহূর্তে খুব ভাব পরিবর্তন হয়। কিন্তু কেন হয়? মুখে বলে, 'না তো। আর কি হবে?'

মল্লিকা নরম হয়ে যায়। সহজ হয়ে যায়। বলে, 'তাই তো, আর কি হবে। তবে বাঘের গর্জনও অসম্ভব নয়।

'অসম্ভব নয়! বাঘ আছে!' প্রভাত প্রায় ধ্বসে পড়ে।

আর মল্লিকা হেসে ওঠে, 'ভয় পাবেন না, পাহাড়ের ওদিকে বাঘ ডাকে। তবে বাঘের চাইতে ভয়ঙ্কর তিন-তিনটে কুকুর রাত্রে পাহারা দেয় এখানে। চেন খুলে রাখা হয়। বাঘও ভয় পায় তাদের!'

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। তারপর আস্তে বলে প্রভাত, 'সন্ধ্যেবেলা আপনি খুব খাটেন, তাই না?'

'শুধু সন্ধ্যেবেলা? সর্বদাই। অহোরাত্র।'

'কেমন একটা ব্যঙ্গ হাসির সঙ্গে বলে মল্লিকা।'

প্রভাত বলে, 'এত কী কাজ? লোকজন তো রয়েছে?'

'লোকজনকে দিয়ে কি সব হয়? অতিথির আদর অভ্যর্থনা নিজেরা না করলে চলে?'

শুনে সহসা প্রভাতের সংস্কারগ্রস্থ গৃহস্থমন বিরূপ হয়ে ওঠে আর অধিকার অনধিকারের প্রশ্ন তুলে বলে ফেলে সে, 'এটা আপনার আপত্তি করা উচিত?'

মল্লিকা নিরীহ ভাবে বলে, 'কোনটা অন্যায়? কিসে আপত্তি করা উচিত?'

'এই যে আসে তার আদর অভ্যর্থনার দায়িত্ব আপনার নেওয়া! কতরকমের লোক আসে, আর এইসব অঞ্চলের নানা জাতের ব্যবসায়ীরা যে কি ধরনের লোক হয়, জানেন না তো?'

মল্লিকা আরও নিরীহ ভাবে বলে, 'আপনি জানেন?'

'এর আর জানাজানির কি আছে?' প্রভাত সবজান্তার ভঙ্গীতে বলে, 'কে না জানে। না না, আপনি ওসব দিকে যাবেন না।'

'বাঃ, মামার ব্যবসার দিকটা তো দেখতে হবে?'

'দেখতে হবে।' প্রভাত চটে উঠে বলে, 'মামার ব্যবসাটাই বড় হলো? নিজের মান-সম্মানটা কিছু নয়?'

'কে বললে মান-সম্মানের হানি হয়?'

আবার উত্তেজিত হয় মল্লিকা।

'হয় না? আপনি বলছেন কি?' প্রভাত উত্তেজিত ভাবে বলে, এমন কিছু কম বয়স আপনার নয় যে জগতের কিছু বোঝেন না। এ থেকে আপনার ক্ষতি হতে পার, এ আশঙ্কা নেই আপনার?'

মল্লিকা গম্ভীর হয়ে যায়। বিষণ্ণভাবে বলে, 'আশঙ্কা থাকলেই বা কি। আমার জীবন তো এইভাবেই কাটবে।'

প্রভাত এই বিষণ্ণ কথার ছোঁয়ায় একটু থতমত খেয়ে গিয়ে বলে, 'বাঃ তাই বা কাটবে কেন? মেয়েদের জীবনে তো মস্ত একটা সুবিধে আছে! বিয়ে হলেই তারা একটা নতুন পরিবেশে চলে যেতে পায়।'

'হুঁ সুবিধেটা মস্ত সন্দেহ নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে, বিয়ে না হলে?'

বিয়ে না হলে? প্রভাত দুর্বলভাবে বলে, না হবে কেন?

'সেটাই স্বাভাবিক!' মল্লিকা হেসে ওঠে, 'মা-বাপ মরা মেয়ে, মামার কি দায়।'

প্রভাত বোধ করি আবার ভুলে যায় সে কে, কী তার অধিকার। তাই রীতিমত চটে উঠে বলে, 'দায় অবশ্যই আছে। এদিকে তো বাঙালীয়ানার খুব বড়াই করলেন আপনার মামা, বাঙালী সংসারে বাপ-মরা ভাগ্নীর বিয়ে দেবার দায় থাকে না? তা থাকবে কেন, আপনাকে দিয়ে দিব্যি সুবিধে সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে।'

মল্লিকা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে ওঠে, 'খুব তো বড় বড় কথা বলছেন, আপনি আমার বিষয়ে কতটুকু জানেন? জানেন, মামা আমাকে দিয়ে কি কি সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন?'

'বেশি জানবার কিছু নেই। নিজের চক্ষেই তো দেখলাম, খাতা লিখিছেন, হিসেব পত্তর দেখছেন, বোর্ডারদের সুবিধে স্বাচ্ছন্দ্য দেখছেন, নিজের মুখেই তো বললেন, অহোরাত্র খাটছেন। এই যথেষ্ট আর বেশি না জানলেও চলবে। আমি বলবো আপনার মামার এটা রীতিমত স্বার্থপরতা। আর আপনার উচিত এর প্রতিবাদ করা।

'সত্যি।' হঠাৎ বেদম খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে মল্লিকা। আর নেহাত বাচাল মেয়ের মত বলে ওঠে, 'মনে হচ্ছে, আমার ওপর আপনার বড্ড মায়া পড়ে গেছে। লক্ষণ ভালো নয়।'

'উপহাস করছেন?'

আহত কণ্ঠে বলে প্রভাত।

'কে বললে?' মল্লিকা হাসি থামিয়ে বলে, 'খাঁটি সত্য কথা। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখেছেন কি, মামা এ-রকম স্বার্থপর না হলে আপনিই-বা আমার জন্যে এত দুশ্চিন্তা করবার অবকাশ পেতেন কোথায়? আপনার সঙ্গেও তো সেই একই সম্পর্ক—মামার বোর্ডার।

প্রভাত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, আরক্ত মুখে বলে, 'মাপ করবেন। নিজের পোজিশনটা হঠাৎ ভুলে গিয়েছিলাম।'

'আরাম কুঞ্জে'র ডান পাশের রাস্তায় জীপ গাড়িটা প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিল, প্রভাত অফিসের সাজে সজ্জিত হয়ে এসে দেখলো ভিতরে আরও দু'জন ইতিমধ্যেই আসীন!

গতকাল একাই গিয়েছিল এবং আজও সেইরকম ধারণা নিয়েই আসছিল, সহযাত্রী যুগলকে দেখে মনটা অপ্রসন্ন হয়ে উঠলো।

তা, প্রভাত কি কুনো?

মানুষ ভালোবাসে না সে?

ঠিক তাও নয়। সত্যিকথা বললে বলতে হয়. প্রভাত একটু প্রাদেশিকতা দোষদুষ্ট। সহযাত্রীরা বাঙালী হলে সে যে পরিমাণ প্রসন্ন হয়ে উঠতো, সেই পরিমাণ অপ্রসন্ন হলো ওদের দেখে।

বিদেশী পদ্ধতিতে একটু সৌজন্যসূচক সম্ভাষণ করে প্রভাত গম্ভীর মুখে উঠে বসলো। দেখলো, পায়ের কাছে তিনটি টিফিন কেরিয়ার বসানো এবং তাদের হাতলে এক একটা সুতো বেঁধে অধিকারীর নামের টিকিট লটকানো।

মিঃ গোস্বামী, মিঃ ট্যাণ্ডন, মিঃ নায়ার। প্রভাত ভাবলো সর্ব-ধর্ম সমন্বয়। ভাবলো চ্যাটার্জি লোকটা ঝুনো ব্যবসাদার বটে!

গাড়ি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চললো, তিনটি যাত্রী কেউ কারো সঙ্গে আলাপের চেষ্টা করলে না। শুধু প্রভাতের মনে হলো অন্য দুজন যেন অনবরত তার দিকেই লক্ষ্য করছে।

মনের ভ্রম?

না কি সম্পূর্ণ সাধারণ ব্যাপার?

প্রভাতও তো বারবার ওদেরই দেখছে।

আজও সন্ধ্যায় গণেশ ও সেই অপর একজন খাবার নিয়ে এলো এবং যথারীতি মল্লিকার দেখা মিললো না।

সকাল থেকে অকারণেই প্রভাতের মনটা বিষ হয়েছিল। সকালের সেই লোকদুটো এ বেলাও সহযাত্রী হয়েছে। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে এই ব্যবস্থাই চলতে থাকবে। জীপের ব্যবস্থা দেখে কাল খুশি হয়েছিল, আজ বিরক্তি বোধ করছে।

কম্পাউণ্ডের মধ্যে এদিক-ওদিক দু'চারখানা প্রাইভেট কার দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মেজাজ আরও খারাপ হয়ে গেছে। ওব মনে হচ্ছে, জগতের সকলেরই প্রভূত টাকা আছে। নেই শুধু প্রভাতের।

নিজের একখানি 'কার' চালিয়ে যথেচ্ছ বেড়াতে পওয়াটাই প্রভাতের মতে আপাততঃ জগতের শ্রেষ্ঠ সুখের অন্যতম মনে হতে লাগলো। জীপের জন্যে আলাদা চার্জ দিতে হবে, অথচ কেমন যেন দয়া দয়া ভাব। নিজেকেও 'দয়ার ভিখিরী' মত লাগছে।.....

গণেশকে প্রশ্ন করলো, 'গাড়িতে আর যে দু'জন ভদ্রলোক ছিল ওরা এখানে বরাবর থাকে?'

গণেশ গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে বলে, 'কি জানি।'

'কি জানি মানে? তুমি জানো না?'

'আজ্ঞে না বাবু, আমাদের কিছু জানবার আইন নেই।'

'ব্যাপার কি বলো তো? এখানে কিছু রহস্য-টহস্য আছে না কি?' প্রভাত উত্তেজিত ভাবে বলে, তোমাদেয় মালিক যখন স্টেশন থেকে নিয়ে এলেন, তখন যেরকম ভেবেছিলাম, সেরকম তো দেখছি না।'

গণেশ এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে, বেশি ভাবাভাবির দরকার কি বাবু? আছেন থাকুন! কোনও অসুবিধে হয় জানবেন, চুকে গেল।'

'গাড়ীতে যারা গেল, তাদের আমার ভালো লাগেনি।'

'তা বিশ্বসুদ্ধু লোককে ভালো লাগবে তার কি মানে আছে?' গণেশ ঝাড়নে হাত মুছতে মুছতে বলে, 'রেলগাড়িতে কত লোক পাশে বসে যায়, সবাইকে আপনার ভালো লাগে? আপনি বাঙালী, আপনার ভালোর জন্য বলছি বাবু, নিজের তালে থাকুন, সুখে থাকবেন। অন্যদিকে নজর দিতে গেলে বিপদ আছে।'

গণেশ চলে যায়।

প্রভাতের মনে হয়, লোকটা নেহাৎ সামান্য চাকর নয়। কথাবার্তা বড্ড বেশি ওস্তাদমার্কা।

আজও দেরী করে খেলো প্রভাত, আর হঠাৎ মনে করলো এখানে থাকবো না। চাট্যার্জির আরামকুঞ্জ ছাড়া সত্যিই কি আর জায়গা জুটবে না? অফিস অঞ্চলে চেষ্টা করে দেখবো।

পিছনের বারান্দা দিকটা অন্ধকার, তার নীচেই সেই সুবিস্তীর্ণ জকি, জানালাগুলোয় শিক নেই, শুধু কাঁচের শার্সি সম্বল।

নাঃ! চলেই যাবে। অস্বস্তি নিয়ে থাকা যায় না।

খাওয়ার পর চিঠি লিখতে বসলো,—'শ্রীচরণেষু কাকিমা, আশা করি কাকাকে লেখা আমার পৌঁছানো সংবাদ পেয়েছেন। লিখেছিলাম বটে থাকার জায়গা খুব ভালো পেয়েছি, কিন্তু একটা মস্ত অসুবিধে, অফিস অনেক দূর। রোজ যাতায়াতের পক্ষে বিরাট ঝামেলা। তাই ভাবছি, অফিস অঞ্চলে একটা ব্যবস্থা করে নেবো। নতুন ঠিকানা হলেই জানবো। ইতি।

আজও ভাবলো কাকিমাকে মল্লিকার কথাটা লিখলে হতো!

কিন্তু লিখতে গিয়ে ভাবলো, কথাটাই বা কী, 'এখানে একটি মেয়ে আছে, নাম মল্লিকা, তার পর?'

এটা কি একটা কথা?

অথচ কথাটা মন থেকে তাড়ানো যাচ্ছে না।

চিঠিখানা কাল পাছে পোস্ট করতে ভুলে যায়, তাই অফিসের কোটের পকেটে বেখে দিয়ে ঘুরে দাড়াতেই অবাক হয়ে গেল প্রভাত!

দরজায় দাঁড়িয়ে চ্যাটার্জি।

পর্দা সরিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন স্থির হয়ে প্রভাতের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই, বিনয়ে একেবারে গলে গিয়ে নীচু হয়ে বললো, 'এই দেখতে এলাম, আপনার কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা।'

প্রভাত ভুরুটা একটু কুঁচকে বললো, 'কই, আমাকে তো ডাকেননি মিস্টার চ্যাটার্জি?'

'আহা-হা ডাকবো কেন? তন্ময় হয়ে চিঠি লিখছিলেন! স্ত্রীকে বোধহয়!'

চ্যাটার্জির গোফের ফাঁকে একটু হাসি ঝলসে ওঠে।

প্রভাতে গতকাল এই বিনয় নম্র লোকটাকেই ঈশ্বর প্রেরিত মনে হয়েছিল, কিন্তু আজ ওর ওই অতি বিনীত ভাবটাতে গা জ্বলে গেল। তাছাড়া মনে

পড়লো মল্লিকার মামা। তাই ঈষৎ কঠিন স্বরে বলে উঠলো, 'স্ত্রী ছাড়া জগতে আর কাউকে কেউ লেখে না?'

'আহা লিখবে না কেন?' আর একটু ধূর্ত হাসি হাসেন চ্যাটার্জি, 'লেখা পোস্টকার্ডে, দু'পাঁচ লাইন। আর এত তন্ময় হয়েও লেখে না। আমরা তো মশাই এটাই সার বুঝি।'

'আপনারা যা বোঝেন, হয়তো সেটাই সব নয়। চিঠি আমার কাকিমাকে লিখেছি।' বলে কথার উপসংহারের সুর টেনে দেয় প্রভাত।

কিন্তু চ্যাটার্জি উপসংহারের এই ইঙ্গিত গায়ে মাখেন না। একটা কৌতুকের হাসি মুখে ফুটিয়ে বলে ওঠেন, 'কা—কি-মা-কে! আপনি যে তাজ্জব করলেন মশাই! কাকিমাকে—চিঠি, তাও এত ইয়ে! তা কি লিখলেন?'

প্রভাত আর শুধু ভুরু কুঁচকেই ক্ষান্ত হয় না, প্রায় ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'প্রশ্নটা কি ভদ্রতা সঙ্গত হলো মিস্টার চ্যাটার্জি?'

'আহা-হা, চটছেন কেন? চটছেন কেন? এমনি একটা কথার কথা বললাম। বারোমাস যত নন্‌-বেঙ্গলী নিয়ে কারবার, দুটো খোলা মেলা কথা তো কইতে পারি না। আপনি বাঙ্গালী বলেই—যাক্ যদি রাগ করেন তো মাপ চাইছি।'

এবার প্রভাতের লজ্জার পালা।

ছি ছি, বড় অসভ্যতা হয়ে গেল। হয়তো লোকটা ভাগ্নীর কাছে গিয়ে গল্প করবে! কী মনে করবে মল্লিকা, তা কে জানে!

আসলে লোকটা মুখ্য! তাই ভাব ভঙ্গিতে কেমন অমার্জিত ভাব। নেহাৎ পদবীটা চ্যাটার্জি তাই। নইলে নেহাৎ নীচু ঘরের মনে হতো।

তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, 'না না, রাগের কথা নয়। লক্ষ্ণৌতে কাকা-কাকিমার কাছেই ছিলাম এতদিন, এসে চিঠিপত্র না দিলে ভালো দেখায়? তা লিখছিলাম কাকিমাকে চিঠি, বললেন স্ত্রীকে। মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। মাথা নেই তার মাথাব্যথা!

'তাই নাকি? হা-হা-হা! ভারী মজার কথা বলেন তো আপনি।' চ্যাটার্জি হেসে ঘর ফাটান।

চ্যাটার্জি চলে গেল, প্রভাত ভাবতে থাকে, অকারণ বিরূপ হচ্ছি কেন। না না, এটা ঠিক নয়। সন্দেহের কিছু নেই। রহস্যই বা কি থাকবে। লোকটা ঝুনো ব্যবসাদার, এই পর্যন্ত। জিপের সহযাত্রীরা বাঙালী নয়, এতে বিরক্তির কি

আছে? অফিসে তো সে ছাড়া আর একজনও বাঙালী নেই। যাচ্ছে না প্রভাত সেখানে?

গণেশের কথাবার্তাই একটু বেশি কায়দার। যেন ইচ্ছে করে রহস্য সৃষ্টি করতে চায়। ওর সঙ্গে আর কথা বেশি বলার দরকার নেই।

আর—

আর মল্লিকার সঙ্গেও দূরত্ব বাজায় রেখে চলতে হবে। কী দরকার প্রভাতের, কার মামা তার ভাগ্নীর প্রতি অন্যায় ব্যবহার করছে কি ন্যায় ব্যবহার করছে তার হিসেব নিতে যাওয়া!

সিদ্ধান্ত করলে, খাবে, ঘুমোবে, কাজে যাবে, ব্যস।

মনটা ভালো করে দরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লো প্রভাত।

ঘড়িতে দেখল রাত পৌনে দশটা।

কিন্তু প্রভাতের নিশ্চিন্ততার সুখ যে ঘণ্টাকয়েক পরেই এমন ভাবে ভেঙে যাবে, তা কি সে স্বপ্নেও ভেবেছিল? ঘণ্টা কয়েক!

ক'ঘণ্টা? পৌনে দশটার পরে শুয়ে কতক্ষণ ঘুমিয়েছে প্রভাত? ঘুমের মধ্যে সময় নির্ণয় হয় না, তবু প্রভাতের মনে হলো ঘণ্টা তিন চার পার হয়েছে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল, জানালার কাছে খুব দ্রুত আর জোরে একটা টকাটক শব্দ! পিছনের খোলা বারান্দার দিকের জানালা।

ভয়ে বুকটা ঠাণ্ডা মেরে গেল প্রভাতের, ঝপ করে বেড সুইচটা টিপে আলোটা জ্বেলে ফেলে কম্পিত বক্ষে সিই দিকে তাকালো।

কে ও?

চোর ডাকাত? খুনে গুণ্ডা?

জানালা ভেঙে ফেলবে? অশরীরী যে একটা আতঙ্ক তাকে পেয়ে বসেছিল সেটা তাহলে ভুল নয়?

না কি সেই বাঘের চাইতে ভয়ঙ্কর কুকুরগুলোই কোন একটা কাঁচ আঁচড়াচ্ছে!

কিন্তু তাই কি?

এ তো নির্ভুল মানুষের আওয়াজ! যেন সাঙ্কেতিক।

কাঁচ ভেদ করে গলার শব্দ আসে না, তাই বোধহয় এই শব্দটাই অবলম্বন করেছে।

শব্দ মুহুর্মুহু বাড়ছে। টকটক। টকাটক খটখট।

কেউ কোন বিপদে পড়েনি তো!

দেখবো না কি। না দেখলেও তো বিপদ আসতে পারে। ঈষৎ ইতস্ততঃ করে প্রভাত বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জানালার কাছে গিয়ে পর্দাটা সরাতে গিয়েই চমকে উঠলো।

কী সর্বনাশ, এ যে মল্লিকা!

কোনো বিপদে পড়েছে তাহলে!

মল্লিকা এতক্ষণ ব্যাকুল আবেদন জানাচ্ছে, আর প্রভাত বোকার মত বিছানায় শুয়ে ভয়ে কাঁপছে। কী বিপদ! কুকুরে তাড়া করেনি তো?

কী ভাবে যে জানালার ছিটকিনিটা খুলে ফেলেছিল প্রভাত তা আর মনে নেই। শুধু দেখতে পায় জানালা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই মল্লিকা উদ্‌ভ্রান্তের মত ঝুপ করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে জানালাটা ফের বন্ধ করে দিয়ে আর পর্দাটা টেনে দিয়ে প্রভাতের বিছানার ধারে বসে হাঁফাচ্ছে।

প্রভাত চিত্রার্পিত পুত্তলিকাবৎ!

এ কী! এর মানে কী!

হাঁফানো থামলে মল্লিকা কাতর বচনে বলে, 'মিস্টার গোস্বামী, আমায় ক্ষমা করুন, দয়া করে আলোটা নিভিয়ে দিন।'

প্রভাত প্রায় অচেতনের মত এই অভূতপূর্ব ঘটনার সামনে দাঁড়িয়েছিল। রাত দুটোর সময় তার বিছানার উপর একটি বেপথু সুন্দরী তরুণী!

এ স্বপ্ন? না মায়া?

কথা কইলে বুঝি এ স্বপ্ন ভেঙে যাবে, এ মায়া মুছে যাবে।

ভেঙে গেল স্বপ্ন, মুছে গেল মায়া। প্রবল একটা ঝাঁকুনি খাওয়ার মত চমকে উঠলো প্রভাত।

কী বলছে বেপরোয়া মেয়েটা!....

দয়া করে আলোটা নিভোন!

প্রভাত প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'কী বলছেন আপনি?'

'মিস্টার গোস্বামী, কী বলছি, তার বিচার পরে করবেন, যদি আমাকে বাঁচাতে চান—'

হঠাৎ নিজেই হাত বাড়িয়ে আলোটা নিভিয়ে দেয় মল্লিকা। বিছানার উপর ভেঙে পড়ে চাপা কান্নায় উদ্বেল হয়ে ওঠে।

আর সেই অন্ধকার ঘরের মাঝখানে প্রভাত বাক্‌শক্তিহীন ভূতের মত দাঁড়িয়ে থাকে।

কতক্ষণ?

কে জানে কতক্ষণ।

হয়তো বা কত যুগ!

যুগ-যুগান্তর পরে কান্নার শব্দ স্তিমিত হয়, অন্ধকারেও অনুভব করতে পারে প্রভাত, মল্লিকা উঠে বসেছে।

কান্নাভেজা গলায় আস্তে কথা বলে মল্লিকা, 'মিষ্টাব গোস্বামী আপনি হয়তো আমাকে পাগল ভাবছেন!'

ভূতের মুখে বাক্য ফোটে?

'আপনাকে কি নিজেকে, তা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আপনি ধারণা করতে পারবেন না মিস্টার গোস্বামী, কী অবস্থায় আমি এভাবে আপনাকে উত্যক্ত করতে এসেছি!'

অবস্থাটা যদি এত ভয়াবহ না হতো শুধু স্নায়ু নয়, অস্থিমজ্জা পর্যন্ত এমন করে সিঁটিযে না উঠতো, তাহলে হয়তো প্রভাত সহানুভূতিতে গলে পড়তো, কী ব্যাপার ঘটেছে জানবার জন্যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করতো। কিন্তু অবস্থাটা ভয়াবহ!

তাই প্রভাতের কণ্ঠ থেকে যে স্বর বার হয়, সেটা শুকনো, আবেগ শূন্য।

'সত্যিই ধারণা করতে পারছি না। কিন্তু দয়া করে আলোটা জ্বালতে দিন, অবস্থাটা অসহ্য লাগছে।

'না না না!' মল্লিকা প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, 'চলে যাবো, ভোর হলেই চলে যাবো আমি। শুধু ঘণ্টা কয়েকের জন্যে আশ্রয় দিয়ে বাঁচান আমাকে।'

'কিন্তু মল্লিকা দেবী, আপনার এই বাঁচা মরার ব্যাপারটা তো কিছুতেই বুঝতে পারছি না আমি।'

'পারবেন না। সে বোঝবার ক্ষমতা আপনাদের পুরুষদের থাকে না। তবু কল্পনা করুন, বাঘে তাড়া করছে আমাকে।'

'বাঘে।'

অস্ফুট একটা আওয়াজ বার হয় প্রভাতের মুখ থেকে। ভাষার অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করবার আগেই পিছনের সেই পাহাড়ের কোল পর্যন্ত প্রসারিত অন্ধকার তৃণভূমির দৃশ্যটা মানশ্চক্ষে ভেসে ওঠে তার, আর অস্ফুট ওই প্রশ্নটা উচ্চারিত হয়।

অন্ধকারে অসহনীয় ধাক্কাটা বুঝি ক্রমশঃ সহনীয় হয়ে আসছে, ভেন্টিলেটার দিয়ে আসা দুরবর্তী কোন আলোর আভাস ঘরের চেহারাটা পরিস্ফুট করে তুলছে। হাসির শব্দটা, লক্ষ্য করে অনুমান করতে পারছে প্রভাত, মল্লিকার মুখে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের রেখা। সেই রেখার কিনারা থেকে উচ্চারিত হলো, 'হ্যাঁ বাঘই। শুধু চেহারাটা মানুষের মত।'

স্তব্ধতা! দীর্ঘস্থায়ী একটা স্তব্ধতা।

তারপর একটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারিত হয়, 'এ-রকম পরিবেশে এইরকম ঘটনা ঘটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বলতে পারেন, এত রাত্রে আপনি নিজের ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছিলেন কেন?'

আবার মিনিটখানেক নিস্তব্ধতা, তারপর মল্লিকার ক্লান্ত করুণস্বর ধ্বনিত হয়, 'এই আমার ললাটলিপি মিস্টার গোস্বামী! চাকব-বাকর শুয়ে পড়ে, আমাকে তদারক করে বেড়াতে হয়, আগামী ভোবেব রসদ মজুত আছে কিনা দেখতে! হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে মনে পড়লো, স্টোরে সকলের ব্রেকফাস্টের উপযুক্ত ডিম নেই। তাই মুরগীর ঘর তল্লাস করতে গিয়েছিলাম। মিস্টাব গোস্বামী, কেন জানি না আমার হঠাৎ মনে হলো আপনার ঘরটাই নিরাপদ আশ্রয়।'

'অদ্ভুত মনে হওয়া। মল্লিকা দেবী, আমিও একজন পুরুষ, এটা বোধকরি আপনি হিসেবের মধ্যে আনেন নি।'

'এনেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্থির করেছিলাম আপনি মানুষ।'

'আপনার এমন বিশ্বাসের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু এটা কেন ভাবছেন না, হঠাৎ যদি কারো চোখে পড়ে আপনি আমার ঘরে এবং আলো নিভানো ঘরে, তাহলে অবস্থাটা কি হবে? আমার কথা থাক, আপনার দুর্নাম সুনামের কথাই ভাবুন।'

'ভাবছি। বুঝতে পারছি, মল্লিকা আরও ক্লান্তগলায় বলে, কিন্তু তবু সে তো মিথ্যা দুর্নাম। সত্যিকার বিপদ নয়। বাঘের কামড় নয়।'

অন্ধকারেই জিনিসপত্র বাঁচিয়ে বারকয়েক পায়চারি করে প্রভাত তারপর দৃঢ়স্বরে বলে, 'কিন্তু সেই বদলোকটা যে কে, আপানার চেনা দরকার ছিল। আপনার মামাকে তার স্বরূপ চিনিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।

'মামাকে আমার মামাকে!' মল্লিকা আর একবার কান্নায় ভেঙে পড়ে, আমার মামাকে আপনিই চেনেন না, তাই বলছেন! মামা তাঁর খদ্দেরকে খুশি করতে, নিজেই আমাকে বাঘের গুহায় ঠেলে দিতে চান—'

'মল্লিকা দেবী!'

তীব্র একটা আর্তনাদ ঘরের স্তব্ধতাকে খান খান করে ফেলে।

না!

সে আর্তনাদের শব্দ কারও কানে প্রবেশ করে ভয়ঙ্কর একটা কেলেঙ্কারী সৃষ্টি করেনি। মোটা কাপড়ের পর্দা ঘেরা কাচের জানালা ভেদ করে কারো নিশ্চিন্ত ঘুমে ব্যাঘাত ঘটায়নি।

এখন সকাল।

এখন প্রভাত এসে দাঁড়িয়েছেন সেই ভয়ঙ্কর সুন্দর প্রকৃতির দৃশ্যের সামনে। গত দুদিন শুধু সামনেই তাকিয়ে দেখেছে মুগ্ধ দৃষ্টিতে। আজ দু'পাশে যতদূর দৃষ্টি চলে দেখতে থাকে। ডানদিকে নীচু জমিতে ওই চালাঘরটা তাহলে মুরগীর ঘর। ওর জালতির দরজাটা সন্দেহের নিরসন করছে।

রাত দুটোর সময় ওইখানে নেমেছিল মল্লিকা ডিমের সন্ধানে?

মল্লিকা কি পাগল?

কথাটা কি বিশ্বাসযোগ্য?

ও কি একটা গল্প বানিয়ে বলে গেল?

কিন্তু তা কি কখনও সম্ভব?

চিরদিন সাধারণ ঘর-গেরস্থীর মধ্যে মানুষ নিঃসন্দিগ্ধচিত্ত প্রভাতের ওই সন্দেহটাকে 'সম্ভব' বলে মনে করতে বাধে।

তবে চ্যাটার্জির যে রূপ উদ্‌ঘাটির করলো মল্লিকা, সেটাকে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেবে, এত অবোধ সরলও নয় প্রভাত। জগতের ভয়াবহ রূপ প্রত্যক্ষ না দেখুক, জানে বৈকি!

স্বার্থের প্রয়োজনে স্ত্রী কন্যা বোনকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দেয়, জগতের এমন পুরুষের অভাব নেই একথা প্রভাত জানে না এমন নয়। এই দণ্ডে এই পিশাচ লোকটার আশ্রয় ত্যাগ করে চলে যেতে ইচ্ছে করছে তার।

কিন্তু।

কিন্তু কী এর আমোঘ অদৃশ্য বন্ধনে বাঁধা পড়ে গেল সে। তাই ভাবছে, মল্লিকাকে সে কথা দিয়েছে এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। এই নরক থেকে এই হিংস্র জানোয়ারের গুহা থেকে।

অথচ জানে না কেমন করে রাখবে সেই প্রতিজ্ঞা।

কাল নিরীক্ষণ করে দেখার দরকার হয়নি, আজ দেখছে। দেখছে সমস্ত

সীমানাটা কাঁটা তারের বেড়ায় ঘেরা, সেই ব্যঘ্রসদৃশ কুকুরগুলো চোখে দেখেনি বটে, কিন্তু রাত্রে তাদের গর্জন মাঝে মাঝেই কানে এসেছে।

রাতে যাওয়া হয় না। তাছাড়া যানবাহন কোথা? সেই চ্যাটার্জির জিপ্‌গাড়িই তো মাত্র ভরসা। এক যদি মল্লিকা শহরের দিকে যাবার কোনও ছুতো আবিষ্কার করতে পারে।

কিন্তু মল্লিকা বলেছে, 'অসম্ভব'।

কিন্তু তুমিতো মামার সঙ্গে রোজ স্টেশনে যাও লোক ধরতে!' বলেছিল প্রভাত।

'হ্যাঁ, মামার সঙ্গে।' মল্লিকা মৃদু তীক্ষ্ণ একটু হেসেছিল।

তবু তাকে আশ্বাস দিয়েছে প্রভাত।

প্রভাত নয়, প্রভাতের শিরায় শিরায় প্রবাহিত পুরুষের রক্ত। যে রক্ত পুরুষানুক্রমে মধ্যবিত্ত জীবনের দায়ে স্তিমিত হয়ে গেলেও একেবারে মরে যায়নি।

আশ্বাস দিয়েছে সেই রক্ত। আশ্বাস দিয়েছে তার যৌবন।

চায়ের সময় হয়ে গেছে।

প্রভাত এখনো নিজেকে প্রস্তুত করে নেয়নি। আকাশে আলো ফুটতে ফুটতেই বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে।

এখন ফের ঘরে এলো। সাবান তোয়ালে টুথব্রাশ নিয়ে সংলগ্ন স্নানের ঘরের দিকে এগোতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

তাকিয়ে দেখলো বিছানাটার দিকে।

রাত দুটোর পর আর শোয়া হয়নি প্রভাতের। শোবার সময় হয়নি, হয়তো বা সাহসও হয়নি। এখন তাকিয়ে দেখছে কোথায় বসেছিল সেই ক্রন্দনবতী। কোনখানটায় আছড়ে পড়ে চোখের জলে সিক্ত করে তুলেছিল।

সত্যিই কি এসেছিল কেউ? না কি প্রভাতের স্বপ্নকল্পনা? চমকে বিছানার কাছে এগিয়ে এলো। বালিশের গায়ে একগাছি লম্বা চুল!

ঈশ্বর রক্ষা করছেন!

এখুনি চাকরবাকর বিছানা ঝাড়তে আসবে।

এ দৃশ্য যদি তাদের চোখে পড়তো! চারিদিকে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে ফেলে দেখলো আর কোথায় আছে কি না।

নেই।

নিশ্চিন্ত হওয়া যায়

কিন্তু?

সমস্ত নিশ্চিন্ততা ছাপিয়ে মল্লিকার একটা কথা মাথার মধ্যে কাঁটার মত বিঁধছে।

সে কাঁটা বলছে—একথা কেন বললো মল্লিকা?

কথাটা আবার মনের মধ্যে স্পষ্ট পরিষ্কার উচ্চারণ করলো প্রভাত। নতুন করে আশ্চর্য হলো।

প্রতিজ্ঞা! প্রতিজ্ঞা করছেন? পুরুষের প্রতিজ্ঞা! কিন্তু আপনি কী সত্যি পুরুষ।

তীব্র তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মত একটু হেসেছিল মল্লিকা এই প্রশ্নের সঙ্গে।

কোন্ কথার পিঠে এ প্রশ্ন উঠেছিল তা মনে পড়ছে না প্রভাতের। বোধকরি প্রভাতের প্রতিজ্ঞামন্ত্র পাঠের পর। না কি তাও নয়।

না তা নয়। বোধহয় চলে যাবার আগে। হ্যাঁ তাই। চলে যাবার আগে ফিরে দাঁড়িয়ে বলে উঠেছিল, 'প্রতিজ্ঞা করছেন? পুরুষের প্রতিজ্ঞা! কিন্তু আপনি কি সত্যি পুরুষ!'

এ কিসের ইঙ্গিত!

মল্লিকার করুণ অভিব্যক্তি আর ভয়বাহ ভাগ্যের পরিচয়ের সঙ্গে ওই হাসি আর প্রশ্নের সামঞ্জস্য কোথায়?

যথারীতি গণেশ এলো।

প্রভাত বিনা প্রশ্নে চায়ের ট্রেটা কাছে টেনে নিলো। কিন্তু তবু চোখে না পড়ে পারলো না কেমন একরকম তাকাচ্ছে আর মিটি মিটি হাসছে গণেশ।

কেন, ওরকম করে হাসছে কেন ও? ও কি ঘরে ঢুকেছিল?

দীর্ঘ বেণী থেকে খসে পড়া কোনও দীর্ঘ অলক আর কোথাও কি চোখে পড়েছে ওর?

কোন বাক্য বিনিময় হলো না অবশ্য! কিন্তু গণেশের ওই চোরা ব্যঙ্গের চাউনিটা গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিয়ে গেল।

আর একদণ্ড এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না।

কী হয়, ওই অফিস যাবার মুখেই যদি প্রভাত বিল মিটিয়ে দিয়ে মালপত্র নিয়ে চলে যায়, 'ওবেলা আর আসবো না' বলে?

ভালোমন্দ যাই হোক হোটেল একটা জুটবেই।

এ রকম 'হিংস্র সুন্দরে' তার দরকার নেই।

এর অন্তরালে কোথাও যেন বিপদের চোরা গহ্বর, এর শিরায় শিরায় যেন ভয়াবহ রহস্যের জাল পাতা।

চ্যাটার্জি লোকটা নোংরা নীচ ইতর কুৎসিত।

চ্যাটার্জির খদ্দেররা সৎ নয়।

নির্ঘাৎ রাত্রে এখানে মাতলামি চলে, নোংরামি চলে, জুয়ার আড্ডা বসে। হয়তো বা কালোবাজারের হিসেব নিকেশ হয়, হয়তো খাদ্যে আর ওষুধে কী পরিমাণ ভেজাল দেওয়া সম্ভব, তারই পরিকল্পনা চলে।

চ্যাটার্জি এদের পালক, পোষক।

কী কুক্ষণেই স্টেশনে চ্যাটার্জির কবলে পড়েছিল প্রভাত।

একবার ভেবেচিন্তে দেখলো না, যার সঙ্গে যাচ্ছে, সে লোকটা কেমন।

'কি নির্বোধ আমি!'

কিন্তু শুধু কি ওইটুকু নির্বুদ্ধিতা।

কী চরম নির্বুদ্ধিতা দেখিয়েছে কাল রাত্রে!

তুমি প্রভাত গোস্বামী, বিদেশে এসেছো চাকরি করতে। কী দরকার ছিল তোমার নারীরক্ষার নায়ক হতে যাবার? কোন্ সাহসে তুমি একটা অসহায় বন্দিনী মেয়েকে ভরসা দিতে গেলে বন্ধন মোচনের? যে মেয়ের রক্ষকই ভক্ষক।

জগতে এমন কত লক্ষ লক্ষ মেয়ে পুরুষের স্বার্থের আর পুরুষের লোভের বলি হয়েছে, হচ্ছে, হবে। যতদিন প্রকৃতির লীলা অব্যাহত থাকবে, ততদিনই এই নিষ্ঠুর লীলা অব্যাহত থাকবে।

প্রভাত ক'জনের দুরবস্থা দূর করতে পারবে?

তবে কেন ওই মেয়েটাকে আশ্বাস দিতে গেল প্রভাত চরম নির্বোধের মত।

চলে যাবে। আজই। জিনিসপত্র নিয়ে।

'তাকিয়ে দেখলো চারদিকে।

কীই বা! এই তো সুটকেস, বিছানা, আর আলনায় ঝোলানো দু-একটা পোশাক!

দু' মিনিটে টেনে নিয়ে গুছিয়ে ফেলা যায়। টিফিন বাক্সটা তো জিপেই আছে।

মল্লিকা তো চোখের আড়ালে।

মল্লিকার সঙ্গে তো জীবনে আর চোখাচোখি হবে না।

আলনায় জামাটায় হাত দিতে গেল।

আর মুহূর্তে 'ছি ছি' করে উঠলো।

প্রভাত না মানুষ? ভদ্ররক্ত গায় আছে না তার?

অফিসে গিয়ে মনে হলো, কাকিমার চিঠিটায় মল্লিকা সম্পর্কে দু লাইন জুড়ে দিয়ে পোস্ট করবে।

পকেট থেকে বার করতে গেল, পেল না।

কী আশ্চর্য, গেল কোথায় চিঠিটা? নিশ্চিত মনে পড়ছে, কোটের পকেটে রেখেছিল।

কিছুতেই ভেবে পেল না, পড়ে যেতে পারে কি করে।

কোটটা হ্যাঙ্গার থেকে তুলে নিয়েছে, গায়ে চড়িয়েছে, গাড়িতে উঠেছে, গাড়ি থেকে নেমে অফিসে ঢুকেছে। এর মধ্যে কী হওয়া সম্ভব?

চিঠিটা তুচ্ছ, আবার লিখলেই লেখা যায়, হারানোটা বিস্ময়কর!

কিন্তু আরও কত বিস্ময় অপেক্ষা করছিল প্রভাতের জন্য, তখনও জানে না প্রভাত। সে বিস্ময় স্তব্ধ করে দিল খাবারের কৌটো খোলার পর।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় নাকি 'চাপাটি' হয়ে উঠেছিল সঙ্কেত প্রেরণের মাধ্যম। ইতিহাসের সেই অধ্যায়টাই কি মল্লিকা কাজে লাগালো?

রুটির গোছার নিচে সাদা একটা কাগজের মোড়ক।

টেনে তুললো।

খুলে পড়লো।

স্তব্ধ হয়ে গেল।

'দয়া করে রাত্রে জানালাটা খুলে রাখবেন।'

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে ছিঁড়ে ফেললো টুকরোটা। না না না! কিছুতেই না!

এ কী কুৎসিত জালে জড়িয়ে পড়েছে সে!

মল্লিকা কী?

ও কি সত্যি বিপন্ন, না মায়াবিনী?

ভদ্র মেয়ের এত দুঃসাহস হয়?

কিন্তু সেই কান্না? সে কী মায়াবিনীর কান্না?

রাত্রে প্রতিজ্ঞা করলো, তবু বিচলিত হবে না সে। জানালা খুলে রাখবে না। কে বলতে পারে বিপদ কোন্ পথ দিয়ে আসে। তার কি মোহ আসছে?

মায়ের মুখ স্মরণ করলো।

প্যাড টেনে নিয়ে চিঠি লিখতে বসলো মাকে!

লেখা চিঠিটা আজ আর কোটের পকেটে রাখলো না, নিজের অফিসের ব্যাগে রেখে দিল।

নিশ্চিন্ত হয়ে শুলো।

কিন্তু ঘুমের কি হলো আজ?

কিছুতেই কোন শান্তির স্নিগ্ধতা আসছে না। কী এক অস্বস্তিতে উঠে বসতে ইচ্ছা করছে।

পাখার হাওয়াটা যেন ঘরের উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। বিছানায় ছুঁচ ফুটছে। মাথায় ঝাঁ ঝাঁ করছে। জানালাটা একবারের জন্য খুলে দিয়ে এই উত্তপ্ত বাতাসটা বার করে দিলে ক্ষতি কি?

মনস্থির করে উঠে বসলো।

জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে মুহূর্তে চিন্তা করে খুলে ফেললো ছিটকিনিটা, ঠেলে দিলো কপাটটা!

হু হু করে স্নিগ্ধ বাতাস এসে ঢুকছে, জুড়িয়ে যাচ্ছে শরীর, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুম এসে যাচ্ছে যেন।

আশ্চর্য! অন্য অন্য কটেজগুলোর জানালা সব খোলা! ওদের ভয় করে না? চোর, ডাকাত, বন্য জন্তুর?

প্রভাত ভাবলো ওরা সকলেই অবাঙালী!

ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে বাক্সর মধ্যে ঘুমানোর কথা ভাবতেই পারে না ওরা।

প্রভাত কী ভীতু?

থাক খোলা, কী হয় দেখাই যাক না!

কিন্তু কী দেখতে চায় প্রভাত?

দেখা গেল কিছুক্ষণ পরে।

আর প্রভাতের মনে হলো, মল্লিকা কি জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকতে অভ্যস্ত?

'মল্লিকা দেবী, এ রকম অসমসাহসিকতা করছেন কেন?'

'কী করবো? কখন কথা বলবো আপনাকে?'

আজও ভেঙে পড়ে মল্লিকা, 'দিনের বেলা চারিদিকে পাহারা। ওই গণেশটা হচ্ছে মামার চর। সহস্র চক্ষু ওর। শুধু এই রাত্তিরে তাড়ি খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে!'

'কিন্তু কি বলবেন তাড়াতাড়ি বলুন।'

'আশ্চর্য! আশ্চর্য আপনি।' মল্লিকার তীক্ষ্ণকণ্ঠ ধিক্কার দিয়ে ওঠে, 'আপনি কী শুকদেব?'

'মল্লিকা দেবী! আপনার ওপর থেকে আমার শ্রদ্ধা কেড়ে নেবেন না।'

মল্লিকা সংযত হয়।

ক্ষুব্ধ হাস্যে বলে, 'কি জানেন, পুরুষের একটা রূপই দেখেছি, তাই সেটাই স্বাভাবিক মনে হয়। আর ভালোকথা, সভ্য সুশ্রী কথা, কবে শিখলাম বলুন? সেই আট বছর বয়স থেকে মামার হোটেলের চাকরাণীগিরি করছি। মামার হুকুমে তাঁর খদ্দেরদের আকর্ষণ করতে—'

'থাক! শুনতে কষ্ট হচ্ছে। আজ আপনার কী বক্তব্য সেটাই শুনি।'

মল্লিকা খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

জানালা দিয়ে ছায়া ছায়া জ্যোৎস্না আসছে। ওকে মনে হচ্ছে বন্দিনী রাজকন্যা!

তবে—

আজ ওর গলা কান্নায় ভেজা নয়! ক্লান্ত বিষণ্ণ মধুর।

'মিস্টার গোস্বামী, আজ আমি কিন্তু নিজের স্বার্থে আসিনি। এসেছি আপনাকে সাবধান করতে। কিন্তু তার আগে প্রশ্ন করছি, রোজ আপনি কী এত লেখেন?'

'লিখি!' লিখি মানে? চিঠি লিখি!

'কাকে? কাকে এত চিঠি—'

প্রভাত বিরক্ত কণ্ঠে বলে, 'কেন বলুন তো? এ কী অদ্ভুত কৌতূহল আপনাদের! আপনার মামাও কাল নানান জেরায় আপনাদের হোটেলের খাতায় এ নিয়মটাও তাহলে লিখে রাখা উচিত ছিল, এখানে থাকতে হলে বাড়িতে চিঠি লেখা নিষেধ।'

'আপনি রাগ করছেন? কিন্তু জানেন মামার সন্দেহ হয়েছে আপনি পুলিসের লোক?'

'চমৎকার।'

'ওই তো! গণেশ রোজ খবর দিচ্ছে আপনি লিখছেন। মামার ভাবনা, এগুলো আপনি রিপোর্ট লিখছেন। কারণ প্রথম দিন এসে নাকি নানা অনুসন্ধান করেছিলেন!

'আরও চমৎকার লাগছে!'

'রাগ করলেও, সাবধান হোন, এই অনুরোধ। মামার এখানে অনেক রকম ব্যাপারই তো চলে। বলতে গেলে বেআইনি কাজের ঘাঁটি।'

'হুঁ'। সেই করমই সন্দেহ হচ্ছিল।

'হওয়াই স্বাভাবিক। আপনি সরল হলেও নির্বোধ নন। কিন্তু জানিয়ে রাখি শুনুন, কিছুদিন আগে আপনারই মতো একটি বাঙালী ছেলে বোর্ডারের ছদ্মবেশে এসে বাসা নিয়েছিল টিকটিকিগিরি করতে! সে আর ফিরে যায়নি।'

'মল্লিকা!'

মল্লিকা কিন্তু এ আর্তনাদে বিচলিত হয় না! তেমনি দার্শনিক ভঙ্গীতে বলে হ্যাঁ! তাই! ওই জঙ্গলের দিকে অনুসন্ধান করলে হয়তো এখনো তার হাড়ের টুকরো পাওয়া যেতে পারে।'

বিচলিত প্রভাত সহসা আত্মস্থভাবে বলে, কিন্তু কি করে বুঝবো আপনিও মামার চর নয়?'

'কী করে বুঝবেন!' মূঢ় শোনায় মল্লিকার কণ্ঠস্বর।

'হ্যাঁ। বিশ্বাস কি? যেখানে এত সতর্ক চক্ষু, সেখানে কী ভাবে আপনি রাত্রিবেলা একজন যুবকের ঘরে—'

হঠাৎ প্রায় শব্দ করে হেসে ওঠে মল্লিকা।

'সেটাই তো ছাড়পত্র মিস্টার গোস্বামী! ওরা সন্দেহ করেছে আর অনুমান করেছে আমি আপনার প্রেমে পড়েছি। আর প্রেমে পড়ার একটামাত্র অর্থই ওরা জানে। কিন্তু আমি অনুরোধ করছি আপনি এখান থেকে পালান। মামাকে বলবেন, অফিসের দূরত্বের জন্যেই—'

প্রভাত আর একবার চেয়ে দেখে।

কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ রাত্রির গভীরে আরও পরিস্ফুট হচ্ছে। মল্লিকাকে অলৌকিক দেখাচ্ছে।

ক্ষণপূর্বের কটুমন্তব্যের জন্য নিজেকে ধিক্কার দিলো প্রভাত। তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বললো, 'কিন্তু গতকাল তো একথা হয়নি, আমি একা পালাবো?'

'কাল আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। এই নরকের মধ্যে আর শাসনের মধ্যে বাস করতে করতে মাঝে মাঝে বুদ্ধিবৃত্তি নষ্ট হয়ে যায়। তাই যা অসম্ভব—'

'কিন্তু যদি আমি সম্ভব করতে পারি?'

'চেষ্টা করতে যাবেন না মারা পড়বেন।'

'মল্লিকা! যদি আমি খোলাখুলি তোমার মামার কাছে প্রস্তাব করি আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

আর বুঝি দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না মল্লিকা। বসে পড়ে বলে আপনি! আপনি কি পাগল! এ প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে খুন হয়ে যাবেন, তা জানেন?'

'খুন!'

'তা ছাড়া তো কি! জানেন না, বুঝতে পারেন নি, আমিই মামার শিকার ধরবার সব চেয়ে দামী টোপ্!'

'বেশ, তবে লুকানো রাস্তাই ধরতে হবে। শুধু তুমি রাজী কিনা—'

'আমি রাজী কিনা—শুধু আমি রাজী কিনা!'

একটা প্রবল বিক্ষোভের সঙ্গে সঙ্গে সহসা কি একজোড়া হিম শীতল সাপ এসে আছড়ে পড়লো প্রভাতের উপর? আর প্রভাতকে বেষ্টন করে ধরলো দৃঢ় বন্ধনে?

কিন্তু নাগপাশে বিভীষিকা নিয়েও বন্ধন কেমন করে এমন আবেশময় হয়ে উঠতে পারে?

'মল্লিকা!'

'চেষ্টার অসাধ্য কাজ নেই' এ কথাটা সব ক্ষেত্রে সত্য হয় কিনা জানি না, কিন্তু প্রভাতের পক্ষে হলো।

ভালোমানুষ প্রভাত, মধ্যবিত্ত গৃহস্থমনা প্রভাত, অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যে একটা অসাধ্যসাধনাই করে বসলো।

কিন্তু এই অসাধ্যসাধনা কি সত্যিই প্রেমের আকর্ষণে?

প্রভাত এমন করেই একটা হোটেলওয়ালি মেয়ের প্রেমে পড়ে গেল যে, ভয় ভাবনা ত্যাগ করে ফেললো? মস্ত একটা বিপদের ঝুঁকি নিতে পিছপা হলো না?

মাত্র কয়েকটি দিনে এমন প্রেমের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব?

হয়তো তা নয়।

মল্লিকার রূপ যৌবন একটা মোহের সঞ্চার করলেও প্রভাতের ভদ্রচিত্তের কাছে সেই আবেদনই শেষ কথা হয়ে ওঠেনি।

মানবিকতার প্রশ্নটাও ছোট নয়।

মল্লিকার অশ্রুজলের আবেদন, একটি নিঃসহায়া নিরুপায় মেয়ের জীবনের অনিবার্য শোচনীয়তা প্রভাতকে বিচলিত করে তুললো।

তাই হঠাৎ মোহে নয়, যা করলো জেনে বুঝেই করলো।

মল্লিকা যে নিষ্কলঙ্ক নয়, মামার শিকারে টোপ হবার জন্যে ওকে যে অনেক খোয়াতে হয়েছে, এ বুঝতে ভুল হয়নি প্রভাতের।

তবু সে মানবিকতার সঙ্গে যুক্তি আর বুদ্ধিকেও কাজে লাগিয়েছে।

ভেবেছে যুগটা আধুনিক।

এ যুগে সভ্যজগতের নিয়ম নয়, মানুষকে মাছ দুধের মত 'নষ্ট হয়ে গেছে' বলে ফেলে দেওয়া।

ভেবেছে, এ যুগে তো বিধবা বিয়ে করছি আমরা। বিবাহ বিচ্ছেদের সমুদ্র পার হওয়া মেয়েকে বিয়ে করছি।

ভেবেছে, ও তো মানসিক পাপে পাপী নয়।

দুর্ভাগ্য যদি ওকে নিদারুণতার মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলে থাকে, সে দোষ কি ওর? একটা মানুষকে যদি পঙ্কের মধ্যে থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়ে সুন্দর জীবনের বৃন্তে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে প্রভাত, সে কাজে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাবে।

তবু মিথ্যা কৌশল অনেক করতে হলো বৈকি। প্রভাতকে কলকাতা থেকে বন্ধু মারফৎ 'মায়ের মারাত্মক অসুখ' বলে টেলিগ্রাম আনিয়ে ছুটি মঞ্জুর করতে হলো, আর মল্লিকাকে স্টেশনের ধারে টাঙা থেকে পড়ে গিয়ে 'পায়ের হাড় ভাঙতে' হলো!

অসহ্য যন্ত্রণার অভিনয়ে অবশ্য মল্লিকাও কম পারদর্শিতা দেখায়নি?

চ্যাটার্জি তাকে হিঁচড়ে টাঙায় তুলবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু জায়গাটা স্টেশন! অনেক লোকের ভিড়। তাদের পরামর্শের চাপে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে ভাগ্নীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হলো চ্যাটার্জিকে, আর 'ডাক্তার নেই, চারটের সময় আসবেন। রেখে যান' নার্সের এই হুকুমও মানতেই হলো।

তারপর?

উৎকোচের পথেও আসতে হয়েছে বৈকি। উৎকোচ আর ধরাধরি।

এই দুই পথেই তো অসাধ্যসাধন হয়।

এই তো জগতের সব সেরা পথ।

ট্রেনে চড়ে বসার পর আর ভয় করে না!

চ্যাটার্জি কি নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে ভাগ্নী খুঁজতে বেরোবে?

আর পুলিস?

তার কাছে জবাব আছে।

মল্লিকা নাবালিকা নয়।

আর ততদিনে—পুলিস যতদিনে খুঁজে পাবে, হয়তো রেজিস্ট্রি করেই ফেলতে পারবে।

রেজিস্ট্রি?

হ্যাঁ, ওটা চাই।

ওই তো রক্ষামন্ত্র। তারপর অনুষ্ঠানের বিয়েও হবে বৈকি! প্রভাত বলে, ওটা নইলে মন ওঠে না। সেই যে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি—

মল্লিকাও তার স্বপ্নসাধের কথা বলে, 'জানো, ছেলেবেলায় এক পিসতুতো দিদির বিয়ে দেখেছিলাম, সেই থেকে সেইরকম কনে হবার যে কী সাধই চেপে বসেছিল মনে, খেলাঘরে 'বিয়ে বিয়ে' খেলতাম, কনে হয়ে ঘোমটা দিতাম, ঘোমটা খুলে অদৃশ্য অদেহী বরের দিকে চোখ তুলে তাকাতাম।

'উঃ, ওইটুকু বয়সে কম পাকা তো ছিলে না?'

প্রভাত হেসে ওঠে।

চলন্ত ট্রেনের কামরা।

জানলা দিয়ে হু হু করে দুরন্ত বাতাস আসছে, মল্লিকা গল্প করছে তার ছেলেবয়সের দুরন্তাপনার কথা।

কেমন করে গাছে চড়ে বসে থেকে মাকে নাজেহাল করতো। কেমন করে পারানির মাঝিদের সঙ্গে ভাব করে নৌকোয় চড়ে গঙ্গার এপার ওপার হতো।

হ্যাঁ, গঙ্গার তীরেই গ্রাম।

যোগের স্নানে লোক আসতো এ-গ্রাম ও-গ্রাম থেকে। মল্লিকা সেই ভীড়ে মিশে মেলাতলায় ঘুরতো।

'আবার মার সঙ্গে মার কাজও করেছি বৈকি। ওই অতটুকু বেলাতেই করেছি। তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়েছি। ছোট্ট, কাচা শাড়ি পরে চন্দন ঘসেছি, ফুল

তুলে রেখেছি—তারপর কোথা দিয়ে কী হলো, ফুলের বন থেকে গিয়ে পড়লাম পাঁকের গর্তে। স্বর্গ থেকে পড়লাম নরকে। ওর থেকে যে কোনোদিন উদ্ধার পাবো, 'সে আশা—'

কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে যায় মল্লিকার। অশ্রু টলমল করে দুটি চোখ।

'আমার জীবন, যেন একটা গল্পের কাহিনী।'

মল্লিকা চেয়ে থাকে সুদূর আকাশের দিকে।

তা চ্যাটার্জির জীবনও একটা গল্পকথা বৈকি।

চাটুজ্যে বামুনের ঘরের ছেলে, বাপ সামান্য কিং চাকরি করে, আবার যজমানীও করে। ছেলে ছোট থেকে উচ্ছন্নের পথে। নীচু জাতের ঘরে পড়ে থাকে, তাদের সঙ্গে তাড়ি খায়, গাঁজা খায়! বাপ বকেঝকে যজমানী কাজ করতে বললে হি হি করে হাসে, আর বলে, 'বাগ্দীর ঘরের ভাত খেয়ে আমার তো জাতজন্মের বালাই নেই। ছুঁলে তোমার শালগেরামের জাত যাবে না?'

কিন্তু ছেলেবেলায় সেই দুষ্টুমি বয়েস হতেই পরিণত হলো কেউটে বিষে। একবার বাগ্দীদের হাতে মার খেয়ে হাড় ভেঙে ঘরে পড়ে রইলো তিন মাস, তখন বাপের কাছে দিব্যি কাটলো, কান মললো, নাকে খৎ দিলো, আর সেরে উঠে মানুষ হয়েই একদিন রাতের অন্ধকারে গেল নিরুদ্দেশ হয়ে।

আর সেই রাত্রে বাগ্দীদের সেই রঙ্গিণী বৌটাও হলো হাওয়া। যার জন্যে মার খেয়ে হাড় ভাঙা।

তারপর বহু বহুকাল পাত্তা নেই, অবশেষে একদিন বোনকে অর্থাৎ মল্লিকার মাকে, একটা চিঠি লিখে জানালো 'বেঁচে আছি, তবে এমন জড়িয়ে পড়েছি যে, যাওয়া অসম্ভব। ঠিকানা দিলাম, বাবা মরলে একটা খবর দিস। যতই হোক বামুনের ছেলে, নেহাৎ শুয়োর গরুটা আর খাবো না সে সময়।' ছেলে চলে যেতে যেতে মেয়ে জামাইকে কাছে এনে রেখেছিল চাটুজ্যের বাপ।

তা বাপ মরতে দিয়েছিল চিঠি, বোন নয়, ভগ্নিপতি।

আর সেই খবর পেয়েই চাটুজ্যে অতকাল পরে গ্রামে ফিরে এসে বাপের ভাঙা ভিটেটুকু আর পাঁচ বিঘে যা ধানজমি ছিল, বেচে দিয়ে বোন-ভগ্নিপতিকে উচ্ছেদ করে আবার স্বস্থানে প্রস্থান করেছিল।

এসব কথা মল্লিকা তার মার মুখে শুনেছে। তখনও সে শিশু। তারপর তারও বাপ মরেছে। মা লোকের বাড়ি ধান ভেনে, বাড়ি দিয়ে, কাজকর্মে রেঁধে,

দিন গুজরাণ করে মেয়েটাকে মানুষ করে তুলেছিল। তা সে মাও মরলো। আর কেমন করে না জামি খবর পেয়ে মামা এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল।

কে জানতো যে সেই তখন থেকেই মতলব ভাঁজছিল চাটুজ্যে!

তখন তো বুঝিনি—'মল্লিকা নিশ্বাস ফেলে বলে, 'মামার মুখে মধু, ভিতরে বিষ। আমাকে কোলে জড়িয়ে বোনের নাম করে কত কাঁদল, কত আক্ষেপ করল, আমায় এতদিন আদর যত্ন করেনি বলে হা হুতোশ করল। মুখের মধুর মোহে তখন খুব ভালোবেসে ফেললাম। মনে হলো, মামার নামে যা কিছু নিন্দে শুনেছি সব বাজে। কিন্তু বয়েস হবার সঙ্গে সঙ্গে—'

শিউরে ওঠে মল্লিকা। চুপ করে যায়।

প্রভাত ওর মুখের দিকে তাকায়।

সরল, পবিত্র মুখ।

সত্যি, মানুষ কি এতই সস্তা জিনিস যে সামান্য খুঁত হলেই তাকে বর্জন করতে হবে?

দূর পথে পাড়ি।

কত কথা, কত গল্প!

সেই বাগ্দীদের বৌটা?

সেটা নাকি আর কার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। মামা বলতো, 'আপদ গেছে। হাড় জ্বালিয়ে খেয়েছে আমার!' এখন আর কোন কিছু নেশা নেই মামার, শুধু পয়সা আর পয়সা।

আচ্ছা, তা' তো হল, কিন্তু এর মাঝখানে লেখাপড়া শিখলো কখন মল্লিকা? এমন কায়দাদুরস্ত হলো কি করে?

তা তার জন্যে মামার কাছে ঋণী বৈকি!

যে উদ্দেশ্যেই হোক, মেম রেখে ইংরিজি শিখিয়েছে মামা, শিখিয়েছে চালচলন।

না, উদ্দেশ্যটা মহৎ নয়। দুরস্ত করেছে যত অবাঙালী খদ্দেরদের জন্যে—তবু যে ভাবেই হোক মল্লিকা তো পেয়েছে কিছু!

বাংলা? সেটা সম্পূর্ণ নিজের আকুলতায় আর চেষ্টায়। পার্শেলে বই আনিয়ে আনিয়ে—

তাতে আপত্তি ছিল না মামার?

না। এদিকে যে আবার মল্লিকার তোয়াজ করতেন। বুঝতেন তো মল্লিকাই

[illegible]দের অনেক আকর্ষণ। সেখানে একা গেলে লোক আসতে চায় না, মল্লিকা গেলে ঠিক বঁড়শি গেলে।

'তার সাক্ষী তো স্বয়ং আমিই—হেসে উঠেছিল প্রভাত।

হ্যাঁ, ওখানে সব আছে।

মদ, জুয়া, ভেজাল, কালোবাজার! তারাই তো দামী খদ্দের! আর ওইজন্যেই তো পুলিসে অত ভয় চাটুজ্যের। পুলিসের লোক বলে সন্দেহ হলেই—

সব কথাই বলছি তোমায় সব কথাই বলবো। মল্লিকা বলে, 'প্রথম যেদিন তোমার ঘরে এসেছিলাম, সেদিন ঠকিয়েছিলাম তোমায়। অভিনয় করেছিলাম।'

অভিনয়!

আড়ষ্ট হয়ে তাকায় প্রভাত।

মল্লিকা মুখ তুলে বলে, 'হ্যাঁ অভিনয়। অভিনয় করতে করতেই তো বড় হয়েছি! মামার শিক্ষায় অভিনয করেছি। আবার মামাকে ঠকাতেও করেছি। সেদিন গিয়েছিলাম মামার শিক্ষায় তোমার পকেট থেকে চিঠি চুরি করতে।'

'চিঠি চুরি!' পৃথিবীটা দুলে ওঠে প্রভাতের।

কিন্তু মল্লিকা অকম্পিত।

সে সব বলবে। তারপর প্রভাত তাকে দূর করে দিক, আর মুখ না দেখুক, তাও সইতে পারবে।

মরতে ইচ্ছে হতো মাঝে মাঝে। কিন্তু রূপ রস গন্ধ স্পর্শময়ী এই পৃথিবীর দিকে তাকালেই মনটা কেঁদে উঠতো। নিজের ওপর মায়ায় ভরে যেতো মন। আর কল্পনা করতো, কবে কোন্‌দিন আসবে তার ত্রাণকর্তা!

আরও তিনজন আশ্বাস দিয়েছিল!

'প্রথমবার এক বাঙালী মহিলা।'

মহিলা!

হ্যাঁ, একজন নার্স! স্বাস্থ্যান্বেষণে এসেছিলেন। অনুভব করেছিলেন মল্লিকার দুঃসহ যন্ত্রণা। টের পেয়েছিলেন মল্লিকার জীবনে গ্লানি। বলেছিলেন, মল্লিকাকে নিয়ে যাবেন। তাকে সুস্থ জীবনের স্বাদ এনে দেবেন।

কিন্তু হঠাৎ একদিন মল্লিকাকে কিছু না বলে পালিয়ে গেলেন।

'তারপর আপনারই মত দু'জন যুবক। সহানুভূতি দেখিয়েছেন, উদ্ধার করে নিয়ে যাবেন বলেছেন, যাবার সময় ভুলে গেলেন।'

'তার মানে ওই আশা লোভ দেখিয়ে রেখে বিশেষ সুবিধে আদায় করে নিয়েছে! প্রভাত রাগ করে বলে।

মল্লিকা মুখ তুলে বলে, পৃথিবীতে দেবতা আর দু'জন জন্মায়?

প্রভাত তার হাতের ওপর একটা হাত রাখে ঈষৎ চাপ দেয়। তারপর বলে, কিন্তু মনে আছে তো? তোমার পরিচয়টি কি? মনে রেখো তোমার মামা গরীব ব্রাহ্মণ, মামী হঠাৎ মারা যাওয়ায় তোমাকে নিয়ে অকুলপাথারে পড়েছেন। দূর প্রবাসে ছোট্ট একটি দোকান আছে, সেইটি ছেড়ে বাংলাদেশে এসে ভাগ্নীর জন্যে পাত্র খুঁজবেন, এমন অবস্থা নয়। দৈবক্রমে আমার সঙ্গে পবিচয়। আমি গোস্বামী শুনে, হাতে স্বর্গপ্রাপ্তি—'

হেসে ওঠে প্রভাত।

মল্লিকা বলে, 'ভুলে যাবো না।'

না, ভুলে গেল না তারা।

ওই গল্প দিয়ে ভোলালো বাড়ির লোককে, আত্মীয়বর্গকে।

কিন্তু সমাজে সংসারী ঝুনো মানুষদের ভোলানো কি সোজা? নাঃ সোজা নয়। তাই কাজটা খুব সহজ হয়নি। অনেকের ভুরু কুঁচকে উঠেছিল।

প্রথম ভুরু কোঁচকালেন মা।

প্রভাত জননী করুণাময়ী।

ভুরু কুঁচকে বললেন, বাংলা বিহার ছাড়া পাণ্ডববর্জিত দেশ সেই পাঞ্জাব বর্ডারে লোকটা যে একা পড়ে আছে, এর কারণ কি? দোষঘাট ছিল কিনা কে জানে। শুনে মনে হচ্ছে যেন সমাজ সংসার থেকে পালিয়ে গিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে বসে থাকা লোক। বলি তার জ্ঞাতি-গোত্তর আত্মীবন্ধু কাউকে দেখেছিস সেখানে!...দেখিসনি? তবে? বলি তাঁর জাতকুলের নিশ্চয়তাই বা কী? সে বলল, 'আমি বামুন, অমনি তুই মেনে নিলি বামুন। জাত ভাঁড়িয়ে অবক্ষণীয়া কন্যে পার করার কথাও আমরা শুনিনি এমন নয়। এরপর যদি প্রকাশ পায় তেলি-তামলি কি—হাড়ি ডোম—'

প্রভাত মৃদু হেসে উত্তর দিয়েছিল, 'দেখে কি হাড়িডোম বলে ভ্রম হচ্ছে তোমার?'

শুনে করুণাময়ী কিঞ্চিৎ থতমত খেয়েছিলেন, বলেছিলেন, আহা সে কথা বলছি না। তবে সময় সময় গোবরেও পদ্মফুল ফোটে না তা নয়।

সে পদ্ম তুলে নিয়ে ঠাকুর পুজো কর না তোমরা?

হুঁহ, ব্যঙ্গের সুর—, করুণাময়ী বলেন, 'ফুলের জাত আছে?'

নেই। আর মানুষেরও থাকা উচিত নয়। মানুষ হচ্ছে মানুষ এই তার পরিচয়। তার সত্যিকার পরিচয় তৈরি হয় তার আচাব আচরণের রুচি প্রকৃতিতে—

করুণাময়ী ঝঙ্কার দেন, এই কদিন বিদেশ ঘুরে এসে অনেক কথা শিখেছিস দেখছি। এ আর কিছু নয়, তোর খুড়ির কুশিক্ষা।

চিরদিন দেখেছি, ছোটবৌ তোকে বেশি ভালবাসাব ভান কবে আমার বিপক্ষে উস্কেছে। আর এবার তো একেবারে বেওয়ারিশ হাতে পেয়েছিল।

'আহা কী মুস্কিল। সে ভদ্রমহিলাকে আবার এর মধ্যে টানছ কেন? যার কথা হচ্ছিল তার কথাই হোক না। ওই মামা নামক ভদ্রলোকটির পদবী চ্যাটার্জি এতে সন্দেহ নেই। দীর্ঘকালেব ব্যবসা বাণিজ্য সেখানে তাঁব। জীবনেব প্রারম্ভে কি আর ভদ্রলোক ভবিষ্যৎ দর্শন করে রেখেছিলেন যে, সুদূর কালে তিনি ভাগ্নীদায়ে পড়বেন, আব এই আমা হেন গুণনিধি তাঁর কবলে গিযে পডবে, তাই সেই আগে থেকে গলায পৈতে ঝুলিয়ে চাটুয্যেব খাতায় নাম লিখিয়ে বসে থেকে ছিলেন?'

'হয়েছে, অনেক কথা শিখেছিস। যাক তবুও হেস্তনেস্ত আমি দেখবো। ওই রিষডে না কোথায যেন মেযের বাপেব দেশ বলছিস। সেখানে খোঁজ করবো আমি। তবে বৌ বরণ করে ঘবে তুলবো।'

প্রভাত চুপ করে ছিল।

চট করে মুখেব ওপব বলতে পারেনি, 'রিষড়েই হোক আব বাজস্থানই হোক, যতই তুমি তোলপাড় করে ফেলো মা, বিয়ে ওকে আমি করবোই। আমাকে করতে হবেই। আমি ওকে আশ্রয় দিয়েছি, আশ্বাস দিয়েছি।'

ভেবেছিল দেখাই যাক না মায়ের দৌড়। কে যাবে অত খোঁজ খবর নিতে।

মল্লিকা তখন অবস্থান করতে প্রভাতের এক ছেলেবেলার বন্ধুব বোনের বাড়িতে। করুণাময়ীই ব্যবস্থার ব্যবস্থাপক।

বলেছিলেন, 'বাড়িতে এনে ভরে রেখে তারপর বৌ করে বরণ করা সে যে একেবারে পুতুলের বিয়েব বেহদ্দ। ওর থাকার ব্যবস্থা আমি করছি। যা দেখছি, বিয়ে তুই ওকে করবেই, তবু লোক-সৌষ্ঠবটা তো রাখতে হবে।'

হ্যাঁ, প্রথমটা এমনি কঠিনই হয়েছিলেন করুণাময়ী। কিন্তু মল্লিকার নম্রতা, মল্লিকার দুঃখগাথা রূপ, এই তিন অস্ত্রে ক্রমশঃ কাবু হয়ে পড়েছিলেন।

তা' মেয়েরাই কি মেয়েদের রূপে মুগ্ধ হয় না? হয় বৈকি। রূপকে হৃদয়ের নৈবেদ্য না দিয়ে উপায় কোথায় মানুষের? প্রকৃতিই যে তাকে দুর্বলতার কাছে মেরে রেখেছে।

তবু তল্লাস করতে ছাড়লেন না।

রীতিমত তোড়জোড় করেই তল্লাস করলেন, রিষড়ের আঠারো ছাব্বিশ বছর আগে সুরেশ মুখুয্যে বলে কেউ ছিল কি না।

যে লোককে পাঠিয়েছিলেন, সে এসে বিস্তারিত বললো, 'হ্যাঁ, ছিল বৈ কি, ছিল। সেই সুরেশ মুখুয্যের জ্ঞাতিরা তো রয়েছে এখনো রিষড়েয়।'

সুরেশ মুখুয্যে মরেছে অনেকদিন, তার স্ত্রী কন্যা ছিল। মেয়েটাকে নিয়ে দুঃখকষ্ট করে চালাচ্ছিল ও, কিন্তু সুরেশের স্ত্রীও মরল। আর সেই খবর পেয়ে তার ভাই, অর্থাৎ ওই আপনাদের মেয়ের মামা মাদ্রাজ না পাঞ্জাব কোথা থেকে এসে মেয়েটাকে নিয়ে চলে গেল। তারপর কে কার খবর রাখে। অবশ্যি একথা বলতে ছাড়েন নি সুরেশ মুখুয্যের জ্ঞাতি ভ্রাতা, 'মেয়েটাকে আমার কাছে রাখবার জন্যে ঢের চেষ্টা করেছিলাম মশাই, বলি ঘরের মেয়ে ঘরেই থাকুক, বিশ্ব বাংলা ছেড়ে কোথায় যাবে? দেখেশুনে বে থা আমরাই দেব। কিন্তু মামাটা মশাই রগচটা। বলল 'না না ও আমার কাছেই থাকবে ভাল।' বলি '—তবে তাই হোক। ভাল থাকলেই ভাল। তারপর মশাই কে আর খবর রাখছে?'

ভদ্রলোকের কথায় বাঁধুনি দেখে অবশ্য বোঝবার উপায় ছিল না তাঁর সেই মহানুভবতার গল্পটি গল্পই মাত্র।

করুণাময়ীর প্রেরিত লোক এসে সেই কথাই বলে, 'বংশ ভাল বলেই মনে হ'ল। কাকাটি অতি ভদ্র। পাজী ছিল ওই মামাটা। নিজে তো চিরকেলে বাউণ্ডুলে, বাপ মিনসে মেয়ে জামাইকে কাছে নিয়ে রেখেছিল, তা' সেই বাপ মরতে নাকি গরীব বোন ভগ্নিপতিকে ভিটে থেকে উচ্ছেদ করে বেচে কিনে চলে গিয়েছিল। কাকা তাই বলছিল—বৌ মরেছে? হাড়ির হাল হয়েছে? বেশ হয়েছে, হবেই তো! অমন লোকের দুর্দশা হবে না তো কার হবে? পাজী লোকের পয়সা কখনো থাকে না।'

তা' না থাক, করুণাময়ীর শান্তিটা থাকলো। তাঁর কোঁচকানো ভুরু কিছুটা সোজা হ'ল বৌ বরণ করে ঘরে তুললেন তিনি। কিন্তু করুণাময়ীর পতিকুলেই কি জ্ঞাতি নেই? না তাঁদের ভুরু নেই?

এ যুগে যে 'সমাজ' নামক শব্দটার কোনও অর্থ নেই এ তাঁরা জানলেও

এবং নিজেরা সমাজকে সম্যকরূপে না মানলেও, এ বিয়ের যজ্ঞিতে খাওয়া-দাওয়ার অনিচ্ছে প্রকাশ করতে ছাড়েন নি তাঁরা। আর এ কথাও বলেছিলেন, ওই একটা অজ্ঞাতকুলশীল মেয়েকে প্রভাত হঠাৎ ঘাড়ে করে নিয়ে এসে বিয়ে করতে বসা দেখে তাঁরা এত বেশি স্তম্ভিত হয়ে গেছেন যে, হয়তো করুণাময়ীর সঙ্গে একেবারেই সম্পর্ক ছেদ করতে হবে তাঁদের।

করুণাময়ী নিজের সেই জ্ঞাতিদের রিষড়ের সুরেশ মুখুয্যের জ্ঞাতির ঠিকানা দিলেন, বললেন, 'খোঁজ করে এসো।'

খোঁজ?

এমন পাগল আবার কে আছে, যে গাঁটের কড়ি খরচ করে তথ্যানুসন্ধানে যাবে? হাওড়া থেকে রিষড়ে গোটাকতক পয়সার মামলা? তাতে কি? তাই বা কেন? জ্ঞাতিদের সঙ্গে সম্পর্ক চোকালেই যখন সব চুকে যায়!

শেষ পর্যন্ত অবিশ্যি সম্বন্ধ চুকল না। আর ভোজবাড়িতে চর্ব চোষ্য লেহ্য পেয়র স্বাদ নিতেও কার্পণ্য করলেন না তাঁরা, তবে অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে। মোটকথা পাত্র-পাত্রী দু'পক্ষের মধ্যে 'লাখ কথা' না হলেও, সেই লাখ কথাটা একপক্ষেই হল।

তবু শেষ অবধি সবই হ'ল।

'বিয়ে' নামক অনুষ্ঠানটির যে মোহময় এবং ভাবময় ছবিখানি আঁকা ছিল বর আর কন্যার হৃদয়পটে, সে ছবি মলিন হল না। সেই গায়ে হলুদ আর ছাঁদনাতলা, কুশণ্ডিকা আর কড়ি খেলা, এয়োদের হুড়োহুড়ি আর তরুণীদের বাড়াবাড়ি ইত্যাদি সপ্তসমুদ্র পার হয়ে অবশেষে ফুলশয্যার ঘাটে তরী ভিড়ল।

পুষ্প আর পুষ্পসারের সম্মিলিত তীব্র মধুর গন্ধে উতলা হয়ে উঠল বাতাস, আর পরিহাস রসিকার দল বিদায় নেওয়ার পরেও যেন ঘরের মধ্যে উত্তাল হয়ে রইল তাদের পরিহাসের উন্মাদতা।

'আমার জন্যে কতো জ্বালা তোমার!'

মল্লিকা গভীর কালো চোখ দুটি তুলে তাকায়।

প্রভাত সেই গভীর দৃষ্টির ছায়াকে নিবিড় করে তুলে আবেগ কাঁপা গলায় বলে, 'হাঁ ভারী জ্বালা! অনেক জ্বালা।'

না সত্যি। কে জানে কেন কুগ্রহের মত হঠাৎ—এসে পড়লাম তোমাদের জীবনের মধ্যে—

'বোধকরি কোন সুগ্রহের আশীর্বাদে—'

'চিরদিন কি এ স্নেহ রাখতে পারবে তুমি আমার ওপর?'

'সন্দেহ কেন মল্লিকা?'

'না গো না, ভুল বুঝো না তুমি আমায়। সন্দেহ নয় ভয়।'

'ওটা বড্ড সেকেলে, বড্ড পুরোনো। শরৎবাবুর উপন্যাসের নায়িকার উক্তির মত।'

মল্লিকা আবার সেই গভীর চোখ দুটি তুলে তাকায়। মল্লিকাকে আর 'রূপসী' বলে মনে হয় না, মনে হল লাবণ্যময়ী। রমণীয় নয়, কমনীয়। বিদ্যুৎ নয়, গৃহদীপ।

সেই আরতির দীপের মত দৃষ্টিটি তুলে মল্লিকা বলে, 'তা' ভাগ্য যাকে উপন্যাসের নায়িকা করে তুলেছে—

'তা' বেশ তো। সেকেলে উপন্যাসের কেন? হেসে ওঠে প্রভাত, আধুনিক উপন্যাসের নায়িকা হও। যারা প্রতি পদে ভয় পায় না, প্রতি পদে নিজেকে ছোট বলে মনে করে না। সাহসিকা তেজস্বনী—'

ঘনিষ্ঠ করে কাছে টেনে নেয় প্রভাত আইন এবং অনুষ্ঠান উভয় শক্তিতে লাভ করা সদ্য লব্ধাকে।

মল্লিকা ভেঙ্গে পড়ে।

অস্ফুট স্বরে বলে, 'না না, ও সব কিছু হতে চাই না আমি। আমি শুধু বৌ হতে চাই। বাংলার গ্রামের বৌ। যে বৌয়ের ছবি দেখেছি জীবনের শৈশবে। যারা পবিত্র সুন্দর মহৎ।'

'নাঃ বড্ড বেশি সিরিয়াস হয়ে উঠছ। মনে রেখো এটা আমাদের ফুলশয্যার রাত্রি।'

পরিবেশ হালকা করে তুলতে চায় প্রভাত। জীবনের এই পরম রাত্রিটিকে ভারাক্রান্ত করে তুলতে চায় না কতকগুলো ভারী ভারী কথায়।

বিয়েটাকে একেবারে সাধারণ বিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলেই বা ক্ষতি কি?

এ বিয়েতে কাকিমা অবশ্য আসেন নি। খবর পেয়ে নিজের গালে মুখে চড়িয়েছেন, আরও আগে কেন গেঁথে ফেলেন নি বলে। আর শেষ আক্ষেপের কামড় দিয়েছেন বড়জার কাছে চিঠিতে, তাঁর বোন ভগ্নিপতি কী পরিমাণ দানসামগ্রী, আর কী পরিমাণ নগত গহনা দিতে প্রস্তুত ছিলেন, তার হিসাব দাখিল করে।

করুণাময়ী একবার কপালে করাঘাত করেন, আবার একবার ভাবেন মরুকগে। সে হ'লে ছেলেটা তো আমার স্রেফ্ ছোট গিন্নীর সম্পত্তি হয়ে যেত।

প্রভাত হাসে। মল্লিকার কাছে।

বলে, উঃ, ভাগ্যিস ওই দানসামগ্রী আর নগদের কবলে পড়ে যাইনি।

• •

ওদের হাওড়ার বাড়িতে এখনও গ্রাম গ্রাম গন্ধ। ঘরে গৃহদেবতা, উঠোনে তুলসীমঞ্চ, রান্নাঘরে শুচিতার কড়া আইন।

তা ছাড়া গোয়ালে আছে গরু, পুকুরে আছে মাছ।

মল্লিকা বিভোর হয়, বিগলিত হয়।

এই তো ছিল স্বপ্ন!

ভাবে, ভগবান, আমার জন্যে এত রেখেছিলে তুমি!

প্রথম প্রথম সর্বদা একটি অশুচিতাবোধ তাকে সব কিছুতে বাধা দিতো। শাশুড়ী ডাকতেন, 'বৌমা, আজ লক্ষ্মীপূজো, ঘরে দোরে একটু আলপনা দিতে হয়। পারবে তো? মেলেচ্ছ দেশের মানুষ, দেখোনি তো এ সব। যাক, যা পারো দাও।'

মল্লিকা ভয়ে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে যায়। কিন্তু পারাটা তার নেহাৎ যেমন তেমন হয় না। মনের জগতে ভেসে ওঠে শৈশবে দেখা মায়ের হাতের কাজ। এ-বাড়ি ও বাড়ি থেকে আলপনা দিতে ডাকতো মল্লিকার মাকে, ডাক-সাইটে কর্মিষ্ঠে ছিলেন তিনি।

শাশুড়ী প্রীত হ'ন। ভাবেন—নাঃ যেমন ভেবেছিলাম তেমন নয়। সদ্ ব্রাহ্মণের আচার জানে। ডাকেন, 'বৌমা, একখানা সিল্কের শাড়ি টাড়ি কিছু জড়িয়ে আমার ঠাকুরঘরে একবার এসো তো। চন্দন ঘষে ফুলকটায় একটু মালা গেঁথে দেবে।'

মল্লিকা কম্পিত চিত্তে ভাবে, এই মুহূর্তে ভয়ানক একটা কিছু হয় না তার! হঠাৎ পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া কি ওই করম কিছু?

শাশুড়ী ডাকেন, 'কই গো বৌমা—'

ছুটে যাওয়া ভিন্ন গতি থাকে না!

ক্রমশঃ ভয় ভাঙে।

নিজেই এগিয়ে যায়। কিন্তু রাত্রে কাতরতায় ভেঙে পড়ে। বলে, 'আমার এতে পাপ হচ্ছে না?'

প্রভাত আদরে ডুবিয়ে দেয়! বলে, 'কী আশ্চর্য! পুণ্যি না হয়ে পাপ হবে? এসব তো পুণ্যকর্ম, বরং যদি কিছু পাপ থাকে, ধুয়ে মুছে যাবে। কিন্তু এখনো

এত কাতর কেন তুমি মল্লিকা? আমি তো তোমায় বলেছি, স্বেচ্ছায় অন্যায় না করলে পাপ স্পর্শ করে না।'

ধীরে ধীরে বুঝি কেটে যায় সমস্ত গ্লানি। নতুন আর একজন্মে জন্ম দেয় মল্লিকা! মন বদলেছে, দেহটাও বুঝি বদলাচ্ছে।

নখের আগায় নেল পালিশের বদলে হলুদের ছোপ ঠোঁটে লিপস্টিকের বদলে পানের রাঙা, সুর্মাবিহীন চোখ নম্র কোমল। শাড়ি পরার ভঙ্গিমা বদলে ফেলেছে মল্লিকা, বদলেছে জামার গড়ন।

মল্লিকা আস্তে আস্তে তার মার মত হয়ে যাচ্ছে। পুণ্যবতী সতীমায়ের মত। যে মা তার খেটে খেয়েছে, কিন্তু সম্মান হারায়নি।

কিন্তু অনাবিল সুখ মানুষের জীবনে কতক্ষণ। প্রভাতের কাকার চিঠি আসে, 'বিয়ে তো আমরাও একদা করেছিলাম বাপু, কিন্তু এভাবে উচ্ছন্ন যাইনি। আর বেশি ছুটি নিলে চাকরীতেই ছুটি হয়ে যাবে। শীঘ্র চলে এসো। একেবারে খোদ রাজধানী! তাছাড়া কোয়ার্টার্স পাওয়া যাবে।'

অর্থাৎ নানা টালবাহানা করে করে মেডিক্যাল লিভ্ নিয়ে নিয়ে যে বিভোর গৃহসুখের জগতে বাস করছিল প্রভাত, তার থেকে বিদায় নিতে হবে।

কিন্তু বিদায়ই বা কেন?

কোয়ার্টার্স তো পাওয়া যাচ্ছে।

এখনো ভাইপোর জন্য কাকার দরদের পরিচয়ে কাকিমা বিরূপ, কিন্তু কাকা নিজ নীতিতে অটল আছেন।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে মাকে দেখায় প্রভাত। মা বলেন, তা বটে! কিন্তু আমার যে অভ্যেস খারাপ করে দিলি বাবা! বৌমাটিকে ছেড়ে—'

প্রভাত বলে, 'উঃ মা! নিজের ছেলেটিকে ছেড়ে এতদিন থাকতে পারলে—'

মা হাসেন। বলে, 'কী করবো। মেয়েটা বড় মায়াবিনী!'

'মায়াবিনী' শব্দের নতুন অর্থে হাসে প্রভাত।

আর মল্লিকাকে গিয়ে ক্ষ্যাপায়, 'ওগো মায়াবিনী, কি মায়া জানো!'

মল্লিকার চোখে কিন্তু শঙ্কা ঘনায়।

দিল্লী।

দিল্লী যে বাঘের গুহার তল্লাটে! মামাকে মাঝেমাঝেই আসতে হয় দিল্লীতে! মামার বেশির ভাগ খদ্দের আসে দিল্লী থেকে।

প্রভাত বলে, 'দিল্লী কত বড় শহর, কত তার লোকসংখ্যা! কে সন্ধান রাখবে, কোন কোয়াটার্সে সেই মিসেস ব্যানার্জি বাস করেন, যাঁর পুরানো নাম ছিল ম[illegible]।

'না গো, আমার ভয় করছে!'

'তবে চাকরী বাকরী ছেড়েই দেওয়া যাক, কি বলো?'

'তাই দাও না গো!' মল্লিকা লুটিয়ে পড়ে, 'কলকাতায় একটা চাকরী জোগাড় করে নিতে পারবে না?'

'হয়তো পারি। কিন্তু লোকের কাছে 'পাগল' নাম কিনতে চাই না বুঝলে? কেন ভয় পাচ্ছো?'

কিন্তু ভয়! ভয়! ভয় যে মল্লিকার স্নায়ুতে শিরাতে পরিব্যাপ্ত। কি করে তার হাত এড়াবে সে? কেউ যদি দেখতে পায়? যদি সে গিয়ে মামাকে খবর দেয়? যে মামা দেখতে নিতান্ত নিরীহ হলেও বাঘের মতই ভয়ঙ্কর। কে বলতে পারে অসতর্ক প্রভাতের তাজা রক্তে একদিন দিল্লীর রাস্তা ভিজে উঠবে কি না।

তাই শেষ পর্যন্ত মল্লিকার ভয়ই জয়ী হয়।

লোকের কাছে 'পাগল' নামই কিনে বসে প্রভাত।

কাকাকে লিখে পাঠায় বাংলার বাইরের রুক্ষ জলবায়ু তার ঠিকমত সহ্য হয়নি। এখন তো আরো হবে না, কারণ শরীরটা খুব খারাপ হয়ে গেছে। নচেৎ কেন একবার মেডিক্যাল লিভ্ নিতে বাধ্য হচ্ছিল?

অতএব?

সোনার পাঁচশ টাকার চাকরী! তা কি আর করা যাবে?

প্রভাতের দুই দাদা, যাঁরা বাড়ির মধ্যেই আড়াল তুলে মায়ের সঙ্গে পৃথগান্ন হয়ে বাস করছেন, তাঁরা ছি ছি করেন, এবং পুরাণ উপপুরাণ থেকে সুরু করে আধুনিক ইতিহাস পর্যন্ত স্ত্রীর-বশ পুরুষের কী কী অধোগতি হয়েছে তার নজীর দেখান।

কাকা চিঠির মারফৎই সম্পর্ক ছেদ করেন, এবং পাড়া-প্রতিবেশী গালে হাত দেয়।

'দিল্লী' নামক ইন্দ্রপুরীর স্বর্গীয় চাকরী যে কেউ স্বেচ্ছায় বিসর্জন দেয়, এ লোকের ধারণার বাইরে।

শুধু করুণাময়ী!

করুণাময়ী ছোট ছেলের এই সুমতিতে পাঠবাড়িতে হরিরলুট দিয়ে আসেন।

ধারে কাছে দুই ছেলে বৌ কিন্তু করুণাময়ী থাকতেন বেচারীর মত। নিঃসহায় নিরভিভাবক। অথচ তেজ আছে ষোল আনা, তাই পৃথগান্ন ছেলেদের সাহায্য দিতেন না। অসময়ে দরকার পড়লে বরং পাড়ার লোকের কাছে জানাতেন তো ছেলেদের নয়।

শাশুড়ীর এই অহঙ্কারে ছেলের বৌরাও ডেকে কথা কইতো না।

প্রভাত এসে পর্যন্ত করুণাময়ী একটা সহায় পেয়েছেন। তা ছাড়া ছোটবৌয়ের রূপ গুণ। যেটা বড় মেজ বৌকে 'থ' করে দেবার মত? করুণাময়ী একটা রাজত্বের অধীশ্বরী হয়েছিলেন এই ক'মাস।

তবু মনের মধ্যে বাজছিল বিদায় রাগিনী। 'ফুরিয়ে যাবে' ফুরিয়ে যাবে এই আবুহোসেনের রাজ্যপাট। ফুরিয়ে যাবে সংসার করা!

ছুটি ফুরোলেই বৌ নিয়ে লম্বা দেবে প্রভাত, আর আবার দুই বৌয়ের দাপটের মাঝখানে পড়ে করুণাময়ীকে শুধু হরিনামের মালা সম্বল করে মানমর্যাদা বজায় রাখতে হবে।

বেশ করেছ প্রভাত দূরের চাকরী ছেড়ে দিয়ে।

তেমন চেষ্টা করলে কি আর কলকাতায় একটা চাকরী জুটবে না?

তা' মাতৃ আশীর্বাদের জোরেই হোক আর চেষ্টার জোরেই হোক— কলকাতায় চাকরী জোগাড় হয়।

প্রভাত এসে মাকে প্রণাম করে বলে, 'মাইনে অবিশ্যি এখানে ও চাকরীর থেকে কম, কিন্তু ভবিষ্যৎ খারাপ নয়।'

করুণাময়ী আশীর্বাদের সঙ্গে অশ্রুজল মিশিয়ে বলেন, 'তা হোক। তা হোক। ঘরের ছেলে ঘরের ভাত খাবি, কী বা খরচ! আমি বলছি এই চাকরীতেই তোর উন্নতি হবে।'

'তা হলে খুসি।'

'হ্যাঁ বাবা, খুব খুসি।'

ঘরে গিয়ে মল্লিকাকেও সেই প্রশ্ন করতে যায়। কিন্তু ঘরে পায় না মল্লিকাকে।

কোথায় সে?

রান্নাঘরে? ভাঁড়ার ঘরে? ঠাকুরঘরে? গোয়ালে?

না।

ছাদে উঠেছে মল্লিকা।

প্রভাত এসে আলশের ধারে বসে পড়ে। বলে, 'উঃ খুব খাটালে। এই চূড়োয় উঠে বসে আছো যে?

'খুঁজবে বলে।' মল্লিকা হাসে।

কিন্তু হাসিটা কেমন নিষ্প্রভ দেখায়।

'আমি কিন্তু ভেবেছিলাম আজ আমার জন্যে পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকবে।'

'ইস! সেইরকম বাড়ি কিনা তোমাদের।'

'আহা, বাড়ি মানে তো বড়বৌদি মেজবৌদি! ওদের নিন্দেয় কিছু এসে যায় না। যাক, খুশি তো?

খুশি!

মল্লিকা অমন চমকে ওঠে কেন?

কেন বলে, 'কিসের খুশি?'

'বাঃ, চমৎকার! দিল্লীর সঙ্গে সম্পর্ক চ্ছেদের পাকা বনেদ গাঁথা হলো না? 'ন্যাশনাল ইণ্ড্রাস্ট্রীর' কাজটা পেয়ে গেলাম না আজ।'

'ওমা। তাই বুঝি। সত্যি হলো?' মল্লিকা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

কিন্তু প্রভাতের হঠাৎ মনে হয় মল্লিকার এই উচ্ছ্বাসটা যেন রঙ্গমঞ্চের অপটু অভিনেত্রীর 'শেখা ভঙ্গীর' মত।

ভুরু কুঁচকে বললো, কই, খুব খুশি তো মনে হচ্ছে না।'

মল্লিকা জোর হেসে উঠলো, 'কী যে বলো। আমি বলে তোমাদের ঠাকুরের কাছে পুজো মেনেছিলাম, যাতে তোমার আগের চাকরীটা ঘোচে, এখান থেকে আর কোথাও যেতে না হয়।'

প্রভাত হাসে। বলে, 'আমাদের ঠাকুর নয়, তোমার ঠাকুর, সকলের ঠাকুর।'

মল্লিকা মাথা দুলিয়ে বলে, 'হ্যাঁ গো মশাই, তাই।'

তবু প্রভাতের মনে হয় মার কাছে যে আন্তরিক অভিনন্দন পেলো, মল্লিকার কাছে বুঝি তেমন নয়।

অথচ মল্লিকার জন্যেই তো—

কেন? এখানে টাকার অঙ্ক কম বলে?

কিন্তু তাই কি হতে পারে?

মল্লিকার দিল্লীর ভীতি তো দেখেছে সে।

তবে কেন তেমন খুশি হলো না মল্লিকা?

কিন্তু সত্যিই কি মল্লিকা খুশি হয়নি?

নিজেই সেকথা ভাবছে মল্লিকা।

খুশি খুশি, খুশিতে উপছে পড়া উচিত ছিল তো তার। কিন্তু তেমন হচ্ছে না কেন?

কেন হঠাৎ ভয়ঙ্কর একটা শূন্যতাবোধ সমস্ত স্নায়ু, শিরাকে নিস্তেজ করে দিচ্ছে? কেন মনে হচ্ছে কোথায় বুঝি একটা মস্ত জমার ঘর ছিল তার, সে ঘরটা সহসা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

কী সেই জমা?

কী সেই ফুরিয়ে যাওয়া?

গভীররাত্রে যখন প্রভাত পড়েছে ঘুমিয়ে, আর প্রভাতদের এই পাড়াটা নিঝুম নিঃসাড় হয়ে যেন ছায়া দৈত্যের মত ঘাপটি মেরে পড়ে আছে, তখন মল্লিকা বিছানা ছেড়ে উঠে জানালার ধারে এসে দাঁড়ায়।

জানালার ঠিক নিচেটাতেই খানিকটা ঝোপ, তা থেকে কেমন বুনো বুনো গন্ধ আসছে? মল্লিকার মনে হ'ল এ গন্ধ যেন জোলো ভাব প্রবণতার, সস্তা উচ্ছ্বাসের।

আগে, অনেকদিন আগে এমনি করে মাঝরাতে উঠে জানালার ধারে কি দাঁড়াত না মল্লিকা? দাঁড়াত বৈকি, দাঁড়াত। কিন্তু সে জানলা খুলতেই এক ঝলক বাতাসের সঙ্গে যে গন্ধ এসে ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে ধাক্কা দিতো, সে গন্ধ বনকচু আর আশ-শ্যাওড়ার নয়। সে গন্ধ যেন অদূরে বিচরণশীল বাঘের গন্ধ। যার মধ্যে ভয়ঙ্কর এক ভয়ের রোমাঞ্চ, উগ্র এক মদের স্বাদ!

আর উন্মাদ সেই পাহাড়ী ঝড়।

যে ঝড় হঠাৎ কোনও এক রাত্রির বুক চিরে ক্রুদ্ধ-গর্জনে ছুটে আসতো কোন দূর দূরান্তরের অরণ্য থেকে। ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত গুঁতো মারতো পাহাড়ের গায়ে গায়ে। তার সেই উন্মত্ত আক্ষেপের ফোঁস্-ফাঁসানিতে উত্তাল হয়ে উঠতো দেহের সমস্ত রক্ত কণিকা, প্রাণ আছড়ে পড়তে চাইত অজানা কোনও এক ভয়ঙ্করতার মধ্যে।

জীবনে আর কোনও দিন সেই দূর অরণ্যের ডাক শুনতে পাবে না মল্লিকা। দেখতে পাবে না ঝড়ের সেই মাতামাতি?

আচ্ছ মামা কি এখনো খুঁজে বেড়াচ্ছেন মল্লিকাকে। দেখতে পেলেই

একখানা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুচিকুচি করে কেটে ফেলবেন বলে। যতদূর নয় ততদূর বেইমানী তো করে এসেছে মল্লিকা তাঁর সঙ্গে।

তা' বেইমানী বৈকি।

তা' ছাড়া আর কি।

মামা তার জীবনের ভয়ঙ্কর এক রাহু, কিন্তু মামা তার জীবনদাতাও নয় কি? মল্লিকা যে এই মল্লিকা হল, যে মল্লিকা ভাবতে জানে, স্বপ্ন দেখতে জানে, জীবন কি তা' বুঝতে জানে সে মল্লিকাকে গড়ল কে? কোথায় থাকতো সেই মল্লিকা মামা যদি তাকে নিয়ে না যেত?

মামা নিয়ে না গেলে তা তাদের সেই রিষড়ের বাড়িতে কাকাদের আশ্রয়ে গণ্ডমুখ্য গাঁইয়া একটা মেয়ে হয়ে পড়ে থাকতে হতো মল্লিকাকে, হয়তো কোন্ কালে হতভাগা একটা বরের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যেত, হয়তো একপাল ছেলেমেয়েও হতো এতদিনে। পাহাড়ী ঝড়ের উন্মত্ত রূপ কোনদিন দেখতে পেত না মল্লিকা, দেখতে পেত না হঠাৎ বিদ্যুতের মত বাঘের হলুদ কালো ডোরা।

তবে মামাকে সে বন্ধু বলবে না শত্রু বলবে?

হঠাৎ একটা ঝোড়ো ঝোড়ো বাতাস ওঠে, আর সেই বাতাসের শব্দের মধ্যে যেন হা হা করা একটা হাসি ভেসে আসে। অনেকগুলো মাতালের সম্মিলিত হাসি!....হাজার মাইল দূর থেকে কেমন করে ভেসে এল এ হাসি।

বুক কেঁপে উঠল মল্লিকার।

আর ঠিক সেই সময় বুঝি ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতই পিঠের উপর একখানা স্নেহ কোমল হাত এসে পড়ল।

প্রভাত ঘুম ভেঙে উঠে এসেছে।

নরম গলায় বলছে, 'এমন করে দাঁড়িয়ে আছো কেন মল্লিকা?' ঘুম আসছে না?

ফিরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ স্বামীর বুকের ওপর আছড়ে পড়ে মল্লিকা। রুদ্ধ গলায় বলে, 'তুমি কেন ঘুমিয়ে পড়? তুমি কেন আমার সঙ্গে জেগে থাক না।'

সহজ স্বাভাবিক ভাবেই মেনে নেয় প্রভাত—এ হচ্ছে মল্লিকার অভিমান? সত্যি মল্লিকা যখন জেগে বসে আছে, তখন এমন অচৈতন্য হয়ে ঘুমানো উচিত হয়নি প্রভাতের। তাই ওকে কাছে টেনে নেয়, আরও নরম গলায় বলে, 'সত্যি মল্লিকা, আমি একটা বুদ্ধু।'

এমন স্বীকারোক্তির পর পরিস্থিতি নিতান্ত সহজ হয়ে যেতে দেরী হয় না, কিন্তু সেই সহজ সুর কি স্থায়ী হয়? মাঝে মাঝেই কেটে যায় সে সুর। মাঝে মাঝেই বিস্বাদ হয়ে ওঠে মল্লিকার. এই ছকে বাঁধা সংসারের সুনিপুণ ছন্দ।

কিন্তু ঘরকুনো প্রভাত বড় খুশিতে আছে।

হাওড়া থেকে বালি, অফিস থেকে বাড়ি। খাবার ঘর থেকে শোবার ঘর, মার স্নেহচ্ছায়া থেকে স্ত্রীর অঞ্চলচ্ছায়া।

তাঁতির মাকুকে এর বেশি আর ছুটোছুটি করতে হয় না। আবাল্যের পরিবেশ নামক সর্বদা সুধারসে সিক্ত করে রাখে, মাঝখানের বিদেশ-বাসের তিনটে বছর ছায়ার মত বিলীন হয়ে যায়।

এতদিনে বুঝি প্রভাত জীবনের মানে খুঁজে পায়।

কিন্তু মল্লিকা ক্রমশঃ জীবনের মানে হারাচ্ছে কেন? কেন ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছে? স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে?

হয়তো, বা মাঝে মাঝে একটু রুক্ষও।

এতদিন ভোর থেকে সুরু করে রাত্রি পর্যন্ত গৃহস্থালীর কাজগুলির ভার পেয়ে যে সে প্রতিমুহূর্তে কৃতার্থ হয়েছে। বিগলিত হয়েছে তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে, লক্ষ্মীর ঘরে ধূপ ধুনো দিতে, পূর্ণিমায় পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণের জন্যে মালা গাঁথতে, চন্দন ঘসতে।

সেই কৃতার্থমন্যতা কোথায় গেল?

কাজগুলো যান্ত্রিক হয়ে উঠছে কেন?

সংসারী গৃহস্থের মূর্তপ্রতীক প্রভাত। সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরে অসময়ের ফুলকপির জোড়া হাতে ঝুলিয়ে, ভাবতে ভাবতে আসে, মাকে বলবে, 'মা, দুটোই যেন তুমি চিংড়িমাছ দিয়ে রেঁধে শেষ করে দিয়ো না। তোমার নিরিমিষ ঘরে রাঁধবে একটা—

মল্লিকার মধ্যেকার সুর কেটে যায়।

প্রভাত কেন এমন জেলো, এমন ক্ষুদ্র সুখে সুখী?

এমনি এক সুর কাটা সন্ধ্যায় যখন প্রভাতের মা গিয়েছেন পাঠ বাড়িতে পাঠ শুনতে, আর নির্জন বড়ির দালানের একেবারে একটেরে ছোট্ট একটা তোলা উনুন জ্বেলে মল্লিকাকে ক্ষীর জ্বাল দিতে হচ্ছে শাশুড়ীর রাতের খাওয়ার জন্যে, খিড়কির দরজায় হুড়কো ঠেলার শব্দ হ'ল।

পাড়া গাঁয়ের প্রথামত হুড়কোটা এমন ভাবে ঠেকনো থাকে, যাতে বাইরে

থেকেই খুলে বাড়িতে ঢোকা যায়। আর সে পদ্ধতিটা বাড়ির সকলেরই জানা থাকে। প্রভাতও ক্রমশঃই এই পিছন দরজা দিয়ে ঢোকে। শব্দটা শুনে মল্লিকা ভাবল তাই হবে, প্রভাতই এসেছে। আর তাকিয়ে দেখল না।

অন্যদিন হলে হয় তো মল্লিকা তাড়াতাড়ি তাকিয়ে দেখতো, কিন্তু আজকের সন্ধ্যার সুর কাটা। আজ আর মল্লিকা ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে আসে না। বরং আরও ঘোমটা টেনে হেঁট মুখে কড়ায় হাতা নেড়ে নেড়ে দুধ জ্বাল দিতে থাকে। পরণে একখানা লাল হল্‌দে ছাপ মারা সিল্কের শাড়ি আর শাড়ির পাড়ের সঙ্গে মিলানো একটি লাল সিল্কের ব্লাউজ। যদিও সাজটা বাহারী তবে এ একেবারে ভাঁড়ার ঘরের আলনায় রাখা বিশুদ্ধ। ক্ষীর জ্বাল না হওয়া পর্যন্ত এ পরে কাউকে স্পর্শ করার উপায় নেই।

প্রভাত প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যায় এসে এই দৃশ্যটিই দেখে। মা পাঠবাড়িতে যান, ঝিটা সারাদিনের কাজ সেরে সন্ধ্যার মুখে বিদায় নেয়, আর মল্লিকা বিশুদ্ধ শাড়ি পরে শাশুড়ীর রাতের খাওয়ার ক্ষীর জ্বাল দেয়।

প্রভাত অনুযোগ করে, 'কাজটা একটু আগে সেরে রাখতে পার না? সারাদিনের পর বাড়ি এসে ঝপ্ করে একটু ছুঁতে পাই না। এ যে বক্ষে অগাধ তৃষ্ণা, অথচ সামনে লবণ সমুদ্র।'

মল্লিকা ভ্রূভঙ্গী করে উত্তর দেয়, 'তৃষ্ণাটা একটু কমাও, বাড়ির যখন এই ব্যবস্থা। গরু দোহা হবে সন্ধ্যার মুখে। আমাদের ওখানে তো বেলা চারটা না বাজতেই—' কথাটা প্রায়শঃই শেষ হয় না। যে কোন সময় অসতর্কে 'আমাদের ওখানে' বলে ফেলেই থেমে যায় মল্লিকা। তাড়াতাড়ি কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, 'চারটে পাঁচটার সময় দুধটা দোহা হলে ঠিকই কাজ সেরে রাখতাম।'

কিন্তু এসব হচ্ছে যেদিন ভিতরে সুর ঠিক থাকে। তাল ভঙ্গ হয় না। আজ আর ঠিক তেমনটি ছিল না। আজ মল্লিকার ভিতরের সুর গেছে কেটে, তার গেছে ঢিলে হয়ে।

আজ তাই খিড়কির হুড়কো ঠেলে যে ব্যক্তি ঢুকলো, তার দিকে উদাস একটি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মল্লিকা নিজের কাজ করে চলে।

কিন্তু বাড়িতে যে ঢুকলো সে কি প্রভাত?

মল্লিকা ত্রস্ত হ'ল।

তারপর দেখল পরিমল। বছর কুড়ি বাইশের একটি সুকান্তি ছেলে। ফরসা রং, চুলগুলি উল্টে আঁচড়ানো, পরণে একটা পায়জামা আর পাঞ্জাবী। মুখে মৃদু হাসি।

'জেঠিমা বাড়ি নেই?'

বলল ছেলেটা।

মল্লিকা বৌগিরি বজায় রেখে আস্তে বলে, 'মা তো রোজই এ সময় পাঠ শুনতে যান।'

'আর প্রভাতদা?'

'সেও তো সেই কখন ফেরে।'

ছেলেটা দাওয়ার একধারে বসে পড়ে বলে ওঠে, এ ভারী অন্যায় প্রভাতদার। আপনি এই সন্ধ্যাবেলা একা থাকেন। ওর একটু আগে ফেরাই উচিত। পাঁচটায় তো ছুটি হয়ে যায় ওর।'

ছেলেটা প্রভাতের খুড়তুতো ভাই, একটু বেশী বাক্যবাগীশ। তবে 'জেঠিমা' অর্থাৎ প্রভাতের মার কড়া দৃষ্টির সামনে সে বাক্যস্রোত রুদ্ধ রাখতে হয়। সেই রেখেই আসছে। আজ এমন নির্জন বাড়িতে বৌদিকে একা পেয়ে তার বাক্যের ধারা উথলে ওঠে......

প্রভাত সম্পর্কে ওই মন্তব্যটুকু সেই উথলে ওঠার সূচনামাত্র। কথাটা নিতান্তই বলার জন্যে।

কিন্তু তুচ্ছ এই কথাটুকুই যেন মল্লিকার সমস্ত স্নায়ু শিরা ধরে নাড়া দিয়ে দেয়। ওর মনে হয়, সত্যিই তো? এ অন্যায়, একান্ত অন্যায়। এই নির্জন সময়টুকু প্রভাত ইচ্ছা করে নষ্ট করে। এ সময় ও যায় বাজার ঘুরে নতুন ফুলকপি কি অসময়ের আম, গঙ্গার ইলিশ কি টাটকা ছানা সওদা করতে।

ছি ছি।

নিশ্চয় প্রভাতের মনের মধ্যেই নেই আগ্রহের ব্যাকুলতা। তাই খুড়তুতো দেওরের এই কথায় বিদ্যুৎ শরাহতের মত উঠে দাঁড়িয়ে সরে এসে বলে, 'উচিত কাজ তোমাদের এই বাড়িতে কে বা করেছে। নইলে তোমাদের দাদারকি উচিত ছিল এই আমাকে বিয়ে করা?'

'কি মুস্কিল! সেটা আবার কি এমন অনুচিত হলো? আমরা তো নিত্য প্রভাতদাকে হিংসে না করে জল গ্রহণ করি না....'

'ভুল—ভুল, সব ভুল! উচিত হয়নি আমাকে বিয়ে করা। বনের পাখীকে ধরে খাঁচায় এনে পোরা।'

ছেলেটা হেসে উঠে বলে, 'তা' সুন্দর পাখীটি দেখলে, কেই বা না চেষ্টা করে তাকে ফাঁদ পেতে ধরে ফেলে খাঁচায় পুরতে। সত্যি, চাকরী করতে

বিদেশে তো সবাই যায়, প্রভাতদার মত এমন অচিন দেশের রাজকুমারীর দেখা কে পায় বলুন?'

হঠাৎ খিলখিল করে হেসে ওঠে মল্লিকা। সহসা চকিত করে তোলা বাচাল হাসি। এ হাসি আজও মনে আছে মল্লিকার?

আজও পারে এ হাসি হাসতে। এ ওকে চেষ্টা করতে হল না! অনেকগুলো মাতালের সম্মিলিত হাসির বিপরীতে চেষ্টা করে আনা, শেকানো বাচাল এই হাসি মল্লিকার রক্তের মধ্যে মিশে গেছে না কি?

কখন গেছে?

কোন অসর্তকতায়?

ছেলেটা বোধকরি সহসা এই বাচাল হাসির ঘায়ে বিমূঢ় হয়ে যায়, তাকিয়ে থাকে হ্যাঁ করে, আর লজ্জায় লাল হয়ে যায় মল্লিকার পরবর্তী কথায় ; 'অচিন দেশের রাজকুমারীটিকে দেখছি ন'ঠাকুরপোর বেজায় পছন্দ। একটু আধটু প্রসাদ কণিকা পেয়ে ধন্য হতে চাও তো বল। রাজকুমারী কৃপণ নয়। তার ভাঁড়ারে অনেক ঐশ্বর্য।

বাক্য বাগীশ ছেলেটা তার বাক্যস্রোত হারিয়ে ফেলে নির্বোধের মত তাকিয়ে থেকে বলে, 'কী বলছেন?'

'বলছি তোমার মাথা। যে মাথায় গোবর ছাড়া আর কিছু নেই। সাধে কি আর তোমাদের এই বাংলাদেশে ঘেন্না ধরে যাচ্ছে আমার? নাও সরো। সরে বোসো। এখান দিয়ে আমাকে রান্নাঘরের দিকে যেতে হবে। তোমার সঙ্গে ছোঁওয়া গেলে তো জাতিপাত।'

ছেলেটা স্তত্র হয়ে সরে বসে?

মল্লিকা একটা তীব্র কটাক্ষ হেনে দাওয়া থেকে উঠানে নেমে পড়ে রান্নাঘর থেকে বাটি আনতে।

শাশুড়ীর স্পেশাল পিতলের বাটিটি। যেটি দেখতে ছোট 'খোলে' বড়।

কিন্তু সেই বাটিটি নিয়ে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই অবোধ ছেলেটা একটা বেখাপ্পা কথা বলে বসে।

বলে, 'সাধে কি আর এত মোহিত হয় লোকে? সুন্দর মানুষদের সবই সুন্দর। রাগও অপূর্ব।'

'তাই না কি?'

মল্লিকা চোখে বিদ্যুৎ হানে।

ছেলেটা বোধকরি নেহাৎই ঘায়েল হয়ে গিয়ে বলে ওঠে 'তাইতো। আর শাড়িখানাও কি আপনার তেমনি অদ্ভুত। পেলেন কোথায় এই বাঘ ডোরা শাড়ি। যখন রাগ করে এখান থেকে সরে গেলেন, ঠিক যেন মনে হল একটা বাঘ চলে গেল।'

'কী, কী বললে?'

মল্লিকা যেন ছিটকে ওঠে?

ছেলেটা আর একবার থতমত খেয়ে বলে, 'মানে, বলছি আপনার শাড়ির ডোরাটা ঠিক বাঘের গায়ের মত—'

'বাঘ না বাঘিনী?'

আর একটা বিদ্যুৎ হানে মল্লিকা ; যে বিদ্যুৎ কটাক্ষ ছেলেটা তার এই বাইশ বছরের জীবনে কোথাও কোনদিন দেখেনি।

কোথা থেকেই বা দেখবে? নিতান্তই যে গৃহপালিত জীব এরা।

তাই এবার সে ভয় পায়।

ভয়ঙ্কর এক ভয়ের রোমাঞ্চ তাকে যেমন একদিক থেকে এই দাওয়ার সঙ্গে পেরেক পুঁতে আটকে রাখতে চায়, তেমনি আর একদিক থেকে ধাক্কা মেরে তাড়াতে চায়।

শেষ অবধি জয় হয় শেষোক্তেরই।

বনকচু আর আশশ্যাওড়ার জোলো জোলো বন্য গন্ধ এদের রোমাঞ্চকে ভয় করতে শিখিয়েছে।

অতএব 'আমি যাই' বলে উঠে দাঁড়ায় ছেলেটা।

মল্লিকা ওর ওই ত্রস্ত মুখের দিকে তাকিয়ে এবার একটু করুণার হাসি হাসে।

ওর মনের দৃষ্টির সামনে ভেসে আসে অনেকগুলো পুরুষের নির্লজ্জ বুভুক্ষু দৃষ্টি। যে দৃষ্টি 'যাই বলে সরে যেতে জানে না, 'খাই' বলে লাফিয়ে পড়তে আসে।

'যাও বাড়ি গিয়ে মাথায় একটু ঠাণ্ডা জল দাও গে। নইলে রাতে ঘুম হবে না।' বলে আর একবার তেমনি বাচাল হাসি হেসে ওঠে মল্লিকা।

আর ও চলে যেতেই সহসা যেন একটা নিষ্ঠুর কাঠিন্যে প্রস্তরময়ী হয়ে যায়।

কী বিশ্রী কী পানসে এখানের এই পুরুষগুলো। ছিঃ। বাইশ বছরের একটা জোয়ান ছেলের রক্ত এত ঠাণ্ডা।

বাঘিনী দেখে ভয় পায়, তাকে শিকার করবার লোভে দুরন্ত হয়ে ওঠে না। হবেই তো, এঁরা যে গোস্বামী।

প্রভাত গোস্বামীর শিরায় শিরায়ও এই জোলো রক্তের স্তিমিত প্রবাহ।

আর একবার খিড়কির দরজাটায় মৃদু শব্দ হয়।

প্রভাত এসে দাঁড়ায় একহাতে একটা ভাল পাকা পেঁপে, আর একহাতে একটা টাটকা ইলিশ মাছ নিয়ে।

পেঁপেটা সাবধানে দাওয়ার ধারে নামিয়ে রেখে বলে ওঠে হুড়কোটা খোলা পড়ে কেন? এই ভর সন্ধ্যাবেলা একা রয়েছ?

মল্লিকা মুচকি হেসে বলে, 'একা বলেই তো সাহস দুর্বার। মনের মানুষ ধরতে দোর খুলে রেখেছি। তা' এমনি আমার কপাল যে, মনের মানুষ ধরা দিতে এসে ভয় পেয়ে পালায়।'

প্রভাত অবশ্য এই উগ্র পরিহাসটুকু নিজের সম্পর্কে প্রযোজ্য করে নিয়ে পরিপাক করে ফেলতে পারে। আর পারে বলেই হেসে বলতে পারে 'পালাবার আর জো কোথায়? সে তো লটকেই পড়ে আছে।....কিন্তু আজও অঙ্গে সেই বিশুদ্ধ পবিত্র শাড়ি? এত দেরী করে এলাম তবু কাজ শেষ হয়নি।'

হঠাৎ মল্লিকা একটা বেপরোয়া কাজ করে বসে। শাশুড়ীর ছুঁৎমার্গের আর বিশুদ্ধতার প্রশ্ন ভুলে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে প্রভাতের গায়ের উপর প্রায় সত্যি বাঘিনীর মত। সাপের মত দুখানা হাতে তাকে পিষে ফেলে নেশা ধরানো গলায় বলে, 'নাই বা হল কাজ শেষ। তুমি পারো না আমাকে শেষ করে দিতে?....

'ছি ছি, এ কী!' শিউরে উঠে মল্লিকাকে প্রায় ঠেলে সরিয়ে দিয়ে প্রভাত নিজে ছিটকে পাঁচ হাত সরে গিয়ে ভর্ৎসনার সুরে বলে, মাছ রান্না করতে করতে মাছের ওপর এসে পড়লে, দেখো তো কী অন্যায়। যাও যাও, শাড়িটা বদলে এসো।

কিন্তু মল্লিকা স্বামীর এই ব্যস্ত অনুজ্ঞা পালনের দিক দিয়েও যায় না। বরং আর একবার কাছে সরে এসে তাকে দুই হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁতে দাঁত পিষে তীব্র কণ্ঠে বলে, 'তুমি কী, তুমি কী। তোমার দেহে কি পুরুষের রক্ত বয় না। যে রক্তে কোন কিছুতে এতটুকু সাড়া জাগে না!'

বিমূঢ় প্রভাত কি বলত কে জানে ; কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে বাইরে প্রভাত-জননীর তীব্র তিক্ত শানানো গলা বেজে ওঠে—' বৌমা কি দুধ চড়িয়ে ঘুমিয়ে গেছে ; না পাড়া বেড়াতে গেছে? দুধ পোড়া গন্ধ যে ভুবন ভরে গেল।'

তারপর সে রাত্রিটা মল্লিকার কেমন করে কাটে কে জানে, কিন্তু পরদিন থেকে ভারী চুপচাপ আর শান্ত হয়ে যায় সে।

ভোর বেলা উঠে স্নান সেরে পুজোর ঘরে ঢুকে ঘর মোছে। চন্দন ঘষে রাখে, ধূপ জ্বালে, তারপর সাজি হাতে নিয়ে বাগানে যায় ফুল তুলসী আনতে।

বাগান মানে নিতান্তই অযত্নবর্ধিত খানিকটা জমি, প্রভাতের মা নিজের প্রয়োজনে দুচারটে ফুল আর তুলসীর গাছ পুঁতেছেন। সে ফুল তুলতে তুলতে মল্লিকা ভাবে, এই বাগানটাকে আমি সুন্দর করে তুলবো, ফুল ধরাবো, রঙ ফলাবো।

আকাশে এত রং, বাতাসে এত রস, সমস্ত পরিবেশ এমন স্নিগ্ধতা এমন পবিত্রতা এ সমস্তই বিফল হবে? আমি হেরে যাবো। মল্লিকার বাবার রক্ত মাথা হেঁট করে আসর ছেড়ে চলে যাবে, জয়ী হয়ে উঠবে মামার অন্ন?

'ছি ছি' কী লজ্জা! কী লজ্জা! কী ভাবল কাল প্রভাত। ও কী মল্লিকাকে ঘৃণা না করে পারবে?

কিন্তু তাই কি?

কোথায় পায় তবে প্রভাত সারারাত্রি ব্যাপী অমন নিশ্চিন্ত শান্তির ঘুম? মল্লিকা যে সারারাত জেগে বসে থেকেছে, জানালার শিকে মাথা ঠুকেছে, অর্ধেক রাত্রে ছাদে উঠে গিয়ে প্রেতনীর মত দীর্ঘ ছায়া ফেলে দীর্ঘশ্বাসে মর্মরিত হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন, তার তো কিছুই টের পায়নি প্রভাত।

শেষ রাত্রির স্নিগ্ধ বাতাসে আস্তে আস্তে কেমন অদ্ভুতভাবে স্তিথমত হয়ে গেছে মল্লিকা। নতুন করে সংকল্প করেছে সে তার মায়ের মত হবে।

তাই ধূপের গন্ধের মধ্যে ফুলের গন্ধের মধ্যে চন্দনের গন্ধের মধ্যে তার মাকে খুঁজে পেতে চায়।

করুণাময়ী হৃষ্ট হন।

ভাবেন গত সন্ধ্যার অসতর্কতার অনুতাপে আর করুণাময়ীর বাঘা শাসনের ভয়ে বৌ ঠাণ্ডা মেরে গেছে।

হুঃ বাবা, কথাতেই আছে হলুদ জব্দ শিলে, আর বৌ জব্দ কীলে। তা' কীল মারা-টারার যুগ আর নেই অবিশ্যি, কিন্তু জিভের ওপর তো আর আইন বসানো যায় না?

'কাকার একটা চিঠি এসেছে'—বলল প্রভাত খামের চিঠিটা হাতে নিয়ে।

করুণাময়ী মুখ তুলে বললেন, 'খামে চিঠি! ব্যাপার কি? হঠাৎ আবার কি বার্তা? কই পড় শুনি।'

প্রভাত ইতস্ততঃ করে বলে, 'ওই মানে আর কি, লিখেছেন যে আমি ওখানের চাকরীটা ছেড়ে দেওয়া পর্যন্ত তিনি খুবই দুঃখিত ছিলেন, তা' সম্প্রতি আবার একটা ভাল পোষ্ট হঠাৎ খালি হয়েছে, কাকা চেষ্টা করলেই হয়ে যেতে পারে। এখন আমি যদি ইচ্ছে করি—

করুণাময়ী ছেলের কথাটা শেষ করতে দেন্ না, প্রায়ই ধেই ধেই করে ওঠেন 'বটে বটে! খুব যে আমার হিতৈষী এলেন দেখছি। ছেলেটিকে বাড়ি ছাড়া না করলে আর চলছে না। ভেবে বুক ফেটে যাচ্ছে যে ছেলেটা মায়ের কোলের কাছটায় রয়েছে, ঘরের দুধটা মাছটা ফলটা তরকারিটা খাচ্ছে। আর কিছু নয়, এ ওই তোর কাকীর কুপরামর্শ। আমার ছেলেটা যাতে আমার কাছে না থাকতে পায়।.....সেবারক অমনি বরকে পরামর্শ দিয়ে দিয়ে একটা চাকরী দিয়েই সেই ছুঁতোয় নিয়ে গেল। বোনঝির সঙ্গে বিয়ে দিয়ে একেবারে 'নয়' করে নেবার তাল ছিল, তা' সে গুড়ে বালি পড়েছে। তবু আবারও এখন চেষ্টা করছে কি করে মার কাছ থেকে ছেলেটাকে আবার নিয়ে—

প্রভাত ব্যাকুলভাবে বলে, 'আচ্ছা মা কি বলছ যা তা?'

'যা তা মানে? মিথ্যে বলছি আমি? ওযে কত বড় জাঁহাবাজ মেয়ে, তার কিছু জানিস তুই? তোর বড় বৌদি মেজ বৌদিকে কুমতলব দিয়ে দিয়ে 'ভেন্ন করাল কে? এক একবার পুজোর সময় কি ছুটি ছাটায় এসেছে, নিজের স্বাধীন সংসারের গল্প করে করে ওদের মন মেজাজ বিগড়ে দিয়ে গেছে। তাতেও আশ মিটল না. এখন শেষ চেষ্টা তোকে যাতে—'

'আচ্ছা মা মিথ্যে একটা মানুষকে দোষী করছো কেন? আমি বলছি এটা সম্পূর্ণ কাকার ব্যাপার। কাকাই লিখেছেন—'

'কী লিখছে তাই শুনি ভাল করে। পড়তো দেখি—

কিন্তু প্রভাত পড়ে না।

অর্থাৎ পড়তে পারে না! এ চিঠির মধ্যে গলদ আছে। তাই চিঠিটা হাতের মধ্যেই রেখে বলে, 'ওই তো বললাম। দোষনীয় কিছু নেই বাপু।'

'বলি, পড়ে যা না তুই। দূষ্য কিছু আছে কি না, সে তুই কি বুঝবি। ধরবার বুদ্ধি তোদের আছে? না বোঝবারই চোখ তোদের আছে? পড় আমি শুনি।'

করুণাময়ী 'দূষ্য' আবিষ্কারের চেষ্টা আর একাগ্রতা নিয়ে অবহিত হয়ে বসেন।

কিন্তু বিপদ হচ্ছে প্রভাতের।

এ চিঠি গড়গড় করে পড়ে গেলে, করুণাময়ী রসাতল করে ছাড়বে না। এক আসামীকে ছেড়ে, ধরবেন আর এক আসামীকে। তাই কখনো যা না করে তাই করে বসে। মিথ্যে কথা বলে মাকে।

'এ চিঠির কোনখানেই বা পড়ে শোনাব তোমাকে? তিনভাগই তো ইংরিজি। মোট কথাটা ওই যা বললাম।'

একটু ইতস্ততঃ করে, 'যাই দাড়িটা কামিয়ে আসি', বলে গালে হাত বুলোতে বুলোতে সরে পড়ে সে মার কাছ থেকে।

করুণাময়ী ওর গমন পথের দিকে তাকিয়ে ভাবেন, তুই আজ মিথ্যে কথা বললি আমায়। আমি তোর মুখ চোখ দেখে বুঝছি না? হবেই তো, কোন না কোন হাভাতের ঘরের একটা মেয়ে এনে মাথার ওপর বসিয়েছিস, এখন স্বভাব বিগড়োবে এ আর বিচিত্র কি।

বৌকে অবশ্য তিনিও শেষ পর্যন্ত দ্বিধা ত্যাগ করে বরণ করে তুলেছিলেন, গ্রহণ করে নিয়েছেন, কিন্তু সে নিতান্তই নিরুপায় হয়ে। ছেলে যখন কাজটা প্রায় সমাধা করেই বসেছে, তখন আর আপত্তি দেখিয়ে ধাষ্টমো করে লাভ কি।

তবে একটু প্রসন্নতা ছিল এই কারণে, মেজবৌটার বড় রূপের গরব ছিল, সে গরব ভাঙাবার অন্তর নিয়ে ঢুকেছিল ছোট বৌটা। তাছাড়া নিজের ছোট জায়ের থোঁতা মুখটা ভোঁতা হল তো?

মল্লিকাকে করুণাময়ী সুচক্ষে দেখেন। বিশেষ করে যখন মল্লিকা বরটিকে নিয়ে 'বাসায় যাবার' কুমতলবটি না করে উল্টে বরং বাসায় না যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করে প্রভাতকে কলকাতায় থাকার প্ররোচনা দিল, তখন থেকে আরো সুনজরে দেখছিলো। কিন্তু হঠাৎ ক'দিন থেকে কেমন বিগড়ে গেছে বৌটা!

আর কিছু নয়, নিশ্চয় ওই জায়েরা তলায় তলায় ফুসলেছে। 'ভেন্ন' হাঁড়িই করেছে ওরা, বাড়িতে আসনটি তো ছাড়েনি। 'ঠাকুরপো ঠাকুরপো' করে রঙ্গ রসটিও কমতি নেই কিছু। ইচ্ছে হয় যে ছুঁড়িগুলোর সঙ্গে কথা বন্ধ হয়ে যাক, এদিকে আসা বন্ধ হোক, নেহাৎ ওই নিজের পেটের ছেলে দুটোর জন্যই মায়া। তবু তো আসে, বসে কথা কয়।

না, নতুন বৌটাকে—এবার একটু কড়া নজরে রাখতে হবে। যাতে ওদের

সঙ্গে বেশি মিশতে না পারে। বৌটা একটু খামখেয়ালি আছে। হয়তো একদিন দেখো ভোর রাত্তের উঠে চান করেছে, ফুল তুলেছে, চন্দন ঘসেছে, পুজোর গোছ করেছে, রান্নাঘরে গিয়ে কুটনোটি বাটনাটি করতে লেগেছে। ওমা আবার একদিন দেখ, না চান—না কিছু সকাল বেলা থেকে ছাদে উঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেন কোন জগতের মানুষ।...কিচ্ছু না ওই কুপরামর্শ। যাই হোক প্রভাতকে আর তিনি খুড়ো-খুড়ির কবলে পড়তে যেতে দিচ্ছেন না। হোক এখানে মাইনে কম, ঘরের ভাত খেয়ে থেকে যতটি জমবে, বাইরে গিয়ে তার ডবল মাইনে পেলেও কি তা' জমবে? ভাবলেন এই যুক্তিতেই তিনি ছেলেকে কাৎ করবেন। বৌটা তাঁর দলে এই যা ভরসা। একা বাসায় যেতে চায় না।

বুকের বল নিয়ে পাড়ার বান্ধবীদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন করুণাময়ী রান্নাঘরের দরজাটায় শেকল টেনে দিয়ে।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘরের মধ্যে আলোচনা চলছিল উল্টো।

প্রভাত ঘরে ঢুকে নীচু গলায় মল্লিকাকে যে প্রশ্ন করে, সে প্রশ্নে আহত বিস্ময়ের সুর।

'তুমি আমার কাকীমাকে চিঠি দিয়েছিলে?'

মল্লিকা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। পাড়াগাঁয়ের বাড়ির ছোট জানালা। যার মধ্যে দিয়ে আকাশ ধরা পড়ে না, দৃষ্টি ব্যাহত হয় জঙ্গলে গাছপালায়। তবু জানালার ধারেই দাঁড়িয়ে থাকে মল্লিকা যখনই পায়।

প্রভাতের প্রশ্নে, ফিরে না তাকিয়ে বলে হ্যাঁ।

'আশ্চর্য তো, কই বলনি তো?'

কাউকে একটা চিঠি দিলে সে কথা বলতে হয় তা জানতাম না।

'এভাবে বলছ কেন? ছিঃ!'

মল্লিকা নীরব।

'রাগ করছ? কিন্তু ভেবে দেখ, আমার কি আশ্চর্য হবার কিছু নেই, দিল্লী যাবার ব্যাপারে আপত্তি করছিলে তুমিই বেশি। অথচ—তুমি কাকীমাকে জানিয়েছ বাইরে আমার জন্য কাজ দেখতে, এটা একটা ধাঁধা নয় কি?

হঠাৎ জানালা থেকে সরে আসে মল্লিকা। এসে দাঁড়ায় প্রভাতের একেবারে নিতান্ত কাছে। রহস্যময় একটু হাসি হেসে বলে, ধাঁধা বলে ধাঁধা? একেবারে গোলক ধাঁধা!'

ওই রহস্যের ঝিলিক লাগানো চোখ মুখ দেখে কে পারে মাথার ঠিক

রাখতে। আর যেই পারুক অনন্ত প্রভাত পারে না। তাই বিগলিত আদরে বলে, 'মর্ত্যবাসী অধম জীব', 'গোলক' তত্ত্ব বোঝবার ক্ষমতা কোথায়? সত্যি বল না, হঠাৎ এ খেয়াল হল কেন? কাকীমাকে তো তুমি চেনও না, বাসার ঠিকানাই বা জানল্লে কি করে?'

মল্লিকা মুচকি হেসে বলে, 'ও আর জানা কি?' চিঠি চুরি করে ঠিকানা জোগাড় এসব তো আমার নিত্যকর্ম ছিল। এমন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ঘরে ঢুকেছি যে, লোক ঘরে জেগে বসে থেকেছে, সেও—ঝোঁকের মাথায় বলতে হঠাৎ থেমে যায় মল্লিকা। শুধু একটু হাসে। আর ওর সেই হাসির মধ্যে ধরা পড়ে একখানি অতীতের ঘুরে বেড়ান মন। এখানে বসে আছে মল্লিকা, তবু যেন এখানে নেই।

প্রভাত, ওর সেই অনুপস্থিত মনের ছায়া ফেলা মুখের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হয়ে বলে, 'এসব কথা তুমি আর বোলো না মল্লিকা। শুনতে বড় কষ্ট লাগে। আমার তো এখন আর কিছুইতেই বিশ্বাস হয় না সেই 'আরাম কুঞ্জ'র সঙ্গে কখনো কোনও যোগ ছিল তোমার।...কী অপূর্ব লাগে যখন তুমি চেলির শাড়ি পরে লক্ষ্মীর ঘরে আলপনা দাও, তুলসী তলায় প্রদীপ দাও, মায়ের রান্নার যোগাড় করে দাও, কি মিষ্টি লাগে যখন তুমি ঘরকন্নার খুঁটিনাটি কাজে ঘুরে বেড়াও মাথায় ঘোমটা দিয়ে। এ বাড়িতে তুমি কখনো ছিলে না ভাবতে ইচ্ছা করে না। ভাবতে গেলে ভয়ানক একটা যন্ত্রণা হয় তুমি একদা সেই বিশ্রী কুৎসিত পরিবেশে ছিলে—

মল্লিকা ওর দিকে তীক্ষ্ণ কুটিল একটা দৃষ্টি ফেলে বলে, যন্ত্রণা হয়, না ঘৃণা হয়?

ঘৃণা! না মল্লিকা ঘৃণা হয় না।

'হয় না?'

'নাঃ। তা যদি হতো, তখনই হতো। তাহলে তোমাকে সেখান থেকে নিয়ে এসে আমার মার রান্নাঘরে, চিরদিনের গৃহদেবতার ঘরে এনে তুলতে পারতাম না।'

মল্লিকা আর একটু তীক্ষ্ণ হয়, সে তখন নতুন নেশার মোহে—'

'ভুল করছ মল্লিকা, নেশাও নয়, মোহও নয়, সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস সেটা—'

'তবে বোধকরি দয়া, করুণা!'

'নিজেকে ছোট করবার জন্যে এই চেষ্টার পাগলামী কেন তোমার মল্লিকা?'

'ছোট করবার চেষ্টা নয়, সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করবার চেষ্টা। আর সে সত্যকে সহ্য করবার শক্তি আমার আছে। তুমি আমাকে দেখে করুণায় বিগলিত হয়ে আমার ভার গ্রহণ করলে, এটা তোমার নিজের মনের কাছে সাফাই হতে পারে, আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমি বলবো, তুমি রূপ-নেশাগ্রস্ত হয়ে—'

'মল্লিকা! আমরা এখন ভদ্রঘরের স্বামী-স্ত্রী!'

'ওঃ। আচ্ছা। খোলাখুলি কথা কওয়া তো এ সমাজে অচল। কিন্তু না জিজ্ঞেস করে পারছি না, আমি যদি মামার একটা হাড় মুখ্যু কুচ্ছিত ভাগ্নী হতাম?'

'কী হলে কী হতে, সে উত্তর দেওয়া অর্থহীন মল্লিকা! মানুষ যে কোন পরিস্থিতিতে কোন কাজ করে, অথবা করতে পারে, আগে থেকে কিছুই বলা যায় না। তবু আমাকে যদি 'রূপ মুগ্ধ পতঙ্গ' বলে অভিহিত কর, সেটা তোমার প্রতি নিতান্ত অবিচার হবে।'

'কেন। কেন। কেনই বা তা হবে তুমি?' হঠাৎ দু'খানা সর্পিল হাত বেষ্টন করে ধরে প্রভাতকে পিষ্ট করে ফেলতে চায় যেন, 'কেন তুমি এত বেশি জোলো হবে? আমার রূপটা বুঝি তুচ্ছ করার মত? এতে মুগ্ধ হওয়ায় অগৌরব?'

'উঃ, উঃ, ছাড় ছাড়, লাগে লাগে।' প্রভাত হেসে ফেলে। হেসে বলে, 'পাহাড়ে মেয়ের আদরও পাহাড়ে। স্বীকার করছি বাবা, এ হতভাগ্য ওই রূপের অনলে একেবারে দগ্ধপক্ষ পতঙ্গ ; এখন তার বাকটুকু আর চোখের অনলে ভস্ম করে ফেলো না।'

মল্লিকা হাত দু'খানাকে কোলের ওপর জড় করে নেয়, মল্লিকা সহসা স্থির হয়ে যায়। স্তিমিত গলায় বলে, 'অপমান করলেই করবো হয়তো।'

'অপমান?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু টিন্তু জানি না। কিসে, মানে কিসে অপমান সে বোধ তোমার থাকলে তো। আশ্চর্য, তুমি যে কেন এত বেশি ঠাণ্ডা! তোমার দাদারা তো—'

'কি আমার দাদারা?'

'কিছু না।'

'বাঃ আধখানা বলে রেখে আধকপালে ধরিয়ে দিতে চাও?'

'নাঃ, তা চাই না। বলছিলাম তোমার দাদাদের তো বেশ প্রাণশক্তি আছে—'

'রাতদিন বৌদিদের সঙ্গে ঝগড়া চলে বলে? তা যদি হয়, স্বীকার করছি আমার প্রাণশক্তির অভাব আছে।'

কিন্তু ঝগড়া জিনিসটা খারাপ নয়।

'খারাপ নয়।'

'না। ওতে ভিতরের বন্ধ বাতাস মুক্তি পায়। মনের মধ্যে তিলতিল করে যে অভিযোগ জমে ওঠে, তাকে বেরোবার পথ দেওয়া হয়।'

'যা দেখছি ও বাড়ির জেঠিমার মত পাকাকুঁদুলি নামটি আহরণ না করে ছাড়বে না তুমি। যাক আমাকে একটু খেতে পরতে দিলেই হল। তোমার গৃহে গৃহপালিত পোষ্য হয়ে কাটিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু আগের কথাটায় ফিরে আসা যাক, তুমি চিঠিতে কাকীমাকে অনুরোধ করেছ আমাকে আবার ওদিকে একটা চাকরী করে দিতে।' প্রভাতের চোখে গভীরতা।

মল্লিকা সেই গভীর দৃষ্টির দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে একটু চেয়ে থেকে বলে, 'করেছিলাম।'

'কেন বল তো? তুমি তো তা' চাওনি—'

'যদি বলি, তখন চাইনি, এখন চাইছি।'

'কিন্তু কেন? বাংলা দেশের জল হাওয়া আর ভাল লাগছে না? না, সহ্য হচ্ছে না?'

মল্লিকা প্রভাতের এই সহজ প্রশ্নটুকুতেই কেমন কেঁপে ওঠে। কোথায় যেন ভয়ানক একটা ব্যাকুলতা। কণ্ঠেও সেই ব্যাকুল সুর ফোটে, 'আমি বুঝি শুধু আমার কথাই ভেবেছি? শুধু আমার জন্যেই বলছি? আমার অহেতুক একটা তুচ্ছ ভয়ের জন্যে তোমার কেরিয়ারটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এটা বুঝি আমাকে কষ্ট দেয় না?'

'এই কথা!'

প্রভাত যেন অকুল সমুদ্রে কুল পায়। অন্ধকারে আলো পায়।

'এই কথা! এই ভেবে তুমি মাথা খারাপ করছ? আর আমি যদি বলি কেরিয়ার নষ্টটা তোমার মনের ভ্রম। আমি যদি সন্তুষ্ট থাকতে পারি, আমি যা পেয়েছি, যাতে আছি, তাতেই সুখী যদি হই, তা'হলে কে নষ্ট করতে পারে

আমার ভবিষ্যৎ? ওই বাজে কথাটা ভেবে তুমি মন খারাপ কোর না মল্লিকা। নাই বা হলো আমাদের জীবনের কাব্যের মলাটটা খুব রংচঙে 'গর্জ্জাস', ভিতরের কবিতায় থাকুক ছন্দের লালিত্য ভাবের মাধুর্য। আর সে থাকা তো আমাদের নিজেদেরই হাতে। তাই নয় কি মল্লিকা? আমার বাবা আমার দাদারা যে ভাবে জীবনটা কাটিয়ে গেলেন কাটিয়ে আসছেন সুখ দুঃখের ছোট্ট নৌকাখানি বেয়ে আমরাও যদি তেমনি ভাবে কাটিয়ে যাই ক্ষতি কি? তুমি পারবে না মল্লিকা আমার মা ঠাকুমার মত জীবনে সন্তুষ্ট থাকতে?

মল্লিকা ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

মল্লিকার চোখে জল আসে।

মল্লিকার সেই জলভরা দুই চোখ তুলে বলে, পারবো।

পিছিয়ে যেতে হল ফেলে আসা দিনে, ফিরে যেতে হ'ল বাংলা থেকে পাঞ্জাবে।

গণশা! হারামজাদা, পাজী!

চাটুয্যে দু'হাতে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে তেড়ে আসেন গণেশের চুল ছিঁড়তে।

তোর ষড়যন্ত্র না থাকলে এ কাজ হতেই পারে না। বল হারামজাদা শয়তান, কোথায় গেছে তারা?

গণেশ নির্বিকারের সাধক।

সে মাথা বাঁচাবার চেষ্টামাত্র না করে গম্ভীর গলায় বলে, কোথায় গেছে সে কথা জানলে কি আর আপনাকে প্রশ্ন করতে আসতে হতো বাবু। নিজে গিয়ে জানিয়ে দিয়ে আসতাম।

'বিচ্ছু শয়তান, স্টুপিড্ গোভূত। চালাকি খেলে আমার সঙ্গে পার পাবি? বাঘা আর হায়নাকে যদি তোর ওপর লেলিয়ে দিই?'

'ইচ্ছে হয় দিন।'

'কবুল না করলে ওরা তোকে টুকরে টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে তা জানিস?'

'তা আর জানবো না কেন বাবু? দেখলাম তো অনেক।'

'চুপ। নোংরা ছুঁচো ইঁদুর শুয়োর গাধার বাচ্চা'—

বাচ্ছা টাচ্ছা বলবেন মা বাবু, মেজাজ ঠিক রাখতে পারবো না।'

'মেজাজ ঠিক রাখতে পারবো না? হারামজাদা শালা। আমার মেজাজ ঠিক রাখতে পারছি আমি, আর তুমি—'

'ঠিক আর রাখছেন কোথায় বাবু? মেজাজ তো আকাশে চড়াচ্ছেন।'

'চড়াব না? তুই বলিস কিরে বদমাস। রাতারাতি সাতকৌটোর মাঝ কৌটোয় ভরা রাজপুরীর প্রাণপাখীটুকু উড়ে গেল, আর আমি চুপ করে থাকবো?'

'বাবু তো বেশ ভাল ভাল বাক্যি কইতে পারেন। সে—ই কবে ঠাকুমার কাছ থেকে ওই সব সোনার কাঠি সোনার কৌটোর গল্প শুনেছি—'

'গণেশ! তোকে আমি খুন করবো। ন্যাকরা করছিস আমার সঙ্গে? আর সময় পেলি না ন্যাকরা করার। বল লক্ষ্মীছাড়া পাজী, দিদিমণি গেল কোথায়?'

'সেই পুরনো উত্তুরই দিতে হবে বাবু।'

'লাঠি, লাঠি চাই একটা গণশা, নিয়ে আয় শিগগির একটা লাঠি। তোর মাথাটা ফাটিবে তবে আজ আমি জলগ্রহণ করবো—'

গণেশ দ্রুত অন্তর্হিত হয় ; এবং মুহূর্তের মধ্যে একগাছা মোটা লাঠি নিয়ে মনিবের হাতে তুলে দেয়।

চাটুয্যে অবশ্য সেইটুকু সময়ের মধ্যেই ভুলে গিয়েছেন, লাঠিটা কেন চেয়েছিলেন। বলে ওঠেন 'কী হবে?'

'ওই যে বলেছিলেন মাথা ফাটাবেন—'

'ওরে বজ্জাত। সমানে তুই আমার সঙ্গে ইয়ার্কি চালিয়ে যাচ্ছিস? শেষ কালে কী রাগের মাথায় সত্যিই একটা খুনোখুনি করে বসবো? দেখতে পাচ্ছিস না মাথার মধ্যে আমার আগুন জ্বলছে। সেই গোস্বামীটাকে যদি এখন হাতে পেতাম—'

গণেশ উদাস মুখে বলে, 'তেনার আর দোষ কি?'

'দোষ নেই? তার দোষ নেই? তবে কি ট্যাগুনটা—'

'আহা হা, রাম রাম! তা কেন। ট্যাগুন ম্যাগুন নায়ার ফায়ার, ওনারা সকলেই মহৎ চরিত্তির লোক। পরস্ত্রীর দিকে ফিরেও তাকান না, তা ফুসলে বার করে নিয়ে যাওয়া—'

'গণশা।। কার কাছে টাকা খেয়েছিস তুই, তাই বল আমায়।'

'টাকা। ছিঃ? বাবু, ছি ছি। ওই ছোট কথাটা মুখ দিয়ে বর করতে আপনার লজ্জা লাগল না। গণশা যদি টাকা খেয়ে বেইমানি করার মতন ছুঁচো বেক্তি হতো আরাম কুঞ্জের একখানা ইঁটও গেড়ে থাকত এখানে? বলি পুলিসের টিকটিকি এসে কেতা কেতা নোট নিয়ে—'

গণেশ সহসা চুপ করে যায়।

আত্মগরিমা করা তা'র নীতি বিরুদ্ধ।

চাটুয্যে নরম হন।

বিনীত গলায় বলেন, 'তা' কি আর জানি নে রে বাপ? তোর মাথা-ফাতা ঠিক থাকে না। বল দিকি সেই গোঁসাই পাজীটাকে কি করে কুকুরে খাওয়াই?

'শুধু পরের ছেলের ওপর গোঁসা করে কী হবে বাবু? ঘরের মেয়ের ব্যাভারটাও ভাবুন? নেমক যে খায়নি, আর তো আর নেমক হারামীর দোষ অর্শায় না? কিন্তু নেমক খেয়ে খেয়ে যে হাতিটি হলেন দিদি বাবু যা করল—'

চাটুয্যে বসে পথে অসহায় কণ্ঠে বলে, 'আচ্ছা গণেশ, বল দিকি কি করে করল? আমি তাকে সেই এতটুকু বয়েস থেকে লাললাম পাললাম, লেখাপড়া শেখালাম, কেতা কানুন শেখালাম, আর সে আমার মুখে জুতো মেরে—'

গণেশ নির্লিপ্ত স্বরে বলে, 'সবই করেছিলেন বাবু, শুধু একটা কাজ করতে ভুলে গেছলেন। মানুষটা করেন নি। লেলেছেন পেলেছেন, সবই ঠিক, ওই মানুষটা করে তুলতে বাকী থেকে গেছে। মানুষ করলে কি আর নেমকহারমীটা—'

'দেখ গণশা।—এমন ভাবে এক কথায় হারিয়ে যেতে তাকে আমি দেব না। যে করে হোক খুঁজে তাকে আনতেই হবে।'

'তা তো হবেই বাবু। নইলে তো আপনার 'আরাম কুঞ্জ'র ব্যবসাটাই লাটে ওঠে।'

চাটুয্যে সন্দিগ্ধভাবে বলে, 'গণশা তোর কথাবার্তাগুলো তো সুচাকের নয়! কেমন যেন ভ্যাঙচানি ভ্যাঙচানি সুরে কথা কইছিস মনে হচ্ছে।'

'কী যে বলেন বাবু।'

'তবে শোন্। সোজা হয়ে কথার জবাব দে। কাল কখন সেই হারামজাদার ব্যাটা হারামজাদাকে শেষ দেখেছিলি?'

'আজ্ঞে রাতে খাওয়ার সময়।'

'আর মল্লিকাকে?'

'আজ্ঞে তার ঘণ্টা দুই পরে। রান্নাঘর মেটানর সময়।'

'তারপর? কখন সেই শয়তান দুটো একত্র হয়ে—কেউ টের পেল না?'

'আজ্ঞে নরলোকের কেউ টের পেলে তো আর তাঁদেরকে স্বর্গলোকে পৌঁছতে হত না?'

'তুই ভোরে উঠে খোঁজ করেছিলি?'

গণেশ ঈষৎ মাথা চুলকে লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলে 'আজ্ঞে সত্যি কথা বলতে হলে, খোঁজ একবার মাঝরাত্তিরেই করতে হয়েছেল।'

'তার মানে?'

'তার মানে আজ্ঞে, জানেন তো সব। পাপ মুখে আর কবুল করাচ্ছেন কেন? যাই মাঝ রাত্তিরে ওই আপনার নায়ার সাহেবের হঠাৎ পিপাসা পেয়ে গেল, আমাকে ডেকে অর্ডার করলেন মিস সাহেবকে দিয়ে এক গেলাস জল পাঠিয়ে দিতে, তা' আমি খোঁজ করে গিয়ে বললাম, 'হবে না সাহেব। পাখী বাসায় নেই। বোধ করি অন্য ডালে গিয়ে বসেছে—'

চাটুয্যে হঠাৎ দু'হাতে গণেশের কাঁধ দুটো ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, 'শালা পাজী, তক্ষুণি আমাকে এসে খবর দিলি নে কেন?'

গণেশ নির্বাক, নিষ্কম্প।

'আজ্ঞে সে রেওয়াজ তো নেই।'

'আমার সন্দেহ হচ্ছে, এর মূলে তোর হাত আছে। তোর সাহায্য না পেলে—'

'এ সন্দেহ তো বাবু আপনার সঙ্গের সাথী। শুধু আপনার কেন আদি অনন্তকালের পৃথিবীতে আপনার তস্বৎ মহাপুরুষেরই এই অব্যেস। যার কাছে বিশ্বাস, তাকেই সব থেকে অবিশ্বাস।'

'আচ্ছা গণশা! এই দুঃসময়ে তুই আমার কথার দোষ ত্রুটি ধরছিস? বুঝছিস না আমার প্রাণের মধ্যে কী আগুন জ্বলছে। মল্লিকা আমার সঙ্গে এই করল।'

'আচ্ছা এই তো দুনিয়ার নিয়ম।'

'আচ্ছা আমিও দেখে নেব। সেই বা কেমন চীজ্ আর আমিই বা কেমন চীজ্। সেই গোঁসাইটাকে ধরে এনে যদি মল্লিকার সামনে টুকরো টুকরো করে না কাটতে পারি—'

'বাবু খপ্ করে অত সব দিব্যি টিব্যি গেলে বসবেন না। এই ভারত খানা তো আপনার হাতের চেটো নয়?'

নয় কি হয় তা' দেখবো। তবে তুই ব্যাটা যদি বিপক্ষে ষড়যন্ত্র না করিস্—

'আজ্ঞে আবার বেমাত্রা হচ্ছেন বাবু। বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করতে শিখলে এর অনেক আগে মিস সাহেব পাচার হয়ে যেতে পারতো। ওই আপনার গিয়ে নেমকহারামীটির ভয়ে ধর্ম অধর্ম, পাপ পুণ্যি, মায়া দয়া, মানুষ মনুষ্যত্ব সব বিসর্জন দিয়ে আছি!'

'গণেশরে! আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে!'

'তা একটুক্ষণ নয় কাঁদুন! ভেতরে গ্যাসটা একটু খোলসা হোক।'

'তোর কি মনে হয় বল্‌তো? মল্লিকাকে আর পাওয়া যাবে না?'

'এ দুনিয়ায় অসম্ভব সম্ভব হলে, কি না হতে পারে?'

'চাটুয্যে মিনিট দুই গুম্ হয়ে থেকে বলে, 'হাঁ, হায়েনাটাকে একবার ঘর থেকে বার করে আন দিকি, আর—আচ্ছা, আর শোন কাগে-বগে যেন টেরটা না পায় এখনও—'

'আজ্ঞে টের পেতে তো বাকীও নেই আর কেউ। কে না জেনেছে?'

'জেনেছে? আঃ! সবাই জেনে ফেলেছে?'

'আজ্ঞে নিয্যাস!'

চাটুয্যে মাথার চুল মুঠোয় চেপে বলে, 'যাবে, এইবার যাবে 'আরামকুঞ্জ' শেষ হয়ে যাবে। আরামকুঞ্জর প্রাণপাখীই যখন উড়ে গেল।'

গণেশ নিজস্ব স্টাইলে বলে, 'আজ্ঞে মনে করি মায়া দয়া বলে জিনিসগুলো বাক্স থেকে বার করব না। তবু কেমন এসে পড়ে। তাতেই বলছি, না উড়েই বা করবে কি? পাখীর প্রাণ বৈ তো নয়? হাতী পুষতে যদি কেউ পাখীর মাংসের ওপর ভরসা রাখে—'

'কী বললি? কী বললি পাজী।'

'কিছু না বাবু, কিছু না।'

'হুঁ। বুঝেছি, তুমিই যত নষ্টের গোড়া।'

অনেকক্ষণ গুম্ হয়ে বসে থাকে চাটুয্যে।

তারপর স্মৃতির ভেলায় ভাসতে ভাসতে চলে যায় অনেক দূর সমুদ্রে।

সেই তার ছোট বোনটা। মল্লিকার মা।

লক্ষ্মী প্রতিমার মত মূর্তিটি।

মল্লিকা কি তার মত হয়ে চায়?

আর মল্লিকা যা চায়, তাই তবে.হতে দেবে চাটুয্যে!

এই আরামকুঞ্জের পাট চুকিয়ে চাটি-বাটি গুটিয়ে ফিরে যাবে সেই দূর ঘাটে? যে ঘাট থেকে একদিন নৌকোর রশি কেটে দরিয়ায় ভেসেছিল। আর ভাসতে ভাসতে পাঞ্জাব সীমান্তের এই পাহাড়ে বরাত ঠুকে—বরাত ফিরিয়েছিল।

'আরামকুঞ্জ'র কুঞ্জ ভেঙে দিয়ে পয়সা কড়ি গুটিয়ে নিয়ে চাটুয্যে যদি জন্মভূমিতে ফিরে যায়, করে খেতে তো আর হবে না তাকে এ জীবনে?'

মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে চাটুয্যের।

সত্যি হয় না আর' তো?

কিন্তু কেনই বা হবে না! আর বেশি টাকার কি দরকার তার? না বৌ না ছেলে। না ভাই, না বন্ধু! একটা পুষ্যি ছিল, তা সেটাও শিকলি কেটে হাওয়া হল। কার জন্যে তবে কি? অনেক পাপ তো করা হল, বাকী জীবনটা ধর্ম কর্ম করে—

হঠাৎ নিজের মনেই হেসে ওঠে চাটুয্যে। ক্ষেপে গেল না কি সে? তাই বিড়াল তপস্বী হবার বাসনা জাগল? একেই বুঝি শ্মশান বৈরাগ্য বলে?

উঠে পড়ল।

পরামর্শ করতে গেল প্রিয় বান্ধব ট্যাগুন আর নায়ারের সঙ্গে।

একত্রে নয়, আলাদা আলাদা।

বিশ্বাস সে কাউকে করে না।

কে বলতে পারে ওদের মধ্যেই কেউ 'মল্লিকা হরণে'র নায়ক কিনা।

চাটুয্যে শুধু সেই কবি কবি বাঙালী ছোঁড়াটাকেই সন্দেহ করছে। ও ছোঁড়াগুলোর ভালবাসাবাসির ন্যাকরাই জানা আছে, আর কোনও ক্ষমতা আছে?

এমনও তো হতো পারে, প্রভাত গোস্বামী মল্লিকাকে সরায় নি। প্রভাত গোস্বামীকেই কেউ ইহলোক থেকে সরিয়ে ফেলে, মল্লিকাকে সরিয়েছে। আর সন্দেহের অবকাশ যাতে না থাকে, তার জন্যে এইখানে নিরীহ সেজে বসে আছে।

গণশা অত লম্বা চওড়া কথা কয়। কে জানে সেটাও ছিল কি না। টাকার কাছে আবার নেমক! মোটা টাকা ঘুষ পেয়ে লোকে নিজের কন্যেকে বেচে দিচ্ছে, তো এ কোন্ ছার!

মনিবের ঘরের মেয়ে!

ভারী তো!

ট্যাগুন, নায়ার আর বাসনধোয়া দাইটা তিনজনকেই বাজিয়ে দেখতে হবে। তারপর মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন। হারিয়ে গেল বলে হারিয়ে যেতে দেবে 'মল্লিকা' নামক ঐশ্বর্যটিকে? তাই কখনো হয়?

উঁকি মারল গিয়ে ট্যাগুনের ঘরে।

বোতল নিয়ে বসেছিল সে।

সাড়া পেয়ে মৃদু হাস্যে বলল, 'আইয়ে জী।'

হাসুক।

বিশ্বাস কেউ কাউকে করে না। চোরাচালানের আর চোরাই মালের ব্যবসা করে করে ওদের কাছে গোটা পৃথিবীটাই চোর হয়ে গেছে।

তাই এরা যাদের সঙ্গে গুপ্ত পরামর্শ করে, তাদেরই ধাপ্পা দেয়, যাদের দিয়ে গোপন কাজ করায়, তাদের ওপরই আবার চর বসায়। তাই চ্যাটার্জি যখন মেয়ে চুরির কাহিনী শুনিয়ে হাহাকার করে, ওরা তখন ভাবে, খুব ধড়িবাজ বটে বুড়োটা, নিজেই কোন কারণে সরিয়ে ফেলে, এখন লোক দেখিয়ে আক্ষেপের অভিনয় করছে।.....খুব সম্ভব কোনও কাপ্তেন মার্কা বড়লোকের খপ্পরে চালান করেছে।

তবু খোঁজবার প্রতিশ্রুতি সকলেই দেয়। শুধু নায়ার আর ট্যাগুনই নয়, আরও যারা ছিল খদ্দের। জেনেছে তো সকলেই। কেউ আকাশ থেকে পড়েছে, কেউ বিজ্ঞের হাসি হেসেছে। চ্যাটার্জির মতন ঘুঘু ব্যক্তির চোখ এড়িয়ে তার ভাগ্নী হাওয়া হল, এ কী আর একটা বিশ্বাসযোগ্য কথা?

কিন্তু পুরো অবিশ্বাস করাও তো চলছে না, মোটা টাকা 'খরচা' কবলাচ্ছে চ্যাটার্জী উড়ে যাওয়া পাখী ধরে আনতে।

পুলিসে খবর দেবার উপায় তো আর নেই? নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল কে মারে? তা ওরা গোয়েন্দা পুলিসের বাবা। যাদের নিয়ে কারবার চ্যাটার্জীর, যারা তার 'আরামকুঞ্জে'র চিরকালের খদ্দের।

সামান্য যে কালো মেঘটুকু মাঝে মাঝে ছায়া ফেলছিল সেটুকু বুঝি মুছে গেছে। মল্লিকা যেন মূর্তিমন্ত কল্যাণী। ঘরের কাজের পটুতা তার অসামান্য, তার উপর আছে শিল্প রুচি, সৌন্দর্য বোধ। সমস্ত সংসারটির উপর সেই রুচির আলপনা এঁকেছে সে।

অবশ্য প্রথম প্রথম যখন মল্লিকা সখ করে ঘরে ঝুলিয়েছিল নতুন ধানের শীষের গোছা, দালানের কোণে কোণে চৌকী পেতে 'চিত্র' করা ঘট বসিয়ে, তার মধ্যে বসিয়েছিল কাশফুলের ঝাড়, সংসারেই এখান ওখান থেকে তামা পিতলের ছোট ছোট ঘটি সংগ্রহ করে তাদের ফুলদানী বানিয়ে ঘরে ঘরে নিত্য রাখতে অভ্যাস করেছিল ফুলের মেলা, তখন তার জায়েরা ননদ সম্পর্কীয়ারা আর পড়শীনিরা মুখে আঁচল দিয়ে হেসেছিল এবং করুণাময়ী বিরসমুখে

বলেছিলেন, 'সময় নষ্ট করে কী ছেলেমানুষী কর ছোট বৌমা? অবসর সময়ে গেরস্থর তোলা কাজগুলো করলেও তো হয়।'

কিন্তু ক্রমশঃ দেখা গেল যারা হেসেছিল, তাদের-ই ঘরেই মল্লিকার অনুকরণ। তারা নিজেরা না করুক, তাদের মেয়ে-টেয়েরা লুফে নিচ্ছে এই সৌখিনতা।

কিন্তু এই সব কি মল্লিকা তার মামার আশ্রয় থেকে শিখেছিল? যেখানে রাত্রে বিছানায় শুয়ে বাঘের গর্জন কানে আসে? সেখানে ফুল কোথা? লতা কোথা? কোথায় সবুজের সমারোহ? ছিল না।

কিন্তু মল্লিকার ছিল সৌন্দর্যানুভূতি, আর এখানে এসে সৃষ্টি হ'ল একটি মন। গ্রামে ঘরে যে সব সুন্দর বস্তু অবহেলিত, মল্লিকার তৃষিত চোখে তো অভিনয়, অপূর্ব। তাই ওর ফুলদানিতে ফুলের গা ঘিরে ঠাঁই পায় সজনে পাতা, তেঁতুল পাতা। চাল-কুমড়োকে মাথায় তুলে এতাৎ যে বাঁশের মাচাটা হাড়বার করা দেহখানা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল উঠোনের কোণে, মল্লিকা তার হাড় ঢেকে দেয় মালতি লতা দিয়ে। মাচাটা হয়ে ওঠে কুঞ্জবন। গোবর লেপা উঠোনের মাঝখানে আলপনা আঁকে পদ্মলতা শঙ্খলতায়। সন্ধ্যায় সেখানে মাটির পিলসুজে প্রদীপ রাখে। জীবনের মোড় ঘোরাতে চাইলে বুঝি এমনি করেই সাধনা করতে ইচ্ছে হয়।

তা সাধনায় বোধ করি সিদ্ধিলাভ করতে পেরেছে মল্লিকা। মাঝখানে কিছুদিন যে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল সে চাঞ্চল্যকে নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলে সত্যই সে তার মায়ের মত শাশুড়ীর মত। পিতামহীদের মত হচ্ছে।

> '—বিরল তোমার ভবনখানি পুষ্পকানন মাঝে,
> হে কল্যাণী ব্যস্ত আছ নিত্য গৃহ কাজে।
> বাইরে তোমার আম্র শাখে,
> স্নিগ্ধ রবে কোকিল ডাকে,
> ঘরে শিশুর কলধ্বনি—'

যাঃ। অসভ্য! মল্লিকা চকিত কটাক্ষে হেসে ফেলে। হেসেই এদিক ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে শাশুড়ী বাড়িতে আছেন কি না। না নেই, বাড়িতে তিনি কমই থাকেন। পাড়া বেড়ানো, গঙ্গাস্নান, পাঠবাড়ি ইত্যাদি নানা কর্মের স্রোতে বেড়ান তিনি। আসল কথা দুই ছেলে বৌ আলাদা হয়ে যাওয়ার পর প্রভাতও যখন বিদেশে চলে গেল, শূন্য ঘর আর শূন্য হৃদয় করুণাময়ী হৃদয়ের আশ্রয় খুঁজে বেড়াতে লাগলেন বাইরের হিজিবিজির মধ্যে।

এখন ঘরের শূন্যতা ঘুচেছে, হৃদয়ের শূন্যতা ঘুচেছে, কিন্তু অভ্যাস ঘুচছে না। তাছাড়া এখন আবর গৃহকর্মের অনেক ভার মল্লিকা নিয়েছে। তাই তিনি মুক্ত পক্ষ বিহঙ্গের মত উড়ে বেড়ান। তবে মল্লিকার ওপর চোখ রাখবার চোখ যে একেবারে নেই, তা নয়। মল্লিকার বড় মেজ দুই জা, যাঁরা একই বাড়িতে 'ভিন্ন' হয়ে আছেন, তাঁরা ওই 'উড়ে এসে জুড়ে বসা' ছোট জায়ের গতিবিধির প্রতি সাধ্যমত দৃষ্টি রাখেন, এ বিষয়ে দু'জনেই অভিন্ন আত্মা। কিন্তু মজা এই তাঁদের দু'জোড়া চোখ অদৃশ্য পথে দৃষ্টি ফেলে বসে থাকে। মল্লিকার সেটা জানা নেই। তাই মল্লিকা প্রভাতের ছেলে-মানুষীতে অথবা কাব্যি ওখলানোয় বিব্রত পুলকে এদিক ওদিক তাকায় শুধু শাশুড়ী বাড়িতে আছেন কি না দেখতে।

নেই দেখে সহাস্যে বলে, 'কেরাণীগিরি করে করেও এত কাব্য টিঁকে আছে প্রাণে?'

'থাকবে না মানে?' প্রভাত হাসে, 'কাব্য কি শুধুই বড় লোকদের জন্যে? কেরাণীরা অপাংক্তেয়?'

'শুনেছি তো ওকাজ করতে করতে লোকের মাথার ঘি-টি সব ঘুঁটে হয়ে যায়।'

'যায় বুঝি? কই আমার তো তা মনে—'

'এই, কী হচ্ছে? ছাড়।'

'যদি না ছাড়ি।'

'রাহুর প্রেম?'

'প্রায় তাই। কোথায় ছিলে, কোথা থেকে—শিকড় উপড়ে নিয়ে এসে পুঁতে দিলাম বাংলাদেশের ভিজে ভিজে নরম মাটিতে—'

'সে মাটির মর্যাদা কি রাখতে পেরেছি?'

নম্র নম্র বিষণ্ন দুটি চোখ তুলে প্রশ্ন করে মল্লিকা, চাপল্য ত্যাগ করে।

প্রভাতও ছেড়ে গম্ভীর হয়।

বলে, 'পেরেছ বৈ কি।'

মল্লিকা চুপ করে থাকে।

আবহাওয়া কেমন থমথমে হয়ে যায়।

এক সময় মল্লিকা বলে ওঠে, 'মা বলছিলেন, তোমার মামা কেমন ধারা লোক গো বৌমা। একখানা পোস্টকার্ড লিখেও তো কই উদ্দিশ করে না?'

'তুমি কি উত্তর দিলে?'

'কি আর দেব? বললাম, মামা ওই রকমই। দায় চুকেছে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। নইলে আর সম্প্রদান করার কষ্টটুকু পোহাতে রাজী হ'ন না, কুমারী মেয়েটাকে একজনের হাতে ছেড়ে দেন।' মা বললেন, 'তা সত্যি! ধন্যি বটে....তা' বাছা তুমিও তো কই চিঠিপত্র লেখ না?' আবার কথা বানাতে হ'ল, বলতে হল, মামাকে চিঠি লিখি এত সাহস আমার নেই। ভীষণ ভয় করতাম তাঁকে। যা কিছু আদর আবদার ছিল মামীর কাছে।

'অনেক গল্প বানাতে শেখা গেল, কি বল। কলম ধরলে সাহিত্যিক নাম লাভ হতে পারতো। হেসে বলে প্রভাত, একেবারে কথার জাল বোনা।'

মল্লিকা বিমনা ভাবে বলে, 'তবু ফাঁক থেকে যায় কত জায়গায়। প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়।'

'ক্রমশঃ সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'মামা খোঁজ করছেন বলে মনে হয় তোমার।'

'পাগল হয়েছ।' প্রভাত হাসে, 'মেয়ে পালালে কেউ খোঁজ নেয়?'

'ঠিক ওই স্কেলে তো আমার জীবন আর সে জীবনের পরিস্থিতিকে মাপা চলে না। কে জানে তিনি বসে বসে প্রতিশোধের ছুরি শানাচ্ছেন কি না!'

ছুরি শানাচ্ছেন, এ ভয় প্রভাতেরই কি নেই। তবু সে পুরুষ মানুষ, মুখে হারতে রাজী নয়, তাই বলে ওঠে, ছুরি অত সস্তা নয়।'

বলে, 'কিন্তু বুকের মধ্যে ছুরি তার উঁচোনোই আছে। তবে এইটুকুই শুধু ভরসা, কলকাতার এই পঞ্চাশ লক্ষ লোকের মধ্যে থেকে একটা লোককে খুঁজে বার করা সহজ নয়। বোধ করি সম্ভবই নয়।'

তবু প্রায়ই এমন হয়।

আলোর ওপর হঠাৎ ছায়া এসে পড়ে। শুধু সে ছায়া স্থায়ী হতে পারে না, প্রভাতের স্বভাবের ঔজ্জ্বল্যে, আর মল্লিকার একান্ত চেষ্টায়।....হঠাৎ এসে পড়া ছায়াকে প্রভাত উড়িয়ে দেয়, মল্লিকা চাপা দেয়।

কিন্তু মল্লিকাকে কি প্রভাত সম্পূর্ণ বুঝতে পারে?

এইখানেই কোথায় যেন সন্দেহের খটকা। মল্লিকা কল্যানী বধূ মূর্তির অন্তরালে, কি একটা উদ্দাম যৌবনা নারী যখন শান্ত স্বভাব প্রভাতকে প্রখর যৌবনের জ্বালা দিয়ে পুড়িয়ে মারতে চায় না—প্রভাত নামক নিরীহ পুরুষটাকে।

'মল্লিকা' নামা দেহটা যেন একটা মসৃণ কোমল আবরণ। আর শঙ্কা হয়—যে কোনও মুহূর্তে সে আবরণ ভেদ করে ঝলসে উঠবে ভিতরের প্রখরা!

[illegible] ব্যাপার, ঐ চিন্তাটা হাস্যকর। প্রভাত ভাবে ওই তো কপালে মস্ত একটা সিঁদুরের টিপ বাম হাতে গোটা তিন চার লোহা, দু'হাতে শাঁখা চুড়ি বালা। নেহাৎ ঘরোয়া।

শাড়ি পরার ধরণটা পর্যন্ত ঘরোয়া করে ফেলেছে। একেবারে ঘরোয়া। মল্লিকা বদলে গেছে।

মল্লিকা ঘরোয়া হয়ে গেছে।

প্রভাত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

হ্যাঁ, স্বস্তি হয়েছে আজকাল সবদিকেই।

মল্লিকাকে নিয়ে পালিয়ে আসার পর থেকে সর্বদা যে ভয়ঙ্কর একটা অশরীরী আতঙ্ক প্রভাতের পিছু নিয়ে ফিরতো সে আতঙ্কটা ক্রমশঃই যেন হালকা হয়ে যাচ্ছে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ক্রমশঃই ভাবতে অভ্যস্ত হচ্ছে, না, সে যেমন ভেবেছিলাম, তেমন নয়।

একেবারে ডিটেকটিভ্ গল্পের 'নর-পিশাচ' নয়। প্রথমটায় হয়তো খুব রেগেছিল, শাপ-শাপান্ত করেছিল। হয়তো দুটোকে খুন করে ফেলবার স্পৃহাও জেগেছিল মনে, কিন্তু শেষে নিশ্চয়ই ভেবেছে এই নিয়ে টানাটানি কবতে গেলে, নিজেদেরই কোন ফাঁকে পুলিসের নজরে পড়ে যেতে হবে! আর সাধের ব্যবসা এবং প্রাণটি নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে।

অতএব মনের রাগ মনে চেপে বসে আছে ভদ্রলোক।

শাপ শাপান্ত?

এ যুগে ওতে আর কিছুই হয় না।

কলি যুগে ব্রহ্মা তেজ নির্বাসিত, ব্রহ্ম শাপ নিষ্ফল।

কাজেই স্বস্তি! স্বস্তি!

কিন্তু স্বস্তি বোধকরি প্রভাতের কপালে নেই। তাই ক্রমেই যখন তার জীবনটায় ছায়ার চেয়ে আলোর ভাগটাই বেশি হয়ে এসেছে, তখন হঠাৎ আবার ভয়ঙ্কর এক অস্বস্তির কাঁটা এসে বিঁধল বুকের মধ্যে।

অফিসে টিফিন করতে বেরিয়েছিল, ফিরে আসতেই সহকর্মী সুরেশ দত্ত খবরটা দিল।

প্রভাত বিচলিত চিত্তে প্রশ্ন করল, 'আমার সন্ধান নিচ্ছিল? নানান প্রশ্ন করছিল? কেন বলুন তো? কী রকম দেখতে লোকটা?'

সুরেশ দত্ত আরামে পা নাচাতে নাচাতে বলে, 'অনেকটা ঘটক প্যাটার্ণের

দেখতে বুঝলেন। প্রজাপতি অফিস থেকে এর[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
টফিসে। আইবুড়ো শুনলো, কি গাঁথবার তালে লেগে পড়ল।

প্রভাত বিরক্ত সুরে বলে, 'তা' আমি তো আর আইবুড়ো নই? আমার সন্ধান সুলুক নেবার দরকারটা কি।

'ওইতো—' সুরেশ দত্ত একটি রহস্যময় মধুর হাসি হেসে বলে, 'দিলাম একখানি রাম ভাঁওতা। এখন খুঁজুক বসে বসে আপনার ঠিকুজি কুলজি গাঁই গোত্তর! তারপর—'

'থামুন আপনি। ছেলেমানুষী করবেন না—'

সুরেশ দত্তর আরও গড়িয়ে পড়া মোলায়েম মসৃণ হাসিখানিকে নিভিয়ে দিয়ে প্রভাত প্রায় ধমকে ওঠে, 'ঠাট্টা তামাসারও একটা মাত্রা রাখা উচিত।'

সুরেশ বোধকরি অপমান ঢাকতেই অপমানটা হজম করে নিয়ে, বিলম্বিত দীর্ঘলয়ে বলে, 'মাত্রা আছে বলেই তো আপনাকে এগিয়ে ধরলাম। না থাকলে—নিজেকেই একখানি সুপাত্র বলে চালান করতাম। করলাম না। ভেবে দেখলাম—বাড়ির ঠিকানা জোগাড় করে যদি সেখানে ধাওয়া করে, কে জানে লোকটা পৈতৃক প্রাণটুকু খুইয়ে আসবে কিনা। মানে আমার গিন্নীটির কবলে পড়লে—।'

বাজে কথা রাখুন মশাই, লোকটার চেহারা কিরকম তাই বলুন।

সুরেশ দত্ত সোজা হয়ে উঠে বসে বলে, 'ব্যাপারটা কী বলুন তো প্রভাতবাবু। আপনার ধরণধারণ দেখে মনে হচ্ছে, আপনি যেন ফেরারি আসামী আর টিকটিকি পুলিস আপনার সন্ধান করে বেড়াচ্ছে। লোকটা তো অফিসের অনেকেরই নামধাম খোঁজ করছিল, কে কে ব্যাচিলার আছে সেইদিকেই যেন ঝোঁক তার। তা কই আর তো কেউ আপনার মত ক্ষেপে উঠল না? বললাম তো শচীনকে, অমরকে, শ্যামবাবুকে।'

এবার প্রভাত একটু লজ্জিত হয়।

তাড়াতাড়ি বলে, 'ক্ষ্যাপার কথা হচ্ছে না। আপনি খামোকা লোকটাকে আমার একটা ভুল পরিচয় দিতে গেলেন কেন, তাই ভাবছি। হয়তো ওই ব্যাচিলার শুনে বাড়ি গিয়ে ঝামেলা করবে।'

'করুক না। একটু মজা হবে।'

সুরেশ আবার আরামের এলায়িত ভঙ্গী করে বলে, জীবনটাকে একেবারে

মিলিটারীর দৃষ্টিতে দেখবেন কেন? একটু রঙ্গরস, একটু মজা, একটু ভুল বোঝাবুঝি, নইলে আর রইল কি মশাই।

'নাঃ আপনি একেবারে—' বলে উড়িয়ে দেবার ভঙ্গীতে চলে যায় প্রভাত। কিন্তু উড়িয়ে দিতে পারে না। মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করতে থাকে!

কে সে?

কে আসতে পারে প্রভাতের খোঁজে?

'আরামকুঞ্জে'র প্রোপাইটার—'এন কে চ্যাটার্জী ছাড়া প্রভাতের জানা শোনাদের মধ্যে কে এমন আধাবয়সী ভদ্রলোক আছে যে লোক গলাবন্ধ কোট পরে?

আচ্ছা প্রভাত এতই বা ভাবছে কেন?

সত্যিই তো ওই প্রজাপতি অফিসের লোক হয়ে পারে? নিছক বাজে একটা লোককে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে প্রভাত।

ভাবে!

মনকে প্রবোধ দেয়।

কিন্তু মন প্রবোধ মানে না। সে যেন একটা অশরীরী ছায়া দেখতে পাচ্ছে, যে ছায়া তার অন্ধকারের মুঠি বাড়িয়ে প্রভাতের গলা টিপে ধরতে আসছে।

অফিস ফেরার পথে আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে চলে প্রভাত।

ইতিমধ্যেই কি বাড়িতে কোনও ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটে গেছে? প্রভাতকে ফিরে গিয়েই সেই দৃশ্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে?

কী সেই দৃশ্য?

মল্লিকা নেই?

মল্লিকা খুন হয়েছে?

ভগবান! এ কী আবোল তাবোল ভাবছে প্রভাত। বাড়িতে তেমন কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে প্রভাতকে কেউ খবর দিত না। পাড়ায় তো জ্ঞাতি গোত্রের অভাব নেই। এমনিতে তারা সর্বদা বুকের মধ্যে 'দীর্ঘঙ্গি' পুষে রাখলেও, বিপদে আপদে দেখে বৈ কি?

না না, বিপদ কিছু হয়নি।

আচ্ছা বাড়ি গিয়ে কি তবে মল্লিকাকে এই খবরটা জানিয়ে সাবধান করে রাখবে প্রভাত? বলবে 'কে জানে হয়তো তোমার মামা এতদিনে সন্ধান পেয়ে—'

না, না, কাজ নেই।

প্রভাত ভাবল, অকারণ ভয় পাইয়ে দিয়ে লাভ কি? হয়তো সত্যিই কিছু না।

অজস্র ভাবনা এসে ভীড় করে।

মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করে আসে।

মানুষ নির্ভীক হয় কেমন করে? সামান্যতম ভয়ের ছায়াতেই যদি তার দেহমন অবশ হয়ে আসে?

ভেবে পায় না প্রভাত, কি করে মানুষ ভয়ঙ্কর সব কাণ্ডের নায়ক হয়ে হাসিমুখে ঘুরে বেড়াতে পারে সমাজের সর্বস্তরে?

আবার ভাবল, আশ্চর্য। আমিই বা কি করে পেরেছিলাম মল্লিকাকে চুরি করে আনতে।

প্রভাত যখন ভাবনার সমুদ্রে এমনি টলমল করতে করতে বাড়ী ফিরছিল, তখন প্রোপাইটার এন. কে. চ্যাটার্জী প্রভাতেরই এক জ্ঞাতি কাকার বাড়িতে জাঁকিয়ে বসে প্রশ্ন করছিল, 'বলেন কি? আপনারা তাকে জাতিচ্যুত করলেন না?'

'জাতিচ্যুত।'

জ্ঞাতিকাকা উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলেন, 'জাতি কোথায়? যে তার থেকে 'চ্যুত' করবো? আপনি ঘটকালি করে খান আপনি খবর রাখেন না একালে 'জাতি ধর্ম' কথাগুলো কোন্ পাঁশগাদায় আশ্রয় পেয়েছে!'

'জানি আজ্ঞে। জানি সবই। তবে কিনা আপনারা হলেন গিয়ে গোস্বামী বংশোদ্ভূত, আপনাদের কথা অবিশ্যিই স্বতন্ত্র।'

'কিছু স্বতন্ত্র নয় দাদা! ও আপনার গিয়ে সবাইকেই এক জাঁতার তলায় ফেলে পেষাই করা হচ্ছে। হ্যাঁ, ছিল বটে মান মর্যাদা এক সময়। সে সব এখন হাস্যকর। কুলশীল বংশমর্যাদা ওসব কথাগুলোই এখন 'ভূতো' হয়ে গেছে। ওকথা বলতে গেলে লোকে এখন হাসে, নাক বাঁকায়। নইলে—এই তো, কোথা থেকে না কোথা থেকে একটা পরমা সুন্দরী মেয়ে নিয়ে এল, বলল কোন চুলোয় কাকা না মামা কে আছে ব্যস, হয়ে গেল সে মেয়ে ঘরের বৌ। সে বৌ ভাতের হাঁড়িতেও কাঠি দিচ্ছে, নারায়ণের ঘরেও সন্ধ্যেদীপ দিচ্ছে। পাড়া পড়শীর বাড়ি গিয়ে এক পংক্তিতে খাচ্ছেও। আমরাই আর ওসব মীন করি না। যে কালে যে ধর্ম। তবে হ্যাঁ মেয়েটি বড় লক্ষ্মী। যেমন দেবী প্রতিমার

মত রূপ, শুনেছি তেমনি নাকি শিক্ষা সহবৎ।....যাক্ মশাই তাই হলেই হল। এ যুগের কাছে আমরা এই আগের যুগেরা কতটুকু কী চাই বলুন তো? ওই একটু শিক্ষা সহবৎ। গুরুজনকে ক্ষ্যমাঘেন্না করে একটু 'গুরুজন, বলে মানলো, তো বর্তে গেলাম আমরা। তা' আমার বড়ভাজের কাছে, মানে ওই প্রভাতবাবুর মায়ের কাছে শুনতে পাই মেয়ের নাকি গুণের সীমা নেই।...এই। এইটুকুই তো দরকার। যাক্ আপনাকে আর বেশি কি বলবো? দেখতেই পাচ্ছেন। আপনারও কর্মভোগ, তাই এসেছেন বিয়ে হওয়া ছেলের জন্য সম্বন্ধ করতে? হাতের কাছে আর কোনও পাত্রতো দেখছিও না যে আপনাকে—'

'থাক থাক!'

চ্যাটার্জী উঠে পড়ে, বলে, 'এইটির কথাই শুনে এসেছিলাম। তবে কিছুটা বিলম্ব হয়ে গেছে। যাক, আপনার মত একজন সজ্জন ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ হল, এটাই পরম লাভ।'

বিনয়ে বিগলিত হয় সে।

জ্ঞাতি কাকা বলেন, 'সজ্জন? হাসালেন মশাই। দুর্জন, অতি দুর্জন। তবে না কি দুনিয়ার হালচাল দেখে দার্শনিক হয়ে গেছি। নইলে ওই কাণ্ডর পর আমার ওই জ্ঞাতি ভাজের বাড়িতে কাউকে জলস্পর্শ করতে দিতাম? দিতাম না! আগে হলে দিতাম না। এখন ওই যা বললাম—দার্শনিক হয়ে গেছি। তবে হ্যাঁ, মেয়েটা খারাপ ঘরের নয়, দেখলেই বোঝা যায়। এই যে আমি কে না কে, কিন্তু নিত্য সকালে আমার ও বাড়িতে চায়ের বরাদ্দ হয়ে গেছে। কেন? ওই বৌটির অকিঞ্চনে। কই আরও ঢের বৌ তো আছে পল্লীতে, কে পুঁছছে? আমার ওই ভাজটির হাত দিয়ে তো জল গলতো না, এখন বৌটির কারণেই—'হ্যাঁ হয়ে যাচ্ছেন, না?' চোখ দেখেই বুঝতে পেরেছি! তা যেতেই পারেন। এ যুগে তো আর বৌ-ঝির মধ্যে এমন নম্রতা দেখা যায় না।.....আচ্ছা তবে—।'

চোখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন জ্ঞাতিকাকা। তা' হয়তো বোঝাবার মতই বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল প্রোপাইটার এন. কে. চ্যাটার্জীর চোখ জোড়া!

'এন. কে.!' এই নামেই পরিচিত চ্যাটার্জী। ব্যবসা ক্ষেত্রে ওটাই অনেক সময় 'কোডের' কাজ করে। কিন্তু একদা ওর একটা নাম ছিল না? যে নাম সে নিজেই ভুলে গেছে। নন্দকুমার না? নন্দকুমার চট্টোপাধ্যায়। হরিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অকালকুষ্মাণ্ড কুলাঙ্গার ছেলে।

কিন্তু তার মনটা আবার নরম প্যাচ্-পেচে হয়ে যাচ্ছে কী করে? খামোকা

চোখেই বা তাঁর খানিকটা জল উপচে পড়ছে কেন তার বেইমান ভাগ্নীটার সুখের সংসারের গল্প শুনে? আশ্চর্য্য, আশ্চয্যি। এন. কে.-র ভাগ্নী, যে ছিল এন. কে.-র শিকার ধরবার রঙিন রেশমি ফাঁদ, সে কিনা তার মার মত বোনের মত ঠাকুমা পিসিমাদের মত 'লক্ষ্মী বৌ' নাম কিনে সুখে শান্তিতে স্বামীর ঘর করছে!

সে আর নরককুণ্ডে বসে লুব্ধ শয়তানদের হাতে মদের গ্লাস এগিয়ে দেয় না, স্বর্গের এক কোণায় ঠাঁই করে নিয়েছে সে নিজের, সেখানে বসে সে ঠাকুরের নৈবেদ্য সাজায়, গুরুজন পরিজনদের হাতে তৃষ্ণার জল এগিয়ে দেয়!

চাটুয্যে কি তার চিরদিনের 'পাষাণ্ড' নামের ঐতিহ্য বহন করেই চলবে? স্বর্গের এক কোণে যে এতটুকু একটু জায়গা গড়ে নিয়ে শুভ্র হয়ে উঠেছে, পবিত্র হয়ে উঠেছে, তাকে তার সেই জায়গা থেকে টেনে নামাবে। চুলের মুঠি ধরে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাবে আবার সেই পুরানো নরককুণ্ডে। তাকে ডাণ্ডা মেরে বাধ্য করবে ক্ষুধার্ত বাঘেদের গুহায় ঢুকতে। বাধ্য করবে সেই বাঘেদের মদের গ্লাস এগিয়ে দিতে, তাদের সামনে ঘুমুর পরে নাচতে, কটাক্ষ হেনে মন কাড়তে।

নইলে—চাটুয্যের ব্যবসা পড়ে যাবে?

আর উন্নতি কমে যাবে?

মাতালগুলোকে আরও মাতাল করে ফেলে যে সুবিধাগুলো আদায় করতে পারতো সেগুলো আর আদায় হবে না।

অতএব চাটুয্যে—

কিন্তু জীবনে একবার যদি চাঁটুয্যে তার সেই পাষণ্ড নামের ঐতিহ্য ভোলে? যদি সত্যিকার মামা কাকার মত মেয়েটাকে আশীর্বাদ করে তাকে তার কল্যাণের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত রেখে হাসি মুখে ফিরে যায়?

লোকসান হবে 'এন. কে.-র?'

কিন্তু কতখানি?

কত খাবে সে একটা পেটে? কত পরবে একটা দেহে। কতদিন আর ও বাঁচবে—বাহান্ন বছর পার হয়ে যাবার পর?

চিন্তা জর্জ্জর প্রভাত বাড়ি ঢুকতে না ঢুকতেই করুণাময়ী কাছে এসে ব্যঙ্গ মিশ্রিত খুসি খুসি হাসি হেসে বলেন, 'ওরে প্রভাত তোর বৌয়ের যে কপাল ফিরেছে, নিরুদ্দিশ রাজার উদ্দিশ হয়েছে! মামা এসেছে দেখতে!'

'কে এসেছে? কে!'

বজ্রাহতের মত আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে প্রভাত। অনেকরকম ভাবছিল সে কিন্তু এই প্রকাশ্য অভিযানের চেহারা একবারও কল্পনা করেনি।

'তা' হাঁ হয়ে যাবারই কথা! ছোট বৌমাও শুনে প্রথমটা আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল, হাঁ করে তাকিয়ে বসেছিল। মামাকে নাকি আবার ভয়ও করে খুব। মানুষটা কিন্তু ভয়ের মত নয়। বরং একটু হ্যাবলা ক্যাবলা মতন। আর বিনয়ে তো অবতার। 'বেয়ান' 'বেয়ান' করে করে একেবারে জোড়হস্ত।'

প্রভাত সাবধানে দীর্ঘশ্বাস গোপন করে বলে, 'কতক্ষণ এসেছেন?'

'এই তো খানিক আগে। ফল মিষ্টি সরবৎ খাইয়েছি। দৈ দস্তুর করলাম, তা' বলছে থাকতে পারবে না, রাত্তিরের গাড়িতেই চলে যেতে হবে। কী যেন দরকারি কাজে একদিনের জন্যে এসেছে, নেহাৎ নাকি জামাই বাড়িটা হাওড়া ইস্টিশনের গায়ে, তাই—' করুণাময়ী মুখে চোখে একটি আত্মপ্রসাদের ভঙ্গী এঁকে কথার উপসংহার করেন, তবু আমি একেবারে ছেড়েকথা কইনি, শুনিয়ে দিয়েছি বুড়োকে বেশ দু'চার কথা—'

প্রভাত রুদ্ধকণ্ঠে বলে, 'শুনিয়ে দিয়েছ? কী শুনিয়ে দিয়েছ?'

'কী আবার শোনাবো, ন্যায্য কথাই শুনিয়েছি! কেন তোর পরম পূজ্য মামাশ্বশুরের বুঝি আর দোষ ত্রুটি কিছু নেই? বলি সাত জন্মে একটা উদ্দিশ করে? আজ এখন একদিন এক হাঁড়ি রসগোল্লা এনে—

'রসগোল্লা? এক হাঁড়ি—রসগোল্লা!' প্রভাত হঠাৎ চাপা গর্জনে বলে ওঠে, 'তোমার ছোট বৌ খেয়েছ সে রসগোল্লা।'

'ওমা শোন কথা! আসতে আসতেই অমনি হাঁড়ি খুলে খাওয়াতে বসবো—কেন আমার বৌ কি পেট ধুয়ে বসেছিল। বলি—মামাশ্বশুরের নাম শুনে, তুই অমন ভূতে পাওয়ার মতন করছিস কেন? তোরও কি ভয়ের ছোঁয়াচ লাগল না কি? তা' ছোট বৌমা তো তবু যাই হোক ধাতস্থ হয়ে—'

'কোথায় সে। তার সঙ্গে এক ঘরে?'

মার বিস্ময় অগ্রাহ্য করে প্রভাত মরীয়ার মত ছোটে। কী এনেছে মল্লিকার মামা মল্লিকার জন্যে।

বিষ মাখানো রসগোল্লা না বিষাক্ত ছুরি।

করুণাময়ী গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবেন। ভেবে ভেবে সিদ্ধান্ত করেন, 'আর কিছু নয়, বুড়োটার অমতেই বোধহয় এ কাজ হয়েছে। তাই দুটোতেই ভয় পাচ্ছে। তখনই বুঝেছিলাম গণ্ডগোল একটা আছেই'। তবু যতই হোক স্নেহ

নিম্নগামী।' তাই বুড়ো একঘণ্টার জন্যে মরতে মরতে দেখতে এসেছে মিষ্টির হাঁড়ি বুকে করে। যাই হাঁড়িটা সরিয়ে ফেলি। বেশি করে চারটি 'ভাল দিকে' রাখতে হবে। পাঠক ঠাকুরের জন্যে নিয়ে যাব। কিনে কেটে বেশি দেওয়া তো হয় না বড়।...যে আমার বড়বৌটি আর মেজবৌটি এক্ষণি উঁকি দেবে, আর ছোটজায়ের কান ভাঙাবে, 'তোর মামা অত মিষ্টি আনল, তুই কটা পেলি?'

রসগোল্লা সামলাতে সরে যান করুণাময়ী।

কিন্তু করুণাময়ীর ছেলে কেমন করে সামলাবে নিজেকে। কী করে বুঝবে এ স্বপ্ন না মায়া। শয়তান না স্বর্গীয় সুষমা।

আরামকুঞ্জর প্রোপাইটার এন. কে. চ্যাটার্জী কি হঠাৎ ঈশ্বরের স্পর্শ পেয়ে সমস্ত ক্লেদ মুক্ত হয়ে মহৎ হয়ে গেছে? সুন্দর হয়ে উঠেছে।

হয়তো তাই।

হয়তো ক্লেদাক্ত মানুষটা নির্মল হয়ে উঠেছে। ঈশ্বরের স্পর্শ কখনো কখনো এসে পৌঁছায় বুঝি কুৎসিত জীবনের কাদার উপর।

তাই বারবার কোঁটের হাতায় চোখ মুছছে রিষড়ের হরিকুমারের ছেলে নন্দকুমার।

'সুখে থাকে মা, শান্তিতে থাক। আমি তোর হতভাগ্য পাষণ্ড মামা কত জুলুম করেছি তোর ওপর, কত কষ্ট দিয়েছি। তবু এটুকু মনে জানিস যা করেছি বুদ্ধির ভুলে করেছি। কিন্তু তুই আমার মেয়ে নয় ভাগ্নী, একথা কোনদিন মনে করিনি।'

মল্লিকা বুঝতে পারে না।

মল্লিকা দিশেহারা হয়ে এই ভাবাবেগের অর্থ খোঁজে। এ কী তার চির অভিনেতা মামার এক নতুন অভিনয়। নিখুঁত, নিপুণ। নাকি হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে আর অসম্ভবকে সম্ভব করা সন্ধান করে করে শুধু তার পালানো ভাগ্নীকে আশীর্বাদ করতে এসেছে আরামকুঞ্জর প্রোপাইটার এন. কে. চ্যাটার্জী?

সেই আশীর্বাদটুকু দিয়েই আবার ফিরে চলে যাবে সেই হাজার মাইল ভেঙে? কোনও উদ্দেশ্যসিদ্ধি নয়? কোনও হিংস্র প্রতিশোধ নয়? অতীত কলঙ্কের ফাঁস করে দিয়ে টাকা আদায়ের চেষ্টা নয়, কিছুই নয়?

'এই যে বাবাজী।'

তাড়াতাড়ি চোখের শেষ আর্দ্রতাটুকু কোটের হাতায় নিশ্চিহ্ন করে চাটুয্যে বলে, 'কী বলে যে তোমায় আশীর্বাদ করবো। ভাল ভাল কথা তেমন জানি না, তাই শুধু বলছি তুমি সুখী হও, দেবতা তুমি, অধিক আর কি বলবো।'

প্রভাত থতমত খায়।

হতভম্ব হয়। এ কী!

জগতের যত বিস্ময় সবই কি আজ প্রভাতের জন্যেই অপেক্ষা করছিল?

শাণিত ছোরার বদলে আশীর্বাদ শান্তিবারি।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় প্রভাত আর কিছু ভেবে না পেয়ে হঠাৎ হেঁট হয়ে চাটুয্যের পায়ের ধুলো নেয়। ঠিক যেমন নেয় ভদ্র জামাইরা বাড়িতে শ্বশুর সম্পর্কীয় কেউ বেড়াতে এলে।

চাটুয্যেও ঠিক ভদ্র শ্বশুরের মতই বলে, 'থাক্ থাক্। দীর্ঘজীবী হও! মল্লিকা মাকে তাই বলছিলাম, 'অনেক জন্মের পুণ্যে দেবতার দেখা পেয়েছিলি তাই তরে গেলি, নরক থেকে ত্রাণ পেলি। স্বর্গ থেকে তোর বাবা-মা আজ তোদের শত আশীর্বাদ করছে। তোমাকে আর কি বলবো বলো, পাণ্ডব-বর্জিত দেশে পড়েছিলাম, সৎপাত্রে মেয়েটার বিয়ে হয়েতো জীবনেও দিতে পারতাম না। দেখে গেলাম,—বড় শান্তি পেয়ে গেলাম। তবে যাই মা মল্লিকা। আসি বাবা প্রভাত।....বেয়ান কোথায় দেলেন, বেয়ান। বড় মহৎ মানুষ। একটু পায়ের ধুলো নিয়ে যাই।'

স্বভাব বাচাল লোকটা বেশি কথা না কয়ে পারে না। কিন্তু যারা শোনে, তারা অকুল সমুদ্রে আথালি পাথালি করতে থাকে।

সৎ বস্তু, সুন্দর বস্তু, মহৎ বস্তুকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে না পারার মত যন্ত্রণা আর কি আছে?

অনেক রাত্রে বোধহয় কৃষ্ণপক্ষ, আকাশে তখন চাঁদ উঠেছে, জানালার ধারে চৌকীটাকে টেনে এনে বসে আছে ওরা।...প্রভাতের মুখে প্রসন্নতা। কিন্তু মল্লিকার মুখ ভাবশূন্য।

মল্লিকা যেন এখানে বসে নেই।

প্রভাত এই ছায়াছায়া জ্যোৎস্নায় হয়তো ধরতে পারে না সেই অনুপস্থিতি, তাই ওর একটা হাত-হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে গভীর সুরে বলে, 'মানুষের কত পরিবর্তন হয়!'

মল্লিকা কথা বলে না।

প্রভাতই আবার বলে, 'স্বার্থবুদ্ধিতে যাই করে থাকুন, তোমার মামা কিন্তু তোমাকে ভালবাসেন খুব।'

মল্লিকা তবু নীরব।

প্রভাত একটু অপেক্ষা করে বলে, 'ছেলেমেয়ে তো নেই নিজের! সাপের বাঘেরও বাৎসল্য স্নেহ থাকে। কি বল? তাই না?'

মল্লিকা একটা হাই তুলে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'ঘুম পাচ্ছে, শুচ্ছি।'

চাঁদের আলো রেলগাড়ির মধ্যেও এসে পড়েছিল। কিন্তু ঘুম পাচ্ছিল না নন্দকুমার চাটুয্যের। আর অদ্ভুত একটা ইচ্ছে হচ্ছিল ওর। সে ইচ্ছে কামরার দরজাটা খুলে ঝপ্ করে লাফিয়ে পড়বার। পড়লেই কেমন হয়?

গাড়িটা যে ক্রমশঃই তাকে তার ভয়ঙ্কর একটা আশার ঘর থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে। এই করতেই কি হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়েছিল চাটুয্যে হাজার লোকের কাছে সন্ধান নিয়ে নিয়ে? পেয়ে হারাবার জন্যে?

আশ্চর্য! বুদ্ধির গোড়ায় কি শনি ধরেছে চাটুয্যের? তাই তার তখন অকারণ মনে হয়েছিল যার জন্যে ছুটোছুটি তার বদলে খুব মস্ত একটা কি পেলাম! সেই 'পরম পাওয়ার' মিথ্যা আশ্বাসে মুঠোয় পাওয়া জিনিস মুঠো খুলে ফেলে দিয়ে এল।

'এন. কে.-র মত ঘোড়েল লোকটা কিনা ঘায়েল হয়ে গেল সস্তা একটু ভাবালুতায়? আসলে সর্বনাশ করেছিল মেয়েটার ওই টানটান করে চুল বাঁধা কপালের মাঝখানে মস্ত সিঁদুর টিপটা। ওই কপালটা দেখে মনে হচ্ছিল না ও মল্লিকা। মনে হ'ল হরিকুমার চাটুয্যের সেই কিশোরী মেয়েটা। অকাল কুষ্মাণ্ড নন্দকুমারের ছোট বোন। যে বোনটা পরে অনেক দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা সয়ে আর চেহারা সাজ বদলে, তবে মরেছিল।

কিন্তু যখন মরেনি, সাজ বদলায়নি, তখন অমনি টানটান করে চুল বাঁধতো সেই মেয়েটা, আর ফর্সা ধবধবে কপালের মাঝখানে ওই রকম জ্বলজ্বলে একটা টিপ পরতো।

মল্লিকা যেন নন্দকুমারের দুর্বলতার সুযোগ নেবার জন্যেই তার মরা ছোট বোনের চেহারা আর সাজ নিয়ে সমানে এসে দাঁড়াল!

কিন্তু 'এন. কে. পাগল নয়। সাময়িক দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠতে পারে সে।'

উঃ যাই ভাগ্যিস ঠিকানাটা ভাল করে লিখে আনা হয়েছে।

গণেশ মুচকি হেসে বলে, 'জানতাম।'

'জানতিস? কী জানতিস রে তুই শূয়ার?'

'জানতাম ফিরিয়ে আনতে পারবে না।'

'পারব না। অমনি জানতিস তুই?'

চির পরিচিত পরিবেশে ফিরে এসে নিজেকে একটা গাধা বলে মনে হয় চাটুয্যের। তবু মুখে হারে না। বলে, 'তোর মতন তো বুদ্ধু নই যে একটা হঠকারিতা করে বসবো। দেখে এলাম, এবার চেয়ে চেয়ে দেখতে হবে। ট্যাণ্ডন ফিরেছে?'

'কবে! এসে বলল, 'এন. কে.-র মেয়েকে খুঁজে বেড়াবার এত কী দায় আমার? মেয়ের কি অভাব আছে? ভাড়া ফেললেই মেলে। কত চাও?'

'হুঁ। টাকার কাঁড়ি খেয়ে—আবার লম্বা লম্বা বোলচাল। দেখাচ্ছি বাছাধনকে। আর নায়ার?'

'তার কোন খবর জানি না।'

'তা খবর জানবার কথাও নয়।'

সে তখন চাটুয্যের ফেলে আসা পথেই ঘোরাফেরা করছে।

সে কথা বলাবলি করে করুণাময়ীর বড়বৌ আর মেজবৌ। পর-নিন্দরূপ মহৎ আর শোভন কাজটিতে তাদের 'ভাবে'র আর অন্ত নেই।

সেই 'ভাবে'র ক্ষেত্রে বসে দু'জনে বলাবলি করে, 'মামা এসে যাবার পর থেকে ছোট বৌয়ের কীরকম অহঙ্কার অহঙ্কার ভাব হয়েছে দেখেছিস?'

'তা' আর দেখিনি? শাশুড়ীকে লুকিয়ে কত আসতো, বসতো, কাজ শিখতে আগ্রহ করে, আর এখন এমুখো হয় না।'

'দেখেছি ভাই! এখন আবার দেখছি ও বাড়ির ঠাকুরপোর সঙ্গে ভাবের চলাচলি, না কি জুয়া খেলাখেলি চলে।'

'জুয়া।'

'তাই তো বললো ঠাকুরপো। ডাকলাম সেদিন যাবার পথে। বললাম, 'কী গো, নতুনকে পেয়ে পুরনোদের যে একদম ভুলেই গেলে? তা অপ্রতিভ হয়ে বললো, প্রভাতদার বৌ অনেক রকম তাসখেলা জানে, তাই শিখছি—'

'লজ্জাও করে না। মেয়েমানুষের কাছে খেলা শেখা—'

'মরণ তোমার! মেয়েমানুষই তো সকল খেলার কাজী। তেমন তেমন খেলিয়ে মেয়েমানুষ হলে—তা আমাদের ইটিও ত কম যান না। এসে অবধি তো অনেক খেলাই দেখাচ্ছেন। এই একবারে কনে বৌটি, চোখ তুলে তাকান

না। এই আবার দেখ, যেন সিনেমা এ্যাকট্রেস। চোখের চাউনি ভুরুর নাচুনি দেখলে তাক্ লেগে যায়। ঠাট দেখলে গা জ্বলে। ঠাকুরপো চুপি চুপি বলল, ওসব তাস খেলা না কি স্রেফ জুয়া খেলা। বাজী ধরে খেলা তো? বলে না কি, কত খারাপ খারাপ বড়লোক ওই তাস খেলাতেই সর্বস্বান্ত হয়।'

'বলি এত সব জানলো কোথায় ও?'

'কী জানি বাবা। আমরা তো সাত জন্মেও শুনিনি ওসব, জানা তো দূরের কথা। শুধু কি তাই, ঠাকুরপোর কাছে নাকি একদিন বাহাদুরী করে বলেছে—যত রকম মদ আছে জগতে, আর যতরকম সিগারেট পাওয়া যায় বাজারে, ও নাকি সমস্তর নাম জানে।'

'এত সব তোমায় বলল কে গো?'

'কে আর, ছোঁড়াটাই। বলেছে কি আর বুঝে? আমিই কুরে কুরে বার করেছি। 'এতক্ষণ কিসের কথা হচ্ছিল গো? জিগ্যেস করলেই ভয় পেয়ে বলে ফেলে। কিছু কথা হচ্ছিল না, শুধু মুখপানে চেয়ে বসেছিলাম এই কথা পাছে দাঁড়ায়, সেই ভয় আর কি।'

'তা' ভয় ভাঙতে আর কতক্ষণ। মেয়ে মানুষ যদি প্রশ্রয় দেয় হাঁদা ছেলেটার পরকাল ঝরঝরে হলে আর কি!'

'আমাদের ছোটবাবুরও হয়েছে ভাল! ওই বৌয়ের মনোরঞ্জন করে তো চলতে হচ্ছে?'

এমনি অনেক কথা হয় দুই জায়ে।

এমনিতে যারা পান থেকে চুন খসলে পাড়া জানিয়ে কোঁদল করে।

এদের আলোচনার মধ্যে থেকে যে ইসারা উঁকি মারে, সেটা কিন্তু খুব একটা মিথ্যা নয়। খুড়তুতো দ্যাওর পরিমলকে নিয়ে হঠাৎ যেন একটু বাড়াবাড়ি করছে মল্লিকা! বিশেষ করে তাস নিয়ে যেন মেতে ওঠে, কাড়াকাড়ি হুড়োহুড়ি আর সহসা উচ্চকিত হাসির শব্দ বাড়ি ছাড়িয়ে অন্য বাড়ি পৌঁছায়।

করুণাময়ী বাড়িতে খুব কম থাকেন এই রক্ষে, তবু মাঝে মাঝে বিরক্ত হন তিনি! বলেন, 'মামা এসে একদিন দেখা দিয়ে গিয়ে আসপদ্দাটা যেন বড় বাড়িয়ে দিয়ে গেল মনে হচ্ছে। কই, এত বাচাল ছিল না ছোটবৌমা। অতবড় ডাগর ছেলেটার সঙ্গে এত কিসের ফষ্টি-নষ্টি। ওর লেখাপড়া আছে, ওর মাথায় তাসের নেশা ঢুকিয়ে দেবার দরকারই বা কি।

প্রভাতকে লক্ষ্য করেই অবশ্য বলতেন এসব কথা।

প্রথম প্রথম প্রভাত হেসে গড়াত। বলতো, 'ডাগর ছেলেটা তোমার বৌয়ের থেকে পাঁচ বছরের ছোট মা।...বলতো—'মামা হঠাৎ একদিন দেখা দিয়ে মন কেমন বাড়িয়ে দিয়ে গেলেন, মনটা প্রফুল্ল করতে যদি একটু খেলাধুলো করে ক্ষতি কি? বৌদিরা তো ও রসে বঞ্চিত তাই পরিটাকেই ধরে এনে—'

বলাবাহুল্য 'বৌদিদের সঙ্গে বেশি মাখামাখি যে করুণাময়ীর চক্ষুশূল সে কথা জানতে বাকী নেই প্রভাতের, ওইটাই বলতো মাকে থামাতে। 'কুটিল কুচক্কুরে' (করুণাময়ীর ভাষায়) বৌ দুটোর চেয়ে যে খোলামেলা-মন দ্যাওরপোটাকে তিনি শ্রেয় মনে করবেন এ সত্য প্রভাতের জানা।

কিন্তু প্রভাতের নিজেরই একদিন বিরক্তি এল।

ছাতে উঠে গিয়ে তাসের আসর বসানোর সখটা তার চোখে একটু বেশি বাড়াবাড়ি ঠেকল।

উঠে গেল নিজেই।

দেখল পাতা মাদুরের ওপর তাসগুলো। এলোমেলো ছড়ানো, আর কি একটা জিনিস নিয়ে তুমুল কাড়াকাড়ি করছে পরিমল আর মল্লিকা।

'ব্যাপার কি?'

ভুরু কোঁচকালো প্রভাত।

পরিমল অপ্রতিভ হয়ে হাত ছেড়ে দিয়ে মাথা হেঁট করে বলে, 'দেখনা, চার টাকা হেরে গিয়ে বৌদি এখন আমার জিতের পয়সা দেবে না বলছে।'

'টাকা, পয়সা, এসব কি কথা? বাজী ধরে তাস খেলা হচ্ছে না কি?' ক্রুদ্ধ গম্ভীর স্বরে বলে প্রভাত। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতের সেই গম্ভীর্যকে নস্যাৎ করে হেসে ওঠে মল্লিকা। বাচাল হাসি।

বাজী না ধরলে কি আর খেলায় চার্ম আসে?

'না না এসব আমার ভাল লাগে না। টাকা পয়সা নিয়ে খেলা—'

'ভয় নেই— তোমার পয়সা খোওয়া যায় না। খেলা শেষে আবার ফেরৎ নেওয়া-নিয়ি হয়।'

প্রভাত স্পষ্ট বিরক্তি প্রকাশ করে বলে, 'তাই যদি হয় তো, এ খেলার দরকারটাই বা কি?

আর সে বিরক্তিকে ব্যঙ্গ করে হেসে ওঠে মল্লিকা. 'দরকার যে কি, তুমি তার কি বুঝবে? ও রসে বঞ্চিত! তোমাদের এই স্রেফ আলু ভাতের আস্বাদবাহী সংসারে দম বন্ধ হয়ে আসে যে মানুষের।'

প্রভাত একটু নরম হয়।

ভাবে, সত্যি ছেলেমানুষ, একটু আমোদ আহ্লাদের দরকার আছে বৈ কি। বাড়িটা আমাদের সত্যিই বড় স্তিমিত। আমি সারাদিন খেটে-খুটে এসে বাড়ির আরামটি, ঘরের খোপটি চাই, মা নিজে পাড়া বেড়িয়ে 'বেড়ান, অথচ একটু আধটু বেরোতে দিতেও নারাজ, বেচারার দম বন্ধ হয়ে আসা অন্যায় নয়।

আর তাছাড়া—

চকিত লজ্জায় একবার ভাবে, একটা বাচ্চাটাচ্চাও হলে হতে পারতো এতদিনে। আর তা'হলে নিঃসঙ্গতা বোধ করে পাড়ার দ্যাওরকে খোসামোদ করে তাস খেলতে হতো না ওকে।

কিন্তু প্রভাত বিচক্ষণ।

এক্ষুণি সংসার বাড়িয়ে ফেলতে নারাজ।

সে যাক।

আপাততঃ ভিতরে হলেও পরিমলকে শিক্ষা শাসন দেবার জন্যেই গাম্ভীর্য বজায় রেখে বলে, 'তা হোক। তাস খেলা ছাড়াও জগতে অনেক কাজ আছে। বই পড়লেই পার। তাছাড়া দু'জনে আবার খেলা কি? জমে না কি?'

হঠাৎ প্রভাতকে স্তব্ধ করে দিয়ে এক টুকরো ইঙ্গিতবাহী রহস্যময় হাসি হেসে মল্লিকা বলে ওঠে, 'খেলা তো দু'জনেই জমে ভাল?'

প্রভাত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, পরিমল পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়, আর মল্লিকা সহসা সেই তাস ছড়ানো পাতা মাদুরটার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে থাকে।

মল্লিকার হাসিটাও যেমন অস্বস্তির, কান্নাটাও যেমনি যন্ত্রণাদায়ক। আর প্রভাতের কাছে দুটোই অর্থহীন।

তবু কান্না কান্নাই।

অর্থহীন হলেও কান্না দেখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। ভয়ঙ্কর কোনও, আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেলেও না। আর অপর পক্ষের কান্নার ভার এ পক্ষের অপরাধের পাল্লাটা ভারী করে তোলেই।

প্রভাতের মনে পড়ে, এর আগে আর কোনদিন মল্লিকাকে এমন তিরস্কার করেননি সে।

খুবই স্বাভাবিক যে মল্লিকা আহত হবে, বিচলিত হবে।

তবে?

তবে কতক্ষণ আর পড়ে পড় কাঁদতে দেওয়া যায় মল্লিকাকে?

প্রভাত মনে মনে সংকল্প মন্ত্রপাঠ করে, নাঃ, কাল থেকে আর এ রকম নয়। মল্লিকার দিকে একটু অধিক দৃষ্টি দিতে হবে। মল্লিকার জন্যে একটু অধিক সময়।

কিন্তু মুস্কিল হয়েছে এই—

পাড়ার যে পুরানো ক্লাবটা একদা প্রভাতের কৈশোর আর নব-যৌবন কালের একান্ত আনন্দের আশ্রয় ছিল, যার মাধ্যমেই তারা গড়ে তুলেছিল ওই 'হাওড়া যুব পাঠাগার' আর এখন যে ক্লাবের টিম বড় বড় জায়গায় খেলতে যায়, তারাই বর্তমান কর্মকর্তারা ধরে করে পড়েছে প্রভাতকে স্থায়ী প্রেসিডেন্ট হতে হবে।

ছেঁকে ধরেছে তারা, 'প্রভাতদা আগের যাঁরা, তাঁরা কেউই প্রায় এদিকে নজর দেন না, কেউ কেউ বা অন্য জায়গায় চলে গেছেন, আর ছাড়ছি না আপনাকে।'

'ছাড়ছি না ছাড়বো না।'

আজন্মের পরিচিত ঠাঁই যেন এই ক'টা উৎসুক ছেলের মধ্য দিয়েই স্নেহ-কঠিন দুই বাহু জড়িয়ে ধরতে চায়, 'ছাড়ছি না! ছাড়বো না।'

মা বলেন, 'আর ছাড়বো না।'

মল্লিকা তা বলতে পারে না।

মন বলে, 'আর ছাড়বো না।'

আর অনেক যোজন দূরের আকাশ থেকে যে পাখীটিকে ধরে এনে খাঁচায় পুরেছে প্রভাত? সেও বুঝি পরম নির্ভয়ে বুকের আশ্রয় নিয়ে মৌন সজল দৃষ্টির মধ্যে বলে 'ছাড়বো না, ছাড়ছি না।'

এমন একান্ত করে প্রভাতের হয়ে যেতে না পারলে, মামাকে দেখে কি একটুও উতলা হত না মল্লিকা? বলত না একবারটি নয় ঘুরে আসি চিরকালের জায়গা—,

মামা তো তার ঘাতকের বেশে আসেনি, এসেছিল নিতান্তই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়ের রূপেই। কিন্তু মল্লিকা একবারও বলেনি, 'দেখতে ইচ্ছে করে সেই জায়গাটা।'

না, মল্লিকা তা' বলেনি।

মল্লিকা নীল আকাশের ওড়া পাখী ছিল না। ও যে পায়ে শিকল বাঁধা

খেলোয়াড়ের খেলা দেখানো পাখী ছিল। প্রভাত তাকে আপনার খাঁচায় এনে রেখেছে বটে, কিন্তু পায়ের শিকলি তো কেটে দিয়েছে।

তাই না সে অমন নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে শুধু দুটি চোখের চাহনি দিয়েই আশ্বাস দেয় প্রভাতকে, ছাড়বো না, ছাড়বো না।'

মল্লিকা সুখী। মল্লিকাকে সুখী করতে পেরেছে প্রভাত। মল্লিকা কৃতজ্ঞ। মল্লিকাকে কৃতজ্ঞ হবার অবকাশ দিয়েছে প্রভাত। মাঝে মাঝে একটু উল্টোপাল্টা আচরণ করে বটে, সেটা নিতান্তই ওর অভিমানী স্বভাবের ফল। তাই তো ভাবতে হচ্ছে প্রভাতকে, ছুটির দিনগুলো আর কাজের দিনের সন্ধ্যাগুলো মল্লিকার জন্যে রাখতে হবে।

ওই ভাবের ছেলেগুলোর কাছ থেকে কি করে ছাড়ান পাওয়া যাবে?

মল্লিকা তা বলতে পারে না।

আর আপাততঃ মল্লিকার এই অভিমানের কান্নার হাত থেকে?

অনেক চেষ্টার আর অনেক যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হয় প্রভাতকে, মল্লিকা কি ভেবেছে বিরক্ত হয়েছে প্রভাত? পাগল নাকি! মল্লিকার ওপর বিরক্তির প্রশ্ন ওঠেই না। কিন্তু এখানকার জ্ঞাতি সমাজ তো ভাল নয়? ওই পরিমলটার যদি পরীক্ষার ফল ভাল না হয়, সবাই দূষতে বসবে মল্লিকাকেই। বলবে—আড্ডা দিয়ে দিয়ে ছেলেটার মাথা খেয়েছে মল্লিকা! ওটা যে এই তিনবার ঘসটে ঘসটে ফোর্থ ইয়ারে উঠেছে, সে কথা কেউ মনে রাখবে না।

তবে? নিজেরা সাবধান হওয়াই ভাল।

ওকে ভয় পাওয়াবার জন্যেই বিরক্তির ভান দেখাতে হয়েছে প্রভাতকে। এই সব যুক্তির জাল বোনে প্রভাত। মল্লিকার কাছে বসে। এক সময় মল্লিকা চুপ করে।

আর তারপর সহসা উঠে একেবারে নীচের তলায় নেমে গিয়ে করুণাময়ীর কাছে বসে।

প্রভাত আনন্দপ্রসাদে পুলকিত হয়, নিজের বুদ্ধি আর যুক্তির কার্যকারিতায়।

কিন্তু মল্লিকার ওই আকস্মিক কান্না কি সত্যিই প্রভাতের বিরক্তি প্রকাশের অভিমানে?

না, সে-কান্না গভীরতর কোন অবচেতনার স্তর থেকে উঠেছে এক অক্ষমতার নিরুপায়তায়?

—বৌয়ের আওতা ছাড়িয়ে ছেলেকে একেবারে একা পাওয়া বড়ই শক্ত।

ধারে কাছে বৌ নেই, ছেলের কাছে বসে দুটো সুখ-দুঃখের কথা কইলাম, কি হ'ল বৌয়ের একটু সমালোচনা, তার আচার আচরণের একটু নিন্দেবাদ, এমন মাহেন্দ্রক্ষণ জোটা দুষ্কর দিদি!

এ যুগের বৌগুলোই হচ্ছে শাস্ত্রসম্মত সাধ্বী-সতী। স্বামীর একেবারে ছায়ায় ছায়ায় ঘোরে। ফাঁক পাওয়ার আশা দুরাশা। ...আগের আমলে শুধু শোওয়াটাই একসঙ্গে ছিল, তা'ও যতটা সম্ভব সন্তর্পণে। আর এখনকার আমলে দিদি, খাওয়া শোওয়া ওঠা বসা চলাফেরা, বেড়নো সব্বু যুগলে।.....আদেখলে ছোঁড়ারা কেন যে আপিস যাবার সময়টুকুও বৌকে বগলদাবা করে নিয়ে যায় না তাই ভাবি। সেটুকু ফাঁক রেখে বোধহয়, বৌদের 'দিবেনিদ্রে'র জন্য। নইলে— শুনলে বিশ্বাস করবে, আমার ছেলে চুল ছাঁটতে গেলে, বৌ সঙ্গে সঙ্গে চললো সেলুনে। কেলাব লাইব্রেরী সিনেমা থিয়েটার আত্মজনের বাড়ি, সর্বত্র চলল কাছা ধরে।....কোথাও একলা ছাড়বে না। ছেলে তো 'মা' বলে ডেকে কাছে এসে বলতে ভুলেই গেছে!

এক নাগাড়ে এই শতখানেক শব্দযুক্ত আক্ষেপোক্তিটি করে নিঃশ্বাস নিলেন করুণাময়ীর পাঠবাড়ির বান্ধবী।

করুণাময়ী কিন্তু এ বিবৃতিতে সায় দেন না। বরং বলেন, 'আমার ছেলে বৌ কিন্তু অমন নয় ভাই।'

ছেলে বৌ বলতে অবশ্য করুণাময়ী তাঁর ছোট ছেলে বৌয়ের কথাই মেনে নিলেন। কিন্তু বান্ধবীটি কথায় হেরে—ছোট হয়ে যাবার পাত্রী নয়। তিনি সবেগে বলেন, 'রেখে দাও দিদি তোমার ছেলে বৌয়ের গুণগরিমা। বড় মেজ তো বুকের ওপর পাঁচিল তুলে বসে বসে গুণ দেখাচ্ছেন, আর এটিও কম নয়। তুমি দোষ ঢাকলে কি হবে, পাড়া-পড়শী তো আর কানা নয়?.ওইতো সবাই বলছিল, কাল তোমার ছেলে বৌ নাকি ওদের কেলাবের লাইব্রেরীতে গিয়েছিল, তার তোমার বৌ নাকি রাজ্যির ছেলেগুলোর সঙ্গে বাচালতা করছিল। তা' সাধ্যি আছে তোমার সেকথা তুলে বকতে, না সময় মিলছে ছেলেকে আড়ালে ডেকে অত আস্করা দিতে মানা করতে? হু! কিন্তু যাই বল ভাই, আমার বৌঝিরা কেউ আর এখন 'বৌটি' নেই বটে, তবে কেলাবে লাইব্রেরীতে কেউ যায়নি অদ্যাবধি।

এ অপমানে গুম্ হয়ে গেলেন করুণাময়ী, এ সংবাদে আহত। ভাব... বলতে হবে প্রভাতকে। তাঁর অবশ্য বান্ধবীর মত অবস্থা নয়। কারণ তাঁর ...

ঠিক শাস্ত্রসম্মত সাধ্বী-সতী নয়। সে অত ছায়ার মত বরের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে না। বরং একটু খামখেয়ালি মত। আছে তো আছে, নেই তো নেই। হয়তো বাগানেই ঘুরে বেড়ালো, হযতো পুকুরঘাটে গিয়েই বসে থাকলো, হয়তো ছাতেই উঠে গেল।

তবে পরিমলটা বড্ড আসতে শুরু করেছে। বয়সের ধর্ম আর কি! যেখানে রূপযৌবন, সেখানেই আকর্ষণ। বৌদিদি যে তোর থেকে পাঁচ সাত বছরের বড়, তাও হিসেব নেই। যাক, ছেলেকে বৌয়ের আওতার বাইরে পাওয়া করুণাময়ীর পক্ষে শক্ত নয়।

ভাবলেন সবই বলবেন।

বলবেন বলেই ছেলেকে খুঁজছিলেন, ছেলেই তাঁকে খুঁজে বার করল এসে। রুদ্ধ কণ্ঠে বলল—

'মা মল্লিকা কই?'

মায়ের সামনে এমন নাম করে উল্লেখ করে না প্রভাত, বলে, 'তোমার ছোটবৌ'। 'মল্লিকা' শুনে চমকে ছেলের মুখের দিকে তাকালেন করুণাময়ী। তারপর ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কেন? ঘরে নেই?'

'না তো।'

'ছাতে গিয়ে বসে আছে তাহলে।'

'না না, দেখেছি।'

'তা' অত অস্থির হচ্ছিস কেন? মেজ বৌমার ঘরে গিয়ে ঢুকেছে হয়তো।

'না মা, না। সব জায়গায়. খোঁজ করেছি।'

'শোন কথা। কর্পূর না কি যে, উড়ে যাবে। ঘাটে দেখেছিস?'

'ঘাটে! সন্ধ্যে পার হয়ে গেছে, এখন ঘাটে?'

'তা' আশ্চয্যি নেই, আজকাল ওই রকম খামখেয়ালীই হয়েছে। প্রথম প্রথম কী শান্ত, কী নরম, কী ভয় ভয় লজ্জা লজ্জা ভাব দেখালো, ক্রমেই যেন বিগড়ে যাচ্ছে, বদলে যাচ্ছে। তোমাদেরও যেমন আদিখ্যেতা হয়েছে আজকাল। সখ করে বৌকে রাজ্যির বেটাছেলের সঙ্গে মিশতে দেওয়া! আরে বাবা, ওতে বৌ ঝি 'বার চট্‌কা' হয়ে যায়। ঘরতালায় মনে বসে না। কাল তো শুনলাম—

কিন্তু কি শুনেছেন, সে কথা কাকে আর শোনাবেন করুণাময়ী?

শ্রোতা তো ততক্ষণে টর্চ হাতে ঘাটের পথে হাওয়া।

হ্যাঁ করুণাময়ীর অনুমানই ঠিক।

ঘাটের ধারেই বসে আছে মল্লিকা। কিন্তু একাই কি বসে ছিল? না টর্চের ক্ষণিক বিদ্যুৎ প্রভাতকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে?

'এমন সময় এখানে কেন?' এ প্রশ্ন না করে প্রভাত বলে ওঠে, 'এখানে কে ছিল?'

'এখানে?' হঠাৎ উদ্দাম একটা হাসিকে অদূরবর্তী বাঁশ বাগানের ঝোড়ো হাওয়ায় মিশিয়ে দেয় মল্লিকা।

'এখানে ভূত ছিল। তোমার পদশব্দে ভয় খেয়ে পালালো।'

প্রভাত বসে পড়ে বাঁধানো ঘাটের পৈঠেয়! বলে, 'এমন সময় এখানে কী।'

'মাছ ধরছি।'

'মাছ ধরছ?'

'হুঁ গো। দেখনা এই চার, ছিপ, এই বঁড়শি—

নাঃ একেবারে ছেলেমানুষ। কী যে ভাবছিল প্রভাত।

সহসা প্রভাতও হেসে ওঠে।

বলে, 'একটি বৃহৎ রোহিত মৎসের গলায় তো জন্মের শোধ বঁড়শি গিঁথেছ, আবার কেন?'

মল্লিকা আবার হেসে উঠে বলে, 'কে কার গলায় বঁড়শি গিঁথেছে, কে কাকে ছিপে তুলেছে, সেটা বিচার সাপেক্ষ। নইলে আর রাতের মাছ অসাবধানে খেয়ে গেছে বলে সন্ধ্যেবেলা মাছ ধরতে আসতে হয়?'

এই ব্যাপার!

ছি ছি!

লজ্জায় মাথা কাটা যায় প্রভাতের।

এমনি ছেলেমানুষ, আর এমন প্রেমে বিভোর স্ত্রীকে সে কিনা সন্দেহ করছিল? ভাবছিল বাড়িতে আসতে বারণ করেছে বলে পরিমলটা হয়তো পুকুরঘাটে এসে জুটেছে, আর সময়ের জ্ঞান ভুলে আড্ডা হচ্ছে। খেয়ালই নেই যে অফিস থেকে ফেরার সময় উৎরে গেছে প্রভাতের।

নাঃ। পাঁচজনের পাঁচকথায় মনটা বিগড়ে যায়। অফিস থেকে ফেরার পথে ফট করে এমন একটা কথা বলল মেজদা। তাই না ঘরে এসে বৌকে দেখতে না পেয়ে অমন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছিল প্রভাত।

কাকতালীয় ব্যাপার এইভাবেই ঘটে।

নইলে মল্লিকা যখন প্রভাতের খাওয়ার অসুবিধে নিরাকরণ করতে একটা বেপরোয়া ছেলেমানুষী করছে বসে, প্রভাত তখন এক তীব্র সন্দেহে নিজেকে জর্জরিত করছে।

না না।

এখানে কেউ ছিল না।

টর্চের আলোয় বিভ্রান্তি। গাছপালার ছায়া। বাঁশপাতার সরসরানি।

বড় অন্যায় হয়ে গেছে। মল্লিকা প্রভাতের মন জানতে না পারুক, প্রভাত তো নিজে জেনেছে। বোধকরি অপরাধ স্খালন করতেই আদরে ডুবিয়ে দেয় প্রভাত মল্লিকাকে।

কেড়ে রেখে দেয় ছিপ হুইল বঁড়শি। বলে, 'থাক্ আর মাছে কাজ নেই, খাবার জন্যে আরও ভাল জিনিস আছে।'

করুণাময়ী ছেলের দেরী দেখে উদ্বিগ্নচিত্তে পিছু পিছু আসছিলেন, লজ্জায় ঘেন্নায় গর গর করতে করতে ফিরে যান। ততক্ষণে একটু একটু জ্যোৎস্না উঠেছে, কাজেই দৃশ্যটা একেবারে অদৃশ্য নয়।

যে সন্ধ্যায় জ্যোৎস্না উঠেছিল সেই সন্ধ্যায় ঝড় উঠল।

কাঁচা আম ঝরানো তোলপাড় করা ঝড়।

হঠাৎ আচমকা।

জানালা দরজা আছড়ে পড়ে, দেওয়ালে টাঙানো ছবি দড়ি ছিঁড়ে পড়ে ঝনঝনিয়ে ভেঙে গুঁড়ো হয়। তারে শুকোতে দেওয়া কাপড় ফস করে উড়ে গিয়ে পাক খেতে খেতে কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেয় কে জানে।

দরজার মাথার তাকে সাজানো পুতুল পড়ল গড়িয়ে সাঙা থেকে লক্ষ্মীর ঝাঁপি কড়ির কৌটো ছিটকে ধুলোয় লুটালো।

আমবাগান আর বাঁশবাগানে চলতে লাগলো যেন ক্ষ্যাপা অসুরের রাগী লড়াই।

এ ঝড়ের মধ্যে বুঝি সেই দূর অরণ্যের আছড়ানি, দূর সীমান্তের হাতছানি। এ ঝড়ে অনেক দূরের রোমাঞ্চ আর অনেক দিনের ভুলে যাওয়া মদের স্বাদ।

জানালাগুলো সব খুলে দেয় মল্লিকা।

প্রভাতের ঘুম ভাঙল। প্রথমটা জাগেনি, হঠাৎ ছবি পড়ার শব্দে ঘুম ভাঙল।

চমকে উঠে বসে বলল, 'কী সর্বনাশ! ও কি? জানালা খোলা কেন! বন্ধ করো, বন্ধ করো।'

ঝড়ের শব্দে ওর কথার শব্দ ডুবে গেল।

ধড়মড়িয়ে. বিছানা থেকে নেমে এল প্রভাত।

দেখল দুরন্তবেগে মল্লিকার চুল উড়ছে, আঁচল উড়ছে, মল্লিকা জানালার শিখ চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছে, মুখে মাথায় সেই ঝড় খাচ্ছে।

'কী হচ্ছে? তুমি কি পাগলা হয়ে গেলে?

মল্লিকা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হল না।

প্রভাত দাঁড়াতে পারছিল না এই উত্তালের মুখে, তবু দাঁড়িয়ে ওর হাত ধরল, ছাড়িয়ে নিতে গেল শিখ থেকে কপাট বন্ধ করবে বলে। কিন্তু বড় দৃঢ়মুষ্টি মল্লিকার।

'মল্লিকা, এ কী সখ? চোখে মুখে ধুলো ঢুকে মারা যাবে যে! নিজে ধুলোর ভয়ে চোখ বুজে মাথা নীচু করে বলে প্রভাত, 'দোহাই তোমার, জানালার কাছ থেকে সরে এস।'

সহসা ঘুরে দাঁড়ায় মল্লিকা।

কঠিন গলায় বলে, না।

'না।'

'হ্যাঁ। হ্যাঁ। তুমি যাও। অন্য ঘরে চলে যাও। জানালা·দরজা বন্ধ করে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোও গে। নয়তো মার আঁচল তলায়! সেই—তোমার উপযুক্ত ঠাঁই।'

'মল্লিকা।'

মল্লিকা আবার ফিরে দাঁড়িয়েছে বাইরের দিকে মুখ করে। বন্যপশুর আর্তনাদের মত একটা শোঁ শোঁ আওয়াজ আসছে দেয়ালে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে, প্রভাত দাঁড়াতে পারছে না।

প্রভাত দাঁড়াতে পারে না।

তবু ব্যাকুলতা প্রকাশ করে। বলে, 'মল্লিকা, অসুখ করবে।.....মল্লিকা, বাইরে থেকে কিছু ছিটকে এসে চোখে মুখে লেগে বিপদ ঘটবে!'

মল্লিকা নিরুত্তর।

আর পারে না প্রভাত।

বেশ যা খুশি কর।'

বলে সত্যিই পাশের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে।

ভাবে, আশ্চর্য! অদ্ভুত!

এক এক সময় কী যে হয় ওর!

ওদের বংশে কেউ কি পাগল ছিল? শরীরে সেই রক্ত কণিকা বহন করে রয়েছে বলেই মাঝে মাঝে উন্মত্ততা জাগে ওর?

কখন যে ঝড় কমেছে, কখন যে তার আর্তনাদ থেমেছে, খুব স্পষ্ট মনে নেই প্রভাতের, শুধু মনে আছে অনেকক্ষণ ঘুম আসে নি। আর একবার ওঘরে গিয়ে চেষ্টা করেছিল মল্লিকাকে জানালা থেকে সরাতে। পারেনি।

ঘুম ভাঙল প্রভাতের অনেক বেলায়।

তাড়াতাড়ি এঘর থেকে শোবার ঘরে গিয়ে দেখল, ঘর খালি। দেখে নীচে নেমে এল। আর নেমে এসে যে দৃশ্য দেখল তা'তে হাসবে না কাঁদবে ভেবে পেল না।

নীচের দালানে বড় একটা ধামা ভর্তি ঝড়ে পড়া কাঁচা আম, করুণাময়ী তার থেকে বেছে বেছে এগিয়ে দিচ্ছেন, আর মল্লিকা সেগুলো নিয়ে দ্রুত হস্তে ছাড়াচ্ছে।

এ কী কাল রাত্রের সেই মল্লিকা?

মল্লিকা কি বহুরূপী?

নাকি মাঝে মাঝে মল্লিকার উপর ভূতের ভর হয়?

কিন্তু মা সামনে, তাই সম্বোধনটা মল্লিকাকে করা চলে না, আবেগ আবেগ গলায় মাকেই বলে, 'মা, কাল সেই ভয়ঙ্কর ঝড়ের মধ্যে তুমি বাগানে নেমেছিলে?'

আমের সঞ্চয়ে পুষ্ট এবং বাহাদুরিতে হৃষ্ট করুণাময়ী হেসে বলেন, 'না নামলে, ঝড় থামার অপেক্ষায় থাকলে একটা আম চোখে দেখতে পেতাম? রাজ্যের ছোঁড়াছুঁড়ি এসে বাগানে ঝেঁটিয়ে নিয়ে চলে যেত না?'

'সে তো বুঝলাম। কিন্তু গেলে কি করে?'

'কি করে আবার?' যেমন করে ফি বছর যাই। তোর বৌদিরা তো আবার এদিকে অহঙ্কারের রাজা, ঠেকায় করে একটা আম নেয় না, এদিকে তোর বড়দা মেজদার স্বভাব তো জানিস। আচার নইলে ভাত মুখে রোচে না। তা' এই কাঁচা আমের সময়—

প্রভাত হেসে ওঠে।

'এদিকে তো বড় মেজ পুত্তুরের সাত শো নিন্দে না করে জল খাও না, অথচ তাদের মুখরুচির দায়ে প্রাণের ভয় তুচ্ছ করে রাত দুপুরে ঝড়ের মুখে ছোটো আম কুড়োতে। তাজ্জব।

করুণাময়ীর মন আজ প্রসন্ন। তা এ কথায় অভিযোগ অভিমানের দিক দিয়ে না গিয়ে হেসে বলেন, 'তা' তাজ্জব বটে। বুঝবি এরপর এর মানে। আগে ছেলের বাপ হ।'

প্রভাত লজ্জায় লাল হয়।

গোপন কটাক্ষে একবার মল্লিকার মুখের দিকে তাকায়। কিন্তু সে মুখে কোনও বর্ণ বৈচিত্রের খেলা দেখতে পায় না। সে যেমন আনত মুখে হাত চালাচ্ছিল তেমনি চালাতেই থাকে।

অনেকক্ষণ পরে অন্তরালে দেখা হয়।

আস্তে বলে, 'রাতের ভূত ঘাড় থেকে নেমেছে?'

মল্লিকাও আস্তে উত্তর দেয়।

কিন্তু সে মৃদুতার মধ্যে যেন অনেক যোজন দূরত্ব। মজবুত ইস্পাতের কাঠিন্য।

'ভূত কি ঘাড় থেকে সহজে নামে?'

প্রভাত এই দূরত্বের কাছে একটু যেন অসহায়তা বোধ করে, তাই জোর করে সহজ হতে চায়। বলে, তুমি তো দেখি ইচ্ছে করলেই ভূতকে ঘাড়ে তুলতে পারো, ঘাড় থেকে নামাতেও পারো। সত্যি, মাঝে মাঝে কী যে হয় তোমার!'

'কী হয়, সে সম্বন্ধে কি মনে হয় তোমার?'

'কী মনে হয়, আসলে জানো? তুমি বড্ড বেশি সিরিয়াস। জীবনটাকে অত ভারী ভাবার দরকারই বা কি? ইচ্ছে করলেই তো হালকা করে নেওয়া যায়, সহজ করে নেওয়া যায়।'

'সবাইয়ের পক্ষে হয় তো তা' যায় না।'

'ওটা ভুল, হালকা হবো ভাবলেই হালকা হলাম, এর আর কি! চলো আজ সন্ধ্যায় কোথাও একটু বেড়িয়ে আসা যাক। একঘেয়ে বাড়ি বসে থেকে থেকে—'

মল্লিকা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের স্বরে বলে, বেড়াতে! কোথায়! হাওড়া-ময়দানে!'

'হাওড়া ময়দানে!'

'তা' ছাড়া আর কোথায়! লোকালয়ে গেলেই তো নিন্দে। সেদিন একটু লাইব্রেরীতে গিয়েই—'

প্রভাত একথা বলতে পারে না, 'তোমার আচরণে যে কেমন একটা ব্যালেন্সের অভাব মল্লিকা, তাইতো নিন্দে হয়। সেদিন লাইব্রেরীতে তুমি যে কী অদ্ভুত মাত্র ছাড়া বাচালতা করলে!' বলতে পারে না। শুধু বলে, 'আমাদের এই জায়গাটা কলকাতা শহরের প্রবেশপথ হলে কি হবে, বড্ড বেশি ব্যাকওয়ার্ড যে! একটুতেই নানা কথা। কথার সৃষ্টি করে লাভ কি বল। তার চেয়ে সবাই যা করে তাই করাই ভাল নয় কি।'

'সবাই যা করে।' মল্লিকা নির্নিমেষ নেত্রে তাকিয়ে বলে, সেটা কি।

'ধর সিনেমা গেলাম। ওতে আর কেউ নিন্দে করতে আসবে না। নিজেরা তিনবেলা দেখছে সবাই।'

সিনেমা! 'ওঃ!'

'কেন পছন্দ হ'ল না!'

'পছন্দ।' হঠাৎ হেসে ওঠে মল্লিকা। যেমন হঠাৎ হাসিতে মাঝে মাঝে চমকে দেয় প্রভাতকে—তেমনি চমকে দেওয়া হাসি। হেসে বলে, 'সে কী! পছন্দ হবে না কি বল। বরের সঙ্গে সেজেগুজে সিনেমা যাবো, এর থেকে পাছন্দসই আর কি আছে।'

'তাহলে রাজী?'

'নিশ্চয়।'

'একেবারে টিকিট কেটে নিয়ে আসবো তাহলে? আর যতটা সম্ভব সকাল সকাল আসবো। তুমি কিন্তু একেবারে ঠিক হয়ে থেকো! ওই যা বললে—সেজে-গুজে—' একটু থেমে বলে, 'মাকে একটু তাক্ বুঝে, মানে আর কি মুড্ বুঝে জানিয়ে রেখো কেমন।'

'সেটা তুমিই রেখে যাও না।'

'আমি? আচ্ছা আমিই বলে যাবো।' বলে বটে, তবে এই ভাবতে ভাবতে চান করতে যায়, মার মুডটা পাবো তো? পেতেই হবে। রান্নার সুখ্যাতি করতে হবে প্রথমে, তারপর একটু ভাত চেয়ে দিয়ে খেতে হবে। তাহলেই—

ছোট সুখ, ছোট ভাবনা।

নিতান্ত তুচ্ছতা দিয়ে ভরা বাংলার তেলেজলে কাদার মাটিতে গড়া অতি সাধারণ প্রভাত গোস্বামী।

আশ্চর্য যে এই প্রভাত গোস্বামীই সেই হাজার মাইল দূরের দুর্ধর্ষ বাঘের গুহা থেকে তার মুখের গ্রাস চুরি করে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল।

কি করে পেরেছিল?

জল হাওয়া পরিবেশ পরিস্থিতি, এরাই কি মানুষকে ভাঙে গড়ে? আসলে মানুষের নিজস্ব কোনও আকার নেই। মাটি আর হাওয়া তাকে বীর করে, কাপুরুষ করে, ভীরু করে, বেপরোয়া করে?

কিন্তু তাই কি?

যাই হোক আপাততঃ আজকে প্রভাত খুব একখানা সাহসী পুরুষের ভূমিকায় অভিনয় করল। মাকে সোজাসুজি বলল, মা ওবেলা একটু সকাল সকাল আসবো। সিনেমা যাবো।

করুণাময়ী অবশ্য এ সংবাদে প্রীত হলেন না। বিরসকণ্ঠে বলেন, 'সিনেমা? এই তো কবে যেন গেলি!'

'আরে সে তো কতদিন!'

'তা বেশ যাবে যাও। রাত করে ফেরা, বৌকে নিয়ে একটু সাবধানে ফিরো। দিন কাল খারাপ।'

'কী মুস্কিল! দিনকালের আবার কি হলো।'

'হল নাই বা কেন। এই তো মেজবৌমা কাল বলছিল, দুপুরের ফাঁকে নাকি একটা সা-জোয়ান মত লোক আমাদের আম বাগানের ওদিকে ঘোরাঘুরি করছিল।'

'করছিল! অমনি! তোমার ওই মেজবৌমাটি হচ্ছেন এক নম্বরের গুজব সম্রাজ্ঞী।'

'না না। ও বলল স্পষ্ট দেখেছে। বলল তার নাকি ভাব-ভঙ্গী ভল নয়।'

প্রভাত হেসে উঠে বলে, 'অতিরিক্ত রহস্য সিরিজ পড়লেই এইসব দিবাস্বপ্ন দেখে লোকে। রাস্তা দিয়ে একটা লোক হেঁটে গেল, উনি তার ভাবভঙ্গী অনুধাবন করে ফেললেন। যতো—সব!'

মেজবৌদির কথাকে চিরদিনই উড়িয়ে দেয় প্রভাত, আজও দিল।

তবে কিছুদিন আগে হলে হয়তো দিত না, দিতে পারত না। যখন সদাসর্বদা ভয়ঙ্কর একটা আতঙ্ক হয়ে উঠেছিল তার ছায়াসঙ্গী।

মল্লিকাকে নিয়ে আসার পর থেকে অনেকদিন পর্যন্ত এমন ছিল। তখন

মেজবৌদি এমন সংবাদ পরিবেশন করলে হয়তো হেসে ওড়াতে পারত না প্রভাত। ভয়ে সিটিয়ে উঠত।

চাটুয্যে এসে দেখা-সাক্ষাৎ করে যাবার পর থেকে সেই ভয়টা দূর হয়েছে প্রভাতের। আতঙ্ক আর তার ছায়াসঙ্গী নেই। বুঝেছে চাটুয্যে দ্বারা আর কোন অনিষ্ট হবার আশঙ্কা নেই তাদের। মল্লিকার সুখ সৌভাগ্য দেখে মন পরিবর্তিত হয়ে গেছে তার মামার। স্নেহের কাছে স্বার্থ পরাস্ত হয়েছে।

অতএব আবার পুরানো অভ্যাসে মেজবৌদির বৃথা ভয় দেখানোকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলে। মা যে ততটা ভুরু কোঁচকান নি, এতেই খুশির জোয়ার বয় মাতৃগতপ্রাণ প্রভাতের। দাদাদের আর বৌদিদের দুর্ব্যবহারে বিক্ষত মাতৃহৃদয়ে, সদ্ব্যবহারের প্রলেপ লাগাবার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছে প্রভাত সেই কবে থেকে। তাই না মাকে এত মেনে চলা।

হুট করে মল্লিকাকে নিয়ে আসায় তাতে একটা ছন্দপতন হয়েছিল বটে, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছেয় আর প্রভাতের আপ্রাণ চেষ্টায় সে ছন্দ স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছিল অবশেষে।

করুণাময়ী ঈষৎ অসন্তুষ্ট স্বরে বলেন, 'সে যাইহোক সাবধানের মার নেই।'

'আচ্ছা বাপু আচ্ছা, যতটা পারবো সাবধান হবো।'

অফিস বেরিয়ে পড়ে প্রভাত।

ছোটবৌমা খানিক পরেই গঙ্গাস্নান ফেবৎ আসেন করুণাময়ী একটু যেন হন্তদন্ত হয়ে। ডাক দেন 'ছোটবৌমা'!

মল্লিকা দোতলা থেকে নেমে আসে।

করুণাময়ী ব্যস্তভাবে বলেন, 'নীচের তলায় বাগানের দিকের ঘরে ছিলে তুমি।'

মল্লিকা নির্লিপ্তভাবে বলে, 'কই না তো। এই তো নামলাম ওপর থেকে। কেন?'

'বাঁশঝাড়ের ওদিক থেকে হঠাৎ মনে হল কে যেন ওই ঘরের জানলার নীচ থেকে সরে গেল। কাল মেজবৌমাও বলছিল। দেখ দিকি ঘরের কোনও জিনিস খোয়া গেছে কিনা। আমাদের পাঠবাড়ির গিন্নীর তো সেদিন জানলা দিয়ে এক আলনা কাপড় চুরি গেল। যেমন বুদ্ধি, জানলার কাছে আলনা। আঁকশি দিয়ে দিয়ে বার করে নিয়ে গেছে। তোমার এ ঘরে—'

'না নীচের ঘরে তো আমার কিছু থাকে না।'

কথাটা ঠিক। কোন কিছুই থাকে না ও ঘরে। নেহাৎ সংসারে বাড়তি 'ডেয়োঢাকনা' বোঝাই থাকে। জানলা দিয়ে আঁকশি চালিয়ে বার করে নিয়ে যাবার মাল সে সব নয়।

তত্রাচ করুণাময়ী একবার সে ঘরে ঢোকেন, পুঙ্খানুপুঙ্খ তল্লাস করেন। জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে বলেন, 'সন্দেহ হচ্ছে কোনও চোর ছ্যাঁচোড় তক্কে তক্কে ফিরছে। কাল মেজবৌমার কথায় কান দিইনি, আজ প্রভাতও সে কথা হেসে ওড়ালো, কিন্তু এ আমার নিজের চোখ। অবিশ্বাস করতে পারি না। কেমন যেন হিন্দুস্থানী মতন একটা লোক—'

মল্লিকা কিন্তু করুণাময়ীর বকবকানিতে কান করে না। নির্দিষ্ট নিয়মে ওঁর হাত থেকে গঙ্গাজলের ঘটি আর ভিজে কাপড় গামছা নেয়। বলে, 'আপনার উনুনে আগুন দিই?'

'দিও দিও। আগে একটু ঠাণ্ডা হয়ে নিই। ভারী তো রান্না, আপনার একলার আবার রান্না। একপাক ফুটিয়ে নেব।'

কথাটা অবশ্য তেমন সমূলক নয়।

একলার জন্যে সাতখানি রাঁধেন করুণাময়ী। যদিও ছুতোটা করেন 'প্রভাত আমায় ভালবাসে।' টুকটুক্ করে রাখেনও সে সব প্রভাতের জন্য গুছিয়ে।

রাত্রে প্রভাতকে খেতেই হয়, সেই সুক্ত, পোস্তর বড়া, মোচা ছেঁচকি, কচুর শাকের ঘণ্ট।

হ্যাঁ, এমনিই সব পাঁচখানা রাঁধবেন এখন করুণাময়ী। আর মল্লিকাকে বসে থাকতে হবে তার জোগাড় দিতে। গঙ্গাস্নানে যাবার আগে মল্লিকাকে খাইয়ে আমিষ হেঁসেলের পাট চুকিয়ে যান করুণাময়ী। তিনি নিজে যখন খান, তখন জলখাবারের সময় হয়ে যায় মল্লিকার। করুণাময়ীর খুব ইচ্ছে হয় আর একদফা ভাতই খাক ছোট বৌ, শাশুড়ীর অনবদ্য অবদান দিয়ে, কিন্তু ভাত খেতে চায় না বৌটা। একবেলাই খেতে নারাজ তা' দু'বেলা। পশ্চিমে মানুষ তো, মোটা মোটা রুটি গিলে মরেছে চিরকাল।

রান্নার জায়গায় দৃষ্টিপাত করে করুণাময়ী বলে উঠেন, 'মেতির শাক কটা রেখে গিয়েছিলাম, কই বেছে রাখনি ছোট বৌমা?'

'শাক!'

মল্লিকা যেন ভেবে মনে আনতে চেষ্টা করে শাক বস্তুটা কি। যাত্রাকালে কি যেন একটা বলে গিয়েছিলেন করুণাময়ী, সে কি ওই শাকের কথা?

কিন্তু না, বলে গিয়েছিলেন করুণাময়ী অন্য কথা। শাকটা রেখেছিলেন ছোট বৌমার বিবেচনাধীনে। যার বিষয়ে বলে গিয়েছিলেন তার দিকে নজর পড়তেই শিউরে ওঠেন, 'কি সর্বনাশ! সেই কাঁচা আমের ঝুড়ি ছায়ায় পড়ে আছে? রোদের দিকে টেনে দাওনি ছোটবৌমা? ছি ছি! মন তোমাদের কোন্ দিকে থাকে বাছা? অত করে বলে গেলাম।'

নিজেই হিঁচড়ে টেনে আনেন তিনি ঝুড়িটা।

মল্লিকার মনে পড়ে এই কথাটাই বলে গিয়েছিলেন করুণাময়ী। কিন্তু মল্লিকার চিন্তাজগতে কাঁচা আমের ঝুড়ির ঠাঁই কোথায়? করুণাময়ী সেই কথাই বলেন।

বলেন, 'তোমার তো সবই ভাস ছোটবৌমা, এই ভুলটাই একটা রোগ। মাথাটা পরিষ্কার রাখার চেষ্টা কর দিকি!'

মল্লিকা উঠোনে এসে পড়া ভরদুপুরের প্রখর রৌদ্রের দিকে তাকিয়ে শান্তস্বরে বলে, 'করবো।'

করুণাময়ী বলেন, 'হ্যাঁ তাই বলছি। সন্ধ্যেবেলায় সিনেমা না থিয়েটার কোথায় যেন যাবে শুনলাম। তা' আমি তো তখন পাঠবাড়িতে যাবো। দোর জানালা সব ভাল করে বন্ধ করে সদরে তালা লাগিয়ে চাবিটা 'ও বাড়ি' রেখে যেও। আমিই যদি আগে আসি। ভাল করে মনে রেখো, কি জানি তখন কোন্ মতলবে ঘুরছিল লোকটা। এই যে তোমরা সন্ধ্যেবেলা বাড়ি থাকবে না, জেনেছে হয়তো কোন্ ফাঁকে। তালায় চাবিটা লাগিয়ে তালা টেনে দেখে, তবে বেরিয়ো।'

সাবধানের ক্রটি করেন না করুণাময়ী। তাঁর জানার জগতে যে সব সাবধানতা আছে, তার পদ্ধতি শিক্ষা দেন তাঁর অবোধ ছোট বৌকে।

কিন্তু দরজা কি শুধু ঘরেই থাকে?

আর সে দরজার চাবি লাগাতে পারলেই সমস্ত নিরাপদ?

প্রভাত আসছিল ভারী খুশি খুশি মনে।

আজ একটা সুখবর পাওয়া গেছে অফিসে। বেশ কিছু মাইনে বেড়েছে।

ভাবতে ভাবতে আসছিল, বাড়ি গিয়ে মল্লিকাকে বলবে, 'রাতে আজ খুব ভাল করে সাজতে হবে তোমায় মল্লিকা। সেই তোমার ফুলশয্যার শাড়িটা পরবে, খোঁপায় জড়াবে রজনীগন্ধার মালা, কপালে চন্দনের লেখা। তোমায় দেখব বসে বসে।

কিন্তু বাড়ি এসে সে কথা বলবার আর ফুরসৎই পেলেনা বেচারা প্রভাত গোস্বামী। ওই সৌখিন কবিত্বটুকু ফলাবার আগেই চোখ ঝলসে গেল তার।

অপরূপ সাজসজ্জায় ঝলমলিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল মল্লিকা।

পরনে পাতলা জরিদার শাড়ি। রজনীগন্ধার মালা জড়ানো শিথিল কবরী নয়, সাপিনীর মত কালো চকচকে জরি জড়ানো লম্বা বেণী।

ঠোঁটে গাঢ় রক্তিমা, নখে রঙের পালিশ। গালেও বুঝি একটু কৃত্রিম রঙের ছোঁয়াচ। সুর্মাটানা চোখে কেমন একটু বিল্লোল কটাক্ষ হেনে বলে, 'কেমন দেখাচ্ছে?

খুব কি ভাল লাগে প্রভাতের? লাগে না। তবু—

প্রভাত হাসে, আর বলে, 'বড্ড বেশি রূপসী। একটু যেন ভয় ভয় করছে।'

'ভয়!'

'তাই তো! পথে নিয়ে বেরোতে সাহস হচ্ছে না!'

কিন্তু প্রভাতের সেই তুচ্ছ কৌতুকের কথাটুকু কি কোনও ক্রুর ভাগ্যদেবতাকে নিষ্ঠুর কৌতুকের প্রেরণা দিল। তাই ভয় এলো ভয়ঙ্কর মূর্তিতে! লুটে নিয়ে গেল প্রভাতের জীবনের রং, ঈশ্বরের বিশ্বাস, পৃথিবীর প্রতি ভালবাসা।

সিনেমা হল থেকে প্রভাতের বাড়ি ফিরতে এই পথটা একটু গা ছমছমে বটে। এরই আশেপাশে নাকি হাওড়ার বিখ্যাত গুণ্ডা পাড়া।

কিন্তু সন্ধ্যার শো'তে সিনেমা দেখে তো আগেও ফিরেছে প্রভাত আর প্রভাতের পাড়ার লোকেরা।

দুদিন আগেও লাস্ট শোয় ছবি দেখে এসেছে প্রভাতের মেজদা মেজবৌদি—

তবু পাড়ার লোক আর জ্ঞাতিগুষ্ঠি ধিক্কার আর ব্যঙ্গের স্রোত বহালো।

'হবেই তো! সুন্দরী রূপসী বৌকে সঙ্গে করে রাত নটায় গুণ্ডাপাড়া দিয়ে ছি ছি, এত কায়দাও হয়েছে একালের ছেলেদের!...হলো তো, বৌকে চিলে ছোঁ মেরে নিয়ে চলে গেল, ভ্যাকা হয়ে দেখলি তো দাঁড়িয়ে।....' হ্যাঁ, তবু রক্ষে যে তোকে খুন করে রাস্তায় শুইয়ে রেখে যায়নি।.....

আবার একথাও বললো, 'পাড়া কি এত নিশুতি হয়ে গিয়েছিল সত্যি, যে অতবড় কাণ্ডটা কারুর চোখে পড়লো না, অতখানি চেঁচামেচি কারুর কানে গেল না। ভয়ানক একটা চেঁচামেচি ধস্তাধ্বস্তি তো হয়েছে নিশ্চয়ই।'

চেঁচামেচি, ধ্বস্তাধ্বস্তি!

হ্যাঁ, পুলিসকে তাই বলতে হয়েছে বৈকি।

বলতে হয়েছে একসঙ্গে চার পাঁচজন গুণ্ডা ঝাঁপিয়ে পড়ে—

কিন্তু প্রভাত তো জানে একটাই মাত্র লোক। যে লোকটা একখানা ছোট গাড়ি নিয়ে পথের একধারে চুপ করে বসেছিল চালকের আসনে, গাড়ির দরজা খুলে। স্পষ্ট সাদা চোখে দেখেছে প্রভাত, সেই খোলা দরজা দিয়ে ঝপ করে ঢুকে পড়েছে ঝলমলে ঝকঝকে, চোখে সুর্মা টানা মল্লিকা।

আর প্রভাত?

প্রভাত তো তখন রাস্তার ওপারে পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে রঙিন মশলা দিয়ে মিঠে পান সাজাচ্ছিল। হঠাৎ যে মল্লিকার রঙিন মশলা দেওয়া মিঠে পান খাবার ইচ্ছে হয়েছিল।

তাই তো প্রভাতকে ঠেলে পাঠিয়েছিল রাস্তার ওপারে পানের দোকানে। বলেছিল 'আমি দাঁড়াচ্ছি। দেরী করবে না।'

দেরী কি করেছিল প্রভাত? বড্ড বেশি দেরী? তাই ধৈর্য হারিয়েছিল মল্লিকা?

গাড়ির নম্বর?

না, সে আর দেখবার অবকাশ হয়নি প্রভাতের। রাস্তা পার হবার আগেই হুস করে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল গাড়িটা, দরজা বন্ধ করার রূঢ় একটা শব্দ তুলে। যে শব্দটা অবিরত ধ্বনিত হচ্ছে প্রভাতের কানে। গাড়ির পিছনে বৃথা ছুটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়েছিল। কিন্তু চালকের মুখটা দেখা হয়ে গিয়েছিল তার পাশের দোকানের আলোতে।

চিনতে পেরেছিল বৈকি!

ওর সঙ্গে কতগুলো দিন একই জীপের মধ্যে গায়ে গায়ে বসে কত মাইল রাস্তা পাড়ি দিয়েছে প্রভাত।

বৌ হারিয়ে চুপ করে বসে থাকা যায় না।

পুলিশ কেস করতে হচ্ছে।

হাওড়া অঞ্চলের অনেক গুণ্ডাকেই দেখতে যেতে হচ্ছে প্রভাতকে সনাক্ত করতে। কিন্তু কই? সেই চার পাঁচটা লোককে তো—নাঃ। তাদের বার করতে পারছে না পুলিশ।

হাওড়া অঞ্চলে দুর্বৃত্তের অত্যাচারের একটা খবর খবরের কাগজেও ঠাঁই পেয়েছে কোন একটা তারিখে। তা, ও আর আজকাল কেউ তাকিয়ে দেখে না।

দেখেও নি।

কেউ লক্ষ্য করেনি।

কে কত লক্ষ্য করে?

নইলে প্রভাতের বাড়ির পিছনের বাগানের মধ্যেকার ওই সর্টকাটটা ধরে তো পাড়ার কত লোকই বাস রাস্তায় যাওয়া আসা করে, কেউ তো তাকিয়ে দেখেনি ঘাসের জঙ্গলের মধ্যে ছেঁড়া চুলের নুড়ো, এঁটো শালপাতার ঠোঙা, আর বাজে কাগজের কুচোর গাদায় চার ইঞ্চি লম্বা চওড়া ওই কাগজের টুকরোটুকু পড়ে আছে কত বড় ভয়ঙ্কর একটা সাক্ষ প্রমাণ নিয়ে।

তা' তারা দেখলেই কি ধরতে পারতো, কতখানি ভয়ঙ্করতা লুকিয়ে আছে ওই কাগজটুকুর মধ্যে।

পারতো না।

কী করে পারবে।

চিঠি নয়, দলিল নয়, শুধু দুটি বাক্য। নির্ভুল বানানে পরিষ্কার ছাঁদে লেখা। বাংলা নয়, ইংরেজি অক্ষরে। তা' হোক, চিনতে ভুল হয় না প্রভাতের। এই এতগুলো দিনের মধ্যে মল্লিকার হাতের লেখা তো কতই দেখতে হয়েছে প্রভাতকে। বাংলা, ইংরিজি সবই। 'হাওড়া টকী' 'ইভনিং শো'। এই ছোট্ট দুটি কথাই তাই যথেষ্ট।

—০—

যোগ বিয়োগ

— এক —

বাড়ীখানা যখন তৈরি হয়েছিলো এ অঞ্চলটা ছিলো নতুন, কদাচিৎ এখানে ওখানে দু'একটা বাড়ী উঠেছিলো। এখন নতুন রাস্তায় বিস্তর বাড়ী উঠেছে, তবু মোড়ের মাথায় রায়বাহাদুর যামিনীমোহন রায়ের নামাঙ্কিত ফলক আঁটা এই বিরাট বাড়ীখানা যেন সকলের মাঝখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

পথচারী পথিক যদি কিছু ভাবুক হয়, চলতে চলতে ভাববে বাড়ীটার দাঁড়ানোর ভঙ্গীটা কেমন যেন উদ্ধত।

সে একদিন।

সেদিন সময়টা বিকেল, বাতাস উঠেছে জোরে, দোতালার বড়ো বারান্দায় গুটি তিন চার ছোট ছেলেমেয়ে মহোৎসাহে সাবানের ফানুস ওড়াচ্ছিলো। অবশ্য একটি দলপতিও তাদের ছিলো, সেটি কিন্তু বালক নয়। রীতিমত বলিষ্ঠ শ্যামবর্ণ যুবক। তার হাতেই সাবানজলের পাত্র। যদিও ছোট ছেলেরাই উপলক্ষ্য, কিন্তু এই যুবক শিশুটির উৎসাহ সকলের চাইতে বেশী।

সৈন্যদলে সেনাপতির মতোই বোধ করি সে নির্দেশের দ্বারা আপন উৎসাহ ওদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চাইছে।

—হচ্ছে না—হচ্ছে না, রুণুর হচ্ছে না। আরে ছিঃ ছিঃ! এ-ই দেবু পেরেছে। বা বা, এ যে রীতিমত একটি ফুটবল রে! আরে আরে দেখু, আর বাড়াসনে, ফেটে যাবে। ফুটবল 'ফুট' হয়ে যাবে একেবারে।....ওই যাঃ, হ'লো তো? নাও আরও বাড়াও? চাঁদু—ফের লাফালাফি করছো? অমন করলে দেবোনা সাবান জল।

যুবকটির কথার ফাঁকে ফাঁকে ছোটদের টুকরো কথা শোনা যায়...'গোবিন্দকা, দেখো দাদা আমারটা ফাটিয়ে দিলো।' 'ও গোবিন্দকা, আমার নলটা মুচড়ে গেছে, আর একটা করে দাও।'

অতএব বোঝা যাচ্ছে যুবকটির নাম গোবিন্দ।

বাতাস উঠেছে জোরে।

বারান্দার ভিতর দিকে ঘরের দরজার দামী পর্দাগুলো ওজন হারিয়ে দুলছে এদিক ওদিক।

এদের উচ্ছ্বসিত কোলাহলের মধ্যে একখানা পর্দা সরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন বাড়ীর কর্তা।

রায়বাহাদুর যামিনীমোহন রায়।

দীর্ঘ সম্ভ্রান্ত চেহারা, বছর পঞ্চাশ-ছাপান্ন বয়েস, গম্ভীর মুখে প্রসন্নতার আভাস। বেশভূষা চলন বলন সব কিছুতেই একটা বলিষ্ঠ আভিজাত্যের ছাপ।

গম্ভীর কণ্ঠস্বরে কৌতুকের স্বর বাজে—কি হচ্ছে তোমাদের?

গোবিন্দ চমকে ওঠে।

মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়ে লজ্জার ভানে ঈষৎ জিভ কেটে হাতের বাটিটা নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি বারান্দার ওপাশে রক্ষিত আরাম কেদারাকে টেনে মাঝখানে এনে বলে—মামা বোসো।

যামিনীমোহন বসেন না।

বিশেষ গ্রাহ্যও করেন না ওকে।

দাঁড়িয়েই নাতি-নাতনীদের আনন্দ উৎসব দেখতে থাকেন।

চাঁদু বলে ওঠে—দেখছো দাদু, দাদাটা কী বোকা। ফানুষগুলো যতো ইচ্ছে বাড়াচ্ছে। তাই তো না, ফেটে যাচ্ছে।

যামিনীমোহন সহাস্যে বললেন—একা দাদা কেন; দুনিয়ার অনেক লোকই তোর দাদার মতন বোকা বুঝলি? তোদের এই বুড়ো দাদুটাই বা তার চাইতে এমন বেশী কি চালাক? ফানুসকে যতো ইচ্ছে বাড়ালে যে ফেটে যায় সে বুদ্ধি আর হ'লো কই?

ছোট্ট মণি এগিয়ে এসে আবদার করে বলে—দাদু, তুমি একটা ফানুস ওড়াও না! ও দাদু—

যামিনীমোহন নাতনীর মাথায় একটু আদরের চাপড় মেরে বলেন—ফানুস? দূর, আমি কি ওড়াতে পারি! আচ্ছা বোস, আমি বরং ঘুড়ি ওড়াই। ট্রাউজারের পকেট থেকে বার করেন এক গোছা খুচরো নোট, দুটাকার.....পাঁচ টাকার.....এক টাকার।

—এই দেখো আমার ঘুড়ি। যে যেটা ধরে ফেলতে পারবে সেটা তা'র।

*　　　*　　　*　　　*

গোছা সুদ্ধ নোটকে হাওয়ার মুখে উঁচু করে ধরে হাত থেকে ছেড়ে দেন যামিনীমোহন। জোর বাতাস লেগে ফরফর উড়ে বেড়ায় নোটগুলো।

অলক্ষ্যে দু'খানা হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে খানিকটা দূরে গিয়ে ফুটপাথে নেমে পড়ে।

এদিকে বেদম হৈ চৈ সুরু করেছে দেবু, রণু, চাঁদু, মমিরা।—মজার ঘুড়ি....মজার ঘুড়ি! দাদু হরির লুট দিচ্ছেন রে!.....ই.....এই ওটা আমার, আমার হাতেই আগে ঠেকেছিলো!

ধরবার জন্যে প্রচণ্ড লাফালাফি করতে থাকে ছেলেরা।

এ হেন হরির লুট দেখলে বড়োরাই লাফঝাঁপ করতে চায়, তা নেহাৎ শিশুরা!

* * * *

—আমি দুটো পেয়েছি, দুটো লাল.....

—আমি মোটে একটা, দাদু তুমি ধরে দাও! গোবিন্দকা দাওনা ধরে!....কলরব উদ্দাম হয়ে উঠে।

পাশে আর একটা ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন গৃহিণী সন্তোষিণী।

নিঃশব্দ কৌতুকে কিছুক্ষণ দেখে কর্ত্তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন—ঘুড়ি ওড়াচ্ছো? তা' সুতো কই?

যামিনীমোহন একটু রহস্যযুক্ত হাসি হেসে বলেন—আমার কাছে সুতোর কারবার নেই। সুতোবিহীন ঘুড়ি, হাত থেকে ছেড়ে দিই, যেদিকে ইচ্ছে ওড়ে।

সন্তোষিণী মুখ টিপে হেসে উত্তর দেন—তাই তোমার সংসারের অবস্থাও এমন উড়ুউড়ু। কিন্তু আর কতোদিন এ রকম ঘুড়ি ওড়ানো চলবে? ওদিকে যে পেনসনের সময় হয়ে গেলো?

—আসুক না—যামিনীমোহন বেপরোয়াভাবে বলেন—বর্ষা আসবে ভেবে ফাগুনের দিনে দক্ষিণের জানালা এঁটে থাকবো নাকি?

ইত্যবসরে নোটগুলো হস্তগত হওয়ায় ছেলেদের কোলাহল কিছু স্তিমিত হয়ে আসে। নিজেরা দেখাদেখি করতে থাকে সদ্যপ্রাপ্ত ঐশ্বর্যগুলি।

আরামকেদারাটায় এইবার বসেন যামিনীমোহন।

গোবিন্দ 'টুক' করে ঘরে ঢুকে একটা সিগারেটের টিন এনে. চেয়ারের হাতায় রাখে।

রাগতভাবে এসে দাঁড়ায় পুরণো চাকর হরি।

বলে—আপনাদের কাণ্ডখানা কি বাবু? লোট্ দু'খানা বারান্দা থেকে উড়ে

ফুটপাথে গে পড়লো! আমি পান কিনতে গিয়ে উই মোড়ের মাথা থেকে দেখতে পেলাম তাই রক্ষে। এই নিন্।

একখানা এক টাকার ও একখানা দু'টাকার নোট সিগারেটের টিনের ওপর রাখে হরি।

যামিনীমোহন হেসে বললে—তুই পেয়েছিস তুই নে।

—ক্ষ্যামা দ্যান বাবু, এমন ভূতুড়ে কাণ্ড আমার বরদাস্ত হয় না। এ বাড়ীতে টাকা যেমন খোলামকুচি! গোবিন্দদা, যাও নীচে যাও, তোমার খেলার কেলাবের ছেলেরা এসে হাঁক পাড়ছে।

গোবিন্দ সচকিত হয়—এই মরেছে! এসেছে ডাকতে? টাকা তুলে নাও হরিদা ও আমার মামা ফেরৎ নিয়েছে! দোহাত্তা এই রকম বেপরোয়া বাজে খরচ করে করেই উচ্ছন্ন যাবে মামা!

গোবিন্দ রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করে।

শিশুবাহিনীও তার পিছন পিছন অদৃশ্য হয়।

থাকেন কর্ত্তাগিন্নী। যামিনীমোহন সব্যঙ্গতাচ্ছিল্যে বলেন—বন্ধুগুলি বেশ জুটেছে গোবিন্দবাবুর! রতনে রতন চেনে!

সন্তোষিণী ওকালতির ভঙ্গীতে বলেন তা' বলে কিন্তু ওরা শুধু খেলাধূলো আড্ডা নিয়ে থাকে না, অনেকের অনেক উপকার করে। সেই সব করতে দলই করেছে একটা।

—বটে, তাই নাকি? উপকারটা কি ধরনের?....

—এই তো—কোথায় কোন গরীব দুঃখীর ছোঁয়াচে রোগ হয়েছে, সেবা যত্ন হচ্ছে না, ছুটছে সেবা করতে ; কার ঘরে মড়া পড়ে আছে—উঠছে না, যাচ্ছে কোমরে গামছা বেঁধে—

কথার মাঝখানে হেসে ওঠেন যামিনীমোহন। শ্লেষের হাসি!

এগুলো যেন বড্ড জোলো লাগে তাঁর কাছে। হেসে বলেন—ভালো ভালো, মরবার সময়. তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারবো। কোমরে গামছা বাঁধবার লোকের অভাব হবে না।

—কি কথার ছিরি!

ভ্রূভঙ্গী করেন সন্তোষিণী।

কাঁচের গ্লাসে একগ্লাস ওভাল্‌টিন নিয়ে প্রবেশ করে বড়োছেলের বৌ।

—বাবা, আপনার ওভাল্‌টিন খাবার সময় পার হয়ে যাচ্ছে—

যামিনীমোহন হাত বাড়িয়ে গেলাস নিয়ে বলেন—উহঁ, পার হবার জো কি, মায়ের শাসন বড়ো কড়া!

বড়ো বৌ এই স্নেহের ভাষাটি স্মিতহাস্যে পরিপাক করে নিয়ে বলেন—মা, মেজ বৌ আপনাকে খুঁজছিলো।

—কেন?—আমাকে কেন?—সন্তোষিণী প্রশ্ন করেন!

—ওই যে বাবাকে মাছের কচুরি ভেজে খাওয়াবার সখ হয়েছে নাকি, আপনি দেখিয়ে দেবেন বলেছিলেন—

—ওমা! তাই তো—যাই। পারে না কিছু, সখটুকু ষোলা আনা।

তা' এসব হচ্ছে সেদিনের কথা যেদিন ফাল্গুনের বাতাস বইতো।

দক্ষিণের খোলা জানালা দিয়ে আসা মলয় বাতাসে সারা সংসারেই বইতো প্রসন্নতার হাওয়া।

কিন্তু—

যথা নির্দিষ্ট সময়ে উঁকি দিয়েছে বর্ষা!

সংসারের সর্বত্র বইছে ভিজে স্যাঁৎস্যাতে ভারী ভারী পূবে হাওয়া।

অবসর নিয়েছেন যামিনীমোহন।

এখন আর—নিখুঁত ইস্ত্রী করা দামী স্যুটপরিহিত যামিনীমোহনকে মোটর চড়ে আসতে দেখা যায় না। খরচ বাঁচাবার প্রথম পর্যায়ে প্রথম বলি হয়েছে গাড়িখানা।

ছেলের বৌরা গাড়ি বিক্রীর প্রস্তাবে প্রায় ধরাশায়িনী হয়েছিলেন, গৃহিণী ছিছিকার করেছিলেন, সে সব গ্রাহ্য করেন নি যামিনীমোহন। কে জানে, তাঁর নিজের কোনো অসুবিধা বোধ আছে কিনা। কে জানে—স্বচ্ছন্দে, না বাড়ীর লোককে সৎশিক্ষা দিতেই আজ হাঁটার উপকারিতা কীর্ত্তন করেন।

ঢিলে-ঢালা ঘরোয়া পোষাক-পরা অবসরপ্রাপ্ত যামিনীমোহনকে হঠাৎ যেন অনেকটা বেশী বুড়ো লাগে।

মনে হয় একটু বেশী কড়া, বেশী রুক্ষ।

যেন সমস্ত সংসার থেকে অনেকটা তফাতে সরে গিয়ে দূর থেকে সংসারটাকে দেখছেন যামিনীমোহন, কেমন একটু অবজ্ঞার দৃষ্টিতে।

হৃদয়ের যোগসূত্রটা কি ইচ্ছা করেই নিজের খেয়ালে ছিঁড়ে ফেলেছেন যামিনীমোহন?

দুই

এমনি দিনে একদিন বিধবা বড় মেয়ে মুরলা আরক্ত মুখে মা'র কাছে এসে অভিযোগ করে—মা, এই সামান্য বাইশটা টাকা চাঁদার অভাবে খোকার ক্লাবে নাম কাটা যেতে বসেছে—তিনমাস বাছা হাতখরচ পায় নি। মান খুইয়ে বলতে গেলাম বাবাকে, আর বাবা কিনা সাফ জবাব দিয়ে বসলেন—দিতে পারবো না?

সন্তোষিণী মনে মনে প্রমাদ গুণলেও মুখে হাল্কা ভাবে বলেন—ও মা! সে কি, কেন।

মুরলা দুই হাত উল্টে বলে—কেন আবার কি! এই রকম ব্যবহারই তো পাচ্ছি আজকাল। এ রকম হাতে না মেরে ভাতে মারার বদলে স্পষ্ট বললেই হয়, 'বিদেও হও'। খোকা যখন এসে বলছে—'নাম কাটা যাওয়া মানেই মাথা কাটা যাওয়া। ইচ্ছে হচ্ছে গলায় ক্ষুর বসাই', তখন মা হয়ে যে আমি কোন প্রাণে—

কান্নায় কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে মুরলার।

বিব্রত সন্তোষিণী ব্যস্তভাবে বলতে যান—বোসো তো, দেখি গে আমি কর্ত্তার ভীমরতী ধরলো নাকি?

কর্ত্তার কাছে গিয়ে চটে মটে বলেন—তোমার দিনকে দিন কি আক্কেল হচ্ছে?

যামিনীমোহন নিজস্ব আরামকেদারাখানিতে বসে খবরের কাগজের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। কাগজ থেকে মুখ তুলে বলেন—অ্যাঁ, কি বলছো?

—বলছি—আমার মুণ্ডু! বলছি, সুব্রত নাকি ওর ক্লাবের চাঁদার দরুণ বাইশ টাকার অভাবে লজ্জায় পড়েছে, আর তুমি জবাব দিয়ে দিয়েছো—'দিতে পারবো না?'

যামিনীমোহন গম্ভীর হাস্যে বলেন—তা বলেছি বটে।

—ছি ছি! একটু লজ্জা হলো না?

লজ্জা? যামিনীমোহন সন্তোষিণীর মুখের দিকে চোখ তুলে ঈষৎ হাস্যে বলেন—কই আর হলো? বেশ তো স্বচ্ছন্দেই বলে ফেললাম। পকেটে অর্থ না থাকলে লজ্জা থাকাটাই অর্থহীন—বুঝলে গিন্নী!

সন্তোষিণী কিছুটা নরম হয়ে বলেন—কিন্তু মুরলা কি ভাববে বলো তো?

—শুধু মুরলা? যামিনীমোহন একটু উঁচুদরের হাসি হাসেন—মুরলা ভাববে, সুব্রত ভাববে, ছেলেরা ভাববে, তুমি ভাববে, বন্ধু প্রতিবেশী আত্মীয় কুটুম্ব যে যেখানে আছে সবাই কতো কি ভাবতে শুরু করবে। ভাবার এখুনি হয়েছে কি?

সন্তোষিণী একটু চুপ করে থেকে মৃদুস্বরে বলেন—অচ্ছা, এবারটির মতো না হয় দিয়েই দাও। ছেলেবেলা থেকে যখন যা চেয়েছে তার চাইতে বেশী দিয়ে এসেছো, আজ হঠাৎ এই সামান্য কটা টাকার জন্যে—

যামিনীমোহন গম্ভীরভাবে বলেন—উপায় নেই গিন্নী, উপায় নেই। বাইশটা টাকা এখন আর "সামান্য" নয়। টাকা যখন ছিলো, তখন কোনো কিছুতে রাশ টানি নি, আজ যদি সংসারের এই সব বাজে খরচের ওপর কাঁচি না চালাই, এরপর যে ভাতে টান পড়বে।

সন্তোষিণী বিরক্তভাবে বলেন—তোমার কথাবার্ত্তা যা হয়েছে আজকাল, শুনলে গা জ্বালা করে। ভাতেই বা টান পড়বে কেন? আমার ছেলেরা কি মুখ্যু, না অক্ষম?

—ওঃ ছেলেরা?...হ্যাঁ তা' বটে। বলে একটু শ্লেষের হাসি হাসেন যামিনীমোহন।.....অনেক কিছু ব্যক্ত হয় এই হাসিটুকুর মধ্যে।

সত্যি, তিন ছেলে সন্তোষিণীর, কেউই মূর্খও নয় অক্ষমও নয়।

কর্ত্তার ওপর অভিমান করে বড়োছেলে সুবিমলের কাছে গিয়ে হাত পাতেন সন্তোষিণী।

—ভীমরতী ধরেছে ওঁর। বাইশটা টাকা তুই আমাকে দে দিকিন সুবিমল! সুব্রত বুঝি ক্লাবের চাঁদা দিতে পারেনি, তোর বড়দি কাঁদছে।

সুবিমল চম্‌কে ওঠে—অ্যাঁ! উনিশ বছরের ছেলের ক্লাবের চাঁদা বাইশ টাকা! টাকা কি খোলামকুচি? আমার অতো বাজে নষ্ট করবার মতো টাকা নেই মা! তোমার চাঁদা চাওয়া নাতির আবদার মেটাবার এতোই যদি সখ হয়ে থাকে, পরিমলকে বলে দেখো—

মেজছেলে পরিমলের হয়ে উত্তর দেন মেজবৌ।

বলেন—আপনাদের সবটাতেই বাড়াবাড়ি না! নাতি হলেও অতো আদর দেওয়া ঠিক নয়। তাছাড়া—এ মাসে ওর লাইফ-ইন্‌সিওরের প্রিমিয়াম দিতে হবে, পারবেন কোথা থেকে। বাবার মতন উপ্‌রি আয়ের উপায় তো এসব চাকরীতে নেই মা?

অবিবাহিত পুত্র নির্মল বলে—আমাকে বাবার মতো বেহিসেবি পাওনি মা!

খরচ করবো—বুঝে, বিবেচনা করে। সুব্রতর যে এসব লাটসাহেবী এখন কমানোই দরকার, সেটা বুঝতে দাও বড়দিকে।

যামিনীমোহনের পকেটের প্রাচুর্য্য কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেরা প্রতি কথায় মাকে 'বুঝে চলবার' উপদেশ দেয়, কিন্তু নিজেরা?

নিজেরা কে কতোটুকু বোঝে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় সামান্য সামান্য ঘটনায়, ছোট ছোট ইসারায় ইঙ্গিতে।

একদিন সকালে—তুফান ওঠে চায়ের পেয়ালায়।

চিরাচরিত প্রথায় তিন ছেলে ও ছোট মেয়েকে নিয়ে কর্ত্তা বসেছেন চায়ের টেবিলে। পরিবেশনকারিণী মেজ বৌ।

বড়বৌ এ সময়ে থাকেন রান্নাঘরের তদারকে। ভাঁড়ার দেওয়া আর কুটনো কোটার ভার তাঁর।

পরিমল চায়ে একটা চুমুক দিয়েই পেয়ালাটা ঠক্ করে নামিয়ে রেখে বলে ওঠে—অখাদ্য! চা যা হচ্ছে আজকাল, গলা দিয়ে নামানো অসম্ভব। এরকম চা খাওয়ার কোনো মানে আছে?

নির্মল মুচকি হেসে বলে—মন্দ কি? চা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিরেতার জল খাওয়ার কাজ হয়।

মেজবৌ তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে ওঠেন—দামেও বোধ হয় চিরেতার সঙ্গে খুব বেশী তফাৎ নেই। এই কোয়ালিটির চা, যদি এর চইতে টেষ্টফুল করা সম্ভব হয়, যে পারবে সে যেন চা তৈরির ভার নেয় কাল থেকে। আমার দ্বারা হবে না।

যামিনীমোহন বধূকে সান্ত্বনাচ্ছলে বলেন—কই মেজ বৌমা, চা তো খেতে খারাপ হয়নি. এই তো দিব্যি খেয়ে ফেললাম আমি।....নাঃ তোমাদের আজকাল বড্ডো ত্রুটি ধরা স্বভাব হচ্ছে!

নির্মল নিজস্ব তীক্ষ্ণ ভঙ্গিতে বলে—হতে পারে! যাক—এবার থেকে বরং আপনি একাই খাবেন। দিব্যি খাবেন!

ছোটমেয়ে গীতশ্রীও ছোটদার মতো তাচ্ছিল্যের সুরে বলে সত্যি, অকারণ এই একটা খরচের ব্যাপার রেখেই বা লাভ কি? তুলে দিলেই হয় বাড়ী থেকে। অনেক কিছুই তো তুলে দেওয়া হচ্ছে আজকাল।

যামিনীমোহন ছেলেদের কথা কষ্টে পরিপাক করছিলেন, মেয়ের কথাটা আর পারেন না। ক্রুদ্ধস্বরে বলেন—খেতেও পারেন না কেউ, অথচ পড়তেও

পায় না। ফুরোনোর কামাই তো দেখিনি কিছু। এবেলা ওবেলা টিন টিন চা জলা মেলে উড়েও তো যাচ্ছে দিব্যি!

সুবিমল এতোক্ষণ চুপ করে ছিলো, এবার গম্ভীরভাবে বলে—আচ্ছা ভবিষ্যতে যাতে আর না ওড়ে, সে সম্বন্ধে সাবধান হওয়া যাবে।

পরে শোনা যায় সুবিমল ভাত না খেয়ে অফিসে গেছে।

ওদিকে ভাঁড়ার ঘরের মেঝেয় বঁটি পেঁতে বসে দ্রুত অঙ্গুলি চালনায় লাউ কুটতে কুটতে বড়বৌ বোধকরি শ্বাশুড়ীর সাবধান বাণীর উত্তরে ঝঙ্কার দেন—হাত পা আমার খুব সাবধান আছে মা, মেজাজের ঠিক রাখাই শক্ত হচ্ছে। যতো রাজ্যের পচা আলু, পোকা খাওয়া বেগুন, শুকনো আনাজ খুঁজে খুঁজে কিনে আনার প্রবৃত্তি যে কি করে হয় মানুষের, বোঝা অসাধ্য! বাজারে যে এরকম জিনিস পাওয়া যায়, জানতাম না। ওদিকে মাছের বহর দেখুন গে, একবেলা বৈ আর দু'বেলা খেতে হবে না কারুর। কাল থেকে সবাইয়ের খাওয়া দাওয়া দেখাশুনা বরং আপনিই করবেন।

—আমি! সন্তোষিণী অপ্রতিভভাবে বলেন—তা' হলেই হয়েছে। আমার তো কম জিনিস দেখলেই বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে যায়। কি জ্বালা যে হলো। কর্ত্তার দেখছি ষাট বছর বয়েস না হতেই বাহাত্তুরে ধরেছে। নইলে কখনো যা করেন নি, তাই করছেন! লজ্জার মাথা খেয়ে নিজে যাচ্ছেন বাজারে।

বড়বৌ মুচকি হেসে বলেন—শুধু তাই? ওই দেখুন গে মা, কলতলায় মোক্ষদার কি শাস্তি!

তা শাস্তিই বটে। এ বাড়ীর ঝি চাকররা চিরদিন বেপরোয়া স্বরাজ পেয়ে এসেছে। এখন যদি তুচ্ছ একখানা কাপড় কাচা সাবানেরও হিসেব চাওয়া হয় বরদাস্ত করা সহজ?

তা মুখনাড়া দিতে সেও ছাড়ে না।

একরাশ কুচো জামা পাজামা গেঞ্জি ইত্যাদি জড়ো করে এনে সে একেবারে বেপরোয়া নামিয়ে দেয় যামিনীমোহনের পায়ের কাছে।—এই দেখুন বাবু, বিবেচনা করুন, সাবান আমি খাই না মাখি? দেখছেন তো—পিত্যেক দিন ক' গাড়ী কাপড় জামায় সাবান লাগাতে হয়? পরিষ্কার না হলেও তো বৌদিদের কাছে মুখনাড়া খেতে হয়। অন্য ঝি হলে দু'খানা সাবান খরচ করতো।

রায়বাহাদুর চশমার কাঁচটা একবার মুছে নিয়ে ধীরে ধীরে সরে যান।

ঝি মোক্ষদা তখনো আপন মনে চালাতে থাকে—পুরুষ বেটাছেলেকে

আপিস কাছারীতেই মানায়। বাড়ী বসে থাকলেই নজর নীচু হয়ে যায়। 'পেনসিল' নেবার আগে তো বাবু এমন ছিল না। ত্যাখন এই সাবান ঘরে নে গিয়ে এর ওর কাছে বেচে কতো পয়সা করেছি। গ্যাটের কড়ি খরচা করে একটা পান কখনো খাইনি। আপনার ঘরের দরকারে মুনিব বাড়ী থেকে ইচ্ছে মতন জিনিস নিয়ে গেছি, তাকিয়ে দেখেনি কেউ। আর এখন? সেদিনকে একটা দেশলাই বুঝি তুলে আঁচলে বেঁধে বাড়ী যাচ্ছিনু, বড়ো বৌদিদি যাচ্ছেতাই করলো। বাবাঃ! ওই যে মানুষটি হাত দে জল গলে না। বলে কিনা—"বাবুর আমলে অনেক ঠকিয়ে খেয়েছো তোমরা, আমাদের আমলে ওসব চলবে নি।" শ্বশুর বুড়ো জলজ্যান্ত বেঁচে থাকতে আমাদের আমলে বলতে মুখ বাঁধলোনি।......নাঃ এ বাড়ীতে বেশীদিন টিকতে হবেনি।

এ বাড়ীতে টেঁকা দায় হয়ে উঠেছে ক্রমশঃ তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলো ক'দিন পরেই। একাদিক্রমে তেইশ বছর কাজ করছে হরি এ বাড়ীতে, সেই হরিকেই একদিন চোখের জল ফেলতে ফেলতে নিজস্ব পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে বাড়ী থেকে যেতে দেখা গেলো।

কার কারসাজিতে কী ঘটেছে সংসারে, সে সম্বন্ধে সবচেয়ে অনভিজ্ঞ শ্রীমান গোবিন্দ। ও আপন খেয়ালে খোসমেজাজে পার্ক থেকে ফিরছিলো আদরিণী লিলি'কে বেড়িয়ে নিয়ে।

'লিলি' নামধারিণী বিদেশিনী মহিলাটি এক সময় যামিনীমোহনেরই বিশেষ প্রিয়পাত্রী ছিলেন, কোন্ ফাঁকে কে জানে, আপাততঃ তার মালিকানা স্বত্বটা গোবিন্দর উপরই বর্ত্তেছে।

দুটিবেলা তাকে বেড়িয়ে আনা, নাওয়ানো খাওয়ানো সবই গোবিন্দর ডিউটির অন্তর্গত। তার গলায় বাঁধা প্রেম শৃঙ্খলটি ধরে টানতে টানতে এবং গুণগুণ করে বেসুরো গান গাইতে গাইতে বাড়ী ঢুকতে যাচ্ছিল গোবিন্দ, থমকে দাঁড়ালো হরিকে দেখে।

—একি হরিদা, কি হলো? যাচ্ছো কোথা?

হরি উত্তরের পরিবর্তে—'গোবিন্দদা', বলে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলে।

গোবিন্দ অবাক।

—আরে কি হলো তাই বলোনা? কেঁদেই চল্লে বুড়ো মিন্‌সে। বলি—মামা গালমন্দ করেছে? কী মুস্কিল! এ বুড়ো টেঁকির সক্কালবেলা নুনের নৌকা ডুবে গেলো কেন? পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে যাচ্ছেই বা কোন্‌খানে?

এতোক্ষণ হরি কান্না সামলে জবাব দেয়—আজ তেইশ বছর পরে হরির এবাড়ী থেকে অন্ন উঠলো গোবিন্দদা।

—তার মানে?

গোবিন্দ তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করে!

হরির "অন্ন ওঠা" কথাটা এমনি অবিশ্বাস্য যে বুঝে উঠতে পারে না।

হরি গলা ঝেড়ে বলে—মানে টানে জানিনে গোবিন্দদা, শুনতে পাচ্ছি আমি নাকি বড়দাদাবাবুর পকেট মেরেছি। হা ভগবান! এ বাড়ীতে যখন ঢুকেছি, বড়দাদা বাবু তখন ইস্কুলের ছেলে, টিফিন নিয়ে গিয়ে হাতে করে খাইয়ে এসেছি আমি।....বাবু তখনও 'রায়বাহাদুর' হয়নি, মেজদাদাবাবু সেই বছর ইস্কুলে ভর্তি হলো। তুমি আর ছোটদা'বাবু এতোটুকু খোকা। তোমার মা—বাবুর মামাতো বোন না কে হতো যেন—মরণকালে তোমাকে সঁপে দিয়ে গেলো এবাড়ীর গিন্নীমার কাছে—সব আমার চোখের সামনে—

অসহিষ্ণু গোবিন্দ বলে ওঠে—আরে দূর বাবা, ওসব পুরণো গপ্পো কে এখন শুনতে চাইছে তোমার কাছে? 'পকেট মারা' ব্যাপারটা কী তাই বলোনা? নাঃ আবার কাঁদতে বসলো কচি খোকার মতো!....তবে মরো কেঁদে—

হরি কান্না থামিয়ে কাতর গলায় বলে—শুনতে পাচ্ছি 'পেরায়দিন' নাকি বড়দাদাবাবুর পকেটের পয়সায় ঘাট্‌তি হয়, তাই বড়ো বৌদিদি তক্কে তক্কে ছিলো, আজ 'পষ্ট' দেখেছে আমি পকেট হাতড়াচ্ছি—

গোবিন্দ বলে—হুঃ! বড়বৌদির আজকাল দিব্যদিষ্টি খুলে গেছে দেখছি। তা মামা তোমায় কি বল্লে?

হরি চোখ মুছে বলে—বাবু বললেন—"হরি, এ বাড়ীতে কারুর আর বেশীদিন মান সম্ভ্রম বজায় রেখে বাস করা চলবে না, তুই যা। এরপর কোনদিন মার খেয়ে বিদেয় হতে হবে, এই বেলাই বিদেয় হ।"

হরি একবার দোতলার দিকে তাকায়।

দোতলার বারান্দায় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিলেন যামিনীমোহন, হঠাৎ ধরা পড়ে যাওয়া আসামীর মতো সরে গেলেন।

যামিনীমোহনের ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে সন্তোষিণী। তাঁর চোখও অশ্রুভারাক্রান্ত।

তিনি বিষাদ গম্ভীর স্বরে বললেন—কিন্তু ন্যায়বিচার্ করতে গেলে যে বড়ো বৌমাকে মিথ্যেবাদী বলতে হবে।

যামিনীমোহন উত্তেজিতভাবে বলেন—কিন্তু তেইশ বছরের পুরাণো হরি, এই মিথ্যে অপবাদ নিয়ে রায়বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবে, আর যামিনীমোহন রায় তাই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দেখবে? একটি প্রতিবাদ করবে না, কে সত্যি মিথ্যাবাদী—

সন্তোষিণী মৃদুস্বরে বলেন ওগো, চুপ করো, তোমার পায়ে পড়ি, একথা ওদের কানে গেলে এখুনি আগুন জ্বলে উঠবে বাড়ীতে—

যামিনীমোহন একটা অদ্ভুত হাসি হাসেন—ওঃ আগুন! কিন্তু গিন্নী যে আগুন তলে তলে অবিরত ধোঁয়াচ্ছে, তা'কে তুমি আঁচল চাপা দিয়ে ক'দিন ঠেকিয়ে রাখতে পারবে? একদিন না একদিন ওদের নিজেদের দুর্বুদ্ধির বাতাসে সে আগুনকে জ্বালিয়ে তুলবেই তুলবে ওরা!

নীচের তলায় তখন উদ্দাম হয়ে উঠেছে গোবিন্দর গলা—বল্লেই হ'লো হরিদা চোর! এ কি মামদোবাজী নাকি? হরিদা যদি চোর হয়, তা'হলে—এ বাড়ীতে এক ধার থেকে সবাই চোর।

মুরলা তা'কে ধমকে ওঠে তুই থাম দিকি, তোকে কে লম্বা লম্বা কথা কইতে বলেছে?

গোবিন্দ বলে—লম্বা বেঁটে জানিনা বড়দি। জিভটা দিয়েছে ভগবান ন্যায় কথা কইবার জন্যে, কয়ে যাবো, ব্যাস্। কারুর ভালো লাগুক চাই না লাগুক। চন্দ্র সুয্যি উল্টে যেতে পারে, হরিদা চুরি করতে পারে না।

মুরলা শাসনের ভঙ্গীতে বলে—তবে শুধু শুধু হরির নামে বদনাম দিয়ে বড়ো বৌয়ের লাভ?

গোবিন্দ বিজেতার মতো হাসে—হুঁ হুঁ বাবা, লাভ লোকসান বোঝ না? হরিদা হ'লো গে মামার একার খাস চাকর, ওনাদের তো কোন কাজে লাগে না? ওর ভাত কাপড়ের খরচটা বড়োবৌদির গায়ে ছুঁচের মতন বিঁধছে। বড়োগিন্নীর যে ওয়ান পাইস ফাদার মাদার দেখতে পাওনা?

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে নির্ম্মল থমকে দাঁড়ায়, বলে গোবিন্দ, বড্ডো দেখছি বাড় বেড়েছে তোর আজকাল! ফের যদি এরকম কথা শুনি, একটি ঘুঁসিতে তোর ওই সাধের ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেবো বলে রাখছি।

গোবিন্দ আর নির্ম্মল প্রায় সমান বয়সী। ছেলেবেলা থেকে উভয় পক্ষেই 'তুই তোকারি'টা রপ্ত।

নির্ম্মলের এই বীরজনোচিত উক্তিতে ও একটু কাঁধ ঝাড়া দিয়ে হেসে চোখ

কুঁচকে বলে তাই আর কি! ওই সাতাশ বছরের সাধনার ভুঁড়িটি তোর ঐ স্যুটকে ঘুঁসিতে ফাঁসলো আর কি! হক্ কথা আমি কইবোই বাবা! মোসাহেবী করা গোবিন্দর কুষ্ঠিতে লেখে না।

সস্নেহ দৃষ্টিতে নিজের হাতের মাস্‌লের দিকে তাকাতে তাকাতে গোবিন্দ সামনের একটা উঁচু তাক থেকে একটা ছোট কাঁচের বাটি পেড়ে নিয়ে ভাঁড়ার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে কাকে যেন উদ্দেশ্য করে বলে....দাও দিকিন, একটু তেল দাও দিকিন। হরিদা তো খসলো, বুড়োরই দুর্গতি।

তেলের পলা হাতে করে একটি নতমুখী বৌ এসে দাঁড়ায়। ধীরে ধীরে ঢেলে দেয় তেলটা।

গোবিন্দ ঈষৎ নীচু গলায় সাশ্চর্য্যে বলে—কি ব্যাপার, তোমার আবার কি হলো? নাঃ, এ বাড়ীতে আজ সবাই "কান্না ষষ্ঠীর ব্রত" নিয়েছে নাকি?

বলা বাহুল্য, বৌটি গোবিন্দরই।

সে ভীত মৃদু গলায় বলে—তুমি ওঁদের সব কথায় থাকতে যাও কেন বলো তো?

গোবিন্দ চমকিত বিস্ময়ে. বলে—ওঁদের ? ওঁদের মানে? কাদের?

—এই, বড়দি, মেজদিদের।

—বটে? ওদের কথায় থাকতে যাবো না! কেন বলো দিকি? পরের মেয়েরা উড়ে এসে জুড়ে বসে হঠাৎ এতো তালেবর হয়ে উঠলো কি করে, যে তাদের কথায় থাকা চলবে না? ওঃ তোমারও গায়ে লাগছে বুঝি? এক গোয়ালের গরু তো সব। গোবিন্দ কাউকে ভয়-টয় করে না বাবা। কান্না ফান্না রাখো। সব সহ্য হয়, ওইটি সহ্য হয় না।

তেলের বাটি নিয়ে দুম্ দুম্ করে উঠে যায় সিঁড়ি দিয়ে।

ওপরে গিয়ে যামিনীমোহনের কাছে দাঁড়িয়ে বলে—নাও মামা, জামাটা খোল দিকিনি।....মামী , যাও নীচে যাও। দেখোগে ওদিকে তোমার বৌ বেটারা রসাতল সুরু করেছে। কই মামা—

বলে নিজেই যামিনীমোহনের জামাটা ধরে টানে।

যামিনীমোহন ঈষৎ বিরক্তিমিশ্রিত বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকান। অর্থাৎ এর মানে কি?....তারপর বোধকরি বুঝতে পেরে স্থিরস্বরে বলেন—থাক্।

গোবিন্দ স্বচ্ছন্দে বলে—চোখ পাকিয়ে গোবিন্দকে তাড়াতে পারবে না মামা।

বোসো দিকি শান্ত হয়ে। বলি—হরিদাকে তো এককথায় ডিস্‌মিস্‌ করলে, ত্রিশ বছরের অভ্যাসটাকে একদিনে ডিস্‌মিস্‌ করলে সইবে?

যামিনীমোহনের রুক্ষ দৃষ্টি ধীরে ধীরে কেমন যেন কোমল হয়ে আসে।

গোবিন্দকে কি ভালো করে কোনদিন তাকিয়ে দেখেন নি যামিনীমোহন?

ওর এই নতুন পরিচয় পেয়ে কি অবাক হচ্ছেন?

যামিনীমোহনের সুবিধা অসুবিধার প্রশ্ন গোবিন্দর অনুভূতির রাজ্যে ঠাঁই পায়?...উদোমাদা বুদ্ধিহীন গোবিন্দ।

নীচের তলায় তখন তুমুল বৈঠক বসেছে। মুরলা, পরিমল, বড়ো বৌ।

মেজ বৌ শাড়ীর আঁচলটা পিঠে ফেলে ঠিকরে এসে দাঁড়ান।

তীব্র কণ্ঠে বলেন—ওর এতো সাহস আসে কোথা থেকে?

বড়বৌ বলেন এদিকে 'খরচ খরচ' করে সংসারের সব কিছুর ওপর রাশ টানা হচ্ছে, অথচ কতো বাজেখরচ চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে তার হুঁস নেই। মা-বাপ-মরা ভাগ্নেকে ছোট বেলায় মানুষ অমন করেই থাকে লোকে। তাই বলে চিরদিন যে সেই ভাগ্নে বুকে বসে দাড়ি ওপড়াবে, সে শুধু এই সংসারেই দেখছি। সখ করে আবার তার এক বিয়ে দেওয়া হয়েছে! শেষ পর্য্যন্ত পুষবে কে বাবা? তাও যদি মানুষ হ'তো। হয়ে বসে আছেন তো একটা গোঁয়ার গোবিন্দ চাষা!

পরিমল বলে—সত্যি, গোবিন্দর ওই বিয়ে দেওয়াটা যে কী বিশ্রী একটা কাজ হয়েছে মার! অমন মেয়েটা—হয়েছে যেন বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা!

কথাটা খুব মিথ্যাও নয়।

গৌরী মেয়েটি এ সংসারের বানরের গলায় মুক্তোর মালার দৃষ্টান্ত হয়েই বিরাজ করছে।

প্রকৃত ঘটনা এই—

মেয়েটি সন্তোষিণীর বাল্যসখী 'গঙ্গাজলের' মেয়ে।

'গঙ্গাজলে'র অবস্থা বরাবরই খারাপ, সন্তোষিণীও বরাবরই লুকিয়ে এবং দেখিয়ে বহুবিধ সাহায্য করে এসেছেন তাকে, যামিনীমোহনের আপত্তি ছিলোনা কখনো।

কিন্তু বছর কয়েক আগে স্নেহশীলা সন্তোষিণী হঠাৎ যেদিন বাল্য সখীর উপর অগাধ স্নেহের বশে তার বিবাহযোগ্যা কন্যাটিকে 'ঘরে আনবার' প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসলেন, সেদিন বাধলো বিপদ।

. এ প্রতিশ্রুতি রক্ষা কেবলমাত্র যামিনীমোহনের আর্থিক আনুকূল্যে হবার উপায় নেই, আনবার জন্যে বাহক পাঠাতে হয় কনিষ্ঠ পুত্র নির্ম্মলকে। নির্ম্মলের মতামত নেবার আবশ্যকতা অনুভব করেননি অল্পবুদ্ধি সন্তোষিণী। বিচক্ষণ যামিনীমোহন বললেন—কাজটা ভালো করোনি গিন্নী নির্ম্মল রাজী হবে না। তার চাইতে একটি ভালো পাত্র দেখে বিয়ে দিতে বলো, খরচ আমি দেবো।

সন্তোষিণী কাতর ভাবে বলেন কিন্তু আমি যে নিজের ঘরে আনবো বলে বাকদত্তা হয়ে বসে আছি!

যামিনীমোহন মৃদুহেসে বলেন—সেটাই বড়ো ভুল হয়ে গেছে। দ্বিতীয়-ভাগের সব বানান গুলো মুখস্থ রাখতে হয় বুঝলে? আগে 'ঐক্য', তবে 'বাক্য', ভুলে গেছো? যাক্ দেখো চেষ্টা করে, যদি মায়ে ব্যাটায়. ঐক্যসাধন করতে পারো।

কিন্তু 'ব্যাটা' অর্থাৎ শ্রীমান নির্ম্মল প্রস্তাব শুনে মাকে একেবারে নস্যাৎ করে দিল।

—কি হয়েছে? তোমার সেই 'গঙ্গাজলের' মেয়েকে বিয়ে করতে হবে? হঠাৎ বুদ্ধি সুদ্ধি লোপ পেলো না কি তোমার?

সন্তোষিণী বিরক্ত হয়ে বলেন—কি এমন অসঙ্গত কথা বলেছি বাছা! 'গঙ্গাজল' না হয় গরীব, কিন্তু মেয়েটি রূপে গুণে লক্ষ্মী।

—চমৎকার! তাহলে আর চিন্তা কি মা? লক্ষ্মীর বাহন হ'তে অনেক প্যাঁচা জুটবে, আমায় নিয়ে টানাটানি কেন?

সন্তোষিণী আবদারের ভঙ্গীতে বলেন—তা' বলেল শুনছি না। আমি কথা দিয়েছি।

নির্ম্মল অবহেলার হাসিতে বিদ্রূপের ঝাঁজ মিশিয়ে বলে—'কথা' দেওয়া জিনষটা কি এতোই সস্তা মা? নিজের ওজন না বুঝে দিয়ে ফেললেই হলো?

দালানের ওপাশে বসে তেল মাখছিলো গোবিন্দ। সে নির্ম্মলের শেষের কথাটায় হঠাৎ চমকে উঠে বলে—কি বললি রে নির্ম্মল? তুই নিজে তো খুব ওজন রেখে কথা বলছিস?

নির্ম্মল অবজ্ঞায় ওর কথার উত্তর দেয়না, মাকে উদ্দেশ্য করে বলে—ওসব সখ তুলে রেখে দাওগে মা। মায়েরা ছেলেবেলায় কবে কার সঙ্গে গোবরজল, গঙ্গাজল, ডাবের জল, মিশ্রীর জল পাতিয়ে তাদের কাছে যা ইচ্ছে কথা দিয়ে বসবে, আর সুবোধ সুশীল ছেলেরা—মাতৃসত্য পালন করতে টোপর মাথায়

দিয়ে ছুটবে, সে সব যুগ কেটে গেছে। কথা দেবার সময় বিবেচনা করা উচিত ছিলো—সে কথা রাখবার ক্ষমতা তোমার আছে কি না!

হঠাৎ গোবিন্দ তেড়ে এসে বসে—আলবৎ আছে। মামী যা হুকুম করবেন আনতে হবে, ব্যাস্।

নির্ম্মল ব্যঙ্গ মিশ্রিত তীব্র একটু হাসি হেসে—'বটে' বলে চলে যায়।

সন্তোষিণীর চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে দু'ফোটা তপ্ত অশ্রু।

হাঁ তপ্তই তো!

অপমানের অশ্রু তপ্ত বৈ কি!

মিনিট খানেক সেইদিকে হতভম্বের মতো তাকিয়ে থেকে গোবিন্দ হঠাৎ মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিয়ে বলে ওঠে মামী, তোমার ওই 'গোবর জল' না 'গঙ্গাজল' কে যেন কী 'গেত্তর' ওরা?

সন্তোষিণী সচমকে বলেন—কেন? তা' নিয়ে তোর দরকার?

—বলি আমার সঙ্গে আটকাবে? না যদি আটকায়—কুছপরোয়া নেই! বায়না দাও সানাইয়ের।

সন্তোষিণী দুঃখের হাসি হেসে বলেন—তোকে ওরা মেয়ে দেবে কেন?

—দেবে না—মানে? রায়বাহাদুর যামিনীমোহন রায়ের ভাগ্নেকে মেয়ে দেবে না, এতো চাল্ তোমার গঙ্গাজলের? এ দিকে তো শুনি ভাঁড়ে মা ভবানী, দু'বেলা হাঁড়ি চড়ে না।

সন্তোষিণী এই ক্ষ্যাপা পাগলের দিকে একটা সস্নেহ দৃষ্টি ফেলে বলেন—তাদের না হয় হাঁড়ি চড়ে না, তুই বা বিয়ে করে বৌকে খাওয়াবি কি?

গোবিন্দ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বলে—আমি কি খাওয়াবো মানে? তোমার হাঁড়িতে এমন আকাল লাগলো কবে?

সন্তোষিণী দুঃখের মধ্যেও হেসে ফেলে বলেন—আমার হাঁড়ি ভরসা করে তুই বিয়ে করবি কেনরে গোবিন্দ? আমরা কি চিরকাল বেঁচে থাকবো? এইতো তোর মামার ব্লাডপ্রেসার, ওসব রোগে ভরসা কি?

গোবিন্দ বিরক্তভাবে বলে—দেখো মামী, খামোকা ভরদুপুরে মামার অকল্যাণ কোরোনা বলে দিচ্ছি। সোজা কথা বলছি—নির্ম্মল হতভাগার থোঁতোমুখ ভোঁতা করে বিয়ের জোগাড় লাগাও তুমি। লাগাও বাদ্যি বাজনা। কসে ঘটাপটা করো। ফ্যাল্‌ফ্যাল কত্তে তাকিয়ে দেখুন বাবু আর মনে মনে পস্তান।

তা' সন্তোষিণীও সেদিন এই ক্ষ্যাপা ছেলেটার কথায় নেহাৎ ক্ষ্যাপার মতো কাজই করে বসেছিলেন।

তখনো যামিনীমোহনের উজ্জ্বল কর্ম্মজীবন।

পেনসনের ভিক্ষামুষ্ঠি মাত্রই একমাত্র সম্বল নয়। বাজনা বাদ্যি করে বৌকে এক গা গহনা পরিয়ে গৌরীকে ঘরে নিয়ে এসেছিলেন সন্তোষিণী—গোবিন্দকে কাণ্ডারী করে।

এসব অবশ্য চার পাঁচ বছর আগেকার কথা। শান্ত নম্র লক্ষ্মীমূর্ত্তি গৌরীকে গোবিন্দর মতো তাচ্ছিল্য কেউ করে না। তাছাড়া সংসারের বহুবিধ কাজ তার কাছে থেকে পাওয়া যায়। অতএব প্রত্যেক বিষয়ে—"বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা" বলেই উল্লেখ করা হয় তাকে।

এতোদিন এই ভাবেই চলছিলো—

তবে কিছুদিন থেকে সংসারে সকলের সবকিছু বিলাসিতার ওপর ছাঁটাইয়ের কাঁচি পড়ায় আগুন হয়ে আছে সবাই।

নিজেদের অপব্যয়গুলো তারা ন্যায্য খরচই ভাবে, চোখ দেয় অন্যদিকে। আপাততঃ তাদের প্রধান টার্গেট গোবিন্দ। কাজে কাজেই দুটো মানুষের খাওয়া-পরা'র খোঁটা সকলের মুখ থেকেই বেরিয়ে পড়ে। যখন তখনই পড়ে।

সব থেকে বেশী বলে বিধবা মুরলা। দু'বছরের ছেলে নিয়ে বাপের সংসারে ঢুকে সেই ছেলেকে যে উনিশ বছরের 'নদের চাঁদটি' করে তুলেছে।

অবিশ্যি গোবিন্দর কিছুতেই দৃকপাত নেই। ওসব 'খোঁটা' তার গায়েও লাগে না।

সে মনের আনন্দে আধসের চালের ভাত মেরে দিয়ে হাঁক পাড়ে—ঠাকুর আর চারটি ভাত আনো তো—

ভাত নিয়ে বেরিয়ে আসে—ঠাকুর নয়, গৌরী। দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পাশে।

সন্তোষিণী এদিক ওদিক তদারকী করছিলেন, আক্ষেপের স্বরে বলেন—আর ঠাকুর! সে মুখপোড়া আজ কেঁদে কেটে দেশে চলে গেলো, মা মরছে বলে।

সুবিমল মন্তব্য করে—হুঁ মরছে! দরকার মাফিক মরবার জন্যে ক'টা করে মা যে মজুত থাকে ব্যাটাদের! সব বাজে।

গোবিন্দ আশ্চর্য্যভরে বলে তুমি বলো কি বড়দা? মিছে করে বলবে মা মরছে? ছি ছি কি যে বলো! তাই কখনো হয়।

—হয় না বুঝি? সুবিমল ওর সরলতায় ব্যঙ্গ হাসি হাসে।

সন্তোষিণী সস্নেহে বলেন—নতুন বৌমা ছেলেমানুষ, সাহস করে কোমর বেঁধে ঢুকে পড়লো রান্নাঘরে, তাই টু শব্দটি নেই সংসারে।.... দাও নতুন বৌমা, ভাত দাও গোবিন্দকে।

গোবিন্দ বাড়তি ভাতগুলো সাপ্‌টে মাখতে মাখতে বলে—মামীর এক আদিখ্যেতার কথা! 'ছেলেমানুষ' মানে? পাঁচসেরি চালের হাঁড়িটা নামাবার বয়েস বুঝি তবে তোমার? বলি আর বামুন রাখবার দরকারটাই বা কি? মামার এই পেনসন হয়ে গেছে, এ খরচটা কমিয়ে দিলেই হয়।

সন্তোষিণী বলেন—সব্বনেশে কথা বলিসনি গোবিন্দ! বারো মাস এই সংসারের হাঁড়ি ঠেলবে কে?

গোবিন্দ ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে—ঠেলবে পাড়ার লোক। আচ্ছা—বৌদিদের নয় অভ্যেস নেই, কিন্তু নতুন বৌ পারে না? তিনি তো আর জমিদার ঘর থেকে আসেন নি? বলে দিও মামী, বিবিয়ানা ক'রে দিন রাত্তির উল্‌ বোনা চলবে না, রাঁধবে কাল থেকে। কই আর দুটি ভাত দেখি।

শুনে সুবিমল কটমট করে তাকায়।—যেন "আবার ভাত?"

চাঁদু হঠাৎ পাশ থেকে ফিক্ করে হেসে ফেলে বলে—গোবিন্দকা, তুমি কি বক রাক্ষস? মা বলে তুমি চারজনের ভাত একলা খেতে পারো—তাই না গোবিন্দকা?

গোবিন্দ খিঁচিয়ে উঠে বলে—তা' পারবে কেন? তোর মার মতন আধছটাক চালের ভাত খাবো, আর এবেলা ওবেলা মূর্চ্ছা যাবো, কেমন?

খেয়ে উঠে বেসুরো সুরে গান গাইতে গাইতে আঁচাতে যায়।

সুরেলা গান ভেসে আসে সন্ধ্যাবেলা তেতলার ঘর থেকে।

মেজবৌ অর্গান বাজিয়ে চলেছে, গান গাইছে গীতশ্রী। টেবিলে আঙুল ঠুকে তাল দিচ্ছে সুব্রত। ছোট ছেলেমেয়েরা কেউ মন দিয়ে শুনছে, কেউ ঘরে বসে খেলা করছে।

মোটকথা ঘরের মধ্যে বেশ একটা জমজমাট ভাব।

গান থামলে সুব্রত গীতশ্রীকে বলে—গানের চর্চ্চাটা ভাল করে করলে না ছোটমাসী? করলে রীতিমত গাইয়ে হতে পারতে!

মেজ বৌ আরক্ত মুখে বলে ওঠেন—হলেই বা লাভটা কী হতো সুব্রত? শ্বশুরবাড়ী গিয়ে তো গলা খোলবার হুকুম থাকবে না? নইলে—চর্চ্চা আমিও তো কম করিনি।

সুব্রত একটু ফাজিল প্যাটার্ণের সে বন্ধ গলা খোলবার জন্যে অনুরোধ উপরোধ করতে থাকে মামীকে।.....শেষ পর্যন্ত মেজবৌ গলা খোলেন এক ওস্তাদি সুরে।

দোতলায় নিজের ঘরে একা কর্ত্তা বসে একজোড়া তাস নিয়ে পেসেন্স খেলছিলেন, গানের তালে অন্যমনস্ক হয়ে যান।

আর একটা ঘরে সুবিমল ক্রশয়ার্ড পাজ্‌ল সল্‌ভ করবার চেষ্টায় ঘেমে উঠেছিলো, সে বিরক্তিব্যঞ্জকভাবে ভ্রূ কুঁচকে হঠাৎ উঠে জানলাটা বন্ধ করে দেয়।

গোবিন্দ হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে আসে—নীচের তলায় সিঁড়ির পাশে তার নিজের ঘরে।...তাকের ওপর থেকে পেড়ে নিয়ে যায় ডুগি তবলা দুটো।

তার একান্ত প্রিয় বাজনা।

তেতালার বারান্দায় উঠে গিয়ে বাজনা দুটো নিয়ে বসে পড়ে লাগায় জোর চাঁটি।

ঘরের মধ্যে থেকে গীতশ্রী বলে—ন্যুইসেন্স!....উঃ এই বর্ব্বর লোকটাকে সহ্য করা কী দুরূহ!

মেজ বৌ মুচকি হাসেন।

নীচের রান্নঘরে রান্না করছিলো গৌরী।

গানের সুর ভেসে আসে সেখানেও।

সে জানালার কাছে এসে দাঁড়ায় একবার, আবার মন দেয় কাজে।

কর্ত্তার তাস জমে না।

উঠে পড়েন।

ধীরে ধীরে ঢোকেন এপাশের ঘরে ওপাশের ঘরে। সব ঘর খালি, কিন্তু আলো জ্বলে যাচ্ছে আপন মনে। একটি একটি করে নিভিয়ে দেন। নেমে যান নীচের তলায়, সেখানেও নিভোতে থাকেন একটি একটি করে।

সিঁড়ির সামনে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা যামিনীমোহনকে কেমন যেন নিঃসঙ্গ দেখতে লাগে।

সন্তোষিণী দালানে বসে সুপুরি কাটছিলেন, বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করেন—ও কী ছেলেমানুষি হচ্ছে?

—ঘরে ঘরে দেওয়ালির রোশ্‌নাই জ্বলছে দেখতে পাচ্ছো না?

—পাবো না কেন? তা' ভরসন্ধ্যেবেলা আলোগুলো নিভিয়ে ভূতুড়ে বাড়ি করে তুলছো কেন।

—রায়বাড়ীর ভেতরের আলো এমনি করে নিভে আসছে গিন্নি, তাই বাইরের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করছি।

—ও আবার কি অপয়া কথা! শুনলে গা জ্বলে যায়। তোমার যে কী হয়েছে আজকাল!

সত্যি "কি হয়েছেই" বটে!

নইলে—দিনের বেলাতেও নিঃশব্দে এঘর ওঘর ঘুরে বেড়ান যামিনীমোহন, জনশূন্য ঘরে পাখা ঘুরছে কি না তদারক করতে। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় আলো পাখা বন্ধ করে দিয়ে যাবার রেওয়াজ এ বাড়ীতে কোনকালেই নেই। সে দিকে দৃষ্টিও ছিলো না কারুর।

দৃষ্টিটা অকস্মাৎ ফিরছে বলেই কি অভ্যাসটাকে অকস্মাৎ ফেরানো যাবে?

হঠাৎ একদিন। আচমকা চীৎকার করতে থাকেন যামিনীমোহন এতো নবাবি কেন? নভেম্বরের ষোল তারিখ হয়ে গেলো আজ, এখনো চব্বিশ ঘণ্টা পাখা চালানো হচ্ছে। একধার থেকে পাখার ব্লেডগুলো খুলিয়ে রাখবো কাল। যাঁরা বেশী গরম হবে, তিনি যেন মাথায় আইসব্যাগ চাপিয়ে বসে থাকেন।

চেঁচামেচি যামিনীমোহনের স্বভাববিরুদ্ধ। চেঁচানোর জন্যে কেমন যেন অস্বাভাবিক দেখায় তাঁকে।

বাড়ীর সকলেই এদিক ওদিক থেকে মুখ বাড়ায়। কেই ভুরু কুঁচকে, কেউ ত্রস্ত বিস্ময়ে। শুধু প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে এসে দাঁড়ালেন সন্তোষিণী। ধিক্কারে দুঃখে লজ্জায় রাগে তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করেন—তোমার জ্বালায় কি আমি পাগল হবো? কি সুরু করছো ক্রমশঃ?

যামিনীমোহন কণ্ঠকে আরো রাশ ছাড়া এগোতে দেন—সুরু করবো না? ওদিকে যে সবদিক "সারা" হয়ে আসছে। মাসে কত করে ইলেকট্রিক বিল দিচ্ছি জানো? পঞ্চাশ বাহান্ন! এক পয়সা বার করছে কেউ নিজের গাঁট থেকে? এতো বাবুয়ানা কেন তবে, এতো বাজে খরচ কিসের জন্যে?

সন্তোষিণী গম্ভীর মৃদুকণ্ঠে বলেন—আজ ওদের দুষছো, কিন্তু জীবনভোর

তুমিই কি কম বাজে খরচ করেছো? বুঝে চললে কি আজ এই অবস্থা হতো? জমার খাতায় কতো থাকতো, তার হিসেব করেছো কখনো?

সামান্য কথা, সাধারণ কথা। তবু সন্তোষিণীর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই যামিনীমোহনের সমস্ত উত্তেজনা কেমন অদ্ভুতভাবে থিতিয়ে যায়। সন্তোষিণীর মুখের দিকে তাকিয়ে স্তিমিত শান্ত কণ্ঠে বলেন.....থাকতো? না? তাই বটে! জমার খাতায় কিছু রাখতে পারিনি কি বলো? তাই তো—জীবনভোর কি করলাম! অ্যাঁ!....আমাকে দু'খানা খাতা দিতে পারো? একখানায় যোগের অঙ্ক কসবো, একখানায় বিয়োগের। মিলিয়ে দেখবো, মিলিয়ে দেখবো....

সন্তোষিণী শঙ্কিত দৃষ্টিতে বলেন—কি মিলিয়ে দেখবে?

—ওই যে, দেখবো কী করলাম সারা জীবন। এতো যে রোজগার করেছি, কি ভাবে খরচ করেছি তাকে! কতটুকু কাজের খরচ করেছি, কতোখানি বাজে খরচ! দুখানা খাতা চাই দুখানা খাতা।

হাই ব্লাড প্রেসারের রোগী যামিনীমোহনকে কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ দেখায়।

সন্তোষিণী কোনরকমে ধরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেন তাঁকে ধীরে ধীরে বাতাস করেন মাথায়।

বুকটা কেমন কাঁপতে থাকে সন্তোষিণীর।

ওদিকে—অপমানে শয্যা নিয়েছেন মেজবৌ।

কারণ ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহেও তাঁর ঘরে পাখা চলে। কাজেই গায়ে বেজেছে তাঁরই বেশী।

ক্রুদ্ধ এবং রুদ্ধ গর্জ্জনে তিনি পতিদেবতাকে বলতে থাকেন—আলাদা এস্‌টাব্লিসমেণ্ট করতে পারার ক্ষমতা নেই তো বিয়ে করবার সখ হয়ছিলো কেন? বাপের ভরসায় বিয়ে করা শুধু বোকামী নয়, আইনতঃ দণ্ডনীয়!.....রীতিমত শাস্তি হওয়া উচিত এসব লোকের। উঃ এইখানে পড়ে আছি বলেই না এতো অপমান?

পরিমল সান্ত্বনারছলে বলে—বাবা তো আজকাল প্রত্যেককেই যা খুশি বলে বেড়াচ্ছেন, একা তোমাকে মীন্ করে কিছু—

—বোকোনা। বেশী বোকোনা তুমি। প্রধান লক্ষ্য আমি তা জানো? আমি কিন্তু এই বলে রাখছি—আসছে মাস থেকে আলাদা ব্যবস্থা করা চাই। না হলে—

পরিমল বলে—বাবা থাকতে আলাদা হয়ে গেলে আমি আর এ বাড়ীর অংশ পাব না জানো?

মেজবৌ তর্জ্জন থামিয়ে বলেন—তার মানে? কেন?

—ওই আইন। তাইতো এতো সয়েও চুপচাপ আছি। আর ক'টা দিনই বা? বাবার যে রকম হাই ব্লাড্প্রেসার, ক'দিন ভরসা?

পাশের ঘরে বড়বৌ কর্ত্তাকে বলছেন—মেজবৌ এবারে ঠিক আলাদা হবে। মরতে আমিই থাকবো পড়ে। বুড়ো শ্বশুরের গঞ্জনা খাবো, আর খেটে মরবো।

সুবিমল বলে—হ্যাঁ হ্যাঁ আলাদা অমনি হলেই হলো। কত ধানে কতো চাল পরিমল খুব বোঝে।

বড়বৌ অভিমানস্ফুরিত অধরে বলেন—সবাই সব বোঝে গো, তুমিই ন্যাকা। এই যে মেজঠাকুরপো—শুনতে পাই নাকি মোটা মোটা টাকার ইনসিওর করেছে—

সুবিমল রহস্যময় হাসি হেসে বলে—ও সব ইনসিওর টিওর বুঝি না বাবা, খালি লোক জানাজানি! এমনভাবে রাখবো কাকে পক্ষীতে টের পাবে না।

—কাকে পক্ষীতে টের পাবে না—মুরলা ছেলের কাছে ফিস্ফিস্ করে বলে, কাকে পক্ষীতে টের পাবে না, নিয়ে যা তুই, বেচে দিগে যা।....যেমন অসাবধানে যেখানে সেখানে সোনার গয়না ফেলে রাখে, তেমনি জব্দ হোক।

মুরলার হাতে একটা সুদৃশ্য পেনডেণ্ট, আর একটা ঝুমকো পাশা।

হিতাহিত বুদ্ধিহীন স্নেহান্ধ মুরলা ছেলের কষ্ট সহ্য করতে পারে না। ছেলে যে এখন হাত খরচের জন্যে যথেচ্ছ টাকা পায় না, এতে যেন বুক ফেটে যায় তার।

অভাবে স্বভাব নষ্ট।

দুর্ব্বুদ্ধি জাগে মুরলার মনে, দুর্ব্বুদ্ধি দেয় সে ছেলের কানে কানে।

অসাবধান মেয়ে গীতশ্রী কলেজ থেকে এসে যেখানে সেখানে খুলে রাখে গলার পেনডেণ্ট, কানের ঝুমকো পাশা।....রাখে বরাবরই, হঠাৎ একদিন তার ওপর শ্যেনদৃষ্টি পড়ে মুরলার। এদিক ওদিক চেয়ে তুলে নেয় চুপি চুপি, ভাবটা যেন শুধু লুকিয়ে রাখবে, অসাবধানী মেয়ে একটু জব্দ হোক।

কিন্তু দু'তিন দিন কেটে যায়, খেয়াল হয় না গীতশ্রীর। ধীরে ধীরে মুরলার

মধ্যে সৃষ্টি হয় লোভের। একদিন গায়ে পড়ে বলে গীতা তোর কানটা গলাটা খালি কেন? ঝুমকো কোথা গেলো? পেনডেন্ট?

গীতা অগ্রাহ্যভরে একবার গলায় ও কানে হাত দিয়ে বলে—কে জানে বোধ হয় টেবিলের ড্রয়ারে!

মুরলা হিতোপদেশের ভঙ্গীতে বলে—দেখিস বাবু সাবধান।

গীতশ্রী বলে—হুঁ সাবধান! বাড়ীতে কে এমন চোর ডাকাত আছে, যে সর্ব্বদা সাবধান হতে হবে?

মুরলা চোখ টেনে চিবিয়ে বলে—বিশ্বাসই বা কাকে? এই যে হরি আতোদিনের লোক, তোর বড়দার পকেট মারলো তো?

—আমি বিশ্বাস করি না।

বলে চলে যায় গীতশ্রী, আর মুরলা কুটিল আনন্দে উদ্ভাসিত মুখে চলে যায় ছেলের কাছে, ফিস্‌ফিস্ করে বলে—আমি বলছি তুই নিয়ে যা। কাকে পক্ষীতে টের পাবে না। বেচে যা হবে খবচ করে ফেলবি—মা হয়ে আজ তোকে আমি কু-মন্ত্রণা দিচ্ছি বটে, কিন্তু তোর শুকনো মুখ দেখলে যে বুক ফেটে যায় আমার—

চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ফোঁস ফোঁস করতে থাকে মুরলা।

সুব্রত চাপা বিরক্তিতে বলে—দিলে তো দিলে এমন জিনিস যে, ছুঁচো মেরে হাতে গন্ধ! ওতে আর ক'টা টাকা হবে? ক'দিনের খরচ? ছোটলোকের মতো নিঃশব্দে একা বসে হোটেলে খেয়ে আসতেও পারি না, একা বসে বসে সিনেমা দেখতেও পারি না। পাঁচটা বন্ধুবান্ধব নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করতে গেলে—

মুরলা কাতরভাবে বলে—কি করি বল? বাবার আজকালকার মেজাজ দেখেছিস তো?

—তা আর দেখিনি—সুব্রত বলে—বুড়োর কাছে আর আধলার পিত্যেস্ নেই। একটু খোঁটা দিয়ে কথা বললেই বলবে "কি করবো দাদু, যখন ছিলো তখন কি কিছুতে 'না' বলেছি?" কবে কী খাইয়েছেন, এখনো সেই গপ্পো মনে রাখতে হবে? আজকাল আবার কি এক বাতিক দেখেছো? চব্বিশ ঘণ্টা দু'খানা খাতা সামনে রেখে কী বিড়বিড় করে হিসেব করছে, আর খাতা দু'খানায় নোট করছে ব্যাপারটা কি বলোতো?

—জানিনে বাবা! দেখবার হুকুম তো নেই, সেদিন একটু জিগ্যেস

করেছিলাম—কি যে পাগলের মতন উত্তুর দিলেন! বললেন—"সারা জীবনের লেনদেন আর লাভক্ষতির যোগ বিয়োগ দিচ্ছি।.....এ কথার মানে আছে?

—না কোনো মানে নেই—ক্রুদ্ধ সুবিমল মায়ের ওপর গর্জন করছে—কোনো মানে নেই তোমার এ সব সেন্টিমেন্টের!

•

....গয়না হারিয়েছে—তাকে বার করবার জন্যে যা খুসি করবো আমি। আজ গীতার জিনিস হারিয়েছে কাল ওর বৌদিদের জিনিস হারাবে না, তার প্রমাণ আছে?...ছোট জিনিস বলে যদি আজ আগ্রাহ্য করা হয়, কাল যথাসর্ব্বস্ব যেতে পারে তা জানো? 'গুণিন্' এনেছি আমি, সব কটা ঝি চাকরকে 'চালপড়া' খাইয়ে ছাড়বো।

সন্তোষিণী বলেন—আহা চিরদিনের বিশ্বাসী লোক, কাজের লোক, ওদের ওভাবে উৎপীড়ন করলে মনে কষ্ট পাবে, কাজ ছেড়ে দেবে।

সুবিমল বলে—সেইটাই বলোনা স্পষ্ট করে, লোক ছেড়ে গেলে অসুবিধে হবে তোমাদের। কিন্তু সে ভাবনা করি না আমি, বাড়ীতে চোর পুষে রাখবো না, সোজা কথা! 'চালপড়া' 'তেলপড়া' যে উপায়ে হোক বার করবো।

দালান ভর্ত্তি লোক। যামিনীমোহন বাদে জড়ো হয়েছে বাড়ীর সবাই।

একটা কদাকার চেহারার লোক এসে বিড়বিড় করে কী ছাই পাঁশ মন্ত্র পড়ে এক মুঠো চাল নিয়ে হাতে দোলাতে দোলাতে বলে 'খা খা সবাই খা, যে নিয়েছে সে যমের বাড়ী যা'।

আতঙ্ক বিস্ফারিত চক্ষে সকলেই একটু পিছিয়ে যায়।....সাহস করে কেউ খাবে এ ভরসা নেই।

ঝি-চাকর চারটের মুখের অনমনীয় ভাব।

চুরি না করুক, 'চালপড়া' খাবার সাহস কারুক নেই। তাদের ওপর তম্বি চালায় মুরলা—পিছিয়ে গেলে চলবে না, চালপড়া খেতেই হবে। দেখা যাক কে সাধু কে চোর। হাত পাত, পাত শীগ্‌গীর!

বলা বাহুল্য কেউই পাতে না।

হঠাৎ গোবিন্দ এগিয়ে আসে—মেয়েলী ভঙ্গীতে বলে—আ মরণ, ভয়টা কি? নে না, খা কচমচিয়ে। কেঁপে মরছিস কেন? কই হে দাও তো দেখি তোমার চালপড়ার কী গুণ! দাও না হে—

গোটা কতক চাল মচমচিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ঝি-চাকরগুলোকে উদ্দেশ্য করে

বলে—এই তো দেখলি? কি কচুপোড়া হলো? দুটো দুটো খেয়ে নিয়ে পাপ চুকিয়ে দে। সব্বাই লাগাও—কেউ বাকী থাকবে কেন? বড়দা, মেজদা, মামী, বড়বৌদি, মেজবৌদি, বড়দি—

সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস করে ওঠে মুরলা—কী বললি হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া? আমি বিধবা মানুষ, ওই হলুদমাখা সেদ্ধচালগুলো গিলবো? যত কিছু বলি না, তত্তো বাড় বেড়ে যাচ্ছে কেমন? মা, এই তোমাকে বলে রাখছি কিন্তু, নিজের বাপের বাড়ীতে বসে যদি এই ভাবে দাঁড়িয়ে অপমান হতে হয়, তাহলে ছেলের হাত ধরে বেরিয়ে যাবো। পথে পথে ভিক্ষে করে খাই সেও মান্যের।

সন্তোষিণী সান্ত্বনার ভঙ্গীতে বলেন—এই সামান্য কারণে মন খারাপ করিস না মুরলা! ওই পাগলটার কথা আবার মানুষে ধরে?

ওদিকে—সুব্রত হাতমুখ নেড়ে চাকর দুটোকে শাসাতে থাকে।

একটা চাকর হঠাৎ গলা ছেড়ে প্রতিবাদ করে ওঠে—না বাবু না, ওসব সহ্য করবো না। গরীব পেয়েছেন বলে খামোকা চোর বলবেন?

সুব্রত ব্যঙ্গোক্তি করে ওঠে—আহাহা! ইস্....চোর বলবো কেন, "রামকৃষ্ণ পরমহংস" বলবো তোমাদের!.....সব কটা—একের নম্বরের চোর!....মার লাগালে তবে সব শায়েস্তা হয়।

চাকরটা বলে—খবরদার বাবু, ওসব মারধোরের কথা বলবেন না। গরীব পেয়ে যা খুশি করবেন, সে কাল চলে গেছে। এ হচ্ছে স্বাধীন গভোরমেন্টের রাজ্যি।

টিটকারি দিয়ে ওঠে পরিমল—হু' বডডো যে আজকাল লম্বা চওড়া কথা শিখেছিস দেখছি তোরা। বলি কেউ যদি না নেয়, বাড়ী থেকে জিনিষ উড়ে যাবে নাকি?

রীতিমত ঝড় বইতে থাকে জায়গাটায়।

মেজ কর্ত্তার কথার সায়ে মেজগিন্নী এক কথা বলেন, তার প্রতিবাদে বড়োগিন্নী আর এক কথা বলেন, সন্তোষিণী এদের মাঝখানে কিছু বলবার চেষ্টায় হাঁপাহাঁপি করতে থাকেন, গোবিন্দ দুই হাতের মুঠোয় দুই গাল ঠেকিয়ে গম্ভীরভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। ওদিকে দেখা যায় গৌরী বারান্দার পাশে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছে।......

চালপড়া হাতে কদাকার লোকটা আরো কদাকার মুখ করে হাঁ হয়ে চেয়ে থাকে।

ঠিক এই সময় সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে নেমে আসেন যামিনীমোহন। মুহূর্তে সব নিঃশব্দ হয়ে যায়।

একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সব দিক তাকিয়ে যামিনীমোহন শ্লেষের সুরে বলেন—কিসের অ্যাকটিং হচ্ছে এখানে?

কেউ উত্তর দেয় না।

—কি? সবাই হঠাৎ নীরব হয়ে গেলে যে? পালাটা তো বেশ জোর চলছিলো। কিসের পালা? মশক বধ কাব্য?

এবারে পরিমল ঈষৎ বিরক্ত সুরে উত্তর দেয়—কিছুর তো খোঁজ রাখেন না, হঠাৎ একটা দিকে নজর দিলে আর কি হবে? বাড়ী থেকে সোনা রূপোর জিনিস পর্য্যন্ত পাখা মেলে উড়ে যাচ্ছে আজকাল।

—যাচ্ছে বুঝি?—যামিনীমোহন হেসে ওঠেন। হেসে বলেন—ওটা তো কিছু নতুন কথা নয় পরিমল, সোনরূপো জিনিসটার চিরদিনই পাখা গজায়, সুযোগ পেলেই ওড়ে। রায়বাড়ীতে আরো কতো কি উড়তে আরম্ভ করেছে আজকাল, লক্ষ্য করেছো? উড়ছে রায় বাড়ীর সভ্যতা, ভব্যতা, শিক্ষা, সহবৎ। উড়ছে—লজ্জা সরম, মান ইজ্জৎ। একে একে সব উড়ে যাচ্ছে লক্ষ্য করোনি?....

অতঃপর গুণীনটার দিকে তাকিয়ে বলেন—তোমায় কে ডেকে এনেছে বাপু?

লোকটা সভয়ে সুবিমলের দিকে তাকায়।

—হুঁ। কতো মজুরি কবলেছে?...ভয় করবার দরকার নেই—বলে ফেলো। কতো মজুরি তোমার?

—পাঁচ সিকে।

—এই নাও। নিয়ে গেটের বাইরে চলে যাও।

পকেট থেকে বার করে দেন দুটো টাকা।

সুবিমল বিরক্তভাবে প্রতিবাদ করে—কোনো মানে হয় না। লোকটাকে ডাকা হয়েছিল—ওর ক্যাপাসিটির পরীক্ষা হয়ে যেতো। তাড়িয়ে দেবার দরকার কি ছিল?

যামিনীমোহন বড়ছেলের ক্ষুব্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীরস্বরে বলেন—

দরকার হয়তো একটু ছিল সুবিমল! সত্যিই যদি ওর কোন ক্যাপাসিটি থাকে, পরীক্ষাটা অন্যদিকে মারাত্মক হয়ে উঠতো কিনা কে বলতে পারে!

যামিনীমোহন আবার উঠে যান ওপরে।

গোবিন্দ হঠাৎ সকলের পাশ কাটিয়ে পিছন পিছন উঠে যায়। ওর ভাবনা হয় মামা পড়ে না যান। শুনেছে ব্লাডপ্রেসার রোগীর পক্ষে রাগটা নাকি মারাত্মক।

চাকর-বাকরগুলো এদিক ওদিক সরে যায়। সন্তোষিণীও যান।

বাকী সকলের সামনে মুরলা চাপা গলায় হাতমুখ নেড়ে বলে—আমার নিশ্চয় মনে হচ্ছে, আর কেউ নয়, ওই গোবিন্দ মুখপোড়ার কাজ! দেখছো না, কি রকম সুয়োগিরি করে পেছন পেছন উঠে যাওয়া হলো। হরি গিয়ে পর্য্যন্ত সব সময় হরির মতন বাবার হাতে হাতে মুখে মুখে ফরমাস খাটা হচ্ছে। কথাতেই আছে বাবা, অতিভক্তি চোরের লক্ষণ। এই যে আমার সুব্রত, কই বলুক দিকিন কেউ, ও কারুর খোসামোদ করছে। তোরাও তো সবাই ওর মামা।

—থাক বড়দি, সুব্রতর তুলনা আর দিও না। আরো অসহ্য!—বলে মুরলার সমস্ত উৎসাহে বরফ জল ঢেলে দিয়ে চলে যায় নির্ম্মল।

গোবিন্দ ওপরে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে বলে—মামা মাথা ঘুরছে না তো? মুখ দেখে তাই মনে হচ্ছে যে! কি দরকার ছিলো বাপু তোমার, সিঁড়ি ওঠা উঠি করার? ওরা চালপড়া তেলপড়া, করে মরছিলো, মরতো!...নাও একটু শুয়ে পড়ো। প্রায় জোর করেই শুইয়ে দিয়ে পাখার রেগুলেটারটা ঘুরিয়ে দেয়।

যামিনীমোহন মিনিটখানেক চুপ করে থেকে বলেন—তোর কি মনে হয় বলতো গোবিন্দ?

—কিসের মামা?

—কে নিয়েছে জিনিসটা?

—কে জানে মামা. কাক চিলেও নিয়ে যেতে পারে।

দুই হাত উল্টে হতাশার ভঙ্গি করে গোবিন্দ।

যামিনীমোহন চোখ বুজে শুয়ে থাকেন।

ঘুমন্ত ভেবে গোবিন্দ নেমে যায়।

নিঃশব্দে ঘরে ঢোকে সুব্রত। টেবিলের ওপর থেকে সিগারেটের টিনটা তুলে নিয়ে সন্তর্পণে গোটা কয়েক সিগারেট বার করে নিয়ে পকেটে পোরে।

হঠাৎ চোখ মেলে তাকান যামিনীমোহন।

—কে ও? ওঃ সুব্রতবাবু?...বুড়ো হঠাৎ জেগে ওঠায় বড়ো বেশী বিব্রত হয়ে পড়েছো, না? আহা!

সুব্রত একটু ইতস্ততঃ করে বলে ওঠে—কেন কি হয়েছে? আপনার রিষ্টওয়াচটায় দেখছি দম দেওয়া হয়নি, বন্ধ হয়ে রয়েছে।

ভাবটা যেন টেবিলে পড়ে থাকা ঘড়িটাই লক্ষ্য করছিলো সে।

যামিনীমোহন হেসে বলেন—আর ঘড়ি! ঘড়ির মালিকেরই দম বন্ধ হয়ে আসছে ক্রমশঃ। কিন্তু তোমাকে আজকাল বড্ডো অসুবিধেয় পড়তে হয়েছে, তাই না বিব্রতবাবু?

—অসুবিধে কি? কিসের অসুবিধে?

ফাঁকা ফাঁকা উত্তর দেয় সুব্রত।

—আর কিছু নয়। কতকগুলো সদভ্যাস করে ফেলেছো, এখন তার রসদ জোটানো শক্ত হচ্ছে, এই আর কি!....আমারই অন্যায়। অসঙ্গত প্রশ্রয় দিয়ে এসেছি চিরদিন। ভাবতাম—দুহাতে পয়সা ছড়িয়ে, সকলের আশ মিটিয়ে দেবো। হাত দুটো যে একদিন পঙ্গু হয়ে যাবে, খেয়াল করিনি কোনদিন।

শেষের কথাগুলো প্রায় আত্মস্থভাবেই বলেন যামিনীমোহন!—বলে চোখ বোজেন। নিমীলিত দুই চোখের কোণ বেয়ে ছোট দুটি ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে।

সুব্রত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে যামিনীমোহন তাকান।

শান্তস্বরে বলেন—দাদুভাই শোন!

—কি বলছেন?

ওই ড্রয়ারটা খোল। ডান দিকেরটা নয়, বাঁ দিকেরটা।

সুব্রত ব্যাপারটা বোঝে না। খোলে।

যামিনীমোহন বলেন—কি আছে ওখানে দেখতো। ক'টা টাকা।

—সাত টাকা চৌদ্দ আনা।

—আচ্ছা! টাকা ক'টা নিয়ে যাও তুমি, চোদ্দ আনা থাক। পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা, কি বলো?

সুব্রত অপ্রতিভ মুখে বলে—এ টাকা কি হবে?

যামিনীমোহন আবার চোখ বোজেন। বিষণ্ণ কৌতুকে বলেন—নিয়ে যাও।

যে ক'টা দিন অপরের নেশার ভাঁড়ারে সিঁদ না দিয়ে চলে। সব সহ্য হয় ভায়া, আমার গিন্নীটি আর ওই টিনটি, এই দুটি বস্তুর উপর কারুর নজর পড়লে সহ্য হয় না।

সুব্রত মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠোঁট কামড়ায় তারপর এক সময় বোঁ করে বেরিয়ে যায়। অবশ্য টাকা ক'টা পকেটস্থ করেই।

কিছুক্ষণ পরে সন্তোষিণী ঘরে ঢোকেন।

ঘরের এদিকে ওদিকে টুকিটাকি গোছান। পাখাটা একটু কমিয়ে দেন, জানালার পর্দ্দাটা টেনে দেন—জীর্ণ বিবর্ণ পর্দ্দাগুলো একসময় দামী ছিলো বলা যায়। আর দামী ছিল বলেই যেন দৈন্যটা বেশী চোখে পড়ে।

অতঃপর টেবিলের কাছে এসে সিগারেটের টিনটা খুলে দেখেন। দেখে চমকে উঠে সবিস্ময়ে বলেন—অ্যাঁ, এরি মধ্যে এতোগুলো খেয়ে ফেলেছো।—এতগুলো খেলে কখন? এই তো সকালে ভর্ত্তি টিন ছিল।

চিরদিনের কৌতুকপ্রিয় যামিনীমোহনের মুখে একটু মৃদুহাসি ফুটে ওঠে।

—জীবন ভোর কতো ভর্ত্তি টিন খালি করলাম আজ ওই ক'টায় আশ্চর্য্য হচ্ছো?

সন্তোষিণীর মুখেও অনেকদিন পরে একটু স্নিগ্ধ হাসি ফুটে ওঠে। উঁচু পালঙ্কের উপর গুছিয়ে উঠে বসে হাসিমুখে বলেন—চিরদিন যা করেছো, চিরকাল তাই করা চলবে?

—চলে না—না? কিন্তু কেন চলে না বলো তো?

যামিনীমোহন আস্তে আস্তে নিজের ডান হাতখানি সন্তোষিণীর একখানি হাতের ওপর রাখেন।

অনির্ব্বচনীয় ভাব ফুটে ওঠে দু'জনের মুখে।

যেন বাইরের দুর্যোগে বিক্ষুব্ধ দু'টি প্রাণী, সন্ধান পেয়েছে এক পরম আশ্রয়ের।

তিন

ক'দিন পরে—

খাবার দালানে রাত্রে খেতে বসে গোবিন্দ চেঁচায়—বড়দি, বড়দি শোনো এদিকে। আঃ কানের মাথা খেয়ে বসে আছ নাকি সব?

মুরলা বিরক্তচিত্তে এসে দাঁড়ায়।

ঝঙ্কার দিয়ে বলে—কি হয়েছে কি? ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছিস কেন?

—না তা চেঁচাব কেন? তোমরা সব কানে তুলো গুঁজে বসে থাকবে, আর আমি কোকেল সুরে কুহু করবো।...দুধ আনো দিকি একবাটি, বেশ বড় দেখে বাটির। তোমার তো আবার যে ছোটো নজর, একটা মধুপর্কের বাটিতে দুধ এনে হাজির করবে হয়তো।

মুরলা আরও ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে—হ্যাঁ, আমার ছোটো নজরের গুণেই তো সংসারে আজকাল এমন অবস্থা হয়েছে। তা বলি খুব তো লম্বা হুকুম হচ্ছে। বড়ো—একবাটি দুধে হবে কি। কোন্ নারায়ণের ভোগে লাগানো হবে?

গোবিন্দ হা হা করে হেসে ওঠে—তা' বলেছো প্রায় কান ঘেঁসে। নারায়ণের নয়, শ্রীমান গোবিন্দর ভোগ লাগাতে হবে। দেখছো কি হাঁ করে? বুকের রোলার তুলবো এবার। রোলার জান তো? এ বছরে রোলার, আসছে বছর মটরগাড়ী। আমাদের জিমন্যাস্টিক ক্লাবের এ্যানুয়াল কম্‌পিটিশন হচ্ছে বুঝলে? কিছুদিন ভাল করে ঘি দুধ মাছ মাংস খেয়ে নেওয়া দরকার।

মুরলা বিদ্রূপ কুঞ্চিত মুখে বলে—দরকার তো বুঝলাম! আসবে কোথা থেকে?

—আসবে আকাশ থেকে? বলি—যাঁরা নাদুস নুদুস দেহখানি নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা পাখার তলায় পড়ে থাকেন, তাঁদের ভাগ্যে একটু কম পড়লেই বা! আমার দরকারটা দেখতে হবে তো? বুকে রোলার তোলা চারটিখানি কথা নয়, বুঝলেন মশাই? যাও যাও, দুধটা আনো, খাওয়া হয়ে গেলো যে!

মুরলা ঠোঁট উল্টে বলে—মুখ্যু আর কাকে বলে, মুখ্যু কি আর গাছে ফলে? উনি গুণ্ডামী করতে যাবেন, আর বাড়ীর সবাই বঞ্চিত থেকে ওঁকে দুধটি খাওয়াবে! হুঃ! পাঁচজনের ভাগ থেকে কেটে তোকে দুধের বাটি এনে দিতে দায় পড়েছে আমার! ভারী একেবারে বাপের ঠাকুর!

গোবিন্দ সাশ্চর্যে বলে—বাঃ বেশ! তা'হলে আমার গতিটা কি হবে? দুধ ঘি মাছ মাংস এসব না খেলে গায়ে জোর বাড়ে? কম্‌পিটিশনে হেরে গেলে বুঝি খুব মুখ উজ্জ্বল হবে তোমাদের?

ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন সন্তোষিণী—হাতে একবাটি দুধ। নামিয়ে দেন গোবিন্দর প্লাতের কাছে। ঈষৎ অনুযোগের স্বরে বলেন—ওসব কি ছাই পাঁশ খেলা গোবিন্দ? হাত পা নিয়ে চাল্লি, কল্লিস, সে বরং ভালো, বুকের ওপর রোলার তোলা কি খেলা?'

—ওই তো খেলা গো মামী? ঘরে বসে তাসখেলাকে কি আর খেলা বলে? এরপর বুকে হাতী তুলবো, বুঝলে? হাতী!

পরমানন্দে বাঁ হাতটা দিয়ে নিজের বুকের ওপর থাবড়া মারে গোবিন্দ।

মুরলা অস্ফুট স্বরে বলে গলায় দড়ি!

গোবিন্দ উল্লিখিত নাদুস নুদুস চেহারা এবং পাখার তলায় শুয়ে থাকা নিয়ে বাড়ীতে বেশ একটু ঢেউ বয়ে যায়। গোবিন্দর দুঃসহ স্পর্দ্ধায় স্তম্ভিত বড়বৌ রান্নাঘরে ভাঁড়ারঘরে আস্ফালন করতে থাকেন, মেজবৌ আরক্তমুখে এক আধটা শক্ত শক্ত মন্তব্য করেন, মুরলা সন্তোষিণীর বুদ্ধির এবং গোবিন্দকে আস্করা দেওয়ায় ধিক্কার দেয়! আর নতমুখী গৌরী নীরবে সমস্ত মন্তব্য হজম করে গুছিয়ে গুছিয়ে খেতে দেয় সকলকে। হাঁড়ি হেঁসেল গোছায়। বাটিতে বাটিতে দুধ গরম করে।

বড়বৌ যখন মন্তব্য করেন—অন্য সংসার হলে পরগাছার এত বাড় বাড়তো না, নেহাৎ নাকি বারো ভূতের সংসার তাই বড়বৌয়ের নিজের সংসার হলে উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়তেন—তখনো নীরব থাকে গৌরী। অশ্রুজলের সাক্ষী থাকে শুধু ভাতের থালাটা।

তারই মাঝখানে একবার মুরলা তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করে—কি গো নতুন বৌ, তোমার আবার কি হলো? পাতের ভাত নড়ছে না কেন? কর্তার মতন রাবড়ি রসগোল্লা চাই নাকি?

সিঁড়ির পাশের ঘরে একতলায় ছোট্ট ঘরটা। সময়টা মাঝ রাত্রি।

গোবিন্দ শুয়ে শুয়ে ঘামছে, আর গৌরী নিঃশব্দে হাতপাখা নিয়ে হওয়া করছে। এঘরে পাখা নেই! হঠাৎ একসময় গোবিন্দর চমক ভাঙে—একী তুমি ঘুমোওনি? ওকি চোখে জল কেন? সর্দ্দি হয়েছে? মাথা ব্যথা করছে? টিপে দেবো? কি মুস্কিল! বাকরোধ হয়ে গেলো নাকি!

গৌরী হঠাৎ পাখাখানা ফেলে দিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে উপুড় হ'য়ে শুয়ে পড়ে। সমস্ত দেহ ফুলে ফুলে ওঠে তার কান্নার আবেগে।

গোবিন্দ নিরীক্ষণ করে বলে—হুঁ বুঝেছি! পেট কামড়াচ্ছে।...বলতে হবে না, খুব বুঝেছি। পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠছে, কেমন? বলতে হয় এতোক্ষণ? তা' নয় বসে বসে ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ করে কাঁদছে। বোসো মামীর ঘর

থেকে যোয়ানের আরক আছে নিয়ে আসি একটু। খাবার সঙ্গে সঙ্গে আগুনে জল পড়বে।

গোবিন্দ উঠে যোয়ানের আরক আনার তোড়জোড় করতেই গৌরী উঠে বসে ওর হাত ধরে ফেলে। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে—তুমি কি সত্যি পাগল? ওঁরা তো তা'হলে মিথ্যে বলেন না। সত্যি তোমার কি কোনো বোধ শোধই নেই?

—জানি না বাবা।—গোবিন্দ দুই হাত উল্টে বলে—হেঁয়ালি বুঝি না। কি বলবে পষ্ট করে বলো, ব্যস মিটে যাক।

গৌরী স্থির স্বরে বলে—বলছি তুমি কি কিছুই করতে পারো না?

—পারি না মানে। কোন্‌টা পারি না তাই শুনি?

চ্যালেঞ্জের ভঙ্গীতে বালিশের ওপর চাপড় মারে গোবিন্দ।

—কোন্‌টা পারো? পুরুষ মানুষ কে না রোজগার করে, তুমি কই পারো? বটঠাকুররা, নির্মল ঠাকুরপো, সকলেই তো রোজগার করছেন—

গোবিন্দ অবজ্ঞাভরে বলে—ওঃ রোজগার।....তা' কি করবো? বি এ-এম এ, পাশ করলে, সবাই অমন কোটপেণ্টুল পরে অফিস যেতে পারে। বলি বুকের ওপর রোলার তুলতে পারে বটঠাকুররা? আমার মতন তলবায় বোল্ তুলতে পারে তোমার নির্মল ঠাকুরপো? হুঁঃ।

গৌরী মিনতির ভঙ্গীতে বলে—মাথায় দায়িত্ব চাপলে, তুমিও যেমন করে হোক দুটো পেট চালাতে পারবে।....চলো না গো, আমরা কোথাও চলে যাই।

গোবিন্দ অবাক দৃষ্টিতে বলে—চলে যাই মানে? বাড়ী ছেড়ে চলে যাবো কোথায়? যাবোই বা কেন খামোকা?—আমায় বলে পাগল। মাথাটা তোমারই খারাপ হয়ে গেছে নতুন বৌ।

চার

গোবিন্দর ক্লাবের মাঠে আজ প্রতিযোগিতার আসর।

ছেলেদের সমবেত সঙ্গীত, ব্যাণ্ড পার্টি, পুলকিত দর্শকগণ। গোবিন্দর বাড়ী থেকেও এসেছে কেউ কেউ। কুচোকাচা ছেলেরা, দুটো চাকর, রায় বাহাদুর স্বয়ং। পাড়ার মাথা তিনি। তিনিই আজ এ সভার প্রেসিডেন্ট।

—মোটা একগাছা ফুলের মালা চেয়ারের হাতলে ঝুলছে। সামনে টেবিলে ফুলের তোড়া।

নানা জনের নানা খেলা চলছে।

গোবিন্দর ভাগ্যে বরাবর জুটছে প্রশংসার করতালি।....

ভাইপো ভাইঝিরাও উল্লসিত আনন্দে সেই করতালিতে যোগ দিচ্ছে। রায় বাহাদুর শঙ্কিত উৎকণ্ঠায় দেখছেন গোবিন্দর অসম-সাহসিকতা। এক এক সময় ভয়ে চোখ বুজছেন?

গোবিন্দকে কি এতো ভালবাসেন তিনি?

নিজেই অবাক হয়ে যান রায় বাহাদুর যামিনীমোহন। গোবিন্দকে তো কোনোদিন ভালো করে তাকিয়েও দেখেননি আগে। সংসারে আছে—থাকে, খায় দায়। লেখাপড়া শিখলে না বলে তার প্রতি বরাবর বরং একটা অবজ্ঞাই ছিলো।

তবে? গোবিন্দর বুকে রোলার তোলা দেখে রায় বাহাদুর যামিনীমোহনের বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়ে কেন?

মুর্খ, বর্ব্বর, গোঁয়ার গোবিন্দ কোন্ ফাঁকে জায়গা করে নিয়েছে—রায় বাহাদুর যামিনীমোহনের শিক্ষিত সভা মার্জিত চিত্তের একটি কোণে?

ক্লাবের সেক্রেটারী এসে গোবিন্দর অজস্র গুণাগান করতে থাকেন যামিনীমোহনের কাছে। ফিরিস্তি দেন কবে কোথায় কি অসম-সাহসিকতার কাজ করেছে সে, নির্বিচারে করেছে পরোপকার।

ভদ্রলোক অনেক কিছু বলে শেষ পর্য্যন্ত সহাস্যে বক্তৃতার উপসংহার করেন—ছেলেটা একটু বোকা বটে, কিন্তু ভারী সরল। মহাপ্রাণ ছেলে। আর ওর একমাত্র গর্বের বস্তু কে জানেন তো। আপনি। দলের ছেলেরা ওকে "রায় বাহাদুর ভাগ্নে" বলে ক্ষ্যাপায়, ওর তা'তে মহা আনন্দ।

বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন যামিনীমোহন। বিনয়সূচক প্রতিবাদ করতেও ভোলেন।

সব কিছুর শেষে—

বিজয় গৌরবে উৎফুল্ল গোবিন্দ দু'হাতে বয়ে নিয়ে আসে পুরস্কারলব্ধ ভারী ভারী দুটো 'কাপ'। এনেই দুম্ করে বসিয়ে দেয় যামিনীমোনের পায়ের কাছে যেন অনেক সাধনায় অর্জ্জিত পুষ্পমাল্য নিয়ে এসে অর্পণ করলো আরাধ্য দেবতার পদপ্রান্তে।

রায় বাহাদুর তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন।

দেবু, রুণু, চাঁদা হৈ হৈ করে ওঠে। আশপাশের সমস্ত দর্শক হাততালি দিয়ে স্ফূর্তির হাসি হাসতে থাকে।

অভিভূত যামিনীমোহন গোবিন্দর দুই কাঁধে দুই হাত রাখেন। কষ্টে রুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করে বলেন—হাড়গোড়গুলো আস্ত আছে তো হতভাগা? প্রাণটা আছে খাঁচার মধ্যে?

গোবিন্দ হঠাৎ মাথা নীচু করে।

কেন কে জানে, এই কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খ বর্ব্বরের চোখ দিয়ে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে।

গৌরী বসে আছে জানলায়।

মুরলা এসে বলে—একি গো নতুন বৌ, আকাশ পানে চেয়ে বসে আছো যে? ভাসুরদের অফিস থেকে ফেরবার সময় হয়ে গেলো, এখনো ময়দা মাখা হয়নি, কুটনো কোটা হয়নি, কি ব্যাপার? ওদিকে উনুন জ্বলে খাক্ হয়ে যাচ্ছে।.....তখনি বলেছিলাম মাকে, বামুন ছাড়িয়ে দিয়ে কদিন চলবে?

কে জানে কোন্ ফাঁকে সমগ্র সংসারের দায়িত্ব এসে পড়েছে। এই ছোট্ট মেয়েটার মাথায়। নিজেই সে স্বেচ্ছায় ধীরে ধীরে আয়ত্ত করে নিয়েছে সমস্ত কাজ। হয়তো ভাবে গোবিন্দর অক্ষমতার ত্রুটি যদি তার কাজের দ্বারা পুরণ হয়।

মুরলার ডাকে চমকে উঠে পড়ে সে।

বড়ো বৌ মুচকি হেসে বলেন—নতুন বৌ কি আর আজ এখানে আছে? দেহটাই আছে, মন প্রাণ ক্লাবের মাঠে পড়ে আছে। আহা, কর্তা বুকে রোলার তুলেছেন, ভেবে ভেবে গিন্নীর বুক দশহাত হয়ে উঠেছে গো। তাই জানলা পানে তাকিয়ে দেখছেন কখন কলির ভীম বুকে সোনার মেডেল দুলিয়ে বাড়ী ফেরেন।

গৌরী তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে ঢোকে।

এই সময় সিল্কের ব্লাউজ, হাইহীল জুতো, ভ্যানিটিব্যাগ লিপষ্টিক কাজলে সজ্জিত মেজবৌ এসে দাঁড়ান, বলেন—নতুন বৌ! এ কি? কি ব্যাপার। এখনো চায়ের জলটা পর্যন্ত চাপাওনি? আশ্চর্য্য। চমৎকার ব্যবস্থা হয়েছে বটে আজকাল! আচ্ছা থাক, এমনিই যাচ্ছি বাইরে খেয়ে নেবো। গট্‌গট্ করে চলে যান তিনি।

গৌরী ছুটে গিয়ে পথ আগলায়।

বলে—দাঁড়ান মেজদি, দু'মিনিট। চট করে এক কাপ চা করে দিচ্ছি জানতাম না তো আপনি বেরোবেন। জানলে এতোক্ষণে—

মেজবৌ টানা তীক্ষ্ণ সুরে বলেন—এর আর জানাজানি কি? দু ঘণ্টার জন্যে একটু সিনেমায় যাবো, সে খবর বাড়ীসুদ্ধ লোককে ধরে ধরে জানিয়ে রাখা উচিত ছিল বুঝতে পারিনি। থাক্ না, থাক, অতো কষ্ট করবার কী দরকার!

গৌরী তবু তাড়াতাড়ি কেটলী নিয়ে চড়াতে যায়।

কোন্খান থেকে গীতশ্রী এই অপূর্ব অভিনয়ের দর্শকের পার্ট গ্রহণ করেছিলো কে জানে, এখন নেমে আসে মঞ্চে।

কঠিন দৃঢ় হস্তে গৌরী হাত থেকে কেটলীটা নিয়ে নামিয়ে রেখে মেজবৌয়ের দিকে একবার জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে রূঢ় গলায় বলে—নাঃ কিছু দরকার নাই নতুন বৌদি, রেখে দাও। কলকাতা শহরে পথে বেরিয়ে কেউ চায়ের অভাবে গলা শুকিয়ে মারা পড়ে না।...কই কোথায় তোমাদের ময়দা আছে দাও তো, মেখে দিচ্ছি। তুমি ততক্ষণ কুটনো কুটে দাও।

গৌরী কুণ্ঠিতভাবে বলে—তুমি এইমাত্র কলেজ থেকে খেটেখুটে এলে ঠাকুরঝি।

—আরে দূর, সে তো দেড়ঘণ্টা হয়ে গেছে। আমারও বড্ডো অভ্যাস খারাপ হয়ে যাচ্ছে, কিছু করা দরকার। কাল থেকে দিও দিকিন কিছু কিছু কাজ।

পাঁচ

দিন যায়। সংসারের ধূমায়িত অশান্তির আগুন উত্তরোত্তর আত্মপ্রকাশ করে।

যামিনীমোহন আর একটু খিটখিটে হন, সন্তোষিণীর শিথিল মুষ্টি থেকে সংসার তরণীর হালটা আর একটু খসে পড়ে।......

শুধু বিকার নেই গোবিন্দর, আর বোধশোধ নেই ছোট ছেলেমেয়েগুলোর।

গোবিন্দর বুকে রোলার তোলার পর থেকে 'গোবিন্দকা'কে তারা প্রায় পুজো করতে সুরু করেছে। ছাড়তে চায় না। গোবিন্দ লিলির চেন ধরে বেড়াতে যায়—আগে-পিছে দেবু রুণু, হয়তো বা মণি চাঁদু, গোবিন্দর স্কন্ধে।

গোবিন্দ তবলা সাধে, ওরা এসে কাড়াকাড়ি করে তবলায় চাঁটি দেবার জন্যে।...ওদের জগৎটা যেন আলাদা। সেখানে মালিন্য নেই, অসন্তোষ নেই, হিংসা নেই, কুটিলতা নেই।

শুধু সব সময় সজাগ দৃষ্টি থাকে গোবিন্দর, যামিনীমোহনের সুবিধে অসুবিধের প্রতি।

জুতো ঝেড়ে গুছিয়ে রাখে—খাটের তলায়, সিঁড়ির পাশে। দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম সাজিয়ে রেখে যায় টেবিলে। নিয়মিত মাখিয়ে দেয় তেল, কাছে থাকলেই হাতের কাছে এগিয়ে দেয় সিগারেটের টিন, বেরোবার সময় হাতে তুলে দেয় ছড়ি।

যামিনীমোহন অবসর পেলেই সামনে সেই খাতা দুইখানা মেলে ধরে বিড়বিড় করে মিলোতে থাকেন—সারা জীবনের খরচের হিসাব।....পাগলামী ছাড়া আর কি?

এমনি হঠাৎ একদিন সুব্রত এসে গীতশ্রীকে অনুরোধ করে বসে—ছোটমাসী একটা কথা রাখবে?

—বলুন কি হুকুম?

—আঃ আগে থেকেই ঠাট্টা সুরু হলো তোমার? বলছি একটু দেশের কাজ করো না?

—দেশের কাজ? সেটা আবার কি চারপেয়ে বস্তু?

—জানি তুমি খালি হেসে ওড়াবে। কথা হচ্ছে—আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে একটা "চ্যারিটি পারফরম্যান্সের" আয়োজন করছি বুঝলে? তাইতে—

গীতশ্রী বাধা দিয়ে বলে তা' চ্যারিটিটা কাদের জন্যে? তোমাদের এই বন্ধু গোষ্ঠীর জন্যে বোধহয়? আহা বেচারা তোমরা। সত্যিই এমন দুঃস্থ আর কে আছে? সপ্তাহে পাঁচদিন বৈ সিনমা দেখতে পারছো না, দিনে এক টিনের বেশী সিগারেট পোড়াতে পারছো না, মাসে পাঁচ-সাতদিন ছাড়া হোটেল রেষ্টুরেণ্টে খাওয়া জুটছে না, এর থেকে শোচনীয় অবস্থা আর কি হতে পারে?

—নাঃ, ছোটমাসী, তুমি কখনই সিরিয়াস হতে পারবে না। টাকা তুলবো আমরা—রিফিউজিদের জন্যে। উঃ দেখোনি তো গিয়ে শিয়ালদা স্টেশনে? দেখলে—জ্ঞান থাকে না।...দুটো চারটে লোকেরও যদি উপকার করতে পারি—

সুব্রতর কথার সুরে নাটকীয় আবেগ।

গীতশ্রী হেসে বলে—তুই করবি পরোপকার? পরের দুঃখু দেখে তোর বুক ফাটে? বড্ডো যেন ভূতের মুখে রামনামের মতো শোনাচ্ছে রে?

—ওই তো ছোটমাসী, ভাল কাজ করতে গেলেই লোকের সন্দেহ-ভাজন হতে হবে, জগতের রীতিই এই। অথচ আমার এক বন্ধু, যদিও আমার চেয়ে কিছু বড়ো, সুরেশ লাহিড়ী, কি দুর্দান্ত বড়লোক, তিনখানা গাড়ী আছে তাদের বাড়ীতে, সে পর্যন্ত সেদিনকে শিয়ালদায় গিয়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিলে।

গীতা মুখে রুমাল দিয়ে হেসে ওঠে—দেখিস ভদ্দরলোক সেই অশ্রুসাগরে নিজে ভেসে চলে যায়নি তো? টেনে আনতে পেরেছিলি?

সুব্রত রেগে ওঠে—থাক্ তবে বলবো না। মানুষের মধ্যে যে মহত্ত্ব আছে সে তো মানবে না তোমরা? সুরেশ লাহিড়ীই তো এই প্রস্তাব তুলেছে। ও বলেছে—গোড়ায় সমস্ত খরচ ও দেবে, তারপর, তারপর টিকিট বিক্রির টাকা থেকে খরচাটুকু তুলে নিয়ে লাভের টাকা সমস্ত দিয়ে দেবে উদ্বাস্তু ভাণ্ডারে।

গীতশ্রী বলে—লাভ থাকবে তো? কিন্তু এতো ঝঞ্ঝাটে কাজ কি বাপু? তার চেয়ে তোর সেই দুর্দান্ত বড়লোক বন্ধু নিজেই কিছু টাকা দিয়ে দিক না সাহায্য ভাণ্ডারে?

—বাঃ। তাহলে আর পাঁচজনের মনে প্রেরণা জাগানো যাবে কি করে? নাঃ ভেবেছিলাম তোমার কিছু সাহায্য পাবো—

গীতশ্রী এবার হাসি থামিয়ে বলে—তা' আমার দ্বারা কি হতে পা‍ তোদের?

—কি না হতে পারে? তোমার বান্ধবীদের মধ্যে থেকে নাচিয়ে-গাইয়ে মেয়ে জোগাড় করতে পারো, তালিম দিয়ে তৈরি করতে পারো, পরিচিত বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের কাছে গিয়ে টিকিট বিক্রি করতে পারো। এসব ব্যাপারে মেয়েদের সাহায্য না হলে অচল।

গীতশ্রী কি ভেবে—আচ্ছা দেখি তোদের কিছু করতে পারি কিনা। সত্যি কিছু কাজের কাজ যদি করিস, আমার সায় আছে।

অতঃপর দেখা যায় গীতশ্রীকে ছোট ছোট মেয়েদের নিয়ে তালিম দিচ্ছে—গানের, আবৃত্তির। ঘুরে বেড়াচ্ছে সুরেশ লাহিড়ীর গাড়িতে এখানে ওখানে।

"বিচিত্রানুষ্ঠানে"র বিচিত্র কাজে একতিল সময় নেই তার।

সুরেশ লাহিড়ী বলে—আপনাকে আমাদের মধ্যে না পেলে যে এ ব্যাপারে কি করে ম্যানেজ করে তুলতাম গীতশ্রী দেবী!

গীতশ্রী কষ্টে হাসি চেপে বলে—'দেবী' 'টেবী' বলে অতো কষ্ট করছেন কেন? বন্ধুর সুবাদে আমাকে বরং 'ছোট মাসী' বলুন না?

সুরেশ লাহিড়ী যেন ভারী আহত হয়। দুঃখিত ভাবে বলে—আপনি যে কেন এমন করেন? আমার মনের ভেতরটা কি আপনি দেখতে পান নি?

—ওমা সে কি? পরম বিস্ময়ের ভান করে গীতশ্রী—তাই আবার দেখা যায় নাকি? আমার কি দিব্যদৃষ্টি আছে?

দিব্য দৃষ্টির দরকার হয় না, একটু করুণা দৃষ্টি থাকলেও দেখা যেতো গীতশ্রী দেবী! আপনাকে কি করে বোঝাবো আমার মনের অবস্থা, আমি আপনার জন্যে মরতে পারি গীতশ্রী দেবী!

—দোহাই আপনার, ও চেষ্টাটা আর করবেন না। মরাটরা আমার কেমন সহ্য হয় না!

গীতশ্রী এই লোকটার বোকার মত কথাবার্ত্তা শুনে মনে মনে হাসে বটে, তবু কিছু প্রশ্রয় কি দেয় না?

স্তুতিগানের মোহ, বুদ্ধিসম্পন্ন লোককেও একটু নির্বোধ করে তোলে বৈকি।

তাছাড়া কাজ কিছু হোক না হোক. "একটা কিছু করছি" মনে করে ব্যস্ত থাকার মধ্যেও কতকটা আত্মতৃপ্তি আছে। তাই গীতশ্রীকে যেখানে সেখানে দেখা যায় সুরেশ লাহিড়ীর সঙ্গে সঙ্গে। অবশ্য সুব্রতও সঙ্গে থাকে অনেক সময়। আর সেটাই গীতশ্রীর বাড়ীর লোকের কাছে ছাড়পত্র।

কিন্তু তবু একদিন এটা বিশেষ করে চোখে ঠেকলো একটা ব্যাপার থেকে।

বাড়ীতে ধোবা এসেছে।

পর্বতপ্রমাণ কাপড় জমা হয়ে রয়েছে এক পাশে। খাতা-পেন্সিল হাতে মেজবৌ।

জ্বলন্ত সিগারেট ধরা হাতটাকে আর একটা হাতের সঙ্গে পিছন দিকে আবদ্ধ করে যামিনীমোহন পায়চারি করে বেড়াচ্ছিলেন—হঠাৎ চোখ পড়লো এই দিকে।

ওঃ তাই। তাই ধোবার খরচ মাসে পঞ্চাশ টাকা।

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ধোবাটাকেই প্রশ্ন করেন—তুমি কি আজকাল মাসে একবার করে আসছো মতিলাল?

'তুমি' সম্বোধনে ভীত মতিলাল করজোড়ে বলে—আজ্ঞে না কর্ত্তাবাবু, প্রত্যেক রবিবার আসি আমি।

—হুঁ। খবরের কাগজ খুললেই চোখ পড়ে বাঙলা দেশে "ভাত নেই, কাপড় নেই।" এ বাড়ীটা বোধহয় বাঙলা দেশের বাইরে, কি বলো মেজবৌমা?

মেজবৌমা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলেন—তার আর আমি কি করবো বলুন? ইচ্ছে হয় হিসেব করে দেখুন, আমার ঘরের ক'খানা জিনিস যাচ্ছে। একা গাতীই তো সাতদিনে সাত সেট্ শাড়ী ব্লাউজ বদলায়।

একটু অপেক্ষা করে শ্লেষের সুরে আবার বলে—অবিশ্যি দরকার হয়। সর্বদা বাইরের কাজে ঘোরে, বড়লোকের গাড়ীতে যাওয়া-আসা করা—

যামিনীমোহন প্রশ্ন করেন—হুঁ লক্ষ্য করছি বটে, তিনি আজকাল খুব উড়ছেন। কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

—কি করে জানবো বলুন। আমার অনুমতি নিয়ে তো সবাই চলছে না।

—আচ্ছা, এলে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।

ধীরে ধীরে আপন মনে বলেন....নাঃ কর্তব্য এখনো ফুরোয় নি। আমি মরে গেছি মনে করে চুপ করে থাকবার দিন আসেন নি এখনি।

ওদিকে মেজবৌ গিয়ে আছড়ে পড়েন বিছানায়। জলস্পর্শ করবেন না তিনি আজ।

ডাকতে আসে মুরলা।

ডাকতে আসেন সন্তোষিণী।

হঠাৎ উঠে বসেন মেজবৌ। শানানো মাজাঘষা গলা বেশ কিছু চড়িয়ে বলে—মাপ করবেন মা, যে বাড়ীতে দু'খানা শাড়ী ধোপার বাড়ী দিলে বাক্যযন্ত্রণা সইতে হয়, সে বাড়ীতে ভাত খাবার প্রবৃত্তি আমার নেই।

সন্তোষিণী বধূর হাত ধরে কাতরভাবে বলেন—কি যে বলো বৌমা! কার বাড়ী, কার ঘর? সংসার তো তোমাদেরই! তোমার শ্বশুরের ভীমরথী হয়েছে তাই অমন করছেন। আর দিনকালও হয়েছে তেমনি। পয়সা কমে গেছে—সবদিকে দৃষ্টি না দিলে চলে না।

মেজবৌ উদাস গম্ভীর স্বরে বলেন—সবদিকে দৃষ্টি দিলে তো বলবার কিছু ছিলো না মা। বাজারের সেরা, সব থেকে দামী সিগারেটটি তো দেখছি টিন টিন উড়ে যাচ্ছে। তাতে বুঝি খরচ নেই? অবিশ্যি ওঁর টাকা, ওঁর দাবী আছে। সবদিকে দৃষ্টি দেওয়ার কথাটা তুললেন, তাই বলা।

বজ্রাহতের মতো তাকিয়ে থাকেন সন্তোষিণী।

কী শুনলেন তিনি? সত্যি শুনলেন তো? নাকি স্বপ্ন?

বজ্রাহত আর একজন হয়ে পড়েছেন বটে। কারুর কান বাঁচিয়ে কথা বলবার ইচ্ছে তো ছিল না মেজবৌয়ের। যামিনীমোহনের কানেও গেছে। বারান্দায় আরাম কেদারায় বসে থাকতে থাকতে কথাটা এসে পড়েছে কানের ওপর।

হাত থেকে স্খলিত হয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে বাজারের সেরা দামী সিগারেটের টিনটা। মাথাটা কেমন ঝুঁকে পড়ে।

নীচের উঠানে গোবিন্দ সাবান আর লিলিকে নিয়ে পড়েছে।

মনে তার স্ফূর্তির জোয়ার, কণ্ঠে বেসুরো গান। লিলিকে আদর করছে আর তার গায়ে সাবান ঘষছে।

রুণু সামনে উবু হয়ে বসে আছে গোবিন্দকে সাহায্য করবার মানসে, তার কাছে বালতী ও মগ।

হঠাৎ গীতার উদ্ধত উত্তেজিত কণ্ঠ কানে আসে—বাড়ীর কর্তা বলেই কি যাকে যা খুসি বলবার রাইট জন্মায়? বোরকা পরে পর্দ্দার আড়ালে থাকবার দিন এখনো আছে তোমরা মনে করো? দেখে এসো দিকি বাইরে, কিভাবে চলাফেরা করছে মেয়েরা! যুগের দিকে তাকিয়ে দেখতে হয় মা, ইচ্ছে মতন শাসন করার চেষ্টা বোকামী ছাড়া কিছু নয়। আমি কিন্তু স্পষ্ট বলে দিচ্ছি—বাবার কোনো রাইট নেই যাকে যা খুশী শাসন করবার!

শেষ কথাটা ভালো করে কানে আসে গোবিন্দর।

সে সাবানের ফেনা মাখা হাতে উঠে আসে। ক্রুদ্ধ স্বরে বলে—কী বললি গীতা? মামার কোন রাইট নেই তোদের শাসন করবার? কলেজে পড়ে বড্ডো যে বড়োবড়ো কথা কইতে শিখেছিস। এদিকে তো রাতদিন মুখে চোখে রং মেখে ডলিপুতুল হয়ে থাকিস!

গীতশ্রী উত্তেজিতভাবে বলে—দেখো মা, ওকে বারণ করে দাও, ও যেন আমার বিষয়ে কোন কথা কইতে না আসে।

সন্তোষিণী ক্লান্তস্বরে বলেন—তুই সব কথায় কথা কইতে আসিস কেন গোবিন্দ? নিজের চরকায় তেল দিগে না।

গোবিন্দ মাথা ঝাঁকিয়ে উত্তর দেয়—নিজের চরকা পরের চরকা বুঝি না মামী, হক্ কথা আমি কইবোই। দু'খানা পাশ দিয়ে যেন চারখানা হাত বেরিয়েছে মেয়ের! মামার ওপর কথা! এই আমি বলে দিচ্ছি—বাড়ীর কর্ত্তা যাকে যা খুশী বলতে পারে, বলবার রাইট আছে।

লিলির 'ঘৌ ঘৌ' আহ্বানে বাকী কথা মুলতুবী রেখেই চলে যেতে হয় গোবিন্দকে।

গীতশ্রী একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে চলে যায়।

ছয়

যথাসময়ে গীতশ্রীদের অনুষ্ঠান শেষ হয়। রীতিমত সাফল্যের সঙ্গেই হয়।

কর্ম্মকর্ত্তা সুরেশ লাহিড়ী পরিচালিকা গীতশ্রী দেবীর হাত চেপে ধরে বলে ওঠেন—এর সাফল্যের জন্য দায়ী আপনিই গীতশ্রী দেবী। আপনার সাহায্য না পেলে—ইয়ে, আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু আমি যে আপনাকে কি রকম—

গীতশ্রী হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে—কত টাকা উঠলো আপনার?

—আশাতিরিক্ত। বুঝলেন গীতশ্রী দেবী, এর অর্দ্ধেকেরও আশা করিনি আমি। আচ্ছা দাঁড়ান, আমাদের কেশিয়ার সুব্রতবাবুকে ডাকি। নীট্ খবর পাবেন তাঁর কাছে।

—সুব্রতবাবু! সুব্রতবাবু!

কিন্তু কোথায় সুব্রতবাবু? অভিনয়ের গোলমালেব সুযোগে কেশিয়ার সুব্রতবাবু নিখোঁজ। অবশ্য ক্যাশটা সঙ্গে নিতে ভোলেন নি।

একটা গোলমালের হৈ চৈ পড়ে যায়।

যথেচ্ছ গালাগাল ছোটায় সুরেশ লাহিড়ী। গীতাকে দু' একটা কথা বলতে ছাড়ে না। বেশ অপমানসূচকভাবেই বলে—মাসী বোনপোর ষড়যন্ত্র আছে এই তার ধারণা।

অপমানিতা গীতা এক সময় চলে আসে।

না, লাহিড়ীর গাড়ীতে নয়, পায়ে হেঁটে।.....বাড়ীতে কাউকে কিছু বলে না, শুয়ে পড়ে।

পরদিন সকালে খোঁজ পড়ে। ঘুম থেকে উঠে পর্যন্ত সুব্রতকে দেখা যাচ্ছে না।

সকলের মুখে মুখে ঘোরে—সুব্রত কই? সুব্রত? তিনতলা থেকে একতলা, সকাল থেকে দুপুর, সবাই খোঁজে—সুব্রত?

গীতা নীরব।

মুরলা ডাক ছেড়ে কাঁদে।

সন্তোষিণী মেয়েকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিজেও কাঁদতে থাকেন।

কি হলো ছেলের? নিরুদ্দেশ? আত্মঘাতী? না অপঘাতী? মামারা বলে—গেছে কোথাও বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে। খুব তো লায়েক হয়েছে আজকাল।

শুধু যামিনীমোহন বসে থাকেন পাথরের মত, কোন মন্তব্য করেন না।

সমস্যার মীমাংসা হয় সন্ধ্যায়।

সুরেশ লাহিড়ী 'তক্কে তক্কে' সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়ীতে এসেছে খোঁজ করতে। আসামী সারাদিন যেখানে হোক ঘুরে বেড়াক, এসময় নিশ্চয় বাড়ী ঢুকেছে।

অসভ্য ইতরের মতো চেচাঁয় সে—বেরিয়ে আসুন সুব্রতবাবু, ভালোয় ভালোয় টাকা ফেলে দিন তো মঙ্গল, নইলে পুলিশ কেস্ করে ছাড়বো আমি। সুরেশ লাহিড়ীর টাকা মেরে পার পাবে এতো বড়ো ধুরন্ধর জগতে জন্মায়নি এখনো।....ওঃ, দেখছি বাড়ীর লোকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র আছে! মনে রাখবেন কেস্ করে সবাইকে কোর্টে দাঁড় করাতে পারি!....ওঃ বাড়ীর দরজায় খুব যে লম্বা চওড়া খেতাব লটাকানো হয়েছে! ওহে রায়বাহাদুর নেবে আসুন না একবার!

জানালা দিয়ে উঁকুঝুঁকি মারে বৌরা, ঠাকুর চাকররা দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে তামাসা দেখার আশায়। সন্তোষিণী কাঁপেন, মুরলা হাপুস্ নয়নে কাঁদে।

আর ওপরে বারান্দায় পাথরের স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে থাকেন যামিনীমোহন।

হঠাৎ সকলকে প্রায় স্তম্ভিত করে দিয়ে খোলা রাস্তায় নেমে আসে গীতশ্রী।

গাড়ীর কাছে গিয়ে সুরেশের হাতের ওপর একখানা হাত রাখে। স্থির অচঞ্চল স্বরে বলে—আপনি তো আমাকে খুব ভালোবাসেন? আমার জন্যে মরতে পারেন, বাঁচতে পারেন? আমার কথায় এই সামান্য ক'টা টাকার মায়া ত্যাগ করতে পারেন না? চলে যেতে পারেন না? নিঃশব্দে?

সুরেশ লাহিড়ী অনায়াসে নিজের হাতখানা সরিয়ে নেয়, তার বড়ো আকাঙ্ক্ষিত দুর্লভ হাতখানির স্পর্শ হতে। একটু কুটিল হাসি হেসে বলে—দু'চার হাজার টাকাকে 'সামান্য' বলে উড়িয়ে দিতে পারি এতো বড়োলোক আমি নই গীতশ্রী দেবী! টাকা কি খোলামকুচি? লাভের টাকা চুলোয় যাক, ঘর থেকে আমার নিজের যা গেছে সেটা দিচ্ছে কে? নগদ দু'টি হাজার টাকা এতেই ফেলেছি আমি, তা জানেন? সুব্রত মজুমদারকে শ্রীঘর বাস না করাই তো আমি সুরেশ লাহিড়ী নই!

গাড়ীর ধুলো উড়িয়ে চলে যায় সুরেশ লাহিড়ী।

রক্তহীন পাংশুমুখে দাঁড়িয়ে থাকে গীতশ্রী। এই পাংশু মুখখানা নিয়ে যে মুখ লুকোবার জায়গা খুঁজতে বাড়ীর মধ্যে ফিরে যাওয়া দরকার সে জ্ঞানও যেন হারিয়ে গেছে তার। যেন পৃথিবীকে ও সহসা এইমাত্র চিনলো, সামলাতে পারছে না সেই নতুন অভিজ্ঞতার ভার। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তাই।

দিন দুই পরে ওপাড়া থেকে আসে বাড়ির পুরনো আমলের বাতিল হয়ে যাওয়া স্যাকরা নিত্যানন্দ।

হালফ্যাসানের গহনা গড়াবার কাজের উপযুক্ত স্যাকরা নিত্যানন্দ নয়, তাই ইদানিং বাতিল করা হয়েছে তাকে। বৌদের মনের মতো গহনার জন্যে অর্ডার যায় নামকরা জুয়েলারি দোকানে।

নিত্যানন্দ কর্ত্তার কাছে গিয়ে বলে—কর্ত্তাবাবু, এই জিনিস ক'টা বাঁধা রেখে আপনার নাতি কিছু টাকা নিয়ে রেখেছেন....শুনেছি নাকি—

ইয়ে, তাঁকে নাকি—মানে এগুলোর কি বিহিত হবে বলুন কর্ত্তা মশাই?

অর্থাৎ সুব্রতর কীর্ত্তিকলাপ কানে পৌঁছেছে তার।

তাই তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছে চোরাই মাল রাখবার দায়ে ধরা পড়বার ভয়ে।

পাতলা কাগজের মোড়ক থেকে জিনিস কটা তুলে তুলে দেখেন যামিনীমোহন।

গীতার গলার পেনডেন্ট আর কানপাশা। যার জন্যে চাকর বাকরদের চালপড়া খাওানোর তোড়জোড় চলেছিলো একদিন।

আরও যোগ হয়েছে দুটো জিনিস।

সন্তোষিণীর হাতের পাথর বসানো আঙটিটা আর যামিনীমোহনের হাতঘড়ি।

যামিনীমোহন জানা জিনিস দেখার মতোই নিতান্ত অবহেলাভরে জিনিস ক'টা দেখে সহজভাবে বলেন—নাতি নিজে নয় হে নিত্যানন্দ, হঠাৎ কিছু টাকার দরকার পড়ায় আমিই ও ক'টা বন্ধক দিতে পাঠিয়েছিলাম, মনে পড়েছে।.....যাকগে—ও তুমি বেচেই নাওগে, সেকেলে হয়ে গেছে জিনিসগুলো। তুমি বরং তোমাদের গিন্নিমার আঙ্গুলের আন্দাজে দুচরাটে আঙটি এনে দেখিওতো। নতুন ডিজাইনের রাখছো-টাকছো কিছু?

—আজ্ঞে কর্ত্তা রাখছি বৈকি। আনবো, কাল পরশুই আনবো! কিন্তু ঘড়িটা কর্ত্তামশাই?

—ঘড়ি?

যামিনীমোহন হেসে ওঠেন—ও ঘড়ি তুমি ফেলে দাওগে নিত্যানন্দ, ওর আর কোনো পদার্থ নেই। রায়বাড়ীর মতোই অবস্থা হ'য়ে গেছে ওর। চিরদিনের মতো দম বন্ধ হয়ে গেছে, চালাতে গেলে চলে না, জোর করলে স্প্রীং কেটে যায়।

নিত্যানন্দ উঠে যেতে সন্তোষিণী রুদ্ধকণ্ঠে বলে ওঠেন—এই দুঃসময়ে আবার আমার আঙটির ফরমাস কেন? বুদ্ধিভ্রংস হলো নাকি তোমার?

যামিনামোহন হেসে ওঠেন। হাসিটা যেন কেমন বাড়াবাড়ি!

হেসে বলেন—নাঃ, বুদ্ধিটা আর ভ্রংস হচ্ছে কই? হলে তো বেঁচে যেতাম, আনন্দে থাকতাম! দুঃসময় বলেই তো গহনার ফরমাস দেওয়া দরকার! মাছ ঢাকতে শাক চাই না? আগুন ঢাকতে ছাই?

আরাম কেদারাই যেন এখন একমাত্র আশ্রয়।

যেন সমস্ত সংসার থেকে নিজেকে গুটিয়ে এনে এইটুকুর মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ করতে পেরে বেঁচেছেন যামিনীমোহন। চুপচাপ বসে থাকেন তিনি মাথাটা ঝুঁকিয়ে, সন্তোষিণী বারান্দার রেলিঙে পিঠ দিয়ে বসে থাকেন।

জীবনে কখনো স্বামীকে ভয় করেনি সন্তোষিণী, আজকাল কেমন যেন ভয় ভয় করে। কাছে বসে থাকেন, কথা জোগায় না মুখে।

কোনো কিছুর বালাই যার মনে নেই সে আসে লাফাতে লাফাতে।

—এই যে মামা মামী দুজনেই আছো। সুব্রতবাবুকে দেখলাম যে ওপাড়ায়।

সন্তোষিণী চমকে তাকান।

—কোথায় দেখলি রে গোবিন্দ?

মানিকতলার ওদিকে। আমি চলেছি নিজের ধান্ধায়, হঠাৎ দেখি অখাদ্য এক রেষ্টুরেণ্টে বসে বাবু চটাওঠা এক এনামেলের কাপে চা গিলছেন। আমাকে দেখে ভয়ে কাঠ। তখন গোবিন্দ মামা, 'গোবিন্দ মামা'র ঘটা দেখে কে। বলে—'প্রকাশ করে দিও না।....বাড়ীর সবাই ওর জন্য ভেবে খুন হয়ে যাচ্ছে, আর আমি খবরটা চেপে বসে থাকবো। শোনো দিকি কথা! বড়দিকে বলে প্রাণ ঠাণ্ডা করে দিয়ে এসেছি।'

সন্তোষিণী প্রশ্ন করেন—তুই ওখানে গিয়েছিলি কিসের ধান্ধায়?

—এ্যাই—আসল কথাটাই ভুল।

হঠাৎ ঢিপ্ ঢিপ্ করে দুজনকে দুটো প্রণাম করে বসে গোবিন্দ।

—ও আবার কি। কি হলো? জিজ্ঞেস করেন সন্তোষিণী।

যামিনীমোহন কিছু বলেন না, শুধু পিঠটা খাড়া করে সোজা হয়ে বসেন।

—একটা চাকরী পেয়ে গেলাম? উঃ, বাঁচা গেলো বাবা, বাক্য-যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেলো!

সন্তোষিণী অশ্রুসিক্ত চোখ নিয়েই হেসে ফেলে প্রশ্ন করেন—চাকরীর জন্যে কে তোকে বাক্য যন্ত্রণা দিচ্ছিল রে গোবিন্দ?

—কেন, ওই তোমার সাধের গঙ্গাজলের কন্যে! তোমাদের আদরের নতুন বৌমা! রোজদিন ঘ্যানঘ্যানানি—'চাকরী খোঁজো, চাকরী খোঁজো, কতোদিন আর মামার গলগ্রহ হয়ে থাকবে—বয়েস হয়েছে—এখন মামাবাবুকে সাহায্য করা উচিত'—এই সব বাক্‌চাতুরী! আরে বাবু করা উচিত তা কি আমিই জানি না? কিন্তু চাকরী নিয়ে কে বসে আছে আমার জন্যে। বলো কতো বি এ, এম এ, পাশ করা বাবুরাই ভ্যারেণ্ডা ভাজছে!....যাক্ জুটিয়েছি তো একটা। আর ট্যাফোঁ করতে আসুক দিকি?

এতোক্ষণ যামিনীমোহন প্রশ্ন করেন—কাজটা কি?

গোবিন্দর বুদ্ধির ওপর আস্থার লেশও নেই তাঁর। অবোধ বই আর কিছু নয়, কে জানে কে ওর সঙ্গে পরিহাস করেছে। নাকি ঠকাবার তালেই আছে কেউ।

গোবিন্দ মহোৎসাহে উত্তর দেয়—কাজ আর কি, কারখানার কাজ। আখড়ার একটা ছেলে বলে দিলো—চলে গেলাম 'দুগ্‌গা বলে! ব্যাস হয়ে গেল চাকরী। হবে না? চেহারাখানি তৈরী করেছি কেমন? সাহেব তো দেখে মহাখুশী!

—কোথাকার কারখানা?

আর একটি প্রশ্ন করেন যামিনীমোহন।

—ইয়ে—কাশীপুরে। যা বুঝেছি বাড়ী থেকে আসা যাওয়া চলবে না, ওখানে থাকতে হবে। সে যা হয় হয়ে যাবে মামী, ভেবো না! কালই জয়েন করতে হবে। কাজেই আজ রাত্রেই—

সন্তোষিণী শঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন—কাশীপুরের করাখানায় কাজ, সে তো লোহা পিটানোর কাজ।

—তবে? হা হা করে হেসে ওঠে গোবিন্দ—লোহা পিটাবো না তো কি ফ্যানের তলায় গদিআঁটা চেয়ারে বসে খস খস করে কলম ঘসবো? কতো বিদ্বান ভাগ্নেটি তোমার!

—কতো মাইনে?

—মাইনে? মাইনে আবার কি? 'হপ্তার মজুরী'। হপ্তায়—সাড়ে—সাড়ে ইয়ে....ইয়ে কি যে বললো অতো কি কান করেছি।

কথা বলতে বলতে এদিক ওদিক তাকায় গোবিন্দ, তারপর উঠে পড়ে ঘরে

গিয়ে দেখতে থাকে— টেবিল, সেলফে আলমারীর মাথায়।....হতাশ হয়ে ঘুরে এসে বলে—মামার টিনটা কোথায় মামী? সিগারেটের টিনটা?

সন্তোষিণী ধীরে ধীরে মাথা নাড়েন।

—ও আর উনি খান না বাবা।

—অ্যাঁ! কি বললে? মামা সিগারেট খান না? তার মানে? বেড়ালের মাছে অরুচি। মামা ব্যাপার কি বলো তো?

যামিনীমোহন মৃদুহাস্যে বলেন—কি হবে, মিথ্যে খরচ পুষে?

—মিথ্যে খরচ?

অকস্মাৎ প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে গোবিন্দ চেঁচিয়ে ওঠে— মামী, নিশ্চয় তুমি কিছু বলেছো! সব পারো তুমি! কি বলেছো মামাকে?

সন্তোষিণী ম্লান হাসি হেসে বলেন—আমি আর কতোই বলতে পারবো! বাড়ীতে বলবার লোকের কি অভাব আছে রে গোবিন্দ?

হঠাৎ কোঁচার খুঁটে চোখ ঢেকে মেয়ে মানুষের মতো প্রায় ডুকরে কেঁদে ছুটে পালিয়ে যায় গোবিন্দ। আর্ত্তনাদের মতো শোনায় তার কণ্ঠস্বর—কেন? কেন মামাকে তোমরা—সবাই না, এ সব সইবো না আমি.... প্রথম হপ্তার মজুরি পেলেই আমি সব টাকাগুলো দিয়ে—

বিচলিত যামিনীমোহন হাত বাড়িয়ে বলেন—খাতা দুখানা দাওতো গিন্নী, জমা খরচটা আজ একবার ভালো করে মিলিয়ে দেখি। গোবিন্দকে বসিয়েছিলাম কোন হিসেবের ঘরে? বাজে খরচের? সাতাশ বছর ধরে ওর জন্য কতো বাজে খরচ হয়েছে তারই হিসেব কষেছি যে বসে বসে।

কিন্তু গোবিন্দর হিসেব মিলোতে গিয়েই কি এতো বেশী শক্ লেগেছিল যামিনীমোহনের? তাই এক দিন একা বসে সে হিসেব মিলোতে চুপচাপ খাতার ওপর মাথাটা ঝুঁকিয়ে বসেই থাকলেন তিনি?

ছেলেরা যখন ধরাধরি করে বিছানায় শুইয়ে দিলো তখন প্রাণটার এতোটুকু যদি বা কোথাই অবশিষ্ট ছিলো, জ্ঞানটা গিয়েছিলো উধাও হয়ে।

এতোদিনে কি নিশ্চিত হলেন যামিনীমোহন?

পেলেন—বুদ্ধিভ্রংশ হতে পারার নিশ্চিন্ত আরাম?

নাঃ, একেবারেই নিশ্চিন্ত হয়ে গেছেন যামিনীমোহন।

গোলমালের মধ্যে সন্তোষিণী কাতর হাহাকার করে ওঠেন—ওরে গোবিন্দটা

কোথায় রইলো, তাকে একটা খবর দে তোরা!....সে যে মামা বলে প্রাণটা উপড়ে দিতে পারতো! তাকে আমি মুখ দেখাবো কি করে?

গোবিন্দ সম্বন্ধে এতোটা বাড়াবাড়ি ছেলেদের বোধহয় পছন্দ হয় না, ভ্রূ কুঁচকে সরে যায়। বৌরা বলে—সে আছে কোথায় সে ঠিকানা কে জানে? গৌরী জানে তো বলুক। তাই বা ছুটে গিয়ে তাকে ডেকে আনবার সময় কার হচ্ছে? তবে যদি গোবিন্দ না এলে শেষ কাজ বন্ধ রাখতে হয়, বুঝুন তাঁর ছেলেরা!

সন্তোষিণী চুপ হয়ে যান।

সাত

ওদিকে গোবিন্দ আছে নিজের তালে।

সে আপন মনে বেসুরো গান গায়, মজুরের কাজ করে, আর হিসেব করে সাপ্তাহিক মজুরিটা পাবে কবে।

আকাঙ্ক্ষিত দিন আসে।

পাড়ার কাছাকাছি 'বাস্' থেকে নেমেই প্রথমে যে দোকানটা দেখে, তা'তে ঢুকে পড়ে বেছে দেখেশুনে কেনে দু'টিন সিগারেট!

ভাবতে ভাবতে যায়....টিন দুটো আরাম কেদারার হাতলে বসিয়ে দিয়ে টিপ করে একটা প্রণাম করে নেবে মামাকে!

মামার প্রসন্ন দৃষ্টির অন্তরালে ফুটে উঠবে একটি সস্নেহ হাসি। গোবিন্দর সকল সাধনার পুরস্কার!

বাড়ীতে ঢুকতে গিয়েই কেমন নিঃঝুম লাগে।

দোরের কাছে লিলিটা মনমরা হয়ে বসে আছে কুণ্ডলী হয়ে! ওকে টপ করে তুলে নিয়ে গোবিন্দ সোহাগভরে প্রশ্ন করে—কি গো 'লিলিরাণী', মুখ এমন বেজার কেন? অভিমানে? আরে বাবা তোকে খুব মনে ছিলো আমার, কি করবো—পরের চাকরী!....পরক্ষণেই ওকে লুফতে লুফতে চেঁচায়—কই গো মামী, কোথায় সব? সন্ধ্যেরাতেই নিঃঝুমের পালা কেন?....এই রুণু, এই দেবু, কি হলো তোদের?

কেউ সাড়া দেয় না।

ধক্ ধক্ করে ওঠে বুকটা! রোলার তোলা বুক!

শুকনো শুকনো মুখে উঠে যায় দোতলায়। কাউকে দেখতে পায় না ধারে

কাছে! বারান্দায় গিয়ে দেখি আরাম চেয়ারটা পড়ে আছে, যেন অন্তহীন শূন্যতা নিয়ে।

কাঁপতে থাকে পা। পর্দ্দা ঠেলতে হাত কাঁপে।

বোধহীন গোবিন্দর এ এক অদ্ভুত নতুন অনুভূতি!

তবু সাহস করে পর্দ্দাটা ঠেলে ঢুকে পড়ে ঘরে।

বিছান শূন্য।

তা'কে কি! কোনদিন কি সন্ধ্যাবেলা বেড়াতে বার হন না যামিনীমোহন? হয়তো তাই।

নাঃ তা নয়।

দেওয়ালের একপাশে বাসি শাকের মতো বিশীর্ণ মূর্ত্তিতে গুটিয়ে শুয়ে আছেন সন্তোষিণী। নিরাভরণা শুভ্রবাসা।

শুভ্রতাটা কী নির্লজ্জ রূঢ়!

মামীর পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে মেয়েমানুষের মত ডুকরে কেঁদে ওঠে গোবিন্দ—ও মামী, আমার মামাকে তোমরা কোথায় ফেললে গো! ওগো আমি যে পাঁচদিনের জন্য মোটে বাড়ী ছাড়া ছিলাম, এর মধ্যে এতোবড়ো কাণ্ড কি করে হলো গো!

ঠাঁই ঠাঁই করে নিজের মাথাটা মাটিতে ঠোকে গোবিন্দ।

চীৎকারে অতিষ্ঠ হয়ে নির্ম্মল এসে দাঁড়ায়।

কয়েক সেকেণ্ড দেখে--'নুইসেন্স' বলে চলে যায়।

পর্দ্দার আড়ালে ছোট বড়ো অনেকগুলি পা দেখা যায়, কিন্তু ঘরের মধ্যে পড়ে না সে পায়ের ধুলো।

গোবিন্দর কান্নাটা সত্যিই হাস্যোদ্রেক করে, তাই কেউ গ্রাহ্য করে ঢোকে না, বাইরে থেকে মজা দেখে!

এক সময় সন্তোষিণী উঠে বসে বলেন—গোবিন্দ চুপ কর!

ছোটছেলের মতো সঙ্গে সঙ্গেই চুপ করে যায় গোবিন্দ। কিছুক্ষণ বসে থাকে জড়ের মতো। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকায় চারিদিকে।

এক সময় আস্তে আস্তে উঠে পকেট থেকে বার করে সিগারেটের টিন দুটি। সাবধানে পাশাপাশি রেখে দেয় বিছানার ওপর।

নতজানু হয়ে খাটের ধারে বসে বিছানায় মাথা ঠেকায়।

দালানে—

থানপরা রুক্ষকেশ তিন ভাই। তর্কের ঝড় উঠেছে উদ্দাম হয়ে। দূরে বসে আছেন সন্তোষিণী দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ ঢেকে। ওদিকে ছাড়া ছাড়া ভাবে বসে দুই বৌ। বড়বৌয়ের গায়ের কাছে বসে তাঁর মা, মেজবৌয়ের কাছাকাছি তাঁর বাবা। মাঝখানে কম্বলের আসন পেতে বসে কুলপুরোহিত।

আগের কথার জের টেনে সুবিমল বলে—পারলে অবশ্য করাই উচিত। পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধে সমারোহ করার বিধি রয়েছে যখন, কিন্তু না থাকলে তো চুরি করতে পারি না।

বড়বৌয়ের মা বলেন—সে তো সত্যিই বাবা। তুমি তো আমার তেমন ছেলে নও। কিন্তু এখন বাপের 'ছেরাদ্দয়' সর্ব্বস্ব বিকিয়ে ফেল্লে এরপর যে কন্যাদায়ের সময় পরের কাছে হাত পাততে হবে! নইলে উচিত তো বটেই—

পরিমল উদ্ধতভাবে বলে—উচিত? কে বল্লে উচিত? ওসব বামুনদের কারসাজি! আমার মতে টাকা থাকলেও কতকগুলো ভূতভোজন করিয়ে, আর বামুনের পেট ভরিয়ে সে টাকা খরচ করা উচিত নয়। আমি তো করবো না।

মেজবৌয়ের বাবা বলেন—ঠিক কথা! আমিও একথা সমর্থন করি। তাছাড়া—তোমাদের স্বর্গত বাবা নিজে যথেচ্ছ খরচ করে সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে গিয়েছেন, একপয়সা রেখে যান নি ছেলেদের জন্যে। তোমাদের কোনো বাধ্যবাধকতাও নেই তাঁর শ্রাদ্ধে দানসাগর বৃষোৎসর্গ করবার। এতে যদি বেহাইমশায়ের প্রেতাত্মা অসন্তুষ্ট হ'ন, নাচার!

নির্ম্মল ব্যঙ্গহাসির সঙ্গে বলে—আপনাদের কি ধারণা, আত্মা বলে সত্যিই যদি কিছু থাকে, সে ওই চালকলার পিণ্ডি খাবার আশায় ঘুরে বেড়ায়। যতো সব কুসংস্কার! মৃতলোকের আত্মীয়স্বজনের সেন্টিমেন্টের সুযোগ নিয়ে এসব পুরুত বামুনদের ব্যবসা চালানো।

—দুর্গা দুর্গা!—উঠে দাঁড়ান কুলপুরোহিত ভটচাযমশাই।....বলেন—থাক্ বাবা থাক্। পিতৃশ্রাদ্ধে ঘটা করবার আইন কিছু নেই। শুদ্ধ হবার জন্য যেটুকু আইন আছে যদি মানো তো—ওই দিন একটু তিলকাঞ্চনের ব্যবস্থা রেখো। তারা ব্রহ্মময়ী মা!

একটুক্ষণ পরেই বোধ করি ভটচাযমশাইয়ের খবর পেয়ে ছুটে আসে গোবিন্দ—তার মানে? মামার 'ছেরাদ্দয়' ঘটা হবে না মানে?

সন্তোষিণী এতোক্ষণ পরে মুখ তুলে বলেন—তুই যা গোবিন্দ!

—যাবো মানে? এর একটা হেস্তনেস্ত না করে যাবো? মামার ছেরাদ্দয় 'বৃষ' করা চাই, কাঙ্গালী ভোজন করানো চাই, ব্যস। রায়বাহাদুর যামিনীমোহনের ছেরাদ্দ হবে তিল-কাঞ্চনে? এ কথা মুখে আনতে লজ্জা করে না? তোমরা সব ইজের জামা পরে আপিস যাও না? গলায় দড়ি! গলায় দড়ি!

পরিমলের শ্বশুর বলেন—এই কিন্তু যত জীবটি কে হে পরিমল?

—আর কেন বলেন! বাবার কুপুষ্যি! বেরিয়ে যা গোবিন্দ? উঃ চাবুক লাগালে রাগ যায় না।

বড়বৌয়ের মা বলেন—তা এবারে ওসব কুপুষ্যিগুলো বিদায় দাও বাবা সুবিমল। তোমাদের তো আর সত্যি জমিদারী নেই।....ওই বৌটা বুঝি ওরই? বাবাঃ, আজকালকার দিনে দুটো মানুষ পোষা!

পরিমলের শ্বশুর বলেন—বেহাই মশাই আমাদের উদার ব্যক্তি ছিলেন।

অকস্মাৎ ধৈর্য্যচ্যুত হয় গোবিন্দ।

তেড়ে এসে বলে—খবরদার বলছি, মামার কথা মুখে আনবে না। কুটুম আছো কুটুমের মতো থাকো, বেহাইয়ের ছেরাদ্দয় সন্দেশ মণ্ডা খেয়ে যাও। এ বাড়ীর কথায় কুপরামর্শ দিতে আস তো বরাতে দুঃখ আছে।

সুবিমল তেড়ে ওঠে! নির্মল ওর ঘাড়টা চেপে ধরে!

সন্তোষিণী আর একবার মুখ তুলে আদেশের দৃঢ় সুরে বলেন—গোবিন্দ, যা তুই এখান থেকে।

মাথা নীচু করে বেরিয়ে যায় গোবিন্দ।

বড়বৌয়ের মা বলেন—এই অবসরে বাবা, তোমরা তিন মাথায় এক করে বাড়ীঘরের একটা বিলিবন্দেজ করে ফেলো। ও এই বেলাই হয়ে যাওয়া সুবিধে।....দোতলায় বেহাই মশাইয়ের দরুণ অংশটা থাক সুবিমলের। শাস্ত্রেই রয়েছে জ্যেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ ভাগ। সুবিমলের পুরনো ঘর দুখানায় ওর ছেলেরা পড়াশুনা করবে, আত্মকুটুম এলে থাকবে, এই আর কি।...বেয়ান ঠাকরুণ তাঁর বিধবা আর আইবুড়ো দুই মেয়ে নিয়ে নীচের তলায় কোথাও থাকুন। ভাগ্নেটি এবার পথ দেখুক। আর কেন?

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মেজবৌ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে ওঠেন—আমি কিন্তু বরাবর যেমন তিনতলায় আছি, থাকবো। ওর দখল ছাড়বো না। অবিশ্যি আমিও নীচের দিকে পা বাড়াতে যাবো না। কুকারে রাঁধবো স্টোভে চা খাবো, ব্যস। কারুর ঝামেলা নিতেও চাই না, কাউকে ঝামেলা দিতেও চাই না।

বড়বৌ খর খর করে বলে ফেলেন—আর আমার গলায় শাশুড়ী-ননদী, অপুষ্যি-কুপুষ্যি সব, কেমন? ভাগটা মন্দ নয়!

মেজবৌ কুটিল হাসি হেসে বলেন—তা দিদি, শুনলে তো এখুনি, জ্যেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ ভাগ! পাওনার বেলায় জ্যেষ্ঠ হতে গেলে দায়িত্বের বেলাতেও হতে হয় বৈকি!

ঠিকরে ওঠেন বড়বৌয়ের মা।

—মেজমেয়ের কথাগুলো তো আচ্ছা চ্যাটাং চ্যাটাং।

এক সময় সন্তোষিণী ধীরে ধীরে উঠে যান। গিয়ে ঢোকেন গোবিন্দর ঘরে। দেখেন গোবিন্দ যামিনীমোহনের বড়ো ফটোখানা ওপরের ঘর থেকে নামিয়ে এনে ধুলো মুছছে!

এক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে শান্ত স্থিরভাবে বলেন—গোবিন্দ, তোর চাকরীটার কি হলো?

গোবিন্দ বিক্ষুব্ধ স্বরে বলে—ও অপয়া চাকরী আবার!

সন্তোষিণী জেদের মতো বলেন—তা বললে তো হবে না বাবা, তুই এবারে গৌরীকে নিয়ে আর কোথাও গিয়ে থাক গে যা।

গোবিন্দ অবাক বিস্ময়ে বলে—নতুন বৌকে নিয়ে? সে আবার কি? কোথায় যাবো?

—যেখানে হোক। বেটাছেলে, এতো গায়ের জোরের বড়াই করিস, এটুকু মনের জোর নেই। নিজের বৌটার ভার নিয়ে দুটো পেট চালাতে পারবি না? আমার হুকুম তুই এ বাড়ী থেকে চলে যা।

গোবিন্দ গম্ভীরভাবে বলে—তা তোমার যদি হুকুম হয়, যেতেই হবে!

—হ্যাঁ বাবা, তাই হুকুম। আজ পারিস আজই চলে যা। খোলার চালা, টিনের চালা—যেখানে এতোটুকু আশ্রয় পাবি সেখানে যা!

পাছে অপরের কাছে অপমানিত হয়ে বিতাড়িত হতে হয় গোবিন্দকে, সেই আতঙ্কে এমন নিষ্ঠুর বাক্যও উচ্চারণ করে বসেন সন্তোষিণী।

গোবিন্দ বলে—বেশ! তা' মামার 'ছেরাদ্দ'টা হতে দাও?

সন্তোষিণী ব্যাকুল আবেদন জানান—তার আগেই যেতে পারিস না রে? দু'বছরের ছেলে থেকে মানুষ করেছি তোকে, 'মা' বলেই জানিস তুই আমায়! কখনো কিছু চাইনি তোর কাছে। আজ তোর হাত ধরে বলছি বাবা, এ বাড়ীর মায়া তুই কাটা।

গোবিন্দ নির্বোধের মত এক মিনিট হাঁ করে তাকিয়ে থেকে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে,—তোমার ওই গুণধর পুত্তুররাই তোমাকে পাগল করে তুলছে মামী! যাও একটু শুয়ে পড়গে দিকি!

তুই কথা দে, গৌরীকে নিয়ে অন্যত্র থাকবি?

—থাকবো কি মরবো তাতে তোমার কি দরকার?—'গোবিন্দ চেঁচিয়ে ওঠে,—তাই বলে মামার 'কাজ কর্ম' না মিটলে তো যেতে পারি না? তুমিই নয় পাগল হয়েছ, আমি তো হইনি!

সন্তোষিণী দৃঢ়স্বরে বলেন—হ্যাঁ আমি পাগলই হয়েছি। আর সেই পাগলের কথাই মানতে হবে তোকে। তুই আগেই যা।

—ঠিক আছে, তাই যাবো।—বলে চোখে হাত চাপা দিয়ে মেজেয় শুয়ে পড়ে গোবিন্দ।

কিন্তু 'যাবো' বলে নির্দ্দেশনামায় সই করলেই কি তৎক্ষণাৎ যাওয়া যায়? মায়া কাটানো না হয় নিজের হাতে, বাধা কাটানোর অস্ত্রটা তো নিজের হাতে নেই।

পৃথিবীটা অনেক বড় সন্দেহ নেই, কিন্তু তাতে অধিকারও তো বড় বড় মানুষগুলোর। অভাগা গোবিন্দর মত তুচ্ছ প্রাণীর জন্যে ঠাঁই কোথায় বিরাট পৃথিবীতে?

একা নিজে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল গোবিন্দ সেদিন, যেদিন সহসা যামিনীমোহনের সিগারেটের দামের উল্লেখে বিচলিত হয়ে গিয়েছিল। কাশীপুরে যাবার কথা ছিল রাত্রে, ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল বিকেল বেলাতেই মনের আবেগে। সে আবেগের শাস্তি তো ভালমতই পেয়েছিল গোবিন্দ।

যতবারই কথাটা ভাবতে চেষ্টা করেছে গোবিন্দ ততবারই যেন অবিশ্বাস্য বিস্ময়ে ভাবতে ভুলে গিয়ে চুপ করে গিয়েছে। বোকার মত হাঁ করে বসে থেকেছে। গোবিন্দ যেদিন বাড়ী ছেড়ে চলে গেল, ঠিক তার পরদিনই মারা গেলেন যামিনীমোহন।

এর চাইতে অদ্ভুত ঘটনা আর কি ঘটতে পারে জগতে? এমন কথাও ভেবেছে সে, তবে কি গোবিন্দর সঙ্গে যামিনীমোহনের জীবনের গ্রহ নক্ষত্রের কোন যোগসূত্র ছিল? তাই গোবিন্দর অনুপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই—

নিজেকে এত মূল্যবান ভাবতে লজ্জা করছে গোবিন্দর। তবু মনে মনে বলে বসে.....কি জানি জ্যোতিষ শাস্ত্রে তো কতই অদ্ভুত অদ্ভুত সব কাণ্ড থাকে,

নইলে যতদিন গোবিন্দ থাকলো, ততদিন মামা থাকলেন যেই গোবিন্দ চলে গেল, সেই তখুনি—

অবোধ মন নিয়ে এই সব এলোমেলো কথা ভাবতে ভাবতে মাথাটা খুঁড়ে ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করেছে গোবিন্দর। কেন সে চলে গেল? কেন একটা তুচ্ছ মেয়েমানুষের কথাকে অত প্রাধান্য দিল?

গৌরীই সমস্ত অঘটনের মূল, এমন একটা বদ্ধমূল ধারণায় গৌরীর উপর এত বিরক্ত হয়ে উঠেছে সে যে, বেচারী গৌরীর দিন কাটে কেবল চোখের জল ফেলে ফেলে। সামনে এসে দাঁড়ালেই খিঁচিয়ে ওঠে গোবিন্দ, "আবার কি পরামর্শ দিতে এসেছো? যাতে মামীটাও যায় তারই ব্যবস্থাপত্র বোধহয়? তুমি, এই তুমিই হচ্ছো যত অনিষ্টের গোড়া। মামার ভাত গলা দিয়ে নামছিলো না কেমন? বড্ডই অপমান হচ্ছিল? তাই মান্যের ভাত খুঁজতে বাড়ী থেকে দূর দূর করে বার করে দেওয়া হল। এখন হয়েছে তো? মিটেছে আশ? মনের বাসনা পূর্ণ হয়েছে? আমার ভাত আর ইহজীবনে খেতে হবে না। ব্যাস! অপমানের শেকড় সুদ্ধ উচ্ছেদ হয়ে গেছে। তবে এও জেনো, আবার কোন কুপরামর্শ দিতে এলে রক্ষে থাকবে না।"

গৌরী উত্তর দেবে কি, চোখের জলের স্রোতেই যে তার বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হয়ে যায়। তবু যদি কোনোদিন মনের জোর করে উত্তর দিতে যায়, গোবিন্দ ভীষণ হয়ে ওঠে, মনে হয় বৌকে এক ঘা মেরে বসাও বুঝি তার পক্ষে আশ্চর্য নয়।

আর পরামর্শ মানেই তো, "চাকরীটার কি হল?....বেশী দিন কামাই করলে হাতছাড়া হয়ে যাবে না তো? তোমার জন্য মামা গেলেন, একি আর একটা কথা? ওটা দৈবের ঘটনা। ও নিয়ে মাথা মন খারাপ করে লাভ কি?"

শুনলে হাড়পিত্তি জ্বলে যায়।

মন ভাল খারাপ করা যেন নিজের হাত ধরা। সংকল্প স্থির করেছে সে—নাঃ, বাড়ী ছেড়ে কোথাও চলে গিয়ে চাকরী আর করবে না সে, মেরে ফেললেও না। এখানে বসে থেকে যদি কিছু হয় তো আলাদা। কেন, এত বড় বাড়ীটার জন্যে একটা চাকরেরও তো দরকার? গোবিন্দই যদি সে কাজটা চালিয়ে দেয়? একটা বালতী, একটা ঝাঁটা আর একখানা ন্যাতা, এই তো সরঞ্জাম, একবার জোগাড় করে নিলে বাড়ী সাফ করে ফেলতে কতক্ষণ?

মামীর গঙ্গাজলের কন্যের যদি তা'তে মানের কণা খসে যায়, তো থাকুন তিনি গিয়ে বাপের বাড়ীতে।

এক এক সময় সেই ইচ্ছেই করে গোবিন্দর, তাহলে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ কান্না থেকে রেহাই পাওয়া যায়। কিন্তু নেহাৎ নাকি সংসারের ভাতের হাঁড়ীর ভার গৌরীর হাতে, তাই ইচ্ছেটা কাজে পরিণত করা চলে না।

কাশীপুর থেকে আসার পর ক'দিন ধরে অবিরত এইসব কথাই ভাবছে গোবিন্দ, আর বাড়ী ছেড়ে পা না নড়াবার সংকল্প স্থির করে রেখেছে। এবার চলে গেলে মামীর একটা ভালমন্দ হয়ে বসে থাকবে এটা যেন গোবিন্দর নিশ্চিত ধারণা।

কিন্তু এ কি হল?

সন্তোষিণী এ কি করে বসলেন?

এর চাইতে গোবিন্দকে তিনি মরে যাবার আদেশ দিলেন না কেন? চলে যেতে হবে! সত্যিই চলে যেতে হবে?

এ বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হবে! দু'দশদিনের মত নয়, চিরকালের মত! এত নিষ্ঠুর কি করে হলেন সন্তোষিণী?

গোবিন্দর মান বাঁচাতে গিয়ে তার প্রাণটা যে ছিঁড়ে খুঁড়ে শেষ করে দিলেন, একবার ভাবলেন না সেটা?

মান! মান!

কী এর মানে?

অর্থহীন তুচ্ছ এই কথাটা নিয়ে কেন এত ঝঞ্ঝাট? কেন মানুষ অকারণ জীবনে আর সংসারে এত জটিলতার সৃষ্টি করে বসে ওই তুচ্ছ কথাটার জন্যে।

কিসে মান থাকে? কিসে অপমান হয়।

কোন্ কথাটায় মান থাকে, আর কোন্ কথার ঘায়ে মান যায়, কে বলে দিয়েছে মানুষকে?

ভগবান? মানুষকে যিনি গড়ে তৈরী করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন?

তাই যদি হয় তো গোবিন্দ সেই ভগবানকে মানুষের শত্রু বলেই গণ্য করবে।

কিন্তু যাই হোক আর তাই হোক, বাড়ী থেকে যেতে হবে গোবিন্দকে, বুক বেঁধে খুঁজে বেড়াতে হবে আস্তানা। তাই কি শুধু নিজের জন্যে? শুধু নিজের জন্যে হলে গোবিন্দ ফুটপাথে পড়ে থাকতো। থাকতো কারো গাড়ীবারান্দার তলায়,—কারো রোয়াকের কোণে। সে সুখটুকুও সইল না ভগবানের, হুকুম হয়েছে গৌরীকে সুদ্ধু নিয়ে যেতে হবে।

এর চাইতে শাস্তি আর কি আছে?

এই যন্ত্রণার মুহূর্তে গৌরী এল সেই একই প্রস্তাব নিয়ে।—আর বসে কেন? চল বেড়িয়ে পড়ি।

খিঁচিয়ে ওঠে গোবিন্দ,—বেরিয়ে পড়বো? তবে আনো একটা দড়ি তোমাকে গলায় বেঁধে গঙ্গায় ডুবিগে!

আমার কি দোষ? গৌরীর চোখে জল ঝরে।

—না, যত দোষ আমার। বেশ চললাম, দেখি কোথায় কি জোটে।

চললাম বলে ছুটে বেরিয়ে যায়—তবু গোবিন্দর মনে নিশ্চিত এক আশা, একটা কিছু ঘটে এসব দিব্যিটিব্যি লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। হয়তো যাবার তোড়-জোড় দেখে দাদারাই কেউ বলবে, "রাগের মাথায় কি দু'টো কথা বলেছি, তাই বলে সত্যি চলে যাবি? সাধে কি আর বলি গোঁয়ার গোবিন্দ? নে নে থাম!"

কারণও তো একটা আছে।

অতি অবোধ হলেও গোবিন্দ আজকাল ভাবতে শিখেছে, আর ভেবে ভেবে যেন কিছু বুঝতে শিখছে। তাই দাদাদের মহানুভবতার ছবি কল্পনা করে নিয়ে ভেবেছে—কারণও তো আছে রে বাপু, বৌদিদের কারো ক্ষমতা হবে এই সংসারের হাঁড়ি ঠেলতে? কুটুম্বরা এসে যতই কুমন্ত্রণা দিক, সত্যিই কি আর মরা মায়ের ওপর খাঁড়ার ঘা দিয়ে এখুনি ভায়ে ভায়ে ভেন্ন হবে?

অতএব?

অতএব গৌরীকে প্রয়োজন।

গৌরীর ওপর রেগে গিয়ে বেরিয়েও হঠাৎ গৌরীর প্রতি মনটা প্রসন্ন হয়ে ওঠে, মনে হয় আহা বেচারাকে বড্ড বকা হয়ে গেছে। সত্যিই বলে বটে দাদারা—'গোঁয়ার গোবিন্দ।'

রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেই একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে এই হচ্ছে মেয়েমানুষের ধারণা কিন্তু কেমন করে সেই ব্যবস্থা হয়। তবু ঘুরে মরে গোবিন্দ—চেনা-শুনো পানের দোকানে। চায়ের দোকানে হয়তো রাস্তায় একটা ফেরিওয়ালাকে বলে—'ভাই হে, একটা ঘর দেখে দিতে পারো, আমার একজন চেনা লোক খুঁজছে।'

নিজের কথা বলতে পারে না, তাতে বুঝি যামিনীমোহনের পদ-মর্যদায় ঘা পড়বে।

কিন্তু কোথায় ঘর?

অবশেষে সেই কাশীপুরেই ছোটে। যেখানে মাত্র পাঁচদিন কাজ করে এসেছে। গিয়ে আবেদন জানায় কাজের জন্যে।

কাজ? হ্যাঁ তা পাওয়া যাবে।

কিন্তু ঘর? নাঃ অসম্ভব!

তবু অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে বৈকি। দু'চার দিনের মধ্যেই করতে হবে। মামীর হুকুম পালন না করে উপায় নেই। অপয়া চাকরীটায় আবার ঢুকলে একটা কোন বিপদ আপদ ঘটবেই নিশ্চিত, উপায় কি? সন্তোষিণী যদি তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেন। সে কাদের জোরে থাকবে?

এই জন্যেই বলে বটে—কে বলে কি বলে সে সব আর মনে আসে না গোবিন্দর, সে শুধু ভাবে মানুষের নিষ্ঠুরতা দেখে মানুষই কী সব যেন বলে।

চেষ্টায় সবই হয়।

আশ্রয়ও জোটে। গোবিন্দর মত লোকের যেমন আশ্রয় হওয়া উচিত। সাড়ে তিনহাতের বেশী জমি এক-এক জনের ভাগে পড়ে না, এমন আশ্রয় জোটে। টিনের চাল, মাটির দেওয়াল। কাশীপুরের এক অখ্যাত গলির মধ্যেকার বস্তিতে।

গৌরীকে এসে শাসায় গোবিন্দ, "খবরদার কারুর কাছে পরিচয় প্রকাশ করে বোসো না, আহ্লাদ করে বলতে যেও না, আমরা রায়বাহাদুরের বাড়ীর লোক।"

"কাকে বলতে যাবো!"

গৌরী অবাক হয়।

"কাকে বলতে যাবে, তা কি আমি হাত গুণবো? বলি পাড়াপড়শী তো আছে গুচ্ছির? তাদের সঙ্গে সই পাতাতে যাবে তো?"

"দেশ শুদ্ধু লোকের সঙ্গে সই পাতিয়ে বেড়াচ্ছি বুঝি আমি?"

"এখন না বেড়াও, তখন বেড়াবে। মেয়েমানুষ তো। স্বাধীন হলেই সাপের পাঁচ পা দেখবে। নইলে মামা থাকতে মামী আমায় কোনদিন বলতে পেরেছে তুই বেরিয়ে যা!"

গৌরী হতাশভাবে বলে, "মামীমার মনটা তুমি বুঝতে পারো না।"

"পারবো না কেন? খুব পারি। সবাইয়ের মনই বুঝতে পারি। কিন্তু বলতে

পারো আমার প্রাণটা কেউ বুঝতে পারে না কেন? কেন ওই ছাইপাঁশ 'মান মান' করে এই সব করে বসে? দাদারা আমার গুরুজন বৈ তো লঘুজন নয়? যদিই দু'কথা বলে, তাতে একেবারে মানের ভরাডুবি হবে আমার? সেই অপমানের জ্বালায় বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হবে? বেশ ভালই হয়েছে! চল এবার বস্তির মধ্যে মাটির দেওয়ালে। খুব মুখোজ্জ্বল হবে!

ক'দিন পরে দেখা যায় তুমুল সোরগোল তুলে বাড়ী ছাড়াবার গোছগাছ করছে গোবিন্দ! বিছানা বাঁধছে, ট্রাঙ্ক টানটানি করছে। অকারণ ছোট ছেলে-মেয়েদের তাড়া দিচ্ছে—সর, সর, কাজের সময় গোল করিস নি।.....তবলায় হাত দিচ্ছিস যে? রাখ, রেখে দে।....লিলি কোথায় গেল? লিলি? উঃ আজ আর গোলমালে লিলিকে চান করানোই হলো না। যাক বাবা, ওবাড়ীতে গিয়ে করালেই হবে। কোন গোলমাল তো নেই সেখানে, নির্ঝঞ্ঝাট!

গৌরী চোখের জল ফেলতে ফেলতে প্রণাম করে ঠাকুর ঘরে, প্রণাম করে সমস্ত গুরুজনকে।

অকস্মাৎ গোবিন্দ বলে ওঠে ধন্যি বাড়ী বটে! বাড়ীর একটা জলজ্যান্ত আস্ত লোক বাড়ী থেকে চলে যাচ্ছে, তা চোখে এক ফোঁটা জল নেই কারুর! হুঁ! হবে কি? গোবিন্দ তো কোন্ ছার, বাড়ীর কর্তা চলে গেলো, তাই বড়ো—

বোধ করি, অন্যের চোখের জলের ত্রুটি পূরণ সে নিজেই করে, তাই সেখানে আর দাঁড়ায় না। চট করে ঢুকে পড়ে ঘরের মধ্যে।

বেরোবার সময় খপ করে ধরে নির্ম্মল!

বলে—লিলিকে নিয়ে যাচ্ছিস মানে?

—নিয়ে যাবো না মানে? গোবিন্দ রুখে ওঠে—তোমাদের হাতে পড়ে হত্যে হতে রেখে যাবো ওকে। কে ওর সেবা-যত্ন চালাবে শুনি?

—সে আমরা বুঝবো। বাবার কুকুরটা খামোকা তুমি নিয়ে যাবে কেন? আর এই বাজনা দুটোই বা যাচ্ছে কি জন্যে? বেশ আছো! যাবার সময় যা কিছু হাতিয়ে নিতে পারা যায়, কেমন? বাড়ীর জিনিস বাড়ীতে থাক।

নির্ম্মল ডুগী তবলা দুটো নামিয়ে রাখে গোবিন্দর ট্রাঙ্কের ওপর থেকে।

গোবিন্দ হতভম্ভ হয়ে বলে—মামী, দেখছো? দেখছো হিংসুটেপনা? ডুগী তবলা দুটো নিয়ে যাওয়া চলবে না!....রেখে তোরা কি করবি শুনি? একটা চাঁটি দিতে শিখেছিস কেউ?

—না শিখেছি, না শিখেছি। চেলিয়ে উনুনে দেবো তাও ভাল।

—চেলিয়ে উনুনে দিবি? বেশ, তাই দিস! লিলিটাকেও পুড়িয়ে খাস!

গোবিন্দ এক হ্যাঁচকায় ট্রাঙ্ক বেডিং কাঁধে তুলে নেয়।

ছোট্ট মণি খিলখিল করে হেসে হাততালি দিয়ে বলে—গোবিন্দকা মুটে, গোবিন্দকা মুটে!

আট

ভাঁড়ার ঘরের পিছন দিকের জানলার ওদিকে চোরের মতো চুপিসারে এসে দাঁড়ায় সুব্রত। এদিকে দাঁড়িয়ে মুরলা।

সুব্রত চাপা আক্ষেপের সুরে বলে—দাদু শেষটায় এই করলেন! ঈস্! ছি ছি, একবার শেষ দেখাটাও হলো না। তা শুনছি নাকি মামারা এই অশৌচের মধ্যেই ভাগ ভেন্ন হচ্ছে?

—তাইতো দেখছি! আগে থেকেই মনে মনে ভেন্ন হয়ে ছিলো, নেহাৎ বাবার সামনে চক্ষুলজ্জায় পারছিলো না।...তা' তুই এমন ঘুরে ঘুরে বেড়াবি ক'দিন? আছিস কোথায়?

'চোরের মায়ের' মতোই চুপি চুপি কথা কয় মুরলা।

—আছি এক জায়গায়। খবর রাখি সবই। ধ্যেৎ, বুড়ো গেলো গেলো, এক কাণাকড়িও দিয়ে গেলো না। কাজটা ভালো হলো?

—বাবা কা'র ওপরই বা কি ভালো ব্যবহার করলেন? এই যে আমি একটা বিধবা মেয়ে রয়েছি, তার আখের ভেবেছেন কোনোদিন? মরে গেছেন স্বর্গে গেছেন, তবু বলি—আক্কেল বলে বিশেষ কিছু ছিলো না।....তা' শোন্, তুই হ'লি গে তাঁর একমাত্র দৌত্তুর সন্তান, একেবারে ফাঁকে পড়বিই বা কেন? এই রুপোর বাসন ক'টা তাঁর চিহ্ন হিসেবে রাখ তুই।

আঁচলের তলা থেকে বার করে জানালা দিয়ে গলিয়ে দেয় মুরলা,—বাপের দারুণ রুপোর রেকাবি, গেলাস, ডিবে, বাটি, চামচ।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু চামচটা হাতেই থাকে, দেওয়া হয় না।

হঠাৎ 'সুট' করে মাথা নামিয়ে নেমে পড়ে সটকান দেয় সুব্রত। মুরলা চমকে ফিরে দেখে পিছনে বড়বৌ।

—বাঃ ঠাকুরঝি বেশ! চমৎকার? বাড়ীর বাসন কোসন নিয়ে

শিশি বোতলওয়ালাকে বেচা হচ্ছে বুঝি? ওমা কি সর্ব্বনাশ রুপোর চামচ পর্য্যন্ত?

মুরলা কাষ্ঠের হাসি হেসে বলে—কি যে বলো বড়ো বৌ? চামচখানা হাতে ছিলো। এখানে দাঁড়িয়ে একটা ভিখিরি ভিক্ষে চাইছিলো কিনা—

বড়োবৌ সন্দিগ্ধ সুরে বলেন—কি জানি ভাই, অনেকক্ষণ থেকে তো দাঁড়িয়ে আছো লক্ষ্য করছি। ভিখিরির সঙ্গে এতো কিসের গপ্‌পো বুঝি না। তা আমি বলছিলাম কি শ্বশুরমশায়ের কাজকর্ম মিটে গেলে তোমার শ্বশুরবাড়ির দেশে কে তোমার ভাসুর-টাসুর আছে, সেখানে একটা চিঠি লেখো না? দুটো বিধবাকে পুষতে পারবে এমন বড়োমানুষি তো তোমার ভাইয়েরা নয় ভাই।....কি করবো, 'মা' জিনিস ফেলার উপায় নেই, তাঁকে মাথায় করে বইতেই হবে। তোমারই একটু বিবেচনা করা দরকার।

—দুর্গা দুর্গা! তারা ব্রহ্মময়ী!

অবিরত মাতৃনাম উচ্চারণের সঙ্গে আলোচাল কাঁচকলা নিয়ে গোছগাছ করছেন ভটচাযমশাই। মুখের ভাবে বিশ্বের বিরক্তি।

মুণ্ডিতমস্তক তিন পুত্র তিনখানি কুশাসন পেতে বসে আছে। সামনে অকিঞ্চিৎকর সামান্য কিছু উপাচার!

হঠাৎ বাইরে তুমুল একটা সোরগোল শোনা যায়।

উদ্দাম হয়ে উঠেছে গোবিন্দর গলা।

—বেশ করবো আনবো। নেহাৎ যে আমি ভিন্ন গোত্তর, মামার ছেরাদ্দ তো আমার দ্বারা হবে না। তাই না—ওই চামারগুলোকে খোসামোদ করা! এই 'বেরষোৎসর্গের' সব সামগ্রী জোগাড় করে এনেছি—ভটচাযমশাইয়ের ফর্দ্দ মিলিয়ে। করুক ওরা ছেরাদ্দ।

হুড়মুড় করে এসে পড়ে গোবিন্দ, দুটো মুটের মাথায় রাশিকৃত জিনিস চাপিয়ে! দরজার বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে ঠেলা গাড়ীতে খাট বিছানা বাসন?

কুশাসন ছেড়ে উঠে পড়ে তিন ভাই।

বাড়ীতে যে যেখানে আছে স্তম্ভিত বিস্ময়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে গর্জ্জন করে ওঠে সুবিমল...মা, এর মানে?

দেয়ালে হেলান দিয়ে চুপ করে বসেছিলেন সন্তোষিণী, ক্ষীণ কণ্ঠে বলেন আমি কি করে জানবো বাবা?

না, তুমি জানবে না, জানবো আমি। এই যদি তোমার মনে ছিলো, আগে স্পষ্ট করে বললেই পারতে? ধার করে কর্জ্জ করে যেমন করে হোক করতামই। এভাবে পাঁচজনের সামনে অপদস্থ করবার দরকার ছিলো না।

বাড়ীর বাইরে কাঙালীর দলের হট্টগোল শোনা যায়।

পরিমল উঁকি মেরে দেখে এসে বলে—চমৎকার! মার্ভোলাস প্ল্যানটা বটে! কার মাথা থেকে বেরিয়েছিলো তাই ভাবছি। এর চাইতে তুমি নিজে হাতে আমাদের একগালে চুণ আর একগালে কালি দিয়ে দিলেই পারতে মা! গোবিন্দকে দিয়ে এতো অপমান করানোর চাইতে ভালা হতো।

সন্তোষিণীর ওষ্ঠাধর কেঁপে ওঠে থর থর করে।

—তোরা কি সত্যিই সেই সন্দেহ করছিস পরিমল? গোবিন্দকে দিয়ে আমি—

—সন্দেহের তো কিছু নেই মা, যা ফ্যাক্ট তাই বলছি। গোবিন্দ হঠাৎ লটারিতে ফার্ষ্ট প্রাইজ পেয়েছে একথা তো বিশ্বাস করাতে পারবে না আমাদের? তা' টাকা যদি তোমার কাছে লুকোনো ছিলই মা, আমাদের হাতে দিতে পারতে। অবিশ্যিই পকেটে পুরতাম না!

মানুষের দুর্ব্যবহারে উদ্ধত গীতশ্রীর অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। সে কাতরভাবে এগিয়ে এসে মাকে আড়াল করে বলে—মড়ার ওপর আর খাঁড়ার ঘা দিও না তোমরা মেজদা, দোহাই তোমাদের!.....তোমাকেই জিজ্ঞেস করি গোবিন্দদা, এসবের মানে কি? কি দরকার ছিলো তোমার এসব সর্দ্দারী করবার?

এতোক্ষণে গোবিন্দ একটু নীরব ছিলো, আবার উদ্দাম হয়ে ওঠে তার কণ্ঠ।

—কেন করবো না? আলবৎ করবো? আমি কি কেউ নই মামার? ভট্টচাজ্যি যে মত দিলো না, নইলে কে তোয়াক্কা রাখতো ওদের? নিজেই 'বেরষো' করতাম আমি।

গীতশ্রী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে—আচ্ছা আচ্ছা বেশ। কিন্তু টাকা পেলে কোথায় তাই শুনি?

—টাকা? দরকারের সময় টাকা আবার কোথায় পায় মানুষ? গয়না বেচলে টাকা হয়, এ তো কচি ছেলেটাও জানে। এককাঁড়ি গয়না কি দরকার নতুন বৌয়ের, তাই শুনি? ও গয়না ওকে দিয়েছিলো কে?

ইত্যবসরে পরিমলের শ্বশুর হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন—বাইরে কী ব্যাপার

হচ্ছে পরিমল? প্রায় দুশো তিনশো কাঙালী বাড়ী ঘেরাও করে চেঁচাচ্ছে। কে ডেকে এনেছে ওদের?

—জিজ্ঞেস করুন ওই রাস্কেলকে—

বলে গোবিন্দকে দেখিয়ে দেয় পরিমল।

পরিমলের শ্বশুর বলেন—তুমি কে হে ছোকরা? গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল। ওপর পড়া হয়ে ফোঁপর দালালী করতে এসেছো কিসের জন্যে?

গোবিন্দ চীৎকার করে ওঠে—খবরদার বলছি তালুক মশাই, ভালো হবে না! বলি তুমি কি জন্যে এ বাড়ীতে এসেছো মোড়লি করতে? কি করবো গুরুজন, নইলে এক ঘুঁষিতে ওই টাক দু'ফাঁক করে ছাড়তাম!

—কি? কি বললি রাস্কেল? বেরিয়ে যা! বেরিয়ে যা। পরিমল ছুটে এসে, আচমকা এক ধাক্কা দেয় গোবিন্দকে।

গোবিন্দও গা ঝেড়ে উঠে জামার আস্তিন গুটোতে বসে।

বড়বৌয়ের মা ডুকরে কেঁদে ওঠেন—ওমা একী সর্ব্বনেশে কথা গো! আজকের দিনে একী খুনোখুনি ব্যাপার! ধন্যি বলি বেয়ানঠাকরুণকে, পেটের ছেলেকে খুন করতে গুণ্ডা লেলিয়ে দেওয়া! ছি ছি এ কি কেলেঙ্কারী!

ভীড় জমেছে নানা দিক থেকে।

সহসা ভীড় দু'হাতে ঠেলে সরিয়ে উদভ্রান্তের মতো এগিয়ে আসেন সন্তোষিণী। গোবিন্দর সামনে দাঁড়িয়ে স্বভাববিরুদ্ধ তীব্র কণ্ঠে বলেন—আমিও বলছি গোবিন্দ, বেরিয়ে যা তুই, এ দণ্ডে এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে যা। শেয়াল কুকুরের মতো দূর দূর করে দিয়েছি সেদিন, তবু তোর লজ্জা নেই হতভাগা। তবু এ বাড়ীর মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে? এইবার তোকে আমার মাথার দিব্যি দিচ্ছি লক্ষ্মীছাড়া ফের যদি তুই এবাড়ীর চৌকাঠ ডিঙোস, মরা মুখ দেখবি আমার!

গোবিন্দ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বলে—মাথার দিব্যি? মরা মুখ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার মাথার দিব্যি আজই বিদেয় হয়ে যাবি তুই, এবাড়ীর চৌকাঠ আর ডিঙোবি না!

নয়

'শ্রাদ্ধশান্তি' বলে কথা।

শান্তি অশান্তি যে ভাবেই হোক যামিনীমোহনের শ্রাদ্ধটা চুকে যাওয়ার পর গোবিন্দর আর রায় বাড়ীর চৌকাঠ ডিঙোবার উপায় থাকে না, কারণ সন্তোষিণী তা'কে মাথার দিব্যি দিয়ে বসেছেন।

অথচ সেই একটিমাত্র চৌকাঠ ছাড়া সারা পৃথিবীটাই যে তার কাছে অর্থহীন, ঝাপসা!

যখন তখন সে তাই মনোবেদনাটা গৌরীর কাছে ব্যক্ত না করে পারে না।

সেদিন নিজের টিনের চালাঘারখানার সামনে দাওয়ায় বসে বলে—আক্কেলখানা একবার দেখলে তো নতুন বৌ। 'চৌকাঠ ডিঙোবি না দিব্যি দেওয়া হলো! গোবিন্দ ওঁর পাকা ধানে মই দেবে!'

গৌরী বলে—দিব্যি না দিয়েই বা করবেন কি? তুমি কখন কি ভাবে ওঁকে বিপদে ফেলবে কে জানে!

—কি হয়েছে? বিপদে ফেলবো? গোবিন্দ কপাল কুঁচকে বলে—বটে, গোবিন্দ বিপদে ফেলবে, আর ওঁর ওই সোনারচাঁদ বাপের ঠাকুররা রাজ্যপদ দেবে ওনাকে, কেমন? আমি এই বলে রাখছি নতুন বৌ—

গৌরী তাড়াতাড়ি বলে—থাক, থাক, তোমাকে আর ভয়ানক কিছু একটা বলে রাখতে হবে না। আমি একটা কথা বলি শোন—কালকে বলা হয়নি, তোমার ও পাড়ার সেই খেলার ক্লাবের ছেলেরা বাড়ী খুঁজে খুঁজে বার করে তোমাকে ডাকতে এসেছিল—

গোবিন্দ চমকে বলে—অ্যাঁ? তারপর? কি বললে তুমি?

—কি আর, বলে দিলাম তুমি বাড়ী নেই, এলে বলবো।

—যা ভাবছি তাই? গোবিন্দ যেন চাবুক খাওয়ার মতো লাফিয়ে ওঠে—মেয়েমানুষের বুদ্ধি আর কতো হবে? কেন বলতে পারলে না—গোবিন্দ-টোবিন্দ বলে এখানে কেউ থাকে না।

—ওমা সেকি? তা' বলবো কেন? তুমি কি ফেরারী আসামী?

—নাঃ, তার চেয়ে ভারী একেবারে মান্যবান ব্যক্তি! দেখে গেলো তো রায়বাহাদুর যামিনীমোহন রায়ের ভাগ্নে টিনের চালায় বাস করছে! মামার উঁচু মাথাটা হেঁট করে ভারী পৌরুষ হলো, কেমন!

মৃত মামাশ্বশুরের উঁচু মাথাটা গোবিন্দর আচার আচরণের দ্বারা নীচু হয়ে যাওয়া সম্ভব কিনা এ নিয়ে আর অবুঝ পাগলের সঙ্গে তর্ক করে না গৌরী, বরং মমতার সুরে বলে—বলাটা ভুল হয়ে গেছে সত্যি, বুদ্ধিহীন মেয়েমানুষ বৈ তো নই? কিন্তু তুমিই বা তোমার কেলাব টেলাব সব ছেড়ে দিয়েছ কেন? আবার যাও না?

—দূর দূর—গোবিন্দ উদাসভাবে বলে—আর ভালো লাগে না ও সব! ছেলেবেলা থেকে ও সব বাঁদরামী না করে, যদি লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে পারতাম। হয়ে রাইলাম একটা অমনিষ্যি—

গৌরী সস্নেহে বলে—কে বললে অমানুষ হয়ে আছো! মানুষকে কি শুধু বি-এ, এম-এ, পাশ দিয়ে মাপতে হয়?

—হয়ই তো—গোবিন্দ হঠাৎ ক্রুদ্ধস্বরে বলে ওঠে—আলবৎ হয়, এই যে মামী আমাকে শেয়াল-কুকুরের মতন দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল, মুখ্যু চাষা বলেই না? চারটে পাশ করে চারখানা পা যদি আমার গজাতো, পারতো?

গৌরী বলে—ছিঃ ওরকম কথা ভাবতে নেই। অনেক দুঃখেই তিনি তোমাকে—

—জানি জানি! গোবিন্দ গৌরীকে কথা শেষ করতে দেয় না বলে—সব জানি, সেই জন্যেই তো ইচ্ছে হয় সমস্ত পৃথিবীটায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে কোনো চুলোয় চলে যাই।

গৌরী হেসে ফেলে—কষ্ট করে আর আগুন ধরিয়ে দিতে হবে কি? তোমার মনের আগুনেই কোন্ দিন না ভস্ম হয়ে যায়।

গোবিন্দর মনের অবস্থা সে বোঝে।

চেষ্টা করে তার ভারাক্রান্ত মনটাকে কিছুটা হালকা করে দিতে।

যদিও ক্লাবের নামে পরম উদাসীনের ভান দেখিয়েছিলো গোবিন্দ, তবু পরদিনই গুটিগুটি ওপাড়ার দিকে রওনা হয়। তবু তো পাড়ায় যাওয়ার একটা সত্যিকার উপলক্ষ্যও জোটে!

যদিও এতো দূরে বাসা গোবিন্দর যে, এপাড়া ওপাড়া না বলে এদেশ ওদেশ বলাই উচিত।

ক্লাবে উৎসব পড়ে যায় গোবিন্দকে দেখে।

'গোবিন্দদা' তাদের দলের মধ্যমণি। গোবিন্দ বিহনে তাদের বৃন্দাবন অন্ধকার হয়ে আছে. সবাই 'গোবিন্দদা' 'গোবিন্দদা' করে অস্থির করে তোলে।

অনেক দিন পরে মনটা একটু হালকা হয়ে যায়। মনে পড়ে পুরনো দিনের কথা।

কী সুখের জীবনই ছিলো!

ওদের কাছে বিদায় নিয়ে শীস্ দিতে দিতে বেরোচ্ছিলো। কিন্তু ফুটপাথে পা দিয়েই থমকে দাঁড়ালো।

ডান হাতে খানিকটা গেলেই বাস ষ্টপ, কিন্তু পা দু'খানা কেন বাঁ দিকে যেতে চায়?

রায়বাহাদুর যামিনীমোহনের নেম্‌প্লেট আঁটা তিনতলা সেই বাড়ীখানা যেন কী এক অদৃশ্য সূত্রে টানতে থাকে।

বাইরে থেকে একবার দেখে গেলে কী ক্ষতি?

সত্যি কিছু আর গেটের সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতে যাচ্ছে না সে, একবার শুধু খানিকটা দূর থেকে—

এমন তো হতে পারে ঠিক এই সময় সন্তোষিণী দোতলায় নিজের ঘরের জানালায় দাঁড়িয়েছেন একটু! এ সময় কীই বা এমন কাজ মামীর? ঘরে আলো জ্বললে কতো দূরে থেকে দেখতে পাওয়া যায় মামার সেই প্রকাণ্ড পালঙ্কটার মাথার উঁচু বাজুটা। সেকেলে নক্সাদার দামী পালঙ্ক, দেখবার মতো জমকালো বাজু।...শন্ শন্ করে ঘোরে পাখার ব্লেড্, তার ঘূর্ণায়মান ছায়াটা যেন ঘরের আলোটাকে খণ্ড খণ্ড করতে থাকে।.....আগে কতোদিন ক্লাব থেকে ফিরতে একটু রাত হয়ে গেলেই চোরের মতো চুপি চুপি আসবার সময় ওপর দিকে তাকিয়েছে গোবিন্দ! মামা দাঁড়িয়ে নেই তো জানালায়? তা' হলেই তো গোবিন্দ গেছে!

সন্তোষিণী যে আজকাল দোতলার ঘর থেকে 'ডিমোশান' হয়ে গেছে, সে কথা গোবিন্দর কল্পনার বাইরে। কি করে ধারণা করবে সে—কক্ষচ্যুত সন্তোষিণীর স্থান এখন গোবিন্দর পরিত্যক্ত ঘরে।

না, সে ঘরে পাখা নেই। ঘুরন্ত ব্লেডের তাড়নায় কুচি কুচি হবার মতো প্রখর আলোও নেই সে ঘরে।

পঁচিশ পাওয়ারের একটা বাল্ব জ্বলে। স্তিমিত নিষ্প্রভ।

ইতস্ততঃ করে এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছে, হঠাৎ চমকে দেখে সামনেই গীতশ্রী।

কেমন যেন শীর্ণ শ্রীহীন।

বেশভূষার পারিপাট্যের অভাব। এমনই অভাব যে গোবিন্দর মতো অন্যমনস্ক ব্যক্তিরও চোখে ঠেকে।

—গীতা। তুই! এ সময় এখানে?....একরম দাঁড়কাকের মতো চেহারা কেন?

গীতশ্রী ম্লান হাসে।

—কি, এতোক্ষণ ধরে কলেজ হচ্ছিলো?

—গীতশ্রী শুধু বলে—কলেজ নয়।

—কলেজ নয়? ওঃ আড্ডা! মামা মরতে না মরতে দিব্যি ডানা গজিয়েছে দেখছি। তা' স্বরাজ পেয়ে চেহারাটা খুব বানিয়েছিস তো! বাঃ চুলগুলোই বা অমন বিশ্রী ঝুড়ি করে বেঁধেছিস কেন? সেই সাপের মতো বিনুনি দু'টো গেল কোথায়?

কেশ বেশের পরিপাট্যের আধিক্য দেখে গোবন্দই আগে কতো ক্ষেপিয়েছে গীতশ্রীকে, বলেছে 'পটের বিবি' 'ডলি পুতুল'।

অথচ আজকের ওর এই শ্রীহীনতা মূর্খ গোবিন্দর মনটাকে যেন ধাক্কা মারে।

বুঝতে পারে গীতশ্রী।

তবে বলে না কিছু, শুধু মৃদু হাসির সঙ্গে বলে—বেণী ঝুলিয়ে অফিসে গেলে লোকে হাসবে যে!

অফিস।

গোবিন্দর মুখের হাঁ বুজতে চায় না।

—তুই আপিস যাস?

—যাই তো!

—বলি আপিসটা কিসের?

—ওই যাহোক একটা কিছুর।

—হুঁ। গোবিন্দ দুই হাতের মুঠো গালে ঠেকিয়ে গম্ভীরভাবে বলে—বুঝেছি। দাদারা আর ভাত দিচ্ছে না! বেশ বেশ!....তা—মামীর খবর কি? আছেন না মরেছেন!

—কাছাকাছি। গীতশ্রী বলে—খুব অসুস্থ। অফিস ফেরত মারই দু' একটা ওষুধ কিনতে গিয়ে আরো দেরী হয়ে গেলো।

খুব অসুখ? ব্যাকুল গোবিন্দ সকাতর প্রশ্ন করে—যা ভেবেছি! কি অসুখ? ডাক্তারবাবু কি বলেন।

সহরের একজন খ্যাতানামা ডাক্তার বরাবর যামিনীমোহনের গৃহ-চিকিৎসক হিসাবে ছিলেন, গোবিন্দ তাঁর কথাই বলে।

গীতশ্রী বলে—ডাক্তারবাবু নয়, মেজদার শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কের কে এব কবরেজ—তিনি দেখছেন। ঝঞ্ঝাটের ওষুধ, কেউ তেমন গা করে না, ক'দিন থেকে আনা হচ্ছে না দেখে আমিই আজ....আচ্ছা গোবিন্দদা যাই তাহলে। তোমারও তো রাত হচ্ছে—

হঠাৎ খাপ্‌পা হয়ে ওঠে গোবিন্দ—থাক্ থাক্, আমার রাত হয়ে যাচ্ছে কি দিন হয়ে যাচ্ছে ভাবতে হবে না কারুর! ভয় নেই বেহায়া গোবিন্দ যাচ্ছে না ও বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াতে। মামীকে যখন তোরা খাটে করে বের করবি, তখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখবো! বুঝতে পারছি দেরীও নেই তার...মামাকে মেরেছে, এবার মামীকেও—

অকস্মাৎ কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখের কোণটা মুছে নিয়ে দ্রুতপদে বিপরীত দিকে চলতে শুরু করে গোবিন্দ।

দশ

সন্তোষিণীর ছেলেরা অসুস্থ জননীর যথোচিত যত্ন করে না একথা বললে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয় তাদের নামে।

পরিমলের পিসশ্বশুর রাজীব কবরেজ হামেসাই আসেন। নাড়ি টেপেন জিভ দেখেন, ওষুধের অনুপান বদলে দিয়ে যান।

বড়ো মেজো দুই ছেলে দু'বেলা খোঁজ নিয়ে যায় মার, একজন অফিস বেরোবার সময়, একজন অফিস থেকে ফিরতে।

নীচের তলায় ঠিক সিঁড়ির পাশেই পড়ে কিনা ঘরটা।

বধূমাতারাও নিজস্ব নির্দিষ্ট টাইমে এক-একবার নীচে নামেন। শাশুড়ীকে কুশল প্রশ্ন করেন, সাবধানে থাকবার উপদেশ দেন এবং সন্তোষিণীর ইচ্ছাকৃত অসাবধানতাই যে রোগ বৃদ্ধির মূল কারণ, পাকে প্রকারে সে কথা শুনিয়ে দিতে ছাড়েন না।

তবে বৌয়ের ডিউটির সময়ও অবশ্য আলাদা আলাদা।

তবে দৈবাৎ এক-আধদিন মুখোমুখি হয়ে গেলে, শাশুড়ীর তদ্বির তদারকীর প্রতিযোগিতা চলে।

মেজোকে শুনিয়ে বড়ো বলে—মা'র ফলটল সব আছো তো গীতা? সময় থাকতে লক্ষ্য রেখো।

গীতা সামনের তাকে রক্ষিত 'ফলটলের' দিকে একবার চকিত দৃষ্টিপাত করে সম্মতিসূচক মৃদু ঘাড় নাড়ে।

একটা ছোট্ট চুপড়ির ভেতর থেকে গোটা কয়েক শুকনো পানিফল আর আধখানা কাটা শশা তীক্ষ্ণ কটাক্ষে উপস্থিত সকলের দিকে তাকিয়ে বাঁকা হাসি হাসতে থাকে!

বলা বাহুল্য ফলের ভার বড়ো গিন্নীর।

মেজো গিন্নীর ভার দুধের। বদান্যতায় মহিয়সী তিনি, শাশুড়ীর খাতে পুরো আধসের দুধের বরাদ্দ রেখেছেন। অতএব—

অমায়িক কোমলকণ্ঠে শুধান—দুধটা গয়লা ঠিক মতো দিচ্ছে তো? বিধবা মানুষের পুষ্টিকর বলতে তো ওই দুধটুকুই ভরসা।

মায়ের সম্বন্ধে 'বিধবা' শব্দটার প্রয়োগ যেন কানের পর্দ্দায় শিহরণ এনে দেয় গীতশ্রীর। প্রায় সাত-আট মাস হয়ে গেল মারা গেছেন যামিনীমোহন তবু যেন শব্দটা অসহনীয়।

বাপের শোক সহ্য করা যায়, সহ্য হয় না মায়ের বৈধব্য!

যাই হোক এবারেও ঘাড় নাড়ে সে।

—আমার মনে হয়—মেজোবৌ মাঝে মাঝে বলেন—অতিরিক্ত শুয়ে থাকাই এতো দুর্ব্বলতার কারণ। শরীরের কিছু এক্সাইজ দরকার, ওর অভাবে স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে যায়।

অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে গীতশ্রীর, অনেক সহ্য শক্তি বেড়েছে। তবু এহেন হিতোপদেশে বিরক্তি প্রকাশ না করে পারে না।

বলে—দরকার বুঝি? ওঃ! তা কোন্ কোন্ কাজগুলো করলে স্বাস্থ্যরক্ষা হয় মেজবৌদি? বাসান মাজা? মসলা পেষা? সাবান কাচা?

—ও বাবা মেজাজ একেবারে মিলিটারী! সাধে কি আর এদিক মাড়াতে চাই না—বলে ঠিকরে বেরিয়ে যায় মেজবৌ।

সন্তোষিণী মৃদুস্বরে বলেন—কেন তুই সাপের ন্যাজে পা দিতে যাস গীতু?

—কি করি বলো। সব সময় সহ্য করা শক্ত হয়। কিন্তু না দিলেই কি সাপ ছোবল মারতে ছাড়ে মা? বড়দির কথা ভাবো।

সন্তোষিণী একটা নিঃশ্বাস ফেলে নীরব থাকেন।

বিধবা কন্যা মুরলার কথা মনে পড়ে গিয়ে বুকের ভিতর কি করতে থাকে

তাঁর, বাইরে থেকে বোঝা যায় না। মুরলা মুখরা হোক, অবুঝ হোক, নির্বুদ্ধি হোক, তবু সে সন্তোষিণীরক প্রথম সন্তান। দুঃখী সন্তান।

সেই মুরলা চোখ ছাড়া রয়েছে আজ চার মাস।

শ্বশুরবাড়ীর দেশে একটা অজ পাড়াগাঁয়ে গিয়ে পড়ে আছে মুরলা।

বাপের মৃত্যুর পর সবে যখন বড়ো-মেজো দুই ভাইয়ের হাঁড়ি ভিন্ন হয়েছে এবং মুরলা কার ভাগে পড়বে সাব্যস্ত হচ্ছে না, তখন—'বড়ো গাছে নৌকা বাঁধার' নীতিতে মুরলা খুব তোয়াজ করতে শুরু করেছিলো বড়োভাজকে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পিতৃভিটে ত্যাগ করতে হলো তাকে সেই বড়োবৌয়ের ছোবলের বিষে।

নির্ম্মল অবিবাহিত, আলাদা হাঁড়ির ঠিকমত ব্যবস্থা তার পক্ষে সম্ভব নয়, তা' ছাড়া খুব বেশী দরকারও ঘটেনি। মেজোবৌয়ের ছোট বোনটি বিয়ের মতন বড়ো হয়ে ওঠা পর্য্যন্ত মেজবৌ এম-এ পাশ রোজগারী ছোটো দেওরটিকে চক্ষের মণি দেখতে সুরু করেছে। নির্ম্মল তার ভাগে।

নির্ম্মলও আজকাল বেড়াতে যাওয়ার জায়গা হিসেবে মেজদার শ্বশুরবাড়ীটাকেই সানন্দে নির্ব্বাচন করে নিয়েছে।

আপাততঃ কিছুদিন থেকে সে হাওয়ায় ভাসছে। সন্তোষিণীর সামান্য শরীর খারাপের কথা মনে পড়বার কথা নয়, তা'ছাড়া—তার সময় কোথা?

এগারো

বয়সে বুড়ো না হলেও 'বুড়োমি' করাটা কবিরাজী শাস্ত্রের অন্তর্গত, কাজেই আধা-বয়সী রাজীব কবরেজকে 'বুড়ো'র ভান করতে হয়।

রোগী দেখার ছুতোয় প্রায়ই আজকাল শ্যালকদুহিতার শ্বশুরবাড়ীতে আবির্ভাব ঘটে তাঁর।

তবে এসেই যে রোগী দেখতে ঢোকেন তা' নয়। লাঠি ঠুকঠুক করে ওপর তলায় ওঠেন, মিশ্রীর সরবৎ, বেলের পানা, স্পঞ্জ রসগোল্লা, বাটাছানার সন্দেশ ইত্যাদি কবিরাজভোগ্য ভালো ভালো বস্তুগুলি উদরসাৎ করেন, দ্রবীভূত স্নেহে নাতিনাতনীদের আদর করেন। তাদের সভ্যতা ভব্যতা আচার আচরণের ভূয়সী প্রশংসা করেন, অতঃপর নেমে চলে যাওয়ার সময় বুড়োর ভঙ্গীতে লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে সিঁড়ির পাশে সন্তোষিণীর ঘরে ঢোকেন।

বিছানার চৌকীর কাছে বেতের একটা মোড়া পাতা থাকে, তা'তেই একটু আলগোছ হয়ে বসে একটু নকল কাশি কেশে নিয়ে হাত বাড়িয়ে বলেন—কই বেয়ান নাড়িটা দেখি—

প্রচলিত প্রথায়—আর বেয়াই, মরণ হলেই বাঁচি, আর কেন থাকা—প্রভৃতি মামুলী বাক্যবিন্যাসের ভাষা সন্তোষিণীর মুখে আসে না কখনো, তিনি নীরবে হাতখানা বাড়িয়ে দেন।

রাজীব কবরেজ ধ্যানস্থের ভঙ্গীতে মিনিটখানেক নাড়ি ধরে থেকে একটি বিজ্ঞানসূচক 'হুঁ' উচ্চারণ করে গীতাকে উদ্দেশ্য করে চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন—ওষুধের কাজটা ঠিকমতো হচ্ছে না কেন বলো দিকি—মকরধ্বজ মাড়া ভালো হচ্ছে তো? অনুপান ঠিক আছে?

গীতা ঘাড় হেলায়।

—সকালে পানের রস আর সন্ধ্যেয় বড় এলাচের গুঁড়োর সঙ্গে মধু—দিয়েছিলাম না?

—হ্যাঁ!

—আচ্ছা সকালে পানের রসটা বদলে পটলের রস দিও দিকি। সন্ধ্যেরটাও ওই চলুক দু'দিন।....কিন্তু বাপু আমার মনে হচ্ছে কিছু অনিয়ম হচ্ছে—তা' নইলে—

গীতশ্রী ঈষৎ তীক্ষ্ণ সুরে বলে—কিছু অনিয়ম হচ্ছে না।

—বললে শুনবো কেন? গুরুর কৃপায় আমার ওষুধ 'ডেকে কথা কয়', নিষ্ফল হতেই পারে না। নিশ্চয়ই কোনখানে গোলযোগ হচ্ছে।

গীতশ্রী গম্ভীরভাবে বলে—তা' হলে হচ্ছে!

রাজীব একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওর আপাদমস্তক লক্ষ্য করে নিয়ে সন্তোষিণীকে উদ্দেশ্য করে বলেন—বেয়ানের মেয়েটি একটু জ্যাঠা। হবেই তো—একই কালের স্বধর্ম্ম, তায় আবার রোজগেরে মেয়ে। শ্বশুর ঘরের ভয় তো নেই।....আচ্ছা তা' হলে আজ উঠি।

কবরেজ মশাই বেরোবার আগেই চট্ করে একটা ছায়া সরে যায় দরজার কাছ থেকে।

না, কোনো গুপ্তচরের নয়, ছায়াটা নির্ম্মলের।

ও যখন বেড়িয়ে ফেরে, প্রায়ই সন্তোষিণী ঘুমিয়ে পড়েন, দরজা ভেজানো থাকে। আজ দৈবাৎ একটু সকাল সকাল ফিরেছে, ঢুকছিলো মনের আনন্দে

টেনিস র‍্যাকেট ঘোরাতে ঘোরাতে, সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েই নজর পড়লো ঘরে কবরেজ মশাই, মেজদার পিস্‌শ্বশুর! অদূর ভবিষ্যতে তার নিজেরও পিস্‌শ্বশুর হবার সম্ভাবনা।

ঘরে ঢুকতে গিয়ে ঢুকতে পারলো না। অপ্রতিভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলো রুগ্ন জননীর অনাড়ম্বর পরিবেশের দিকে।

অনাড়ম্বর? না বড় বেশী রিক্ত?

হঠাৎ মনে পড়ে গেলো অনেকদিন আগের একটি দৃশ্য!

ত্রিবেণীতে গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে ম্যালেরিয়া ধরিয়ে এসেছিলেন সন্তোষিণী। কী রাজকীয় আড়ম্বরে সেবা শুশ্রূষা চলেছিলো। নির্ম্মল কোলের ছেলে, মায়ের জন্যে আনা আঙ্গুর আপেল বেদানা কমলার ভাগ খেতে খেতে ফলে অরুচি ধরে গিয়েছিলো তার।

উৎকণ্ঠিত যামিনীমোহন মাথার কাছ থেকে নড়তে চাইতেন না। বাড়ীশুদ্ধ ছেলে বড়ো সবাই তটস্থ! সন্তোষিণীব একটু আরাম আয়াসের জন্যে অসাধ্য সাধন করতে পারে বুঝি বা!

রাজীব কবরেজ ঘরে না থাকলে হয়তো ঢুকে পড়তো। ইতস্ততঃ করতে করতে কেমন একটা চক্ষুলজ্জায় ঝট করে সরে গেলো।

কিছুক্ষণ পরেই ডাক দিলো—গীতা! গীতা।

গীতাশ্রী এসে দাঁড়ালো—কি বলছো ছোড়দা?

—বলছি—বলছি সারাদিন সব করিস কি? মার বিছানা টিছানাগুলো বিশ্রী হয়েছে চোখে পড়ে না? বাড়ীতে ধোবার পাঠ উঠে গেছে নাকি?

গীতা একটু কঠিন হাসি হেসে বলে—গেছে কি না খোঁজ নিও। কিন্তু মার ভাগ্যটা হঠাৎ ফিরে গেলো কেনো বলোতো? ভাবনা ধরিয়ে দিলে যে!

—রাবিশ!

বলে বোনের দিকে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে চলে যায় নির্ম্মল।

হয়তো—এমনি এক আধ সময় কারুর মনে শ্মাশানবৈরাগ্যের উদয় হয়, কিন্তু দাঁড়াতে পারে না সেটা। উচ্চশিক্ষার উচ্চ পালিশ লাগানো মন থেকে সহজেই পিছলে পড়ে যায়।

মনের যন্ত্রণা অহরহ কুরে কুরে খায় শিক্ষাদীক্ষাহীন অমার্জ্জিত মনকে,

মসৃণতার অভাবে পিছলে পড়তে পারে না। তাই যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে মুর্খ অশিক্ষিত গোবিন্দ।

সন্তোষিণীর শক্ত অসুখ, সন্তোষিণী বিছানায় পড়ে, আর গোদিন্দর চোখে দেখাটুকুরও অধিকার নেই? এ কী অদ্ভুত ঘটনা!

সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়ীখানার আশেপাশে ঘুরে বেড়ায় গোবিন্দ। হাঁ করে তাকিয়ে থাকে দোতলার সেই ঘরখানার দিকে? কিন্তু আশ্চর্য্য! কোনোদিন কি জানালা দুটো খোলা থাকতে নেই? জ্বলতে নেই আলো? এতোই কি অসুস্থ সন্তোষিণী, যে একটু খোলা হাওয়া খাবারও হুকুম নেই?

দোলতার সেই ঘরখানার বর্ত্তমান মালিক যে কতদূর বিচক্ষণ সেকথা গোবিন্দ জানবে কেমন করে!

আলো জ্বালালেই যে পয়সা খরচ হয়, নিজের পয়সায় হাত পড়ার পর থেকে সে সম্বন্ধে রীতিমত সচেতন আছেন বড়োগিন্নী।

বারো

হঠাৎ একদিন রাজীবকে রাস্তায় পাকড়াও করলো গোবিন্দ।

—আপনি কে মশাই?

—সে কথায় দরকার কি হে ছোকরা?

খিঁচিয়ে ওঠেন রাজীবলোচন।

—আছে দরকার—গোবিন্দ পথ আগলায়—আপনিই সেই কবরেজ বুঝি?...হুঁঃ, সেই রকমই মনে হচ্ছে যেন!...বলি রুগী দেখলেন কেমন?

—তোমার জানবার প্রয়োজন?

চিবিয়ে চিবিয়ে প্রশ্ন করেন রাজীবলোচন।

হঠাৎ ধমকে ওঠে গোবিন্দ—প্রয়োজন আছে কি নেই আমি বুঝবো, তোমাকে যা বলেছি তার উত্তর দাও দিকিন?...নইলে দেখ—

জামার আস্তিনটা গুটিয়ে পেশীবহুল বলিষ্ঠ হাতখানা সামনে বাড়িয়ে ধরে গোবিন্দ।

রাগ হলে আর 'আপনি আজ্ঞের' গণ্ডিতে আটকে থাকতে পারে না সে।

—দুর্গা! দুর্গা! ভর সন্ধ্যাবেলা একী বিপত্তি! আচ্ছা এক পাগলের পাল্লায় পড়া গেলো তো!.....বলি রোগ তো একটা নয় বাপু, জ্বর-জরা, শোক-তাপ মিলিত ব্যাধি। ও কি সহজে সারে?

—ছেঁদো কথা রাখো। সহজে হোক, শক্তয় হোক, সারবে কি না?—হুঙ্কার দিয়ে ওঠে গোবিন্দ।

কী মুস্কিল!

রাজীব সভয়ে একবার গোবিন্দর প্রায় চল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতির দিকে তাকিয়ে বলল—কী মুস্কিল! সারবে না কে বলেছে? আয়ুর্ব্বেদে মরাকে বাঁচাবার ওষুধ পর্যন্ত আছে, বুঝলে বাপু?....ওঁর যা রোগ, বায়ু পরিবর্তনে সারে।

—বটে? তা' সে হুকুম হচ্ছে না কেন?

—ভ্যালা ফ্যাসাদ হলো তো! আমরা চিকিৎসক, বিধান দিতে পারি, রুগীকে হাওয়া খাইয়ে আনবার দায়িত্ব তো আমাদের নয়!....অসময়ে একি বিপদ! সরো দিকি, সরো!

—উঁহু! এখুনি সরছি না। সব কথার জবাব চাই। হাওয়া বদলের দরকার তো, হাওয়া একেবারে বন্ধ কেন? চব্বিশ ঘণ্টা রুগীর ঘরের জানালা আটকে রাখা কি রকম চিকিচ্ছে?

রাজীব গোবিন্দর দৃষ্টি অনুসরণ করে বলেন—ও ঘরে কি। ও ঘরে কে আছে?

—কেন? মামী! অসুখ কার? মামীরই তো? নির্ব্বোধের মত তাকায় গোবিন্দ।

—ও মামী? তুমি বুঝি বেয়ান-ঠাকরুণের সেই পুষ্যি ভাগনেটি? মামীর জন্যে এতো দরদ কেন বুঝেছি এবার! বোকাসোকা ভালোমানুষ মামীটির মাথায় হাত বুলিয়ে অনেক সুবিধে হয়, কি বলো? মামী মরলে সেটি তো আর—

—খবরদার! মুখ সামলে—

বাঘের মতো হুঙ্কার দিয়ে ওঠে গোবিন্দ—ওই দাঁতের পাটিটি বাঁধানো তাই, না হলে আজ আর আস্ত পাটি নিয়ে ফিরতে হতো না। কাঁচা দাঁত ঘুঁসিয়ে ছাতু করতাম। রুগী কোথায় বলো শীগ্‌গির?

—আরে বাবা, নীচের তলায় ওই তো ওপাশেরই ওই ঘরে। আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া।

হন্ হন্ করে এগিয়ে যান রাজীবলোচন কবিরাজ।

কবিরাজের অঙ্গুলি নির্দ্দেশিত "ও পাশের ঘরের" একপাট কপাট খোলা জানলা দিয়ে যে ক্ষীণ আলোকরেখাটুকু অন্ধকারের মাঝখানে হাত বাড়িয়ে রেখেছে, সেই দিকে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে গোবিন্দ।

ওই ঘরে সন্তোষিণী শুয়ে আছেন।

রোগশয্যায়!

হয় তো বা শেষ শয্যাতেই!

গোবিন্দর পরিত্যক্ত ঘরে!....যে ঘরে ঢুকে কতোদিন সন্তোষিণী ব্যথিত মন্তব্য করেছেন—আহা ঘরখানা তোর বড্ডো গরম গোবিন্দ! পঞ্চাশখানা ফ্যান্ বাড়ীতে, এ ঘরে যদি একখানা—

কথা শেষ করতে পারেননি, নিজের ছেলেদের ব্যঙ্গহাস্যরঞ্জিত মুখের চেহারা স্মরণ করে।

গোবিন্দই হেসে উড়িয়েছে।.....কী যে বলো মামী? মোমের পুতুল নাকি, যে গরমে গলে যাবো?

কিন্তু মামী!

গরমের দিনে কুটনো কুটতে বসলে যাঁর পাশে টেবিল-ফ্যান বসিয়ে দেওয়া হতো—হার্ট উইক মানুষ, গরমটা ক্ষতিকর বলে!

উঁচু বনেদীর বাড়ী।

নীচের তলার ঘরের জানলাগুলোও মেঝে উঁচু উঁচু। রাস্তা থেকে জানলা দিয়ে উঁকি মারা যায় না, বড়ো জোর জানলাব নীচে মাথা ঠোকা যায়। পরীক্ষা করা যায় জানলার কাঠের চাইতে মাথার কাঠামোটা শক্ত কিনা!

নিরুপায় আক্রোশে সেই পরীক্ষাই করতে থাকে গোবিন্দ।

মাথা ঠোকে আর ভাবে—সত্যিই কি মাথার দিব্যি জিনিসটা অলঙ্ঘনীয়? লঙ্ঘন করে ফেললে সত্যিই দিব্যদাতার অমঙ্গল হয়? হয় আয়ুক্ষয়? তাই নিশ্চিত আয়ুক্ষয়ের নিদর্শন দেখেও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে হবে ভবিষ্যৎ আয়ুক্ষয়ের আশঙ্কায়?

গোবিন্দ নিরুপায় ছটফটানির ধাক্কা কাঠের জানালাটা ছাড়া আর একজনকেও খেতে হয়, সে হচ্ছে সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি গৌরী।

বাড়ী ঢুকেই গোবিন্দ যখন উদ্দাম প্রেম আহ্বানের হাঁক দেয়—নতুন বৌ! নতুন বৌ! কানে কালা হয়ে বসে আছো নাকি?—তখন হাতের কাজ ফেলে একখানা পাখা হাতে নিয়ে ত্রস্তে ছুটে আসে সে।

বলে—কি বলছো গো?

গোবিন্দ সর্ব্বাগ্রে ওর হাত থেকে পাখাখানা ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে

বলে—বলছি? বলছি—আমি না হয় হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া বোম্বেটে, আর তুমি? তুমি কি?

—আমি? গৌরী হতচকিতে প্রশ্ন করে—আমি কি?

—বলি তুমি এতো নেমকহারাম কেন? এই যে মামী মরতে বসেছে, তুমি একবার দেখতে যেতে পারো না? মামী কি তোমায় মাথার দিব্যি দিয়েছে?

গৌরী অবাক বিস্ময়ে বলে—আমি কেমন করে যাবো?

গোবিন্দর সঙ্গে ভিন্ন একা যাওয়া তার কি করে সম্ভব, ভেবে অবাক হয় বেচারা।

কিন্তু বাস্তববুদ্ধিহীন গোবিন্দর সে খেয়াল কোথায়?

সে আরো হুমকি দিয়ে ওঠে—কি করে যাবে। ওঃ তাও তো বটে, চতুর্দ্দোলা চাই। তা' নইলে মাহারাণীর মানের কনা খসে যাবে যে! যাঁর মরণ বাঁচন রোগ হয়েছে, সে তোমাকে নেমন্তন্ন করে নিতে পাঠাবে কেমন?.....কেন, তোমায় নিয়ে গিয়ে দোর থেকে ছেড়ে দিতে পারি না আমি?

গৌরী অভিমানভরা স্বরে বলে—পারো তা নিয়ে যাওয়া কেন?

—বলি মুখ ফুটে বলেছো, কোনোদিন? বলেছো—"ওগো মামীকে অনেকদিন দেখিনি. একদিন দেখতে ইচ্ছে করে?" পরের মেয়ে আর কতো হবে?

গৌরী সাগ্রহে বলে—তুমিও চলো না গো! গুরুজন কি বলেছেন না বলেছেন, মনে পুষে রেখে কষ্ট পাবার কি দরকার? গেলে আর তোমার মান যাবে না।

—মান?—গোবিন্দ যেন দপ্ করে জ্বলে ওঠে—গোবিন্দর মান অতো ঠুকনো নয় যে কথার বাতাসে ভেঙে পড়বে! মাথার দিব্যি ঠেলে আমি যাই, আর মামীর মাথাটা খাই, এই তোমাদের ইচ্ছে কেমন?

গোবিন্দ মনের বাতাস কোন মুখো বইছে সেটা বুঝতে পারে না গৌরী, নিরুপায় হয়ে ফেলে দেওয়া পাখাখানা কুড়িয়ে এনে নীরবে ওর গায়ে বাতাস দিতে থাকে।

এবারে আর পাখা ফেলে দেয় না গোবিন্দ, কোঁচার খুঁটে কপালের ঘাম মুছে কিছুক্ষণ চুপকরে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ গৌরীর পাখাধরা হাতখানা চেপে ধরে সাগ্রহে বলে—আচ্ছা নতুন বৌ, পেছনের উঠোনের পাঁচীলটা এমন কি উঁচু?

গৌরী এহেন আকস্মিক প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলো না, বিমূঢ়ভাবে বলে—কোন উঠোনের?

—কোন উঠোনের? গোবিন্দ জ্বলে ওঠে—রায়বাহাদুর যামিনীমোহন রায়ের বাড়ীর গড়নটাই একেবারে বেবাকে ভুলে গেছো, কি বলো? হবেই তো—পরের মেয়ে আর কি হবে? বলি পাঁচ পাঁচটা বছর তো বাস করে এলে, উঠোনের পাঁচীলটা কতো উঁচু, একটা জোয়ানমদ্দ লোকে ডিঙোতে পারে কিনা সে হুঁস হয় না?

গৌরী ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকিয়ে বলে—খুব উঁচু নয়।

—তবে? গোবিন্দ সানন্দে বলে—চৌকাঠ ডিঙোতেই মাথার দিব্যি দেওয়া আছে, পাঁচীলের ওপর তো দিব্যি দেওয়া নেই? আমি যদি পাঁচীল ডিঙিয়ে ঢুকি, কি করতে পারে মামী?

সমস্যা সমাধানের এমন একটা প্রশস্ত পথ আবিষ্কার করে ফেলে উৎফুল্ল হাস্যে স্ত্রীর বিপন্ন মুখের দিকে তাকায় গোবিন্দ।

কি উত্তর দেবে গৌরী? কতোখানি আকুলতায় ক্ষ্যাপা লোকটা এমন অদ্ভুত কল্পনাও করতে পারে তাই মনে করে শঙ্কিত হয়।

ব্যাকুল ভাবে বলে—ওগো তোমার পায়ে পড়ি, ওসব করতে যেওনা, ওরা তাহলে 'চোর' বলে পুলিশে দেবে তোমাকে।

চোর! তাইতো!

হাঁ করে তাকিয়ে থাকে গোবিন্দ।

তা গোবিন্দর ধরণ ধারণটা চোরের মতই দেখায়।

কাজকর্ম্ম চুলোয় গেল তার, যখন তখন এসে ঘুরে বেড়ায় মামার বাড়ীর আশেপাশে! ঝি চাকর কাউকে বেরোতে দেখলেই তার সঙ্গে পায়ে পায়ে এগিয়ে আলাপ জিময়ে 'গিন্নীমার' খবর জানতে চায়।

এখনকার লোকগুলো সকলেই প্রায় নতুন, গোবিন্দকে চেনে না। কেউ গ্রাহ্য করে দুটো উত্তর দেয়, কেউ অগ্রাহ্যভাবে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়।

একটা ঝি তো একদিন বাজার থেকে ফিরে হাত মুখ নেড়ে রীতিমত ব্যাখ্যান সুরু করে দিলো মনিরানীদের কাছে। একটা গুণ্ডো মতন লোক নাকি কেবল এই বাড়ী পানে তাকিয়ে থাকে, একে তাকে ডেকে সন্ধানতলুক জানতে চেষ্টা

করে, মতলব খারাপ তাতে আর সন্দেহ কি। তা সেও সোজা মেয়ে নয়, আচ্ছা করে শুনিয়ে দিয়েছে!

কথাটা গীতশ্রীর কানে যায়।

প্রশ্ন করে—কেমন দেখতে লোকটা? ঝিয়ের মুখে বর্ণনা শুনে অস্বস্তি বোধ করতে থাকে। তার নিশ্চিত ধারণা হয়, এ আর কেউ নয়—গোবিন্দ।

এদিকে অস্থির গোবিন্দ একদিন ছোটে ডাক্তার দাশগুপ্তর কাছে। যামিনীমোহনের আমলে তো অনেক সময় দেখেছে তাঁকে।

সকাতরে বলে....ডাক্তারবাবু, মামীর খুব অসুখ।

ইদানীং আর 'ও' বাড়ীতে তেমন যাওয়া আসা নেই ডাক্তারের, গোবিন্দকে দেখে ভ্রূ কুঁচকে বলেন—তাই নাকি? কি হয়েছে?

—জানিনা ডাক্তারবাবু বড়দা মেজদা এখন হাড়কেপ্পন হয়ে গেছে, একটা হতুড়েবদ্যির হাতে ফেলে রেখে দিয়েছে মামীকে, মামী আর বাঁচবে না। মেরে ফেলবে ওরা।

ব্যাপারটা বোধহয় কিছু বোঝেন ডাক্তার, মৃদু হেসে বলেন—তাঁর ছেলেরা যদি তাঁকে মেরে ফেলবার প্রতিজ্ঞাই করে থাকেন, তুমি আমি কি করতে পারি বলো?

—তা হবে না! গোবিন্দ দৃঢ়কণ্ঠে বলে—আমি কি কেউ নই? আমার কোনো রাইট নেই মামীর ওপর? আপনি একবার দেখতে চলুন ডাক্তারবাবু—বিনীতভাবে গোবিন্দ পকেট থেকে বত্রিশটা টাকা বার করে সসঙ্কোচে ডাক্তারবাবুর টেবিলে রাখে।

কাল সন্ধ্যায় মাইনে পেয়েছে সে।

ডাক্তার বোঝান—ওঁর ছেলেরা 'কল্' না দিলে হঠাৎ যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

কিন্তু গোবিন্দ নাছোড়বান্দা।

যুক্তিতর্কের অভাব অবশ্য তার ভাঁড়ারেও নেই। তাই সেগুলো নিতান্তই তার নিজের মতন এই যা!

ক্রমশঃ স্থান কাল পাত্র বিস্মৃত হয়ে যায় বেচারা। নিজস্ব উদ্দাম কণ্ঠে ঘোষণা করে—ওরা কে? ওদের কি রাইট আছে বিনি চিকিচ্ছেয় মেরে ফেলবার? মামী পেটে দশমাস জায়গা দিয়েছিলো বলেই কি মামীর মাথাটা কিনে

রেখেছে?....আমি দেখে নেবো কি করে মেরে ফেলে ওরা! খবর দেয়নি, জানতে দেয়নি। জানতে দেয়নি তাই মামাকে শেষ করতে পেরেছে—

ডাক্তার মৃদু আশ্বাসের ভঙ্গীতে হাত নেড়ে যেতে বলেন ওকে।

ছেলেটাকে যামিনীমোহনের বাড়ীতে দেখেছেন মাঝে মাঝে, কখনো গ্রাহ্য করেননি। এই নতুন পরিচয়ে চমৎকৃত হন।

তেরো

এদিকে—

দিন কাটছে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে।

সংসার চলেছে নিজের তালে।

বড়ো বৌ প্রতিটি পয়সার হিসেব কষে কষে টাকা জমান, আর লুকিয়ে স্যাকরা ডেকে ভারী ভারী গহনা গড়িয়ে বাক্সে তুলে রাখেন। মেজবৌ "টাকা জিনিসটা যে তার কাছে খোলামকুচির সামিল" ফি হাত এই কথাটি সাড়ম্বরে ঘোষণা করে করে পাঁচজনকে দেখিয়ে দেখিয়ে পরেন—নিত্যনতুন শাড়ী গহনা জামা জুতো, কেনেন—হালফ্যাসানের ভালো ভালো আসবাব পত্র।

নির্ম্মল একান্ত নিষ্ঠায় যাতায়াত করতে থাকে মেজদার শ্বশুরবাড়ী। কিছুদিন পরেই যেটা নিজের শ্বশুর বাড়ীতে পরিণত হতে পারবে।

গীতশ্রী অফিসটা বজায় রেখে বাকী সময়টুকু মা'র তদারকী করে।

সন্তোষিণী বিছানায় শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর পদধ্বনির আশায় দিন গোণেন।....

বৈঠকখানা ঘর থেকে বড়ো ছেলের তাসের আড্ডার 'হররা' কানে আসে...আসে ওপর তলা থেকে মেজ বৌমার গানের আসরের সুর।...ছোট ছোট নাতনীগুলো দরজার গোড়ায় উকিঝুঁকি মারে, আর সন্তোষিণী একটু ডাকলেই ছুটে পালায়।

গহনা কাপড়পরা হাস্যময়ী ঠাকুমা, আচার আমসত্ত মিষ্টান্নের অফুরন্ত ভাঁড়ারী ঠাকুমা ছিলেন তাদের কাছে যেমনই প্রীতিকর, তেমনই ভীতিকর। এই অদ্ভুত সাজ করা শয্যাশায়িনী অশ্রুমুখী ঠাকুমা।

সংসারের বহুবিধ পরিবর্ত্তনে সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বোধকরি এই ছোটগুলো।

একে তা 'গোবিন্দকার' বিরহ তাদের হৃদয়রাজ্যে এক অপূরণীয় ক্ষতি, তার ওপর সংসারের বিধিব্যবস্থাগুলো কী বিশ্রী বিরক্তিকর!

রণু দেবু খেতে বসবে এক জায়গায়, তো মণি চাঁদুকে বসতে হবে অন্যত্র। রণু দেবুর খাদ্য শুকনো রুটি, আর মণি চাঁদুর খাদ্য লুচি সন্দেশ।

দু'পক্ষের পড়ার ঘর আলাদা, খেলার পার্ক আলাদা। উভয় গৃহিণীর কড়া শাসন আছে চাকর বাকরের ওপর।

ওদের কাছে একটা অর্থহীন প্রহেলিকা।

এই নিস্তরঙ্গ সংসারযাত্রায় হঠাৎ একদিন একটা ঢিল পড়লো!

সে ঢিলটা হচ্ছে ডাক্তারবাবুর আকস্মিক আবির্ভাব।

সময়টা সকাল, তিন ভাই বাড়ীতেই উপস্থিত। সহসা ডাক্তার দাশগুপ্তর পরিচিত বিরাট গাড়ীখানা দরজায় এসে দাঁড়াতেই থতমত খেয়ে গেলো ওরা।

তিনজনেই ভাবে....ডাকলে কে? বড়দা? মেজদা? নির্ম্মল?

ব্যাপারটা কি? মায়ের ওপর হঠাৎ এত্রো দরদ? না কি ভাইদের ওপর টেক্কা দেওয়া? পরস্পর পরস্পরকে সন্দেহ করতে থাকে।

যাই হোক তিনজনেই ত্রস্তব্যস্তে ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে ঢোকে রোগীর ঘরে।

পরিচিত ডাক্তার, আগেও কতোবার চিকিৎসা করেছেন সন্তোষিণীকে, এক্ষেত্রে সন্তোষিণীকে দেখে তাঁর বর্ত্তমান অবস্থা এবং পরিস্থিতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মর্জ্জিত ভাষায় এমন দু'একটি মন্তব্য করেন, যা সন্তোষিণীর ছেলেদের পক্ষে মোটেই গৌবরজনক নয়। শ্রুতিসুখকর তো নয়ই।

অসুখ?

অসুখ আবার কি?

চিকিৎসা? চিকিৎসা আর কিছুই নয়, চেঞ্জ!

চেঞ্জ চাই সব কিছুর। অবস্থার, ব্যবস্থার খাওয়দাওয়া সমস্তর।

—'হাওয়া বদল হলেই হলো' ভেবে যেন আবার কলকাতার বাড়ী থেকে দেশের বাড়ীতে ট্রান্সফার করবেন না—ডাক্তার ঠোঁটের কোণে হাসির আভাস এনে বলেন—দরকার বোধ করেন তো সমুদ্রতীরে বাড়ী দেখুন একটা, পুরী ওয়ালটেয়ার, গোপালপুর. যেখানে হোক।....নিদেন পক্ষে কাছেপিঠে দীঘায় চলে যান। সুন্দর জায়গা।

'দরকার বোধ' করুক না করুক, মাথা হেঁট করে শোনে তিনজনেই।

গাড়ী পর্য্যন্ত তুলে দেবার সময় ইতস্ততঃ করে তিনজনেই, ঠিক বুঝতে পারে না ভিজিটটা দেবে কে? অথবা দিয়েছে কে? যে ডেকে এনেছে, দেওয়া

তারই তো উচিত—কোনো ভাইয়েরে সঙ্গে পরামর্শ পর্য্যন্ত না করে যখন বাহাদুরী দেখানো হয়েছে।

শেষ অবধি দেওয়া আর হয় না।

অতঃপর ঘরের মধ্যে কর্ত্তার কাছে আস্ফালন করেন বড়বৌ—আর কিছুই নয়, এ হচ্ছে মেজগিন্নীর কারসাজি। ওই যে দিনরাত নবাবী দেখানো, ভাবটা যেন পয়সাকে পয়সা জ্ঞান করে না, তাই সকলের ওপর এই টেক্কাটি দেওয়া হলো। তা' তুমিই বা সয়ে থাকবে কেন? ভিজিটের টাকার তিন ভাগের এক ভাগ ধরে দাওগে যাও, ছোট ঠাকুরপো দিক আর এক ভাগ, বাকী এক ভাগ থাকুক মেজ ঠাকুরপোর।

ওদিকে মেজগিন্নী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখে পাউডারের তুলি বুলোতে বুলোতে স্বামীকে উদ্দেশ্য করে মুচকি হেসে বলেন—হঠাৎ বড়োগিন্নীর আঁচলের গেরোটা আলগা হয়ে গেল কি করে বলো তো? নগদ বত্রিশ টাকা ফী দিয়ে ডাক্তার আনানো—সোজা কথা? ঝোঁকের মাথায় করে ফেলে শেষে না আফশোসে হার্টফেল করে বসেন! যাও যাও তুমি গোটা ষোল অন্তত দিয়ে এসো! মা তো সকলেরই!

নির্ম্মল পুরোপুরি বত্রিশটা টাকাই পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, বড়দা কি মেজদা, কার হাতে গুঁজে দেবে বুঝে উঠতে পারে না? মনে ভাবে, তারই উচিত ছিলো মায়ের জন্য ডাক্তারকে কল্ দিয়ে আসা।

কিন্তু রঙ্গমঞ্চে কথা উঠতেই প্রত্যেকে অবাক।

কেউ ডাকেনি ডাক্তারকে।

কেউ দেয়নি টাকা।

তবে?

ডাক্তার নিজেই এলো নাকি? তাজ্জব ব্যাপার!...ওঃ নিশ্চয় গীতা! ডাকো তাকে।

গীতশ্রীও মনে মনে ভাবছিলো দাদাদের মধ্যে কে হঠাৎ এমন বদান্য হয়ে উঠলো। ওদের প্রশ্ন শুনে চুপ হয়ে গেলো।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে স্থির স্বরে বললে—ভৌতিক ব্যাপার ভেবে ছটফট করবার দরকার নেই বড়দা, আমি বুঝেছি কে দিয়েছে টাকা, কে দিয়ে এসেছে খবর!

—কে? কে?

—গোবিন্দদা।

গোবিন্দ! শব্দটা যেন ওদের গালের ওপর চড় মারে। তিনটি কণ্ঠ হ'তে একত্রে ধ্বনিত হয়—গোবিন্দ!

—তার আবার এতো মুরোদ হলো কোথা থেকে?

গীতশ্রী তেমনি ভাবে বলে—মুরোদ যে কি করে কোথা থেকে হয় বোঝা শক্ত মেজদা, বাবার শ্রাদ্ধের দিনের কথাটা ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখেছো কোনোদিন? মা ইচ্ছে করে তোমাদের সভার মধ্যে অপদস্থ করবার ফন্দীতে ষড়যন্ত্র করে গোবিন্দদাকে আনিয়েছিলেন, এই ভেবেই নিশ্চিন্ত আছো।

নির্ম্মল বলে—কিন্তু গোবিন্দদা তো এদিকও মাড়ায় না, ও কি করে জানছে মায়ের অসুখ? থাকে তো সেই কোন দূরে।

গীতশ্রী একবার চোখ তুলে একটু হাসে।

—দূরত্বটা কি শুধু গজ ফিতে মাইল নিয়েই মাপা যায় ছোড়দা? নাকি কাছাকাছি থাকাটাই 'কাছে' থাকার একমাত্র প্রমাণ?

অনুরাগে নয়, রাগে রাগে তোড়জোড় চলে মাকে হাওয়া বদলাতে পাঠাবার। কাজ কিছু না হোক, কথা হয় বিস্তর। মাঝে মাঝে একত্রে তিন ভাইয়ের পদধূলি পড়ে মায়ের ঘরে।

কাজ কামাই করে কে মাকে নিয়ে অনিশ্চিত কালের জন্যে সমুদ্র তীরে বাস করতে যাবে এ প্রশ্ন সন্তোষিণীকেই করা হয়।

বেকার তো কেউ নয়!

মায় গীতা পর্য্যন্ত চাকরে। এক যদি বড়দিকে খবর দেওয়া হয়।

ছাই ফেলবার দরকার হলেই ভাঙা কুলোর খোঁজ পড়ে।

এক সময় সন্তোষিণী ক্লান্তসুরে বলেন—আমাকে কোনোখানে পাঠাবার চেষ্টা তোমরা কোরোনা বাবা, কর্ত্তার তৈরি বাড়ীতে মরণকালটুকু পর্যন্ত থাকবার অধিকার আমার আইনে যদি নাও থাকে দয়া করে থাকতে দিও।

—এটা তোমার রাগের কথা মা—সুবিমল নিজেই রাগতঃ সুরে বলে—আমাদের অবস্থাটা তুমি বিবেচনা করো না, এই বড়ো দোষ। বাবার ওপরও কখনো বিবেচনা করোনি, যখন যা খুশি—

সন্তোষিণী মৃদু কণ্ঠে বলেন—তাঁর কথা থাক সুবিমল, তোমাদের কথাই হচ্ছে হোক। সমুদ্দুরের হাওয়া গায়ে লাগিয়ে নতুন করে সেরে উঠে বেঁচে

থাকবার দরকার আমার আর নেই বাবা!...চিরদিন যাঁর ওপর অবিবেচনা করে এসেছি, তাঁর পায়ের কাছে যেন তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারি এই দিনরাত্তিরের প্রার্থনা আমার!...যদি সেখানে গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি!

পরিমল ততোক্ষণে একটু ,পাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে সিগারেট খাচ্ছিলো, সেটা শেষ হতে ফেলে দিয়ে পায়ে চেপে মুখ ফিরিয়ে বলে—ওসব সেন্টিমেন্টের কথার তো কোন মানে হয় না। নেহাৎ গলায় দড়ি দিয়ে না ঝুললে, যার যতোদিন বাঁচবার বাঁচতেই হবে। বিছনায় পড়ে অন্যের গলগ্রহ হয়ে থাকার চাইতে ভালো ভাবে বাঁচাই ভালো।

—মেজদা, তোমাদের হিতোপদেশগুলো দয়া করে একটু কম করবে?—গীতা বলে—বৌদিদের বলবার জন্যেও খানিকটা রাখো? দেখছো না দরজায় দাঁড়িয়ে ছটফট করছেন ওঁরা।

কথাটা মিথ্যা নয়, দুই বৌ দরজার কাছে ঘোরাঘুরি করছেন।

কারণটা বোধহয়, কর্ত্তারা আবার কেউ কোনো দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে বড়ো রকমের একটা ভার নিয়ে না বসেন সে সম্বন্ধে সচেতন করে রাখা।

কাথাবার্ত্তা শুনে রাগে হাড় জ্বলে যাচ্ছে তাদের।

বুড়োসুড়ো মানুষের আবার সমুদ্রতীরে হাওয়া খেতে যাওয়া!

শুনলে হাসি পায়! দেখুক না চারিদিকে তাকিয়ে, কোন সংসারে এমন বাড়াবাড়ি কাণ্ড ঘটছে?

বড়ো ডাক্তারে অমন বড়ো কথা বলেই থাকে, তাই শুনে যদি চলতে হয়, তা' হলে আর গেরস্থ লোক বাঁচে না।

শুনতে শুনতে একদিন কঠিন আদেশ দিয়ে বসেন সন্তোষিণী, এ বাড়ী থেকে তাঁকে নড়ানো চড়ানোর চেষ্টা যেন না হয়, এই বাড়ীতেই শেষ নিশ্বাস ফেলতে চান তিনি। এবং সেটা যতো তাড়াতাড়ি হয় ততোই মঙ্গল।

সন্তোষীণী 'মঙ্গল' বললে কি হবে, ওদিকে আর একজনের যে আহার নিদ্রা ঘুচে গেছে।

এখন আর লুকিয়ে চুরিয়ে নয়, যখন তখন উদভ্রান্তের মতো বাড়ীর সামনের রাস্তায় ঘোরঘুরি করে গোবিন্দ। একদিন দেখা হয় সুবিমলের সঙ্গে, আগ্রহ ভরে প্রশ্ন করে—ডাক্তারবাবু কি বললেন বড়দা? মামী বাঁচবে তো?

সুবিমল বিরক্তভাবে একবার ওর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলে—তা সে কথা রাস্তার মাঝখানে কেন?

গোবিন্দ হতাশ ভাবে বলে—তোমাদের আর কোথায় পাবো?

—কেন বাড়ী ছেড়ে চলে গেছি আমরা?

—বাড়ী? সে উপায় থাকলে কি আর—আমার মাথা খেয়ে মামী যে মাথার দিব্যি দিয়ে বসে আছে।

সুবিমল বিদ্রূপহাস্যে ঠোঁট বাঁকিয়ে বলে—তাই তোমার প্রবেশ নিষেধ...হুঁ! বাঁদর কি আর গাছে ফলে? ঢের ঢের মুখ্যু দেখেছি—সর সর, অফিস টাইম এখন....তা তুই এ রকম ঘুরে বেড়াচ্ছিস যে? কি একটা কাজকর্ম্ম ছিলো না?

—আছে, আজ যাইনি। আচ্ছা বড়দা—

—কী মুস্কিল! হাত ঘড়িটা দেখে নিয়ে সুবিমল পা চালায়—মরবার সময় নেই।

গোবিন্দ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে, সুবিমল কোঁচা সামলে পা চালায়।

বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে আর একদিন ধরে পরিমলকে।

—মেজদা, ডাক্তার কি বলে গেলো?

ডাক্তার সংক্রান্ত ব্যাপারে অপদস্থ হয়ে গোবিন্দর ওপর হাড়ে চটে ছিলো পরিমল, উত্তরে ক্রুদ্ধস্বরে বলে—সে প্রশ্নটা স্বয়ং ডাক্তারকে গিয়েই করলে পারো? ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে তো বেশ শিখেছো?

গোবিন্দ সকাতরে বলে—আমায় মাপ করো মেজদা, ভাবনায় চিন্তায় মাথার ঠিক ছিলো না—

—যথেষ্ট ঠিক আছে। বলি করা হচ্ছে কি আজকাল। 'টু পাইস্' উপরি টুপরি আছে বোধহয়? তাই নবাবী দেখিয়ে বেড়ানো হচ্ছে, কেমন? ওগুলো জায়গা বিশেষে করলেই ভালো হয় বুঝলে হে গোবিন্দবাবু? সব বিষয়ে আমাদের ওপর টেক্কা দিতে আসা, খুব সভ্যতার পরিচয় নয়।

মট্‌মটে সুট পরা পরিমল গট্‌গট্‌ করে এগিয়ে যায় সামনের চলন্ত বাসটা লক্ষ্য করে!

গোবিন্দ চেয়ে থাকে হাঁ করে।

মরিয়া হয়ে শেষ পর্যন্ত হাজির হয়ে গিয়ে ডাক্তার দাশগুপ্তর কাছেই।

দু'দিন ফিরে গিয়ে গিয়ে অবশেষে দেখা হয়।

প্রশ্ন শুনে ডাক্তার কঠিন হাসি হেসে জবাব দেন—মরবার তাঁর আর বেশী দেরী নেই বাপু, নিশ্চিন্ত থাকোগে, যাও!

এরপর আর দাঁড়াতে পারেনি গোবিন্দ, ছুটে পালিয়েছে চোখের জল গোপন করতে।

কারখানার কাজে গাফিলতি হ'তে থাকে ক্রমাগত।

সহকর্ম্মীরা অনুযোগ করে 'গোবিন্দর হলো কি!' একদিন কথায় কথায় স্নেহশীল মনিবের সঙ্গে হয়ে যায় বচসা'...গৌরী তো উঠতে বসতে বকুনি খেয়ে মরছে!

গোবিন্দ ছোটে কালীঘাটে, ঘোরে ছোট বড়ো নানা মন্দিরে। পূজো দেয়, মানত করে।

ডাক্তারে হাল ছাড়লে দেবতা ছাড়া আর ভরসা কোথায়?

এমনি একদিন খাবার সময় গৌরী বলে—দেখো পাশের বাড়ীর মাসীমা বলছিলেন ওঁর বাপের বাড়ীর দেশে নাকি 'যোগিনী মা' বলে কে একজন আছেন, শনি মঙ্গলবারে নাকি মা কালীর ভর হয় তাঁর ওপর। গোবিন্দ ভাতের ওপর ডালের বাটিটা উপুড় করে দিয়ে বাটিটা ঠক্ করে মাটিতে বসিয়ে বলে—ডাকিনী যোগিনীর ওপর অমন মা কালীর 'ভর' হয়েই থাকে, শুনে আমার কি সগ্‌গো লাভ হবে?

আজকাল সর্ব্বদাই বিশ্বের বিরক্তি তার মনে।

গৌরী কুণ্ঠীতভাবে বলে—মাসীমা গল্প করছিলেন, সে সময় গিয়ে পড়তে পারলে নাকি তিনি মরাকে বাঁচাতে পারেন। কতো শক্ত শক্ত রোগী ভালো করেছেন—শিবের অসাধ্য ব্যাধি তাঁর ওষুধে—

উৎকর্ণ গোবিন্দ হাতের ভাত ফেলে চমকে হাত গুটিয়ে বসে—এই কথা শুনে 'চেপে' বসে আছো?....বলি কোথায় সে বাপের বাড়ী? কোন দেশে?

—কি জানি, 'সোনারডাঙা' না কি গাঁ, ছোট রেলগাড়ী চেপে বারো মাইল গিয়ে, আরও সাত মাইল গরুর গাড়ীতে যেতে হয়। বলেছিলেন রাস্তা নাকি খুব—ওকি? ওকি? খেলেনা? উঠে পড়লে যে? যাচ্ছো কোথায়?

গোবিন্দর ততক্ষণে হাত ধোয়া হয়ে গেছে। কোঁচার খুঁট গায়ে জড়াচ্ছে। গৌরীর ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তর দেয় প্রায় পথে বেরিয়ে—যাচ্ছি তোমার মাসীমার কাছে। সব জেনে নিইগে, কালই তো শনিবার—

ক্ষ্যাপা গোবিন্দকে আর আটকানো যায় না। বেরিয়ে পড়ে পরদিন ভোরে।

শঙ্কাতুরা গৌরী একা বসে ভাবে—সেই তো 'উদোমাদা' 'আড় বুঝো' মানুষ কেমন করে সেই অজানা অচেনা পথ পাড়ি দিয়ে ঠিকমত পৌঁছবে!

ওর বিরাট দেহখানার ভিতর অবস্থিত যে মানুষটা, সেটা যে নিতান্তই শিশু মাত্র গৌরীর মতো এমন করে আর কে জানে?

রেল থেকে নেমে—

সাত্ মাইল পথ গরুর গাড়ীতে।

গরুর গাড়ী পাল্লা দিতে পারবে গোবিন্দর পায়ের সঙ্গে?

আর মনের সঙ্গে? সে কি রেলগাড়ীই পেরে উঠছিলো? কোথায় গোরুর গাড়ী, কে খোঁজে। তা' ছাড়া গাড়ীর মধ্যে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা সে এক যমযন্ত্রণা ব্যাপার। তার চাইতে পা চালানো ভালো।

ঝোপ জঙ্গল খানা ডোবার গা দিয়ে মেঠো পথ। চলতে চলতে যা'কে পায় তাকেই প্রশ্ন করে সোনাডাঙা কোন দিকে জানো? সোনাডাঙা? 'করাল ভৈরবী কালী' আছেন যেখানে? শনি মঙ্গলে যোগিনীমার 'ভর' হয়?

কেউ বা বলতে পারে না, কেউ খানিকটা বুঝিয়ে দেয়।

এমনি এক সময়—

একটা শীর্ণ বিধবা বড়ো একটা পিতলের কলসী কাঁখে নিয়ে ঘাট থেকে উঠতে থমকে দাঁড়ায়।

—কে কথা বলছে? গোবিন্দ?

স্তম্ভিত বিস্ময়ে গোবিন্দর মুখ থেকে শুধু এইটুকু বেরোয়—

—বড়দি?

গোবিন্দ, তুই এখানে?

—আর তুমিই বা এখানে কেন? এই ভাগাড়ে। কি আছে তোমার এখানে?

মুরলা ম্লান হেসে বলে—মরাগরুর ভাগাড় ছাড়া আর কোথায় ঠাঁই হবে? এই তো শ্বশুরবাড়ীর দেশ আমার! এখানেই আছি এখন।

—তা হঠাৎ মরতে এখানে থাকতে এসেছো কেন?

—মরণ নেই বলেই আসতে হয়েছে রে গোবিন্দ!

—ব্যাটা কোথায়? সুব্রতবাবু?

মুরলা বিষাদের হাসি হাসে—তাই যদি জানবো তবে আর আমার এ হাল কেন? শুনতে পাই কলকাতাতেই আছে। আছে ভালো ফুর্ত্তিতে আছে।

—হুঁ! তা যাক, বাড়ী ছেড়ে হঠাৎ এ চুলোয় আসবার বুদ্ধি দিলে কে? চেহারা তো হয়েছে দুর্ভিক্ষের ক্যাঙালী! ছিঃ! ঝগড়া করে চলে আসা হয়েছে বুঝি?

—ঝগড়া? নাঃ! মুরলা বলে—ভাই ভাজ বললে আর জায়গা হবে না—

গোবিন্দ প্রায় মুখ খিঁচিয়ে বলে—বললে, আর অমনি গট্ গট্ করে চলে এলে!

—কি করবো বল? স্বামী নেই, বাপ গেলেন, ছেলে বাউণ্ডুলে, ভাইদের কাছে কিসের জোর? এখানে জ্ঞাতি ভাসুরে বাড়ী দাসীবিত্তি করছি, আর দুটো ভাত খাচ্ছি—

গোবিন্দ প্রায় চীৎকার করে ওঠে—তা' খাবে বৈ কি! মেয়েমানুষের বুদ্ধি আর কতো হবে?...ভাইদের কাছে কিসের জোর!...কেন, গোবিন্দ বলে যে একটা হতভাগা লক্ষীছাড়া ভাই ছিলো, তার কথা মনে পড়িনি একবার?

অকস্মাৎ চেষ্টাকৃত সমস্ত রূঢ়তা ভেদ করে ঝরঝর করে জল ঝরে পড়ে গোবিন্দর দুই চোখের কোল বেয়ে।

চোখ মুছে বলে—বলে রেখো তোমার সেই ভাসুরকে, ফেরার পথে নিয়ে যাবো তোমাকে আমি। গোবিন্দর যদি দুটো অন্ন জোটে—তবে তার দিদিরও—

মুরলার চোখও শুষ্ক ছিলো না।

গোবিন্দকে অবহেলা হতশ্রদ্ধা উৎপীড়ন সব থেকে বেশী যে করেছে, সে মুরলা!

—কিন্তু তুমি এখানে কেন গোবিন্দ?

—বড়দি, মামীর বড়ো অসুখ, বাঁচেনা। দৈব ওষুধ নিতে এসেছি। সোনাডাঙা জানো? সোনাডাঙ্গার যোগিনী মা?

মুরলা ভুরু কুঁচকে বলে—শুনেছি। খুব নাম ডাক, তবে নিয়ম কানুন বড়ো নাকি কড়া। কিন্তু মাকে আর এখন মাদুলী কবচ দিয়ে বাঁচিয়ে তুলে কি হবে গোবিন্দ? মরলেই তো হাড় ক'খানা জুড়োয়!

—বোকোনা বড়দি! মরাফরা শুনলেই মাথা খারাপ হয়ে যায় আমার....এই চললাম আমি এখন, ফেরার পথে নিয়ে যাবো তোমাকে।....উঃ এই আধমুণে কলসীটা যদি তোমার সেই ভাসুর ঠাকুরের মাথার ওপর ঠুকে বসিয়ে দিতে পারতাম, তবে আমার রাগ মিটতো!

মুরলাকে ফেরার সময় নিয়ে যাবার আশ্বাস দিলেও কথা রাখতে পারে না গোবিন্দ।

অনেক ভীড় ঠেলে, অনেক কাণ্ড করে যোগিনী মার কাছ থেকে ওষুধ সংগ্রহ করতে গেলে সন্ধ্যা হয়ে যায়, আর তিনি অদ্ভুত এক আদেশ দেন।

বলেন—যা বেটা যা, খুব ভাগ্যি যে তুই এসেছিস। আজ অমাবস্যা, শনিবারের

অমাবস্যার ওষুধ অব্যর্থ। তবে—একটা কাজ করতে হবে। এই শেকড় অমাবস্যা থাকতে থাকতে রুগীর হাতে বেঁধে দিতে হবে। পথে যেতে—কাউকে ছুঁবি না, হাত থেকে কোথাও নামাবিনা, গাড়ী, পালকী চড়বিনা।..... ওই পুকুরে ডুব দিয়ে ভিজে কাপড়ে ভিজে মাথায় খালি পায়ে যাবি। নইলে ফল হবে না।

মূর্খ গোবিন্দর সম্ভব অসম্ভব বোধের বালাই নেই।

নেই আসল নকল বিচারের বুদ্ধি।

সেই ভরা সন্ধ্যায় পানাপুকুরে স্নান করে এসে শিকড় হাতে নিয়ে প্রশ্ন করে—অমাবস্যে কতোক্ষণ আছে মা?

—রাত্তির তিনটে অবধি।

তিনটে? উনিশ মাইল পথ? তাতে কি? পা কার? গোবিন্দর না? বৃথাই কি সে বুকের ওপর রোলার তুলেছিলো?

কিন্তু বড়দি?

আচ্ছা আজ থাক। গোবিন্দ তো আজই মরে যাচ্ছে না। কাল আসবে আবার।

অমাবস্যা রাত্রির নিকষ অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মতো ছুটে চলেছে গোবিন্দ। হেঁটে পৌঁছতে হবে। যেমন করেই হোক পৌঁছতে হবে রাত্রি তিনটের মধ্যে। ঝোপজঙ্গল খানা জোবার পাশ কাটাতে কাটাতে আসে রেললাইনের ধার।.... অন্ধকারের চাদর মুড়ি দিয়ে নিশুতি গ্রামগুলো বসে আছে দূরে দূরে।.... চীৎকার করে ওঠে গ্রাম্য কুকুর।

চীৎকার করতে থাকে শৃগালের দল। দূরে কোনখান থেকে কানে আসে শিশুর ক্রন্দন ধ্বনি। মাথার উপর দিয়ে উড়ে চলে যায় নিশাচর পাখী।

দৃশ্যপটের পরিবর্ত্তন হয়।

রেললাইন শেষ হয়....আসে কলকাতার শহরতলী।

ক্ষীণ এক একটা আলোর রেখা নিয়ে দূরে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে গ্যাস পোষ্ট।....কোথায় একটা ঘড়িতে বাজে দুইয়ের ঘন্টা।

এসে পড়ে কলকাতার সেরা সেরা পথ।.....

অবশেষে দেখা যায় বাহাদুর যামিনীমোহন রায়ের বিরাট. তিনতলা বাড়ীখানা।

কিন্তু?

তারপর?

এতোক্ষণ তো এ খেয়াল ছিলোনা গোবিন্দর।

হায়! কোনো খেয়ালই কি ছিলো তার? শুধু খেয়াল ছিলো "পৌঁছতে হবে"। যে করেই হোক পৌঁছতে হবে রাত্রি তিনটের মধ্যে। শনিবার অমাবস্যার মাহেন্দ্রক্ষণ ব্যর্থ না যায়!

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বাঁ হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছে এক মিনিট স্থির হয়ে দাঁড়ায় গোবিন্দ।

অলঙ্ঘ্য দরজার চৌকাঠটা চোখের সামনে যেন উঁচু হতে হতে সমস্ত কপাট জোড়াটা ঢেকে ফেলতে চাইছে। তা ছাড়া—আর সময়ই বা কতোটুকু?

কাকে ডাকবে?

কিভাবে বলবে?

আচ্ছা দরজা থাক, জানালাও কি অলঙ্ঘ্য?....দুটো লোহার গরাদে চাড় দিয়ে বার করে আনা কি গোবিন্দর পক্ষে অসম্ভব?

হাতের ওষুধ নামাতে নেই? তা হোক। আর একটা হাত তো আছে। কার্ণিশের ওপর উঠে পড়ে বাঁ হাত দিয়ে সজোরে টান মারে গোবিন্দ লোহার গরাদেটা ধরে।...একটার পর আর একটা!....এইবার অনায়াসে ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে গোবিন্দর বড়োসড়ো দেহটাকে।

অদ্ভুত একটা শব্দে চমকে জেগে উঠে আলো জ্বেলেই স্তম্ভিত হয়ে যায় গীতশ্রী! সন্তোষিণী ক্ষীণ প্রশ্ন করেন—কে?

—গোবিন্দদা। গীতশ্রী বজ্রাহতের মতো উচ্চারণ করে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ থাম্। ছুঁয়ে ফেলিসনি যেন।....মামী জেগেছো?....কই দেখি তোমার বাঁ হাতটা।....এই যে....ব্যস!....বাবা! মা কালী মুখ রেখেছেন।....

দোতলার বড়ো ঘড়ির আওয়াজ আসে—ঢং ঢং ঢং।

শেষ রাত্রে বাড়ীতে একটা সোরগোল ওঠে— চোর চোর!

পাশের বাড়ীর বামুন ঠাকুর দেখেছে গরাদ ভাঙ্গার কাণ্ড! অবশ্য আরো অনেক কিছুই দেখেছে সে তার উর্ব্বর কল্পনায়।....দেখেছ—'সা-জোয়ান' তিন তিনটে লোক...হাতে আগুনের পাতের মতো ঝকঝক ছোরা।....জানলা দিয়ে ঢুকে ও বাড়ীর গিন্নীমাকে খুন করেছে তাতে আর সন্দেহ কি?

চাপা গলায় ডাক দিয়েছে সে এ বাড়ীর বামুন ঠাকুরকে।

অতঃপর উঠে পড়েছে সকলেই। শেষ রাতের পাতলা ঘুম ভাঙতে দেরী লাগেনি।

দরজায় ধাক্কা পড়ে ঠক্ ঠক্।

ভয়ার্ত্ত নির্ম্মলের গলা শোনা যায়—গীতা! গীতা!

ছেলে বৌ, বামুন-চাকর সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে বন্ধ দরজার এদিকে।

গীতশ্রী দোর খুলে দাঁড়ায়।

—গীতা জেগেছিস তুই? মা কি করছেন?.....

হুমড়ি খেয়ে ঢুকে পড়ে তিন ভাই।

নির্ম্মল বলে—গীতা, আমাদের সন্দেহ হচ্ছে এ ঘরে চোর ঢুকেছে।....অ্যাঁ ওই যে—ওই তো গরাদ ভাঙ্গা—একি? ও কে?

সন্তোষিণীর বিছানার দিকে তাকিয়ে সকলেই যেন পাথর হয়ে যায়।

সন্তোষিণীর কোলের কাছে গোবিন্দ মুখ লুকিয়ে বসে।

তার গায়ের ওপর কৃশ হাতছানি রেখে সন্তোষিণী স্থির শান্ত স্বরে বলে—চোর নয় নির্ম্মল, ডাকাত। আমি দরজা ডিঙোতে বারণ করে মাথার দিব্যি দিয়েছিলাম, ও জানালা ভেঙে ঢুকে তার শোধ নিয়ে জব্দ করেছে আমায়! বাবা সুবিমল, ভেবেছিলাম বাঁচবার আর আমার দরকার নেই, দেখছি—বড়ো ভুল অন্যায় কথা ভেবেছি। বাঁচবার দরকার এখনো ফুরোয়নি আমার।.....লজ্জার মাথা খেয়ে চাইছি—কোথায় তোদের ভালো ভালো ডাক্তার বদ্যি আছে ডেকে আন সমুদ্দুরের হাওয়া খেতে পাঠাবি তো পাঠা। এই অবুঝ হতভাগাটার জন্যে সেরে না উঠে উপায় নেই আমার। তোদের ওপর মিথ্যে অভিমানের বশে ওকে যদি মাতৃহীন করে যাই, মাথার ওপর বসে যিনি বিচার করছেন তিনি ক্ষমা করবেন না।

—০—

পয়সা দিয়ে কেনা

পয়সা দিয়ে তুমি দারিদ্র্য কিনলে।

পয়সা দিয়ে তুমি দারিদ্র্য কিনলে!

পয়সা দিয়ে তুমি—

সকাল থেকে সারাদিন হৃৎপিণ্ডের ওপর দমাস দমাস করে পড়ে চলেছে এই শব্দের হাতুড়ি।...... এই হাতুড়ির আওয়াজ যেন শহরের সমস্ত কোলাহলের খাঁজে খাঁজেও উচ্চকিত হয়ে উঠছে। চলন্ত বাসের চাকার ঘর্ঘরের মধ্যে বারংবার ধ্বনিত হচ্ছে।

ওই তীব্র তীক্ষ্ণ বাক্যটুকু এখন আর সুরমার কণ্ঠনিঃসৃত শ্লেষ-বাক্য বলে মনের মধ্যে পাক খাচ্ছে না পীযূষকান্তি নামের লোকটার। এখন যেন তার নিজেরই চেতনার স্তরে স্তরে অবিরত ওই শব্দটা নিয়ে তীব্র গুঞ্জন তুলে চলেছে একটা কানা ভিমরুল!

পয়সা দিয়ে তুমি দারিদ্র্য কিনলে!

কানা ভিমরুল, না ভাঙা গ্রামোফোন রেকর্ড!

সুরমার অসন্তোষ আর ব্যঙ্গ অবশ্য এখন প্রতিপদেই ঠিকরে ঠিকরে উঠছে। আর বাড়িতে পীযূষকান্তির দুর্মতি নিয়ে সমালোচনায় এবং মন্তব্যের চাষ চলছে তবু এর আগে কোনদিন এমন অস্পষ্টতাহীন তীক্ষ্ণ মন্তব্য শোনা যায়নি সুরমার মুখে।

সকালবেলা বেরোবার মুখে, কথাটাকে যেন ছুঁড়ে মারল সুরমা পীযূষকান্তির গায়ের ওপর। পীযূষকান্তি চমকে উঠেছিল, আর বোধহয় অজ্ঞাতসারেই বলে ফেলেছিল, পয়সা দিয়ে কী কিনলাম?

সুরমা আর দু'বার ব্যাখ্যা করেনি, শুধু সংক্ষেপে বলেছিল, যা কিনেছ তা নিজেই হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছ। পয়সা দিয়ে তুমি—

হঠাৎ কথার ছেদ দিয়ে পীযূষের সামনে থেকে সরে গিয়েছিল সুরমা। এটা সুরমার চিরকালের অভ্যাস, বেশী উত্তাল হলে কথা শেষ করতে পারে না।

পীযূষের আর তখন দাঁড়াবার সময় ছিল না। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছিল, কিন্তু সুরমার ওই কথাটা তাকে সারাদিন তাড়া করে ফিরছে, কিছুতেই সরাতে পারছে না সেটাকে।

কিন্তু কোন পরিস্থিতিতে কথাটা বলেছিল সুরমা?

পীযূষকান্তি যখন বাজারের থলিটা নামিয়ে দিয়েছিল সুরমার সামনে? গুলি গুলি আলু, ক্ষুদে·ক্ষুদে পটল আর চারাপোনা মাছ সমেত? না কি পীযূষের গেঞ্জির পিঠের ঘুলঘুলিগুলো দেখে যখন সুরমা বলে উঠেছিল বাঃ!

কিন্তু সে তো অনেক আগে।

অফিস বেরোবার সময় তো না।

সে তো পীযূষ সামলে নিয়েছিল এ পাড়ার বাজারের নিন্দে করে বলেছিল, ভেবে ছিলাম আর কিছু না হোক অন্ততঃ বাজার টাজারগুলো ফ্রেশ পাওয়া যাবে এদিকটায়! ধ্যুৎ! বাজে বাজার।

সুরমা উদাসীন গাম্ভীর্যে বলেছিল, যখন হাতের মধ্যে একটা সেরা বাজার ছিল, তখন কোনোদিন বাজারের ছায়া মাড়াওনি, এখন এই পচা পাড়ার বাজে বাজারের কানা বেগুন আর পচা পুঁটি খুঁজে বেড়াচ্ছ।

সুরমার ওই 'পচা পুঁটি খুঁজে বেড়ানো'র অভিযোগটি গায়ের জ্বালা প্রসূত হলেও, তার আগের কথাটি কিন্তু নিছক সত্যি! 'গড়িয়াহাট বাজার' হেন বাজারের একেবারে গায়ের কাছে বাস করলেও পীযূষকান্তি কোনদিন তার ছায়া মাড়াতে যায় নি।

শ্যামবাজারের পাড়া থেকে অনেকখানি দৌড় মেরে এ পাড়ায় এসেই পীযূষকান্তি প্রথম দিনই নতুন পাড়ার বাজার দেখতে বেরিয়েই ফিরে এসে মাথায় হাত দিয়ে বলেছিল, সর্বনাশ! কে ঢুকবে বাজারে। বাজারের মধ্যে চোখের সামনে শুধু শাড়ির আঁচল।

শাড়ির আঁচল মানে? মাছ তরকারি বাজারে শাড়ির দোকান? বলে উঠেছিল ছেলে টুটু।

দোকান? তা তাও বলতে পারিস। তবে চলন্ত দোকান। নেমন্তন্ন বাড়ি যাবার মতো জমকালো জমকালো সব শাড়ি পরে মহিলাবাহিনী শৌখিন শৌখিন ব্যাগ থলে সাজি চুপড়ি ইত্যাদি নিয়ে বাজার তোলপাড় করে বেড়াচ্ছেন!

তাতে তোমার কী?

সুরমা বলেছিল, তুমিও টেরিকট্ টেরিলিন স্যুট পরে রঙিন থলে হাতে নিয়ে বাজার চষে বেড়াওগে।

নাঃ। ও আমার দ্বারা হবে না।

পীযূষকান্তি বলেছিল, এপাড়ায় উঠে এসে সংসারের সব থেকে ভারী কাজটাই তোমার ঘাড়ে পড়ল দেখা যাচ্ছে।

তার মানে আমিই যাব বাজার করতে?

তাইতো দাঁড়াচ্ছে।......পীযূষকান্তি উত্তর দিয়েছিল, তোমার কি দু'চারটে ওরকম জমকালো আঁচলাদার শাড়ি নেই?

সুরমা বলেছিল, সাউথে তো কবে থেকেই মেয়েরা বাজার দোকান করে, তোমাদের ওই নর্থের পাড়া এখনো পুরানো খুঁটি ধরে বসে আছে। একদিনের কথা যদি শুনতে—তোমাদের ওখানকার পাশের বাড়ির মাসীমা? দক্ষিণ পাড়ার মেয়েদের নিয়ে কী ব্যাখ্যান। বলেন কিনা, বাড়ির বৌ ঝি কিনা ঝি চাকরাণীর মতো থলে হাতে বাজারে যায়, শাক পাতা মাছ মাংস আলু পটল কিনতে! কি ঘেন্না! কি ঘেন্না! আধুনিক জীবন যাত্রার সঙ্গে পরিচয় ঘটতে তোমাদের ওই শ্যামবাজার পাড়ার এখনো বহুৎ দেরী!

গড়িয়াহাটে গিয়ে থেকেই সুরমা শ্যামবাজার পাড়াটাকে 'তোমাদের' বলতে শুরু করেছিল। পীযূষ সেটাকে ধর্তব্য করেনি। পয়লা রাত্তিরে বেড়াল কাটার গল্পটা পীযূষের জানা ছিল না মনে হয়।

উদোমাদা পীযূষকান্তির অবশ্য অমন অনেক কিছুই জানা ছিল না। কিন্তু সুরমার জানা ছিল নৌকো নিয়ে ভাসতে হলে প্রথম কাজই হচ্ছে নোঙরের দড়িটা কেটে ফেলা।

সে থাক—পীযূষকান্তির প্রস্তাবটা সুরমা লুফে নিয়েছিল। 'সংসারের সবচেয়ে ভারী কাজটা'র ভার কাঁধে তুলে নিয়েছিল বিনা প্রতিবাদে। অবিশ্যি একা যাওয়ার অভ্যাসটা রপ্ত করতে সময় লেগেছে। দামী দামী আঁচলাদার শাড়ি ঘুরিয়ে পরে ছোট মেয়েটিকে নিয়ে বেরোতে শুরু করেছিল।

আর পীযূষকান্তি ভাবতে শুরু করেছিল, বাঁচা গেছে বাবা!

তদবধি ওই বেঁচে যাওয়া অবস্থাটাই চলেছে, কিন্তু আবার যেই পাড়া পাল্টে বসল পীযূষকান্তি, সেই পালা বদলে গেল।

এ পাড়ার ওই নোংরা গাঁইয়া দীনহীন বাজারে কে যেতে যাবে পীযূষকান্তি ছাড়া? সুরমা? তার মেয়েরা অথবা ছেলে? তাদের তো কন্যা দায় পড়েনি।....

পীযূষকান্তির অত সকাল সকাল বাজার যেতে অসুবিধা হয়? হলে উপায় কী? খাল কেটে কুমীর নিয়ে এলে কুমীরের কামড়ও খেতে হবে বৈকি।

কিন্তু মুস্কিল এই—এখানের বাজারটা সত্যিই ততটা দীনহীন নয়, যতটা

দীনহীন এখন পীযূষকান্তির পকেটটা। যে পীযূষকান্তি আগে শুধুই পকেটে নোটের গোছা না থাকলে মনে সুখ পেত না, সেই পীযূষকান্তি এখন গুণে গুণে বাজেট'মতো টাকাটুকুই মাত্র সঙ্গে নিয়ে বাজারে যায়, পাছে বেশী খরচা হয়ে যায়।......শিক্ষাটি পীযূষকান্তির বর্তমানের গুরুদেবের।

তা সেই গুরু নির্দেশিত পন্থায় চালিত ব্যক্তির আহরিত সওদা স্ত্রী কন্যার দেখে আহ্লাদিত হবার কথা নয়। অবশ্যই আক্রমণাত্মক হবার কথা।

কিন্তু সরাসরি আক্রমণে আত্মরক্ষার্থে পীযূষ বলে উঠছে, খুঁজে বেড়াই মানে? এখানে তো দেখি বাজারের এই অবস্থা।

বলেছিল, তবে গলাটা বড়োই দুর্বল শুনিয়েছিল।

সুরমা বাঁকা একটু হেসে সংক্ষিপ্ত ভাষণে 'এখানে' আসা সম্পর্কে একটি তীক্ষ্ণ মন্তব্য করে থলিটা উঠিয়ে নিয়েই চলে গিয়েছিল।

পীযূষকান্তিও হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল, অন্ততঃ তখনকার মতো ঝড় থামল ভেবে। কিন্তু তারপর?

তারপর?

ঠিক অফিস বেরোবার সময়?

হ্যাঁ, ঠিক বেরোবার মুখেই সেই অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটেছিল। বুলু বলেছিল, তার একটা ইকনমিক্সের বইয়ের দরকার। দরকাব মানেই 'অবশ্য' এবং 'আশু' প্রয়োজন। ওদের 'দরকারটা' একদিনও অপেক্ষা করতে জানে না। অতএব বাবা যেন গোটা চল্লিশ টাকা বুলুকে দিয়ে যায় বেরোবার আগে। সেটা শুনে পীযূষকান্তি হঠাৎ.বলে ফেলেছিল, তাঃ তোমাদের পড়ার খরচাতেই ফতুর হতে হবে। এই না সেদিন আটাশ টাকা দিয়ে একটা বই কিনলে? একে তো যা মাইনে কলেজের আর বাস ভাড়ার বহর—

বুলু এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সহসা একটা গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে পাক ঘুরে ঝটকা মেরে গিয়েছিল। শুধু যাবার সময় বলে গিয়েছিল, ঠিক আছে, সামনের মাস থেকে আর আমার পড়ার জন্যে খরচ করতে হবে না তোমাকে। তবে বাস ভাড়াটার খোঁটা দেবার আগে একটু ভেবে কথা বললে ভালো হ'ত।

বুলু মানে পীযূষকান্তির ছোট মেয়ে, যে নাকি এই কিছুদিন গড়িয়াহাটের সেই বাড়িতে 'বাপী' বলে বাপের গলা ধরে ঝুলে পড়ে বলেছে, বাপী গো বাপী, তুমি কি সুইট। কারুর বাপী এমন নয়। ভীষণ মিষ্টি তুমি।

হঠাৎ পীযূষকান্তি বোস নামের লোকটা তার ছেলেমেয়েদের কাছে সব মিষ্টত্ব হারাল কী বাবদ? যে বাবদই হোক হারিয়েছে যে তার পরিমাণ হঠাৎ হঠাৎই পেয়ে যাচ্ছে সে, এখন আরও একবার প্রত্যক্ষভাবে পেল।

তবু পীযূষকান্তি মেয়ের ওই তীব্রতাটিকে হালকা করে দেবার চেষ্টায় (যে চেষ্টা সব সময় করে 'অমৃতৎ বালভাষিতং' হিসেবে ধরে) বলে উঠল, আমার আর খরচ দিতে হবে না? বসিল কি? হঠাৎ একখানা শাহানশা শ্বশুর-টশুর বাগিয়ে বসেছিল নাকি?

মেয়ে সে কথায় কান দিল না, চলে গেল! শুধু সুরমা বলে উঠল থাম তো। সব সময় আর সাপের লেজে পা দিতে যেও না!

পীযূষকান্তি লক্ষ্য করেছে এই কথাটা আজকাল প্রায়ই বলছে সুরমা। পীযূষকান্তির ছেলেমেয়ে তিনটি, পীযূষকান্তি যাদের নাকি আদর করে বলে 'পান্না-চুনী-হীরে', তারা হঠাৎ এক একটা সাপ হয়ে গেল তাহলে? সুরমা তাই তার স্বামীকে সর্বদা সাবধান করছে অসতর্ক পা না ফেলার জন্যে।

পান্না-চুনী-হীরেও হঠাৎ সাপ হয়ে যেতে পারে? প্রশ্নটা কোনও সময় সুরমার সামনে ভাষাহীন বিস্ময়ে উচ্চারণ করেছিল পীযূষকান্তি। কিন্তু সুরমা অবলীলায় উত্তর দিয়েছিল, হবে না কেন? না হওয়াই আশ্চর্য। অকারণ শুধু নিজের সাধ মেটাতে সে দুর্গতি ঘটালে তুমি ওদের।

অকারণ, শুধু নিজের সাধ মেটাতে! সেও একটা বিস্ময়। সেই সাধটা কী?

পীযূষ বোসের ইচ্ছে হয় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সব্বাইকে জিগ্যেস করে, আচ্ছা বলুন তো আপনারা, এই সাধটা কি একটা অভূতপূর্ব অন্যায়? ইহ জগতে আর কেউ কখনো এমন অন্যায় সাধ করেনি? করে না? আর কেউ সে সাধ মেটায়নি, মেটায়না? শুধু এই পীযূষ বোস প্রথম কাণ্ডটা করেছে?

বলতে ইচ্ছে করে, সত্যি তো আর বলা যায় না! তাছাড়া বলতে গেলেই তো পরিস্থিতি আর তার ইতিহাস বোঝাতে হবে! সে তো আকাশে ধুলো ছোঁড়া হবে। অতএব বলা হয় না। বলতে পারে একমাত্র সুধাময়কে, বলেও, কারণ সুধাময় সব ইতিহাস জানে। বলতে গেলে সুধাময়ই 'নাটের গুরু'।

এই 'নাটের গুরু' শব্দটা সুরমার মন্তব্য থেকে গৃহীত।

কিন্তু সুধাময় নামের বন্ধুটা কি পীযূষ বোসকে উচ্ছন্নের পথ চিনিয়ে দিয়েছে? যার ফলশ্রুতি পীযূষের স্ত্রী-সন্তানের দুর্গতি ঘটিয়েছে?

নাকি কোনো এক কঠোর কৃচ্ছ্রসাধক গুরুর নাম সুধাময়।

পীযূষকান্তি বোস, যে নাকি এক নাম কবা অয়েল কোম্পানীর পদস্থ অফিসার, সৌখিন রুচি, দিলদরিয়া মেজাজ, আব 'ভবিষ্যৎ' সম্পর্কে চিন্তার বালাইহীনতাই যার স্বভাবের বৈশিষ্ট্য, সে লোকটা ওই কঠোর গুরুর কাছে হঠাৎ মন্ত্রদীক্ষা নিয়ে বসে কৃচ্ছ্রসাধনের পথে এগিয়ে চলেছে? পীযূষবোসের সেই সাধনাই তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার পক্ষে দুঃখ দুর্গতিবহ?

তা এক হিসেবে প্রায় তাই-ই।

বলতে গেলে গুরুদীক্ষাই।

যদিও সুধাময় সরকার অফিসে পীযূষ বোসের অধস্তন, তবু অন্য এক কারণে বন্ধুত্ব আছে। একদা নাকি দুজন এই স্কুলের ছাত্র ছিল। অফিসে এসে এসে সেটা ধরা পড়ে।

স্কুলের সহপাঠী অতএব পুরনো খাতির রাখতেই হয়েছে। পীযূষ বোসই রেখেছে। নইলে সুধাময় হয়তো রাখতে আসতে সাহস করত না! পীযূষই 'তুমি' ডাকটা প্রচলন করেছে। পীযূষই মাঝে মাঝে সুধাময়কে ডেকে চা খাইয়েছে, আর অফিসের সকলের সামনে সেই বাল্যবন্ধুত্বটিকে স্বীকার করেছে। কারণ পীযূষ বোস লোকটা অহংকারী নয়।

তবে, মনে মনে যে পীযূষ সুধাময়কে কৃপাব দৃষ্টিতে দেখেছে, তার কারণ আলাদা।

সুধাময় লোকটা চিরাচরিত প্রবাদের ভাষায় যাকে বলে 'ওয়ান পাইস ফাদার মাদার'। এটাই পীযূষের কাছে খুবই হাস্যকর। অফিসে কখনো এই কৃপাভাবটা প্রকাশ করেনি বটে, তবে বাড়িতে সুকুমাব কাছে নীলু, বুলু টুলুর কাছে ঢালাও প্রকাশ করেছে।

সুধাময় যে টিফিনের পয়সা বাঁচাতে, অফিসে অমন উৎকৃষ্ট ক্যান্টিন থাকতেও, বাড়ি থেকে আলুচচ্চড়ি নিয়ে এসে খায, এটা কি হাসির খোরাক নয়? তাও ক্যান্টিনের অর্ধেক খরচা তো কোম্পানীর। তবু—তবু ওই কিপটেমি সুধাময়ের।

রুটি। অফিসে! এ মা, ভাবাই যায় না।

বলেছে নীলু বুলু।

সুরমাও। মেয়েদের সঙ্গে গলা মেলানো ওর রুচির অভ্যাস! মেয়েরা যখন এতটুকু তখন থেকে। সুরমাও হেসে গড়িয়ে বলেছে, নাঃ নাঃ বাপু ভাবা যায় না। ক্যান্টিনের ওই গরম চপ, ফ্রাই, গরম কুচুরি, আলুর দম, ছোলার ডালের লোভ সামলে কোন্ সকালের হাতে গড়া রুটি! মহাপুরুষ।

পীযূষ বোস এই হাসিতে পুলকিত হয়ে সুধাময়ের ব্যয় সঙ্কোচের আরো উদাহরণ পেশ করে 'মজা'র জোগান দিয়েছে।

সুধাময় নাকি অফিসে ঢোকার প্রারম্ভে যে জুতো জোড়াটা পরে ঢুকেছিল, এযাবৎকাল সেইটাই পরে চলেছে। সুধাময় নাকি সারা বছর একই প্যান্ট আর হাওয়াই সার্ট পরে অফিসে আসে, রবিবারে রবিবারে সাফ করে নিয়ে। যতক্ষণ না ছেঁড়ে ততক্ষণ সুধাময় একই দৃশ্যে দৃশ্যমান।

সুধাময়ের বাড়ির ঠিক সামনেই না কি বাস-স্টপ, তবু পাঁচ পয়সা ভাড়া বাঁচাবার জন্যে দুটো স্টপ আগে নামে সে, আর সারাদিনের শ্রান্ত শরীরে পুরনো জুতো ঘষটাতে ঘষটাতে অতটা পথ হেঁটে বাড়ি যায়।

এ শুনেও হাসবে না ওরা?

গড়িয়াহাটের সেই পূবের বারান্দাওলা বাড়িটার বারান্দায় পাতা বেতের চেয়ারগুলোয় বসে সপরিবারে খানিকটা জমিয়ে গল্প করা পীযূষের বরাবরের অভ্যাস ছিল। ওই অভ্যাসের জন্যে পীযূষকান্তি কখনো আড্ডা কি তাসখেলার গাড্ডায় পড়েনি।

আসলে পীযূষকান্তি বোস নামের লোকটা নিতান্ত নীচু পোষ্ট থেকে উঁচুতে উঠেছে। অর্থাৎ নেহাত 'মধ্যবিত্ত' অবস্থা থেকে কিছুটা বিত্তের মুখ দেখা আর কি! তাই চিত্তটা প্রায় 'মধ্যই' রয়ে গেছে তার।

স্ত্রী পুত্র-কন্যাদের ঘিরেই তার যা কিছু আনন্দ, পারিবারিক মিলন-সুখই তার কাছে আদর্শ সুখ। 'ওদের জন্যই আমি' এই মনোভাব নিয়েই জীবন কাটিয়ে আসছে। তাই অফিস ফেরত আর কোথাও নয়, সোজা বাড়ি। দেরীও হ'ত না, অফিসের গাড়ি চড়ে আসত। অফিসারদের জন্যে গাড়ির ব্যবস্থা ছিল কোম্পানীর। অবশ্য বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিত না। গড়িয়াহাটের মোড়ে সবইকে নামিয়ে দিয়ে একজন ডিরেকটারকে নিয়ে চলে যেত কোথায় যেন। তা ওই মোড় থেকে তো পীযূষের ছিল দু'মিনিটের রাস্তা। পীযূষের বাড়িটাই ওই মোড়ের সবচেয়ে কাছে পড়ত। বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকত সুরমা সময় দেখে।

বাবা বাড়ি ফিরলে মেয়েরা পরীক্ষার পড়া ফেলেও সমাগত হ'ত ওই বারান্দায়। ইদানীং অবশ্য টুটু ঠিক সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরছিল না, বন্ধু-বান্ধবদের পাল্লায় পড়ে রাত হয়ে যেত, তবু চেষ্ট করত চলে আসবার এবং সান্ধ্য আসরটা ভেঙে গেছে দেখলে খুবই অস্বস্তি পেয়ে দেরীর জন্যে নানান কৈফিয়ৎ দিতে বসত।

আর আবার কথা জমাবার জন্যেই হয়তো বলে উঠতো, তোমার সেই বাল্যসখা সুধাময়ের খবর কি বাপী?

অতঃপর ছেলেমেয়েরা তাদের প্রধান প্রসঙ্গে আসত। সে প্রসঙ্গটা অবশ্য ইদানীং উঠেছিল, প্রসঙ্গটা হচ্ছে—গাড়ির। রেকর্ড চেঞ্জার, টেপ রেকর্ডার, ক্যামেরা ইত্যাদি ছোটখাটো শখগুলো মিটে যাবার পর ধুয়ো উঠেছিল গাড়ির। তলে তলে ছেলেমেয়েদের শখের ধোঁয়ায় ফুঁ দিচ্ছিল সুরমাও। যে পীযূষকান্তি বোসের কোনো একদা একটি ভালো রিস্টওয়াচ ছিল স্বপ্ন, সে-ও ছেলেমেয়ের এই আবদারকে অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে না দিয়ে ভালো কনডিশানের একখানা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড গাড়ির সন্ধানেই ফিরতে শুরু করেছিল। বলেছিলও কাউকে কাউকে।

সুরমার মেজাজ ছিল উঁচু তারে বাঁধা, তাই সুরমা বলেছিল, কিনতে হলে বাপু নতুন গাড়ি কেনাই উচিত। কথাতেই আছে সস্তার তিন অবস্থা. তাছাড়া সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গাড়ির আবার গৌরব কী?

টুটু মায়ের কথা উঠিয়ে দিয়েছে, বলেছে, নতুন গাড়ির আবদার করলে আর এ জন্মে গাড়ি হবে না তোমার মা, একটা এ্যাপ্লিকেশন ঝুলিয়ে রেখে দিন গুণতে গুণতে বুড়ো হয়ে যাবে!.....

টুটুর মত হচ্ছে হাতে হাতে লাভটা হয়ে যাক। হাতে একবার পেলেই সে দুমাসে পাকা চালক হয়ে লাইসেন্স বার করে নিয়ে শহর পয়লট্ট করে বেড়াবে।

নীলু বুলুরও একই মত।

বুলুও ধরে নিয়েছিল দাদার আগেই সে শিখে নেবে। নীলু অতটা ডাকাবুকো নয়, সে বলে গাড়ি চালানোর থেকে গাড়ি চড়া অনেক আরামের।

যাই হোক পীযূষকান্তি গাড়ি কেনা ইচ্ছেটিকে মনের মধ্যে স্থাপিত করে একদিন সুধাময়কে বলে বসেছিল, তুমি তো অনেক তালে ঘোরো, একটা ভালো কনডিশানের সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গাড়ি যোগাড় করে দাও না; পুত্ররত্ন তো পাগল করে তুলছেন।

শুনতে ভালো হবে বলে শুধু ছেলের নামই করেছিল।

তা বলেছিল ঠিক লোককেই। সুধাময় সরকার অফিসের সময় বাদে অন্য অনেক কিছুই করে বেড়ায়। যার সরল বাংলা নাম দালালি। সেই দালালির মধ্যে অবশ্য জমি, বাড়ি বাড়িভাঙা মাল্-মশলা ইত্যাদি কেনা-বেচার ব্যাপারটাই প্রধান, তবে মাঝে মধ্যে গাড়িফাড়িও নাড়ে চাড়ে। অতএব সুধাময়ের এতে

উৎসাহিত হবারই কথা, কিন্তু সুধাময় তা হল না। একটুক্ষণ পীযূষের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে বলল, গাড়ি যোগাড় করা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয় পীযূষ চেষ্টা করলেই হতে পারে। কিন্তু তুমি আমার বন্ধু বলে স্বীকার কর বলেই একটা কথা বলছি—

বলে থামল।

পীযূষকান্তি হেসে উঠে বলল, 'বলছি' ঘোষণা করে থেমে গেলে কেন? যা বলবার বলে ফেল। সুধাময় বলল, বলছি। বন্ধুকৃত্য হিসেবেই তোমায় কিছু বলতে চাইছি কিছুদিন থেকে—

*   *   *   *

বাসের জন্য দাঁড়িয়েছিল পীযূষ!

পীযূষের হঠাৎ মনে হল বাসের জন্যে সে যেন অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। অফিসের গাড়িটা নির্দিষ্ট জায়গার নির্দিষ্ট ক'জনকে নামিয়ে দিয়ে ডিরেক্টরকে নিয়ে চলে গেল ঘটা করে! মনে হয়েছে যেন গতযুগের ব্যাপার।....পীযূষের সামনে দিয়ে কি অনেক বাস চলে গেছে, খেয়াল করেনি সে?

খুব অন্যমনস্ক হয়ে রয়েছে সে আজ, এটা ঠিক।......নিত্যকারের তা আজও গড়িয়াহাটের মোড়ে অফিসের গাড়ি থেকে চারজনে নেমে পড়ার পর ঘোষাল যেন কী একটা বলেছিল, পীযূষ তার উত্তর দেয়নি পরে মনে পড়ল সেটা

কী বলেছিল কে জানে।

দূর? নতুন আর কী বলবে? সেই আক্ষেপ আর সহানুভূতিতে গলে পড়া গলায় বেদনা প্রকাশ তো? মিস্টার বোস, আপনাকে এখন আবার বাস ধরতে হবে। মুসকিল! এতো দূরে বাড়ি করলেন!

ওই এক কথাটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে ওরা পালা করে।.....আগে টুক করে বাড়ি ঢুকে যেতেন। দু' এক মিনিট লাগত। এখন বাসের জন্যে দাঁড়াতে হবে। তারপর আবার অনেকটা দূর পাল্লায় পাড়ি দিতে হবে। আবার বাস বদল করতে হবে।

হবে তো হবে, তাতে তোদের কী?

এই রকম একটা উত্তর দেবার অদম্য ইচ্ছাকে চেপে রেখে ভদ্রতার হাসি হেসে বলতে হয় পীযূষকে, হ্যাঁ এই একটা ঝঞ্ঝাট হয়েছে আর কি।

রাগে মাথা জ্বালা করলেও বলতে হয়।

ওরা পায়ে হেঁটে এগিয়ে যায় এদিক ওদিক। ঘোষাল, চ্যাটার্জি বিন্দুমাধব।

পীযূষকান্তি কেমন একটা জ্বালা জ্বালা চোখে তাকিয়ে থাকে ওই চলে যাওয়ার দিকে।

আজ তাকাতেও ভুলে গেছে মনে হচ্ছে।

আজ সেই একটা শব্দ যেন পীযূষকান্তি বোসকে তাড়া করে কবে কোথায় নিয়ে গিয়ে একটা ছায়াছায়া শূন্যতার মাঝখানে ছেড়ে দিচ্ছে।

পয়সা দিয়ে তুমি—

মিনিবাস্টার তন্বী তরুণী দেহখানির ছায়া চোখে ঝলসে ওঠা মাত্রই অজ্ঞাতসারে ডান হাতখানা প্রায় উঠেই পড়েছিল; চট করে তাকে চৈতন্যে ফিরিয়ে আনতে হ'ল। তোলা হাতখানা যেন ভিজে ন্যাকড়ার ফালির মতো শরীরের পাশে ঝুলে পড়ল। আর ওই তন্বী তরুণী দেহধারিণী বাসটা পীযূষকান্তি নামের লোকটাকে 'দুয়ো' দিয়ে চোখের সামনে ছায়া ফেলে বেরিয়ে গেল।

আশ্চর্য! তার পিছু পিছু আর একখানা, ইঃ তারপর আরও একখানা। শহরের সব মিনিবাসগুলোই কি আজ একই টিকিট ললাটে সেঁটে পথে বেরিয়েছে পীযূষকে লোভের হাতছানি দিয়ে ডেকে সংকল্পভ্রষ্ট কবতে?

কিন্তু পীযূষকান্তি বোঁসের সংকল্পভ্রষ্ট হবার উপায় নেই। পাছে হঠাৎ হয়ে পড়ে, তাই সে অফিসে আসতেও আগে থেকে সাবধান হয়ে বেবোয়। পকেটে মাত্র কিছু কুচরো পয়সার সম্বল থাকলে. কোন সাহসে ওই উর্বশী মেনকা রম্ভা ঘৃতাচীর হাতছানিতে সাড়া দিতে যাবে?

শুধুই কি ওদের? আরো সহস্র লোভের হাতছানিকে উপেক্ষা করে করে চলতে হচ্ছে না এখন পীযুষকে? পীযুষের গুরু বলেছে না ইষ্টদেবতাকে পেতে যেমন একটি মুহূর্তও অপচয় না করে শ্বাসে-প্রশ্বাসে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে হয়, এটাও ঠিক সেই ভাবেই ভাবতে হবে পীযূষ। শ্বাস-প্রশ্বাসে হিসেব রাখবে একটি নয়া পয়সাও যেন বাজে খরচ না হয়। আমার মতে এমনিতেই প্রতিটি সংসারী মানুষের ভাবা উচিত—মিনিমাম নেসেসিটির বাইরে যা কিছু করছি, অন্যায় করছি। তা মনে কিছু কোরো না ভাই, তুমি মানুষটি এ যাবৎ তার উল্টো পথেই চলে এসেছো। এখনো সাবধান হও।

শুনে শুনে পীযূষের কি মনে হতে শুরু করেছিল, সে ভুল পথেই চলে এসেছে এযাবৎকাল? না, প্রথমে নয়। প্রথমে এসব কথা অবাস্তব মনে হয়েছে,

গুরুবাক্যকে অমৃতং বালভাষিতং বলে উড়িয়ে দিয়েছে, বলেছে, আরে বাবা, জীবনের বেশির ভাগটাই খুইয়ে বসে আছি, এখন আর পথ বদল।

গুরু বলল, এখনো সময় আছে। এখনো চেষ্টা করলে—

এতক্ষণে একখানা আকাঙ্ক্ষিত বাস এসে দাঁড়াল। পাদানীতে লোক ঝুলছে।.....একটা আলপিন ঢোকানো যায় এমন খাঁজও দেখা যাচ্ছে না।....তবু—পীযূষকান্তি বোস নামের—এক সুটেড বুটেড ভদ্রলোককে ওর মধ্যেই চালান করে দিতে হবে।

উপায় কি?

আরো অপেক্ষা করার কোনো মানে হয় নাকি? আরো পাঁচখানা ছেড়ে দিলেও কি একখানা হালকা বাস পাওয়া যাবে?

আর তারপর?—আবার সেটা ধরতে হবে? শহরতলীর এই বাসগুলো সম্পর্কে একটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে পীযূষকান্তির—এদিকে রাত যত বাড়ে ভীড় তত বাড়ে।

পীযূষকান্তির অফিসের গাড়ি যেখানে ওকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল, তারই কাছাকাছি একটা বাড়ির একতলা ফ্লাটের জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা দুটো ছেলেমেয়ের মধ্যে ছেলেটা বলে উঠল, ওই যে ফাদারের গাড়ি এসে গেল।

মেয়েটা গ্রীলের খাঁজে যতটা উঁকি মারা সম্ভব তা মেরে দুঃখু-দুঃখু গলায় বলল, এসে গেলেই বা কী! আমার তো এখন দু'খানা বাস বদলে বাড়ি যেতে হবে। সত্যি কি বিশ্রী যে করলি তোরা ভাবাই যায় না।

ছেলেটা কড়া গলায় বলল, এই খবরদার বলছি পপি, 'তোরা' বলবি না। আমি করেছি?

তা জানি!

পপি আরো করুণ গলায় বলে, তা জানি,—তুই বুলু, নীলুদি, মাসিমা সবাই তো ফাইট করেছিল—

হুঁ! কাজ হল না কিছু। একা কুম্ভ রক্ষা করে নকল বুঁদি গড়।

অথচ আগে মেসোমশাই কী ভালো ছিলেন। তোরা যা বলতিস তাই হ'ত। তাই না? আর মাসিমার কথা সর্বদা শিরোধার্য ছিল কী যে হ'ল!

হল আর কি? ঘাড়ে ভূত চাপল। স্ত্রীপুত্রের জন্যে মাথা গোঁজার আশ্রয়

করলেন ফাদার। পুত্রের দায় পড়েছে ফাদারের ওই খামার বাড়িতে গিয়ে মাথা গোঁজার! কী করব, এখন শালা নেহাৎ গাব্ গাড্ডায় পড়ে আছি তাই—

এই টুটু, ফের খারাপ কথা বলছিস? কী প্রমিস করেছিলি সেদিন মনে নেই? থাম পপি। মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে মাইরি। এতে কি আর মুখ দিয়ে তোর গিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাষা বেরোবে? নিজেকে শালা আর কিছু বলতে পারা যাচ্ছে না। তবে দেখে নিস তুই—এই গাড্ডা থেকে একবার ছিটকে উঠতে পারলে এ শালা আর ফাদারের ওই প্রেমের খামারবাড়িতে নাক গলাতে যাচ্ছে না। নেহাৎ গাব্বুপিল হয়ে পড়ে আছে তাই—

ছাত্রাবস্থাকে টুটু বোস 'গাব্বুপিল' হয়ে থাকার অবস্থা বলে। পপির শুনে শুনে কান ভোঁতা। তাই পপি তার দুঃখে সহানুভূতি না জানিয়ে ভেংচি কেটে বলে উঠল, আর গাব্বু থেকে উঠে পড়লেই বুঝি তোর দশটা হাত বেরোবে? ইয়া মোটা মাইনের একটা চাকরী বসানো আছে তোর জন্যে?

চাকরী? কলেজ থেকে বেরিয়েই আমি একটা চাকরিতে গিয়ে ঢুকব? এই তোর 'এম্' পপি?

পপি আরো ভেংচে বলে, আমার কি 'এম্' সেটা তোকে বলে কি হবে শুনি? তুই বলছিস তাই বলছি। তুই এমন বাৎচিত করিস যেন এই পরীক্ষাটা দিতে পারলেই স্বাধীন হয়ে যাবি। নিজেকে একটা 'আস্ত মানুষ' বলে দাঁড় করাতে এখনো তোর কতদিন লাগবে, তার আন্দাজ আছে? এখনো কতকাল ফাদারের ভাতে থাকতে হবে, ফাদারের ওই খামারবাড়ির ছাতের তলায় মাথা গুঁজতে হবে ভেবে দেখেছিস?

টুটু যাকে বেল বেদনাবিদ্ধ গলায় বলে, ও কথা মনে করিয়ে দিসনি পপি! জননী কত আশা দিয়েছিল পাশ করে বেরোলেই ক্যানাডা পাঠিয়ে দেবে ওর সেই কোন তুতো জামাইবাবুর কাছে। সেখান থেকে ছাপ মারা হয়ে আরো হায়ার স্টাডিতে চলে যাব। সব গুবলেট হয়ে গেল।..... এখন বলতে গেলে জননী বলে, একেই মাথার মধ্যে সর্বদা আগুন জ্বলছে—তার ওপর আর আগুন বাড়াতে আসিসনে। আর কিছু হবে না তোদের।

পপি মলিন গলায় বলে, তা বলতেই পারেন। মাসিমার কী দুর্দান্ত ইচ্ছে ছিল তোকে ইয়ে করে মানুষ করতে। তুই অবশ্য নিজে-একটা বাজে, জীবনে কোনোদিন কোনো পরীক্ষায় স্ট্যাণ্ড করতে পারিসনি। তবু যাহোক করে একবার ওদেশে পাঠিয়ে দিলে যা হয় কিছু হতে পারতিস। এই তো আমার ছোটমাসির

ভাগ্নে না কে, প্রায় একটা হাবা বোবা গোছের ছিল। তিনবছর ঘষটে হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করেছিল, বোস্টনে তার দিদি জামাইবাবুর কাছে বেড়াতে যাওয়ার ছুতোয় পাঠিয়ে দেওয়া হল তাকে, ব্যস, কী যে হ'ল কে জানে, এখন নাকি সেখানে হাজার হাজার ডলার রোজগার করছে।

গুজবে কান দিসনি পপি।

গুজব মানে? ছোটমাসি মিছে কথা বলেছে?

আচ্ছা বাবা, না হয় সত্যিই হল, শুনে টুটু বোসের কী ফায়দা? ফাদার যে স্রেফ আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করতেই তোর আমার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান ঘটিয়ে দিল, সেইটা ভাবলেই মেজাজ ঠিক থাকে না।

সত্যি রে—পপি বলে, মাও দুঃখু করছিল, একে বলে সুখে থাকতে ভূতের কিল খাওয়া! তোর টুটুর বাবা এখানে কী রাজার হালে ছিল আর এখন সেই কোন পচা পাড়াগাঁয়ে গিয়ে—সত্যি রে মেসোমশাইকে দেখলে এমন দুঃখ হয়। অফিসের গাড়ি থেকে নামতেন, কেমন টগবগ করতে করতে বাড়ি পৌঁছে যেতেন, আর এখন—

কথা শেষ করার আগেই টুটু ফট করে পপির একটা কাঁধ খামচে ধরে বলে ওঠে, এই পপি কী বলেছে মাসিমা? 'তোর টুটু।'

পপি বলে, ইস। খামচে দিচ্ছ কেন? লাগে না আমার? বলবে না কেন? সব সময়ই তো বলে!

সব সময়ই বলে। তার মানে তুই খুব পাকামি করিস!

পাকামি আবার কি। তুই আমার বন্ধু নয়। লালির কথাতেও তো বলে, তোর লালি!

হুঁ। খুব এঁচোড়ে পেকেছ। যাক, চল আজ।

এক্ষুণি যাবি?

এখন থেকে শুরু না করলে। ঘণ্টা দুই তো লাগবে।

দূর! এত বিচ্ছিরি হয়ে গেল ব্যাপারটা। জানিস তোদের ওই ফ্ল্যাটটায় যারা এসেছে আমি তাদের দিকে তাকাই না। এত রাগ হয় ওদের দেখলে!

টুটু একটি গভীর পরিতাপের নিঃশ্বাস ফেলে বলে, ওদের আর কী দোষ।

তা জানি। তবু তোদের বারান্দায় একটা গুঁফো বুড়ো দাঁড়িয়ে আছে দেখলে রাগ হয় না?

'যাই যাই' করেও আরো মিনিট চল্লিশ কাটিয়ে তবে বিদায় নেয় টুটু।

পপি দাঁড়িয়ে থাকে দরজার সামনে। আহা কী সুখের দিনই ছিল আগে। টুটু এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে ও বাড়ি ঢুকে যেত, দেখে তবে পপি দরজা থেকে নড়ত। কী যে দুর্মতি হ'ল মেসোমশাইয়ের!....কারো কথা শুনল না।

পপিরাই কি বলেনি? পপির মা বাবা পপি নিজে। অতদূরে না যাওয়ার জন্যে পীযূষকান্তি বলেছে—বাঃ তোমরা বেড়াতে যাবে। সেটাতে আরও মজা হবে। বেস আউটিং লাগবে।

পীযূষ যখন বাড়ি এসে পৌছলো, তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। আশীর বি বাসটায় খানিক এসে ব্রে . ডাউন হয়ে বসল।

কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর যখন সে একেবারেই জবাব দিল তখন বালিশে তুলো ঠাসার মতো যাত্রী ঠাসা বাসটাকে পারিত্যাগ করে সবাই একে একে দুই দুইয়ে, অবশেষে হুড়মুড়িয়ে নেমে পড়ে যে যেমন পারে গন্তব্যস্থলে রওনা দেয়।

পীযূষ অবাক হয়ে বসে দেখছিল বাসের মধ্যে কী অকথ্য মন্তব্যের ঢেউ। যন্ত্র নামক জিনিসটা যে মাঝে মাঝে বিকল হয়েই থাকে এটা যেন এরা মানতে রাজী নয়। এদের মতে এটা চালক এবং পরিচালকের সম্পূর্ণ বদমায়েসী।

এই বদমায়েসীতে তাদের লাভ কী, কোন মোক্ষফল পাবে তারা এর থেকে তা কেউ ভেবে দেখতে রাজী নয়।

এরা কারা?

এদের সঙ্গে পীযূষকান্তি বোস নামের লোকটার শ্রেণীগত কোনো মিল আছে?

অথচ পীযূষকান্তি এদেরই একজন।

তার মানে সুরমার কথাই ঠিক।

কিন্তু কেন আমি হঠাৎ পয়সা দিয়ে দারিদ্র্য কিনতে বসলাম।

ভাবতে গিয়ে বেশ খানিকটা পিছনে হঠে গেল পীযূষ। ফিরে গেল সেই গাড়ির প্রসঙ্গে।

গাড়ি থেকেই কথাটা উঠিয়েছিল সুধাময়।

বলে উঠেছিল, তুমি আমায় বন্ধু বলে স্বীকার কর বলেই বলছি। পীযূষ গাড়ির চিন্তাটা ছাড়, তার আগে একখানা বাড়ি করে নাও—

শুনে পীযূষ হো হো করে হেসে উঠেছিল! তুমি এমনভাবে কথাটা বললে সুধাময়, যেন তার আগে একজোড়া জুতো কিনে নাও অথবা একটা ছাতা—

সে হাসিতে কিছু অপ্রতিভ হয়নি সুধাময়, বরং তার উত্তরের যুক্তিটা আরো জোরালো হয়েছিল। ব্যাপারটা যে এক হিসেবে তাই, সেটা বুঝিয়েছিল তুলনা দিয়ে। ভুল বলনি পীযূষ এক হিসেবে তাই পায়ের তলায় পা রাখবার আশ্রয় আর মাথার ওপর ছাতা। এরই নাম বাড়ি। লোকে যাকে চিরকাল বলে আসছে, মাতা গোঁজার আশ্রয়.

পীযূষ অবশ্য তাতে গলেনি, হেসেই বলেছিল, বুঝলাম তো সে কথা, কিন্তু একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গাড়ি কেনবার টাকায় তো আর বাড়ি হয় না? তাও কি ওই গাঁড়ির টাকাটাই মজুত? এখানে সেখানে যা কিছু আছে কুড়িয়ে কাটিয়ে—নেহাৎ পুত্র কন্যার বড়োই আকাঙক্ষা—তাই—

সুধাময় গম্ভীরভাবে একটুক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, নজর দিচ্ছি না ভাই। তবে বলছি, ভগবানের ইচ্ছেয় এতগুলো করে টাকা মাইনে পাচ্ছ। সবই হরিরলুট করে ফেলছ? আখেরটা একটু ভাবছ না? তোমাকে দেখলে তো মনে হয় মাসের তিরিশ তারিখ না আসতেই পকেট গড়ের মাঠ করে বসে থাক।

পীযূষকান্তি অবশ্য এ ধিক্কারেও দমেনি তখন, হেসে হেসেই বলেছিল, ধরেছ ঠিক। মানতেই হবে তোমার সূক্ষ্মদৃষ্টি আছে। আটাশ তারিখ থেকেই গিন্নীর কাছে ধর্ণা দিই। তোমার কিছু থাকে তো দাও, এ দু'তিনটে দিন পার হই। তা তিনিও এককাঠি সরেস। হয়তো মাসের দু'দিন থাকতে একটা দামী শাড়ি কিনে বসে থাকেন।

চমৎকার!

সুধাময় বলেছিল, এই অনুমানই অবশ্য করেছিলাম আমি। কিন্তু তোমায় ভালবাসি বলেই বলছি পীযূষ, অ্যায়সা দিন নেহি রহেগা।

পীযূষ একথাও প্রায় অগ্রাহ্য করে উড়িয়ে দিয়েছিল। আরে ছাড় ভাই, কার কখন কোনদিন থাকছে আর যাচ্ছে ঠিক আছে কিছু? গিন্নীর যে আবার শখের প্রাণ গড়ের মাঠ। বলেন, মানুষের মতন না বাঁচতে পারলে বাঁচার কোন মানে নেই। বলেন ভবিষ্যতে পাছে অসুবিধে ঘটে, এই ভাবনায় জীবনের সব থেকে ভালো দিনগুলো অসুবিধে ভোগ করে করে কৃচ্ছ্রসাধনে কাটিয়ে টাকা জমাবে, এর থেকে বোকামি আর নেই। যতটা সম্ভব ভালোভাবে থাকব, ভালো খাব পরব, ইচ্ছেমতো শখ সাধ মেটাব, এইটাই জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত সংসারী মানুষের। তারপর যা অদৃষ্টে আছে।

অদৃষ্ট যদি মানতে হয়, ভবিষ্যৎ ভাবতে বসার মানে হয় না। ছেলেমেয়েদেরও সেই মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছেন মহিলা। আমি যদি একটু টানা-কষার চেষ্টা করি, ওরা দুয়ো দিয়ে বলে, বাবা কিপটে হয়ে গেছে। বলে, গোয়ালের গোরুছাগল খোয়াড়ের হাঁস-মুরগী, এদের জীবনটা তো আর মানুষের জীবনের আদর্শ হতে পারে না। তবে কি আর অসৎ পথে রোজগার করতে যাচ্ছে? তা নয়। ওই যত্র আয় তত্র ব্যয়, এই আর কি।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি, বলে তখনকার মতো চুপ করে গিয়েছিল সুধাময়। কিন্তু যে লোক পরোপকারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, সে তো আর একেবারে চুপ করে যেতে পারে না?

আবার একদিন সে হঠাৎ বলে বসে, পীযূষ তোমার ফ্লাটটার ভাড়া কত?

পীযূষ এ প্রশ্নের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি। বলেছিল, আর বল কেন? ঢুকেছিলাম তো সাড়ে চারশোয়, দু'বছর না যেতেই পুরো পাঁচ করে নিয়েছেন প্রভু।

সুধাময় একটু গুম হয়ে থেকে বলল, কতদিন আছ ওখানে?

কতদিন? কতদিন—নাইনটিন সিক্সটি থ্রীর এপ্রিলে! তা প্রায় বছর বারো হ'ল।

সুধাময় আরো গম্ভীরভাবে বলে, তার মানে এ যাবৎ তুমি বাড়িওয়ালার চরণে প্রায় একাত্তর হাজার টাকা ধরে দিয়েছ। সত্তর হাজার আটশো।

পীযূষ প্রায় লাফিয়ে উঠে বলে, আরে ব্যস! একেবারে মুখে মুখে হিসেব। কিসের ছাত্র ছিলে বল তো? অঙ্কের?

সুধাময় বলে, জীবনের পথে প্রতি পদে হিসেব কষতে কষতে অঙ্কের ছাত্রই বনে গেছি ভাই! কিন্তু ভেবে আমারই বুকটা ধবসে যাচ্ছে পীযূষ এই বিপুল পরিমাণ অর্থ তুমি ওই পেটমোটা বড় লোকটাকে জুগিয়ে এসেছ, শুধু একটু থাকার বিনিময়ে। অথচ তোমার পৈত্রিক ভিটের ভাগ রয়েছে—

আরে, দূর সেখানে তো শরীকি ব্যাপার। ভাগে কুল্লে একখানা করে ঘরে—

তবু তো ঘর!

সুধাময় দৃঢ় গলায় বলে, একটু কষ্ট করে কোনো মতে কটা বছর কাটিয়ে দিতে পারলেই আজ তুমি নিজে বাড়িওয়ালা হয়ে বসতে পারতে। সত্তর বাহাত্তর হাজারে শহরতলীতে অট্টালিকা হয়ে যেত। একটা তলা ভাড়া দিতে, আর একটা তলায় বাস করতে, সময় অন্তে আরো তলা বাড়াতে পারতে—ইস!

ভেবে আমারই যেন হাত পা কামড়াতে ইচ্ছে করছে পীযূষ! সবদিকে তোমার এত বুদ্ধি অথচ—

সেই শুরু!

সেই প্রথম পীযূষ মনে মনে নিজেকে সুধাময়ের থেকে 'বোকা' বলে স্বীকার করে। সত্যি যদি পারা যেত কি মনেরম হ'ত সেই অবস্থাটি! নিজের তৈরি অট্টালিকায় আছি, আবার বাড়িওয়ালা বনে বসেছি! আহা!

ভেবেছিল। প্রায় 'অবাস্তব' ভাবেই ভেবেছিল।

তাই বাড়ি এসে স্ত্রী-পুত্রের কাছে সুধাময়ের অঙ্ক মেশানোর চমৎকার পদ্ধতি নিয়ে হাসাহাসি কবতে ছাড়েনি। বলেছিল, ইস! একাত্তর হাজার টাকা! একসঙ্গে কেমন দেখতে তাই ভাবছি!

গোড়ার জীবনে ওই সুধাময় সরকারের শিষ্য হয়ে পড়তে পারলে মন্দ হ'ত না, কি বল?

মা কিছু বলার আগে বুলু ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠেছিল, ওই কিপটে ভদ্রলোকেব সঙ্গে বেশী মিশোনাতো বাবা। মান নীচু হয়ে যাবে।.......জ্যাঠামশাইদের বাড়ির সেই একখানা ঘরের মধ্যে জীবন কাটিয়ে টাকা জমানো! উঃ! ভাবা যাব না।

বুলু তখন সবে হায়ার সেকেণ্ডাবী দিয়েছে, কিন্তু কেমন করে যেন মাতব্বরিতে সকলের থেকে প্রধান ভূমিকা নিয়ে বসে আছে।

অতএব যথারীতি সুবমাও মেয়ের কথা সমর্থন করে বলে উঠেছিল যা বলেছিস। কিপটেমি একটা ছোঁয়াচে রোগের মতো।..... এর পর কোনোদিন হয়তো তোমার সুধাময় বলে বসবে এতকাল যত চালে ভাত খেয়ে এসেছ, সেটা না খেয়ে জমাতে পারলে তুমি বড়বাজারে একখানা চালের আড়ত খুলে বসতে পারতে।

শুনে অবশ্য ছেলেমেয়েরা হাসির বন্যা বইয়েছে। অতঃপর ওরা হি হি করে দৈনন্দিন সব কিছু প্রয়োজনীয় বস্তু নিয়ে তুলনা দিতে বসে এই দিদি, ধর আমরা যদি সবাই মিলে কলগেটের বদলে ঘুঁটে কয়লার ছাই দিয়ে দাঁত মাজতাম; তাহলে কত টাকা জমাতে পারা যেত? সারা জীবনের হিসেব কষবি কিন্তু। দিদি গড়িয়ে পড়ে বলে বাড়ির সব কটি সদস্যের জীবনের পরিধি তো এক নয়, হিসেবটা বরং বাবার ওই বন্ধুকে করে দিতে বললে ভালো হয়।

এই টুটু অ্যাভারেজে আমরা মাসে ক'টা করে সিনেমা দেখি? একটা হিসেব

কষে ফেল না। ওটা তো শুদ্ধ বাংলায় কি বলে 'অবশ্য প্রয়োজনীয়' লিস্টেই পড়ে না।

আবার হি হি!

হি-হি-টা চালিয়ে যায় কিছুক্ষণ এবং শেষতক ন্যূনতম প্রয়োজনীয়ের খাতে যা ধার্য করে তা হচ্ছে লোটা-কম্বল, ছাতু-লঙ্কা, গামছা-কৌপীন-ফুটপাত-গাছতলা।

স্ত্রীপুত্র পরিবারের এই হি-হি-র বন্যায় ভেসে গিয়ে সুধাময়ের পরামর্শর হাস্যকর অবাস্তবতা অনুধাবন করেছিল পীযূষ?...সত্যি বাড়িভাড়া না দিলেই কি ওই সত্তর-একাত্তর হাজার জমতো পীযূষকান্তি বোসের? তা হয় না।

হয় না।

অতএব সেই গাড়ির চিন্তাতেই থাকে পীযূষ। সুধাময়কে আর বলতে হয় না, একটা সুযোগ হাতের কাছে এসে যায়। অফিসের যে গাড়ি দুটো সাহেবদের আনা-নেওয়া করে তার একখানা কিছু পুরনো হয়ে যাওয়ায় সেটা বাতিল করে নতুন গাড়ি কেনা হবে এমন একটা খবর কানে আসতেই চঞ্চল হয়ে ওঠে পীযূষ এবং খবরটা যে সঠিক তার সন্ধান নিতে চেষ্টা করে। কিন্তু সেই চেষ্টার সূত্রেই কথাটা সুধাময়ের কর্ণগোচর হয়ে গেল।

অফিসের পরে কথাটা পাড়ল সুধাময়, দীনেশের গাড়িটা নাকি তুমি কিনছ?

দীনেশ ড্রাইভার! কিন্তু গাড়িকে চিহ্নিত করতে সবাই বলে থাকে 'দীনেশের গাড়ি,' আনোয়ারের গাড়ি!

পীযূষ একটু অপ্রতিভভাবে বলে, একেবারে কিনে ফেলেছি এমন নয়। শুনছিলাম গাড়িটা— তার মানে ভূতটা ঘাড় থেকে নামেনি। সুধাময় অভিযোগের গলায় বলে, অথচ আমি তোমার জন্যে একটা বাড়ি খুঁজতে হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছি!

বাড়ি খুঁজতে?

পীযূষের এই অবাক প্রশ্ন সুধাময় উদাত্ত গলায় বলে, হ্যাঁ বাড়ি খুঁজতে? ভেবে দেখেছি তোমার যা দিলদরিয়া স্বভাব, তাতে টাকা জমিয়ে কিছু হবে না তোমার। একেবারে তৈরি বাড়ি কিনে ফেলতে পারলে—

কিনে ফেলতে পারলে?

হো হো করে হেসেছে পীযূষ, স্বপন দেখি প্রবাল দ্বীপে তুলব আমি বাড়ি। তা স্বপ্নীয় টাকা দিয়ে যদি কেনা যায় তাহলে মন্দ নয়? ওসব কথা ছাড় ভাই,

বাড়ি ফাড়ি আমার হবে না। হাজার আষ্টেক টাকার একটা ইনসিওর মাচিওর করেছে, তাই ভাবছি গাড়িটা ওটার মধ্যে যদি হয়ে যায়।

কিন্তু সুধাময়ের যে প্রতিজ্ঞা অবোধ বন্ধুটার হিত না করে ছাড়বে না। অতএব অনেক যুক্তি-তর্কের জাল বোনে সে, উদাহরণ দিয়ে যে যুক্তিকে শক্ত করে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে যে টাকা ধার নেওয়া যায়, একথা মনে করিয়ে দেয় এবং ওই কথাটাই মনে ধরিয়ে দেয় বন্ধুটিকে। পীযূষের মতো উড়নচণ্ডী লোকের টাকা জমার আশা বৃথা, কিন্তু পীযূষের মতো নীতিবাগীশ লোকের ধার শোধ হয়ে যাবেই।

অতএব—

পীযূষ হেসে বলে, অতএব ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ?

আরে বাবা তা নয়। 'অতএব'—দুই আর দুইয়ে চার। বাড়ি করাটা ঘৃতং পীবেৎ-এর পর্যায়ে পাড়ে না ভাই।

নাঃ, তুমি দেখছি আমার বাড়ি না করিয়ে ছাড়বে না! তা ভাগ্যে থাকে কখনো হবে ভাই, এখন গাড়িটা হয়ে যাক! ছেলেমেয়েরা তো—

গাড়িটা হয়ে যাক! এত পরেও?

পীযূষ কি তার নির্লজ্জতা দিয়ে বন্ধুকে লজ্জিত করে ফেলতে সক্ষম হ'ল?

নাঃ, সে আশা করা যায় না।

পরোপকারীর মতো নির্লজ্জ আর কে আছে?

সুধাময় তখন বোঝাতে বসল একখানা গাডি কেনা থেকে সংসারে কী পরিমাণ অশান্তি ঢুকতে পারে।

গভীর গম্ভীর সুর তার তখন।

বাড়ি জিনিসটা হচ্ছে সকলের কেমন কিনা? সকলেই মোটামুটি সমান সুবিধে ভোগ করে, কিন্তু গাড়ি? গাড়ি থেকে কি বাড়ির সবাই সমপরিমাণ সুযোগ সুবিধে পেতে পারে? হয় না ভাই হয় না, সুধাময় দার্শনিকের হাসি হেসে বলে, ওই এক গাড়ি কেনার থেকে কত সোনার সংসার ভেঙে টুকরো হয়ে যেতে দেখলাম।.....আমারই এক ভায়রাভাই, এই ঠিক তোমারই মতো স্ত্রী ছেলেমেয়েব প্ররোচনায় গাড়ি কিনেছিল। অতঃপর কী হ'ল? বলি শোন— গাড়ি পেয়েই ছেলে রাতদিন শহর পয়লট্ট করে বেড়ায়, তার টিকি দেখা যায় না। তাই বাপ একদিন বলে ফেলেছিল, হ্যাঁরে গাড়িটা যদি তুইই সারাদিন অকুপাই করে থাকবি, তাহলে আর সবাই একটু চড়ে কখন?

ঝপ করে ছেলে শুম হয়ে গিয়ে বলল, ওঃ! আমি সারাক্ষণ অকুপাই করে রাখি, আপনাকে অফিসে পৌঁছে দেওয়া হয় না?

বাবা প্রমাদ গণে তাড়াতাড়ি বলেছিল, আহা সে কথা কি বলছি? আমাকে তো রোজই আনা নেওয়া করছিস। মানে তোর মা বলছিল, গাড়ি কেনা হয়েছে এইটুকু মাত্র কানে শুনেছি, একদিন কালীঘাটে গঙ্গাস্নান পর্যন্ত যাওয়া হ'ল না। ব্যাস! হয়ে গেল। ছেলে বলল, ঠিক আছে, কাল থেকে যেন মা ঘরের গাড়িতে রোজ কালীঘাটেই যান। আমি ওর মধ্যে নেই।

'নেই' মানে হাতও দেবেন না আর। বোঝ ব্যাপার! গাড়ি চালাতে আর কে জানে?...মেয়ে বলল, ঠিক আছে। দাদার যখন এত অহঙ্কার, আমি শিখে নিচ্ছি। শুধু মাস দুই একটা ড্রাইভার রেখে দাও।...রাখা হ'ল তাই। তখন সমস্যা যুবতী মেয়েকে কী করে রোজ ড্রাইভারের সঙ্গে একা ছাড়া যায়? তবে মা যাক সঙ্গে।.....মা রোজ সংসার ফেলে যায় বা কি করে? যাওয়া হয় না, মেয়েরও শেখা হয় না। অগত্যা ড্রাইভারই থেকে যায়। সে থেকে যায় মানে সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুই যেতে থাকে। বেশী পেট্রোল যায়, যখন তখন 'পার্টস' খারাপ হয়ে যায়, রোজ রোজ গাড়ি হাসপাতালে যায়, ঝামেলার একশেষ। এদিকে আবার রবিবার ড্রাইভারকে ছুটি দিতে হয়, অথচ গেরস্থ লোকের যা কিছু বেড়ানো ফেড়ানো তো ওই রবিবারেই? কাজেই প্যাঁজ পয়জার দুই হতে থাকে। ছেলে বসে বসে মজা দেখে, মা রাগ করলে বলে, একবার যখন ও গাড়ি ছোঁব না বলেছি, আর আঙুলও ঠেকাব না।

শেষপর্যন্ত ভায়রাভাই রাগ করে বেচেই দিল গাড়িটা। আর তখন ছেলে বলে বেড়াতে লাগল, একেই বলে, 'গরুর ডাবায় কুকুর'। নিজেরাও চড়ল না, আমাকেও চড়তে দিল না।

কিন্তু শুধুই কি নিজের ভাইরাভাইয়ের বাড়ির ব্যাপার বলেই থামল সুধাময়? বলল না এর, ওর তার আর পাড়াপড়শীর বৃত্তান্ত?

কাদের বাড়িতে ভাই ভাইয়ের গাড়িতে চড়ে না, বাপ ছেলের গাড়িতে পা ঠেকায় না, মা ছেলের গাড়িতে ছেলের বৌয়ের সঙ্গে চড়ে না, বোন গাড়িটাকে দাদার গাড়ি না বলে বৌদির গাড়ি এবং সে গাড়ি চড়বার অফার গেলে অবজ্ঞার নাক কুচকে প্রত্যাখ্যান করে ট্যাকসি ডাকতে পাঠায়, এ সব বিবরণ দাখিল করে বন্ধুর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করাতে চেষ্টা করে সুধাময়!

এবং শেষ ভাষ্য দেয় গাড়ি কেনা মানেই পয়সা দিয়ে অশান্তি কেনা। ও

গাড়ি নিয়ে কত মান অভিমান ঈর্ষা অপমানের সমস্যা দেখলাম ভাই। ফলে স্বামী স্ত্রীতেই কত ইয়ে হয়ে যায়। হবেই বা না কেন? একটা পরিবারে একখানা মাত্র গাড়ি, আর একটা পরিবারে একথালা মাত্র ভাতে তফাৎটা কি? কেবলমাত্র বাড়ি ছাড়া কেনা জিনিসই সম্পূর্ণভাবে সকলের ভোগে লাগে না। জামা নয়, জুতো নয়, ছাতা নয়, কোনো কিছুই নয়।

পীযূষকান্তি একটা দুর্বল প্রশ্ন করেছিল, সবাইয়ের মনই কি সংকীর্ণ?

সুধাময় প্রবল উত্তর দিয়েছিল, বেশ মানলাম না হয়, তা সকলের মনই উদার নিরভিমান হ'ল। কিন্তু সংসারের সব মেম্বারেরই তো একই দিকে গন্তব্যস্থল হতে পারে না? অথচ একই সময়? তা হ'লে? বাড়া ভাতের থালাটা কার ভাগে পড়বে? গাড়িখানা নিয়ে কে কোন দিকে যাবে?

কিন্তু বাড়ি? যে যেমন পথেই চল, বাড়ি সবাইকেই সমান আশ্রয় দেয়।....

ফোঁটা ফোঁটা জলে পাথর ক্ষয়।

তিল তিল করে তিলোওমা গড়ে ওঠে!

গাড়ির চিন্তা সরিয়ে রাখে পীযূষ।

অবশ্য বাড়িটাকেও খুব ধরে না, চুপচাপ থাকে। কিন্তু হঠাৎ একদিন টগবগ করতে করতে এল সুধাময়, নাকি জলের দরে একখানা বিরাট বাড়ি চলে যাচ্ছে, পীযূষ যদি তাকে খপ করে চেপে ধরে।

একতলা বাড়ি বটে কিন্তু অনেকখানি জমির ওপর। চারিদিক খোলা, বনেদী প্যাটর্ণে বাড়ি, উঠোন দালান, সারিবন্দী ঘর, সর্বোপরি চমৎকার একখানা ঠাকুর দালান। মানে রীতিমতো একটা সম্পত্তি।

ঠাকুর দালান!

ঠাকুর দালান নিয়ে কী করব আমি? হেসে ওঠে পীযূষ।.....

সুধাময় বলল কী না করবে? প্রতিমা এনে পুজোই করতে হবে—এমন কি মানে আছে? ড্রইং রুম করবে। কী মোটা মোটা থাম, তিন থাক খিলেন, সে একেবারে দেখবার মতো।

পীযূষ বলল, তা এমন বনেদী, ঠাকুরদালানওলা বাড়িটা কোথায়? পাথুরেঘাটায়? ঠনঠনে কালীতলায়? নাকি জোড়াসাঁকোয়?

সুধাময় আহত হল।

ওইসব ঘিঞ্জি জায়গার খবর এনেছে সে বন্ধুর জন্যে। ওসব জায়গায়

চকমিলানো বাড়ি আর মোটা থামওয়ালা ঠাকুরদালান থাকতে পারে, কিন্তু খোলামেলাটা কোথায়? আশেপাশে তো চোদ্দ শরীকের দেওয়াল। না ওই পুরনো কলকাতার দিকে নেই সুধাময়, ওদিকের বাতাস পাথরচাপা। মনের বাতসও। জান না 'উত্তরে হিমালয়' আর ওদিক থেকে প্রগতির বাতাস বয় না। যে চিরদিন চিরনিরুত্তর। সুধাময় খবর এনেছে দক্ষিণের। যেদিকে অগ্রসরতার বাতাসে ভর করে কলকাতা অগ্রসর হয়ে চলেছে 'গ্রেটার ক্যালকাটা' বানাবার তালে।

গড়িয়াহাটে রয়েছ তুমি, তার হাটটা বাদ্ দিয়ে চলে যাও সোজা শুধু 'গড়িয়ার' পথ ধরে। যেতে যেতে গিয়ে পড়ল বিখ্যাত গ্রাম রাজপুরে, পড়লে আর পেয়ে গেলে সেই মোটা মোটা থাম দেওয়া ঠাকুরদালানওয়ালা বাড়ি।

শুনে পীযূষ আর নেই।

রাজপুর? রাজপুরে—বাড়ি কিনতে যাব আমি? নাঃ, তোমার মাথাটা স্রেফ খারাপ হয়ে গেছে সুধাময়! বাড়িতে গিয়ে এ প্রস্তাব শোনালে ওরা আমায় সেই চিরবিখ্যাত দেশটিতে চালান করে দিতে চাইবে। কী খবর আনলে। ধ্যুৎ!

হাসি আর থামতে চায় না পীযূষকান্তির।

কিন্তু বন্ধু নাছোড়বান্দা। সে প্রশ্ন করে রাজপুর সম্পর্কে কোনো ধারণা আছে কিনা পীযূষের।

শুনে পীযূষ একটু স্মৃতির দোলায় দোলায়িত হয়। সম্প্রতিকার কোনো ধারণা অবশ্য নেই, অতীতের আছে। রাজপুরে তার মায়ের মামার বাড়ি ছিল। অতি বাল্যে গিয়েছে মায়ের সঙ্গে। মায়ের মামার বাড়িতে দুর্গাপুজো হ'ত। মোটা মোটা থামওয়ালা ঠাকুরদালান। নীচের উঠোনে দাঁড়িয়ে পুজো দেখত গ্রামের সব লোকেরা, বাড়ির লোকেরা দালানে বসে। ওই দালানে বসার জন্যে নিজেকে বেশ উঁচু উঁচু লাগত পীযূষের।

হঠাৎ মনের মধ্যে একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। আচ্ছা সেই বাড়িটা নয় তো। মোটা মোটা থামওয়ালা অনেক বাড়ি ছিল কি সেখানে?

প্রশ্ন করল মালিকের নাম কি?

অবশ্য নাম শুনলেই কি আর বুঝতে পারা যেত? কে মনে রেখেছে মায়ের থেকে অনেক বড়ো সেই মামাদের নাম? তবু ভাবল শুনিতো।

কিন্তু বাড়িটা নাকি এখন কোনো সূত্রে এক বিধবা বুড়ির সম্পত্তি—জ্ঞাতিগোত্ররা কে কোথায় আছে কে জানে, বুড়িই আছে ভিটে আগলে। কিন্তু

আর একা থাকতে পারছে না, চলে যাবে বোনঝির না কার বাড়ি, তাই বাড়ি বেচার তাগিদ। আর তাগিদ সেখানে প্রবল। সেখানে জলের দর তো হবেই। বুড়ির নাম কে জানতে গেছে। দলিলে দেখা যাবে। পীযূষের একবার কৌতূহল হ'ল—নাম শুনে বোঝা যাবে না দেখলে হয়। কিন্তু বৃথা গিয়ে হবেই বা কি। যদি সেই বাড়িই হয়, পীযূষ কিনতে যাবে নাকি। পীযূষ কথাটাকে নস্যাৎ করল।

কিন্তু ওদিকে কানের কাছে সুধাময় সুধাবর্ষণ করেই চলেছে—

পীযূষের শৈশবের দেখা রাজপুর গ্রামের সঙ্গে এখানকার রাজপুরের তুলনাই চলে না, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলটি হয়ে পর্যন্ত যা ডেভেলাপ করেছে ওদিকটা ধারণা করা যায় না। রাস্তাটাস্তা চমৎকার। হবে না কেন, ওই পথ দিয়েই তো রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী ও অন্য মন্ত্রীমান্ত্রারা যাতায়াত করে থাকেন। নরেন্দ্রপুরে একবারও যাননি এমন কেষ্ট বিষ্টু কে আছে? ওদিকে গেলে স্বাস্থ্য টাস্থ্য ফিরে যাবে। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সুধাধারা তেমন ভাবে কানের মধ্যে না নিলেও মনের মধ্যে চলছিল স্মৃতির অনুরণন....কী ভালোই লাগত মায়ের মামার বাড়ি যেতে। পীযূষদের বাড়ি ছিল কামারপুকুরে, নিজের মামার বাড়ি বাদুড়বাগানে। প্রকৃতি শব্দটার সঙ্গেই কোনো পরিচয় ছিল না। মায়ের মামার বাড়ি যেতে পেলে অগাধ উন্মুক্ত আকাশ বাতাসের স্বাদ মিলত। তার সঙ্গে অবাধ স্বাধীনতারও।....কারণ—মায়ের মামার বাড়িতে বাবা যেত না কোনো বারই। মা যেত নিজের মা-বাবার সঙ্গে। আর মা তখন ছেলেমানুষ হয়ে যেত।

মনের মধ্যে ঢেউটা উঠে পড়েছিল, তার ধাক্কায় পীযূষ বলে ফেলল, আচ্ছা চল না হয় একদিন দেখেই আসা যাক। জাস্ট দেখে আসা। ছেলেবেলার কথাটা মনে পড়ে গেল—

তারপর—

তারপর যা ছিল বিধাতার মনে।

*　　　*　　　*　　　*

নিরভিভাবক ওই নড়বড়ে বুড়িটা যে পীযূষের মায়ের মামার বাড়ির কেউ সেকথা অবশ্য মনে হ'ল না পীযূষের বাড়িখানাও যে সেই বাড়িখানা তাও ঠিক করে বলা গেল না, তবু শৈশবের ভালো লাগার সূত্র ধরে এই মোটাথাম আর ঠাকুরদালানওয়ালা বাড়িটা যেন মনের মধ্যে খানিকটা জায়গা জবর দখল করে বসল।

তাছাড়া—লাখ দেড়েক টাকার সম্পত্তি যদি তুমি সত্তর পঁচাত্তর হাজারে পেয়ে যাও, ভেবে দেখবে না একবার?

ভেবে দেখতে শুরু করল পীযূষ। একটা রবিবার সকালে রাজপুর ঘুরে আসার পর থেকে। সেই ভেবে দেখাই কাল হ'ল।

অতীতের সেই কথাগুলো মনের মধ্যে আলোড়ন তুলছে আজ। কী লড়াই চলেছিল স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। কিন্তু পীযূষ তখন প্রায় সুধাময়ের পুতুল। সুধাময়ের চোখেই পৃথিবী দেখছে তখন। তাই পীযূষেরও মনে হয়েছিল নাগরিক জীবনের সুখ-সুবিধে ব্যহত না করেও যদি মফস্বলের সুযোগ-সুবিধেগুলো আহরণ করা যায় তার চাইতে কাম্য আর কী আছে?

তার সঙ্গে সুধাময় তো পরামর্শর চাষ লাগিয়ে যাচ্ছে।

বাড়ি সংলগ্ন জমি যতখানি পড়ে আছে, তাতে ফুলের বাগানের জন্যে কিছু রেখেও বাকিটায় কিচেন গার্ডেন করতে পারলে, তরি-তরকারি আর কিনে খেতে হবে না।......গোয়ালবাড়ি বলে যে দিকটা পড়ে আছে, একটু সরিয়ে নিয়ে দুটো গরু রাখালে খাঁটি দুধ খেতে পাওয়া যাবে, যে জিনিসটি শহরে একেবারে দুর্লভ।

তার মানে গড়িয়াহাটের এক শৌখিন সভ্য ব্যক্তির হঠাৎ চাষী-বাসী গৃহস্থ বনে যাওয়া। এরপর হয়তো তুমি সুধাময় তোমার বন্ধুকে ধান জমি দেখাবে।

কিন্তু এ ব্যঙ্গ সুধাময়কে কাবু করবে নাকি? সুধাময় কি শুধুই পরোপকারী সুহৃৎ? পাকাপোক্ত একটি দালাল নয়?

যুক্তি নেই ওর?

শহর ছাড়িয়ে শহরতলীতে গাছ গাছালি বাগান সম্বলিত বাড়ি করা-'ওদেশের' ফ্যাশন নয়? ওদেশের সভ্য মার্জিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ভাবতেই পারে না, শহরের ঘিঞ্জির মধ্যে বাড়ি বানানোর কথা। আর আদর্শ বলতে তো ওদেশেই।

যুক্তি, যুক্তি, যুক্তির জালে বাঁধা পড়ে গিয়ে পীযূষকান্তি বোস একটা মোটা অঙ্কের ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ে বসে আছে। যার ফলশ্রুতি হচ্ছে এই কৃচ্ছ্রসাধন। ওই আরামকে হারাম করা; বাড়িটা শেষ পর্যন্ত কিনতে হয়েছিল আটাত্তর হাজারে। সুধাময় জোর দিয়ে বলেছিল, তবু বলব জলের দরে পেলে তুমি।

সুরমা আজ তাকে পয়সা দিয়ে দারিদ্র্য কেনা বলে ঘোষণা করেছে। শুনে

পর্যন্ত কথাটাকে মাথার মধ্যে থেকে তাড়াতে পারছে না পীযূষ। আলো ঝলমলে গড়িয়াহাটকে ছেড়ে চলে আসতে আজ তার গভীর নিশ্বাস পড়েছে। ইচ্ছে করে এই স্বর্গ হারিয়েছে পীযূষ। নিজেকে যেন পরাজিত পরাজিত বলে মনে হচ্ছে। যেন হঠাৎ একটা বেচারী মানুষ হয়ে গেছে পীযূষকান্তি বোস।

বাস থেকে নেমে মিনিট কয়েক হাঁটতে হয়। জ্যোৎস্না থাকলে এই হাঁটাটা খারাপ লাগে না। এক একদিন, মানে যেদিন জ্যোৎস্নাটা খুব মায়াময় হয়ে ওঠে, বরং হাঁটতেই খুব ভালো লাগে। মনে হয় এই প্রত্যক্ষ জগতের অন্তরালে, কোথায় বুঝি কোনো গভীর রহস্যময় এক জগৎ আছে। যেখানে কারো উচ্চকণ্ঠের সাড়া ওঠে না, সবাই চুপি চুপি কথা বলে। জ্যোৎস্নাকে এমন নিথর হয়ে পড়ে থাকতে কখনো যেন দেখিনি পীযূষ। মনে হচ্ছে বুঝি একটা শান্ত জলাশয়।

গড়িয়াহাটের বাড়ির সেই বারান্দাতেও জ্যোৎস্না আসত, সুর এক ফালি আলোর ওড়না এনে বিছিয়ে পড়ত চিত্রবিচিত্র মোজাক মেঝের উপর, ভালো লাগত। কিন্তু বারান্দার ঠিক সামনা-সামনিই ছিল রাস্তার লাইটপোস্টটা। (অন্য ফ্লাটের বাসিন্দারা দেখে ঈর্ষা করত) সেই তড়া আলোর ঝলসানিতে জ্যোৎস্নার এই ছায়া ছায়া মায়া মায়া রূপটা খুঁজে পাওয়া যেত না লোডশেডিং অবস্থা ছাড়া।

কলকাতার আর কোথাও কি জ্যোৎস্না নেই। ময়দানে? ইডেন গার্ডেনে? লেকে? আছে বৈকি, প্রকৃতির একদেশদর্শিতা নেই। তার দানের পাত্র সে সর্বত্রই উপুড় করে ধরে। নেবার মন চাই। দেখার চোখ চাই।

পীযূষকান্তি বোসের কবে আর সে মন তৈরী হ'ল? কবে সে চোখ ছিল। তাকে ঝামাপুকুর থেকে গড়িয়াহাটে উঠে আসতে হয়েছে। তার জীবন হচ্ছে শুধু সেই পদক্ষেপ গোণা।

ভেবেছিল গড়িয়াহাটের ওই ফ্ল্যাটটাই তার লক্ষ্যমাত্র, সেটাকে যথোপযুক্ত সাজিয়ে তোলা, আর আধুনিক ভদ্র জীবনে যা যা থাকা দরকার সেগুলো আহরণ করার পর আর কিছু করণীয় থাকবে না তার। ঘুম থেকে উঠছি, সুন্দর বাথরুমে স্নান করছি, শৌখিন টেবিলে বসে রুচি পছন্দমতো খাচ্ছি, অফিসের গাড়িতে চড়ে অফিস যাচ্ছি, টিফিনের সময় রোজ একবার করে বাড়িতে অকারণ টেলিফোন করছি, বাড়ি ফিরে পুত্র কন্যা নিয়ে পারিবারিক সুখের মৌজে ডুবে সোনালী সুখের গল্প করছি। আবার রাত্রে টেবিলে এসে বসছি,

দিনে যেটা হয় না, সপরিবারে একসঙ্গে খেতে বসা, রাত্রে সে আনন্দটা উপভোগ করছি; তারপর কাকজ্যোৎস্নার মতো মৃদু আলোটি জ্বালিয়ে ডানলোপিলোর গদিতে শুয়ে পড়ছি। এর অধিক আর কী চাইবার আছে। কী থাকে পীযূষকান্তি বোস জানত না সেটা।

হঠাৎ ওই গাড়িটার প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছিল। যেটা ছকে ছিল না। কিন্তু সেটা বা এমন কি বেশী।

ওই ছন্দে গাঁথা দিনের মাঝখানে মাঝে মাঝে যেমন কিছু বই পড়া, কিছু ছবি দেখা, কিছু নাটক দেখা, কখনও কোথাও বেড়াতে যাওয়া, গাড়ির শখটাও এসেছিল তেমনি হালকা চালে।....

পীযূষকান্তি বোসের সেই ছন্দে গাঁথা স্বচ্ছন্দ জীবনের সামনে কোনো হিংস্র শব্দ ছিল না। শব্দটা নিয়ে এল পীযূষের বন্ধু।

সুধাময় প্রথম বিচলিত করিয়েছিল এই প্রশ্ন তুলে, মরা বাঁচার কথা তো বলা যায় না। পীযূষকান্তি বোস যদি হঠাৎ মারা যায়, তার স্ত্রী-পুত্রের ভবিষ্যৎ কী। পাঁচশো টাকা ভাড়ার এই ফ্ল্যাটটার মালিক কি এত দয়ালু যে বিনা ভাড়ায় থাকতে দেবে তাদের। নাকি এই তেল কোম্পানীর কর্মকর্তারা এত হৃদয়বান হবে, যে তার একজন ম্যানেজার মারা গেলেও সেই ম্যানেজারের সংসারটাকে ম্যানেজ করবার দায়িত্ব নেবে তারা।

প্রশ্নটা এল হাতুড়ির মতো!

পীযূষকান্তি বোসের সেই সুন্দর করে সাজানো জীবনছন্দটি হয়ে গেল তাতে।

আশ্চর্য! অথচ এখন আবার এটাকে ছন্দ মনে হচ্ছে। হঠাৎ হঠাৎ পীযূষকান্তি জ্যোৎস্না ঢালা মাঠকে নদী ভাবতে ভালবাসছে, দু' দণ্ড সেই নদীতীরে দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে ইচ্ছে করে ঢেউ উঠেছে কি না।

আজও একবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে দেখল। সারাদিন ধরে যে শব্দটা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে, সেই শব্দটা যেন হঠাৎ থেমে গেল, পীযূষকান্তি তার মোটা থামওয়ালা বাড়িটার কাছে চলে এল কেমন একটা ভালবাসার মন নিয়ে।

মনে হ'ল যেন একটা মন্দিরে ঢুকতে এল।

এখানে দরজায় কলিংবেল নেই। তাই বাড়ির কর্তার বাড়ি ফেরার ঘোষণাটা তীক্ষ্ণ মধুর সাড়া তুলল না। উঠোনের ঘেরা প্রাচীরের গায়ে যে দরজাটা, যাকে সদর দরজা বলা হয়, সেটাকে বাইরে থেকে খুলে ফেলা যায়। কাজেই কড়ানাড়া

দিয়েও সাড়া তোলার দরকার হয় না। একহাতে চাপা দিয়ে আর একহাতে একটা কড়া ধরে টানতেই ভিতরের ছিটকিনিটা পড়ে গেল, পীযূষকান্তি বোস নিজের বাড়িতে এসে ঢুকল।

অবশ্য এই ছিটকিনি পড়ার সামান্য সাড়াটুকুও ভিতরে গিয়ে পৌঁছল। কারণ উৎকর্ণ হয়েই ছিল কেউ। বেরিয়ে এল সে। পীযূষকান্তি একটু চমকে তাকাল।

মনে হ'ল তদের ঝামাপুকুরের বাড়ির রান্নাঘর থেকে যেন বেরিয়ে এল সুরমা। এই মনে হওয়ার কারণটা নির্ণয় করতে গিয়ে দেখল সুরমার শাড়ি পরার ধরণ। গড়িয়াহাটার ফ্ল্যাটে উঠে আসা পর্যন্ত শাড়ি পরার ধাঁচ বদলে ফেলেছিল সুরমা। আশেপাশের ফ্ল্যাটের মেয়েরা যেমন ঘুরিয়ে শাড়ি পরে ছবি ছবি হয়ে বেড়াত, সুরমাও সেটা চট করে রপ্ত করে ফেলেছিল।

সুরমা ক্রমশঃ বাংলা সিনেমা থেকে হিন্দি আর ইংরেজী সিনেমা দেখায় উৎসাহী হয়ে উঠেছিল, সুন্দর করে কথা বলতে শিখেছিল, অনেক শৌখিন রান্না শিখে ফেলেছিল।

নইলে পীযূষকান্তি বোস আগে কবে জেনেছিল 'কেক্' জিনিসটা বাড়িতে বানানো যায়, চপ ফ্রাই পুডিং কাস্টার্ড নিত্য খাদ্যের তালিকায় স্থান পায়?

সুরমার কর্মক্ষমতা আর তাড়াতাড়ি শিখে নেওয়ার ক্ষমতা পীযূষকান্তিকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে।.....

এখানে মানে এই মোটা থামওয়ালা বাড়িটায় আসার পর অবশ্য সুরমা আর তার সেই সৌখিন রান্নার পদগুলি দেখাতে পেরে উঠছে না, কারণ এখানে সুরমাকে নিত্য হাঁড়ি ঠেলার দায় পোহাতে হচ্ছে।

একাধারে ভৃত্য, পাচক, দারোয়ান পিয়ন ইত্যাদি করে সর্ব ভূমিকার শোভমান 'অলক' নামক তরুণটিকে বহু সাধ্য সাধনাতেও এখানে আসতে রাজী করাতে পারেনি সুরমা।

সে অনায়াস অবহেলায় বলেছিল, পাগল হয়েছেন মাসিমা? ওখানে কে যাবে? আমি ভাবছিলাম সাহেব গাড়ি কিনলে আমি ড্রাইভারের কাজটা নিয়ে নে, চালাতে শিখে ফেলতে ক'দিন? তা নয় সাহেব পচা পাড়াগাঁয়ে এক বাড়ি কিনে বাস করতে ছুটলেন। তারপর অবশ্য এ আশ্বাসও দিয়েছিল, সায়েবের ওই বিদঘুটে শখ দু'দিনেই মিটে যাবে, আবার এই বালিগঞ্জ এলাকাতেই ফিরে আসতে হবে। তখন অলকের খোঁজ করলেই চলে আসবে সে। মাসিমার স্নেহ-

যত্ন তো ভোলবার নয়। হয়তো কথাটা মিথ্যে স্তুতি নয়, তা অলকের কর্ম দক্ষতাও তো ভোলাবার নয়। প্রতিপদেই তার অভাব অনুভব করতে হয়।...মেয়েরা এবং মা সর্বদা সেই হা হুতাশ করে ঘোষণা করেন এই প্রচণ্ড লোকসানটা ও পীযূষকান্তির দুর্মতির ফল।

অলককে দেখে অন্য ফ্ল্যাটের সবাই হিংসে করত বুঝলে? অলককে রেখে পর্যন্ত একদিনের জন্যে এককাপ চা তৈরি করে খেতে হয়নি আমায়।...... অলক যা ফাইন ইস্ত্রী করতে পারত, লণ্ড্রিকে হার মানায়! সব হল-এ হাউস ফুল, অলক আমাদের তিন তিনখানা টিকিট যোগাড় করে দিয়েছে। অলকের গুণ বলে ফুরোবার নয়।

অথচ সেই নিধিটি সুরমার জীবন থেকে ফুরিয়ে গেল।

সুরমার শূন্য হৃদয় হাহাকার করবে না?

পীযূষকান্তি অবশ্য মনে মনে ভেবেছে, ফুরিয়ে গিয়ে ভালেই হয়েছে। হিসেবী হয়ে ওঠার পর থেকে হিসেব করে দেখেছে যে অলকের পিছনে মাসে অন্তত দু'শোখানি টাকা খরচ হ'ত। সত্তর টাকা মাইনেটা কিছু না, অলকের খাওয়া পরা বাবুয়ানী, অলকের দরাজ হাতের অবিরত অপচয়, অলকের বাজার দোকান করে এসে বাকি পয়সা ফেরত না দেওয়া, অলকের মাসে দু'তিনটে সিনেমা দেখার খরচ, উচ্চমানের সেলুনে চুল কাটার ব্যায়ভার সব মিলোলে, দুশোর বেশী বৈ কম হবে না।

তার ওপর আবার সুরমা অলককে পাড়াগাঁয়ে আঁনবার খেসারৎ স্বরূপ আরও দশটাকা মাইনে বেশী দিতেও প্রতিশ্রুত হচ্ছিল, অলকের পাষাণ হৃদয় গলাতে পারে নি।

একমাত্র টুটুই অলককে দু-চক্ষে দেখতে পারত না, মায়ের পুত্রাধিক প্রিয় এই মস্তান চাকরটি তার চক্ষুশূল ছিল। তাই সে রেগে রেগে বলেছিল, ওঃ পচা? পাড়াগাঁ! কোন্ দেশ থেকে এসেছেন আপনি। বিলেত থেকে? না আমেরিকা থেকে!

এই প্রশ্নে অলক শুধু উত্তর দিয়েছিল, যে দেশ থেকে এসেছি সেটাই যদি বজায় থাকবে, তবে মা বাপ ছেড়ে এসেছি কেন দাদাবাবু?

এর উত্তরের পরেই সুরমার হৃদয় বিদীর্ণ করে সামনের ফ্ল্যাটে কাজে লেগে গিয়েছিল অলক।

সুরমা ক্ষুব্ধ হয়ে সামনের গিন্নীকে বলেছিল, আর দুটো দিন আপনার সবুর

সইল না মিসেস ভাদুড়ি? বাসা বদলের সময় এই অসুবিধেয় ফেলে চলে গেল ও?

মিসেস ভাদুড়ি অমায়িক গলায় বললেন, আমি তো সেকথা হাজারবার বললাম ওকে মিসেস বোস, তা ও-ই জদে করে ঢুকল। বলল মাসের প্রথম—

সুরমা মিসেস ভাদুড়ির মুখের সামনে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

এই দরজাটি বন্ধ করা মানেই যে গড়িয়াহাটের ওই প্রিয় পরিচিত ফ্ল্যাটবাড়িটারই দরজাও জন্মের শোধ বন্ধ করে দেওয়া হল, সে কথা তখন মনে পড়েনি সুরমার।

নীলু মাঝে মাঝে বলে তুমি এমন কাজটি করে এলে মা যে ও পাড়ায় একবার বেড়াতে যাবার ইচ্ছে হলেও যাওয়া যায় না।

তবে বুলু ঠোঁট উল্টোয়, তোর আবার ও পাড়ায় বেড়াতে গিয়ে ওদের মুখ দেখতে ইচ্ছে করে? রাজ্যহারা রাজার ভূমিকায়? ওরা করুণা দৃষ্টিতে তাকাবে বলে? দুটো সহানুভূতির কথা বলবে বলে? বাবার দুর্মতি নিয়ে দুঃখ আর সমালোচনা করবে বলে?......সেদিন ছোটমাসির বাড়ি গিয়েই আমার বেড়াতে যাবার বাসনা মিটে গেছে।

এসব কথার কিছু কিছু যে পীযূষের কানে এসে আছড়ায় না তা নয়। অগ্রাহ্য করতে চেষ্টা করে সে, ভাবে তিলকে তাল করা মেয়েদের স্বভাব, তবু এক এক সময় অবাক হয় বৈকি। ভাবে একটা ফ্ল্যাটবাড়ির ভাড়া করা ফ্ল্যাট ছেড়ে নিজের বাড়ি করার পিছনে যে এত থাকতে পারে কে জানত!

কিন্তু আজ এই ছায়া ছায়া অন্ধকার দালানে সুরমাকে আটপৌরে ধাঁচে শাড়ি পরে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে পীযূষের মনটা মমতায় ভরে গেল, গভীর একটা অপরাধবোধ এল মনের মধ্যে।

এই সময় গড়িয়াহাটের বাড়ির সেই আলোকোজ্জ্বল বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে থাকত সুরমা ছবি ছবি হয়ে, তাতে হয়তো কোনো একটা পশম বোনা, হয়তো কোনো সেলাই। অলক ট্রে করে চা নিয়ে আসত।

সুরমা মিষ্টি হেসে বলত, অলকের হাতে চা খেয়ে, নিজের তৈরী চা খাওয়ার কথা আমার ভাবতেই ইচ্ছে করে না।

সেই সুরমাকে এখন—

কিন্তু আমি তো ওর ভবিষ্যৎ ভেবেই করেছি। আমি যদি হঠাৎ মারা যেতাম, কী হ'ত সুরমার? এখন আর আমার মরতে ভয় নেই। .....কেউ তো ওকে বাড়ি

থেকে তাড়িয়ে দিতে পারবে না? এ বাড়িটা না করে মরলে, সুরমাকে হয়তো আবার ঝামাপুকুরের বাড়ির সেই ঘরখানায় গিয়ে উঠতে হ'ত, যে ঘরটা আমি ছোট ভাইকে দান করে এসেছিলাম।

তার থেকে কী এটা খারাপ?

সুরমা, তুমি আকর বিচক্ষণতার ফল ভবিষ্যতে বুঝতে পারবে! যখন আমি থাকব না।

এসব কথা অবশ্য মনে মনেই বলে পীযূষ। মুখে এক আধবার বলতে গিয়ে ঝঙ্কার খেয়েছে। কে আগে মরবে, সেটা পীযূষ যমরাজের কাছ থেকে জেনে এসেছে কিনা, সেই কূট প্রশ্নটি করেছে সুরমা।

তাই পীযূষ মনে মনে বলল, কী ব্যাপার, হঠাৎ সাবেক কালের মতো সাজ করে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে—

পীযূষের কণ্ঠে ভালবাসা ছিল, মমতা ছিল, অন্তরঙ্গতার মাধুর্য ছিল, তবু সুরমার কাছ থেকে একটা বেজার গলার উত্তর এল, সাবেক কালের মতন যখন ঘুঁটে কয়লার ধোঁয়া খেয়ে উনুনে বাতাস ঠেঙিয়ে রান্নাই সার হ'ল তখন সেই সাজই ভালো।

পীযূষ শুনেছিল এখানে সুরমার সেই সিলিণ্ডার গ্যাসের উনুন জোড়াটা অকেজো হয়ে পড়ে আছে, গ্যাস সাপ্লাইয়ের অভাবে, কিছু তার জন্যে সুরমাকে যে সাজ বদলাতে হবে এমন কথা শোনেনি। কিন্তু শুধুই কি সাজবদল?

পীযূষের আজ ওই পাষাণ কঠিন মুখ ধাতবকণ্ঠে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে হ'ল পুরো মানুষটাই বদলে গেছে। সেই সুরমাকে বোধহয় আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।....... অথচ পীযূষ ভেবে এসেছে দাঁতে দাঁত চেপে তিন তিনটে বছর কাটিয়ে দিতে পারলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে!....... ধার শোধ হয়ে গেলে আর কী দায় থাকবে পীযূষকান্তি বোসের? ততদিন তো কর্মক্ষেত্রেও উন্নতির সীমারেখায় পৌছবে।

'ভবিষ্যৎ'কে বাঁধিয়ে ফেলে নিশ্চিন্তচিত্ত পীযূষকান্তি তখন আবার যত্র আয় তত্র ব্যয়ের উদার ভঙ্গিতে সংসার করবে, ছেলেমেয়েরা সব অভাব পূরণ করবে, সুরমাকে আরামের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করবে।

অলক ছাড়া অলকের মতো কোনো লোক পৃথিবীতে না জোটে, সেই অলককেই ধরে এনে দেবে সুরমার পায়ের কাছে। টাকায় কিনা হয়? সত্তরের জায়গায় একশো সত্তর পেলে সে দক্ষিণ দিকে এই বাড়টুকু বাড়াতে রাজী হবে

না? সব তুমি আবার ফিরে পাবে সুরমা, তার সঙ্গে রয়ে যাবে জমিদার বাড়ির মতো এই বাড়িটা। খোলামেলা এতখানি জমি।....কলকাতায় কি তুমি একছটাক জমিওয়ালা বাড়ি পেতে? ধর যদি তুমি একটা দশতলা বাড়ির একখানা ফ্ল্যাট কখনো কিনতে, পায়ের তলায় মাটি থাকত তোমার?

এসবই পীযূষ মনে মনে বলে, উচ্চারণ করে বলতে পায় না। সুরমা সেটুকু এগোতেই দেয় না!

আর ছেলে-মেয়েরা?

তারা তো 'সাপ' হয়ে বসে আছে!

তবু পীযূষই সেই দিনটার স্বপ্ন দেখছিল, যেদিন নাকি সব ঠিক হয়ে যাবে। আবার ওরা 'পান্না-চুনী-হীরে' হয়ে যাবে। এতদিন তাই ভেবে এসেছে।

আজই প্রথম পীযূষের মনে হ'ল সে খুব একটা ভুল করেছে, খুব একটা দোষ করেছে।

আস্তে বলল, বাড়িটা এত চুপচাপ যে? ওরা কেউ বাড়ি নেই?

সুরমার তীক্ষ্ণস্বর উচ্চকিত হয়ে উঠল। আকাশ থেকে পড়ছ যে! কবে আবার ওরা সন্ধ্যেবেলা বাড়ি বসে থাকে?

কথাটা বলে ফেলেই এর উত্তরের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল পীযূষ, তাই তাড়াতাড়ি বলল, আজ আর সন্ধে নেই, বেশ রাত হয়ে গেছে।

এর থেকে আরো অনেক রাত করে ফেরে ওরা!

সংক্ষেপে এই কথাটুকু বলে সুরমা ভিতরে চলে গেল, বোধহয় চা বানাতে।

পীযূষ বোকার মতো মুখে হাত দিয়ে মুখ ধুতে গেল।

সত্যি রোজই তো সে বাড়ি ফিরে একা একা চা খায়, একা বসে থাকে চুপচাপ, হয়তো সকালে না-পড়া খবরের কাগজখানা ওলটায়।

কতক্ষণ পরে যেন ফেরে ছেলেমেয়েরা একে একে। নীলু গোলপার্ক কালচার ইনস্টিটিউটে স্পোকন ইংলিশ শিখতে যায়। বুলু কলেজের পর কোন প্রফেসরের বাড়ি পড়তে যায়, তিনি যেদিন যতক্ষণ ইচ্ছে পড়ান। এতএব ফেরার স্থিরতা নেই। টুটুর কথা বাদ দাও, সে সোজা জবাব দিয়ে দিয়েছে, তোমাদের এই রাজা রাজড়াপুরের বাইরে যতক্ষণ থাকা যায় ততক্ষণই মঙ্গল। নেহাত না ফিরলে নয় তাই ফিরি।

চা নিয়ে এল সুরমা, সঙ্গে শৌখিন কিছু নয়, শুধু একটু চিঁড়ে ভাজা। পীযূষের নাকি আজকাল এইটাই সবচেয়ে ভালো লাগে।

শুনে বুলু মুখ বেঁকিয়ে হেসে বলেছিল, বাপীর আজকাল তেসটাটা খুব হাই হয়ে গেছে।

প্রতি কথাতেই তো এখন ওরা বাপকে না ঠুকে কথা বলে না, পীযূষ গায়ে মাখে না, পীযূষ শুধু আবার দিন ফেরার দিন গোণে।

সুরমা যখন চা-টা এগিয়ে দিল, পীযূষের চোখে পড়ল সুরমা আগের থেকে অনেক ময়লা হয়ে গেছে, সুরমার মুখের রেখায় এই একটা বছরেই যেন অনেকগুলো বছরের পদচিহ্ন।

কিন্তু পীযূষকান্তি বোস পয়সা খরচ করে শুধু দারিদ্র্যই কেনেনি, অনেকগুলো অধিকারও হারিয়েছে। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে মমতা প্রকাশের অধিকার। সুরমার কষ্ট দেখে সহানুভূতির মন নিয়ে কিছু বলতে গেলেই সুরমাও সাপ হয়ে যায়। সুরমা তীব্র ব্যঙ্গে ফোঁস করে ওঠে।

তাই মমতাকে বাক্সে বন্ধ করে পীযূষকান্তি শুধু বলল, তোমার চা?

আমার এখন কাজ রয়েছে, ওরা এলে খাব।

সুরমার কথাবার্তা আজকাল কী কাটাছাঁটা সংক্ষিপ্ত।

পীযূষ তবু ভুল করে বসে, যা প্রকাশের অধিকার হারিয়েছে তাই প্রকাশ করে বসে। বলে ফেলে—তা এক হাতে এতসব রুটি ফুটি না করে, ভাত রাঁধলেও তো হয়। মেয়েদের কাছে থেকে কোনো সাহায্য যখন পাচ্ছ না।

দাঁড়িয়ে একটু তীক্ষ্ণ হাসি হেসে বলে, ওইটুকু বাকি আছে।.....মেয়েদের এবার বলি, তোরা সব ঘুচিয়ে এঁদোপড়া রান্নাঘরে বসে মসলা পেশ। রুটি ব্যাল।

সুরমার উক্তিতে অবশ্য কিছু অত্যুক্তি আছে। রান্নাঘর মোটেই এঁদোপড়া নয়, ওদের আগের বাড়ির শোবার ঘরের মাপের একটা ঘর রান্নাঘর হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, কারণ বাড়িটায় ঘর আছে অনেকগুলো।

তাছাড়া কেনার পর অনেক টাকা খরচা করে বাড়িটাকে যতটা সম্ভব আধুনিক করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সুরমার আজকাল প্রায় সব কথাতেই অত্যুক্তিদোষ থাকে। সব সময়ই সয়ে যায় পীযূষকান্তি। কিন্তু আজ হঠাৎ একটা কথা বলে বসে। বলে, এই প্রাসাদের মতো বাড়ি, এ তোমার কাছে এঁদোপাড়া হ'ল।

প্রাসাদের মতো।

সুরমা তীক্ষ্ণ হাসি হেসে বলে, প্রাসাদের মতো বলেই বোধ হয় বরদাস্ত হচ্ছে

না, গরীবের মেয়ে তো! প্রাসাদের বদলে একটু মানুষের বাসযোগ্য জায়গায় দু'খানা ঘরের একখানা কুঁড়ে পেলেই বর্তে যেতাম।

এরপর আর কি বলতে পারে পীযুষ, আর কি বলবার আছে? মনের মধ্যে যে সব কথা ঝনঝনিয়ে বাজে, সে কথা কি বাইরে বলা যায়। বলা গেলে তো বলে উঠতেই পারত—সুরমা, তোমার স্বামীর যদি বদলীর চাকরি হ'ত? আর কাঁহাকাঁহা মুলুকে বদলী হতে হ'ত তাকে! তুমি যেতে না তার সঙ্গে? স্বামীর সঙ্গে তো সুন্দরবনেও যেতে হয় কত মেয়েকে, উড়িষ্যার জঙ্গলে। হিমালয় থেকে-সমুদ্রতীর পর্যন্ত যে কোনো জায়গায়। সেই সমস্ত জায়গা গড়িয়াহাটের মোড়ের মতো?

বলতে পারে না, তাই সুরমাই আবার বলে, রাত্রিতে ভাত! খাবে কি দিয়ে? মাছ যা আছে তাতে তো দু'বেলার প্রশ্নই ওঠে না। তুমি হয়েতো এখন সবই পারবে, শুধু শাক পাতা দিয়েই খেতে পারবে, ওদের পারতে সময় লাগবে।

যখন তখনই একথা বলে সুরমা, 'পারতে সময় লাগবে।'

শুনতে শুনতে হঠাৎ কোনো সময় বলে উঠতে ইচ্ছে করে পীযুষকান্তির, কিন্তু ঝামাপুকুরে সাবেকি বাড়ির প্যাটার্ণ থেকে বালিগঞ্জের ছাঁচে ঢালাই হতে তো 'সময় লাগেনি' তোমাদের।....

দুদিনে শাড়ি পরার স্টাইল বদলে ফেলতে পেরেছিলে, পেরেছিলে সর্বদা চটি পরে থাকতে, ব্লাউজের হাতা ছাটাই করতে।......যে তোমাকে সকাল বেলা স্নান করে তবে রান্নাঘরে ঢুকতে হ'ত, সেই তুমি কত চট করে বেড টী খেতে শিখে ফেলতে পেরেছিলে।.....

অনেক কিছুই তো বদলে ফেলেছিলে সুরমা চটপট। অবশ্য পীযূষকান্তিরও যে ওই বদলগুলো খুব খারাপ লাগত তা নয়, মাঝে মাঝে সাবেকি সেই সংসারটার জন্যে আর তার সদস্যদের জন্যে মন কেমন করলেও, মোটামুটি ভালোই লেগেছে।

আর ওই ভালো লাগাটার সঙ্গে সঙ্গেই অবাক লেগেছে সুরমার এই পটুতায়। সুরমাও তো ওই উত্তরেরই মেয়ে, যে উত্তরে না কি বাতাস বয় না।

বরানগরে বাপের বাড়ি সুরমার।

কিন্তু মা বাপ না থাকায় সে কথাটা কবেই ভুলে মেরে দিয়েছিল সুরমা। সুরমাকে দেখে মনে হত সে জন্মাবধি এই বালিগঞ্জের জীবনেই অভ্যস্ত।......এটা পারতে যদি তোমার একটুও 'সময়' না লেগে থাকে সুরমা

তাহলে আর একটারটি ওই পুরনো অভ্যাসের খাঁজে পা বসাতে এক সময় লাগার প্রশ্ন কেন? ঘুঁটে কয়লা কি তুমি এই রাজপুরে এসেই প্রথম দেখলে?

এসব কথা মনে এলেও মুখ ফুটে বলার সাহস হয় না পীযূষকান্তির। কারণ সংসারে পীযূষকান্তির ভূমিকা এখন কাঠগড়ার আসামীর। বিচারক পক্ষকে সওয়াল করবার অধিকার কোথায় তার।

সর্বস্বান্ত হয়ে এই অনধিকারীর ভূমিকাটি কিনেছে পীযূষকান্তি।

অতএব চুপচাপ সব মেনে নিয়েই চলে, এবং কেমন করে যেন ধীরে ধীরে নিজেকে সেই পুরনো অভ্যাসের খাঁজে বসিয়ে ফেলতে থাকে।

অসুবিধের মধ্যে—তখন এত অনটন ছিল না। একান্নবর্তী বড়ো সংসারে পীযূষকান্তিই ছিল 'কল্পতরু'। যখন যা কিছু বাড়তি খরচ পড়বে, সংসারের সবাই জানে, ওটা পীযূষকান্তির দায়। পীযূষকান্তি নিজেও তাই জানত।.....আর সুরমা ওই নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করলে—হেসে ঠাট্টা করে ব্যাপারটাকে লঘু করে ফেলেছে।

*   *   *   *

তখন পীযূষকান্তি সকাল হলেই থলি হাতে বাজারে ছুটত, মাঝে মাঝে ধুতি পরত। তবে গড়িয়াহাটের পাড়ায় আসার পর অবশ্য সুরমা আর ধুতি পরতে দেয়নি।

যদি বা পরেছে কদাচ, পাট করে লুঙ্গির মতো জড়িয়ে।

ওটাতে নাকি কিছুটা আভিজাত্য আছে! অবশ্য সিল্কের লুঙ্গি হলেই সব থেকে ভালো, ওতে আভিজাত্যও আছে, সুবিধেও আছে। কিন্তু ওটা কিছুতেই বরকে পরতে ধরাতে পারেনি সুরমা। ঘন গাঢ় রঙের সিল্কের লুঙ্গিগুলোয় কত সুবিধে তা বুঝিয়ে বুঝিয়ে হয়রান হয়েও না। নরম, হালকা ময়লা হওয়া বোঝা যায় না, কত সুবিধে দেখ—

সুবিধে!

ওটাইতো জীবনের মূলমন্ত্র। সুবিধের জন্য কত কীই করতে হয়; ছাড়তে ছাড়তে আর ধরতে ধরতেই জীবনের পথে এগিয়ে চলা।

তবে কিছু কিছু লোক এখনো আগেকার মতো বোকা আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরনো খুঁটি ধরে পুঁতে বসে থকতে চায়। পীযূকান্তিও এক হিসেবে বোকাই। অন্তত কোনো ক্ষেত্রে, যেমন ওই লুঙ্গি, কি যে এক কুসংস্কার। না কি

ওঁর মা বলতেন, ওইগুলো পরে বেড়ালে হিন্দুর ছেলে বলে মনে হয় না। কাছাখোলা বেটাছেলে তো নিন্দের কথা।

এইটা একটা আজীবন আঁকড়ে ধরে থাকবার মতো কথা হ'ল?

অথচ পীযূষকান্তি আছে তাই ধরে। বাড়িতে পায়জামাটাই চালু রেখেছে। যদিও এখন আর তাতে তেমন জৌলুস দেখা যায় না। ভাঁজভাঙা আধময়লা আরো এক সেকেলেপনা আছে, পীযূষকান্তির যা দেখে তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা হাসে। অফিস যাওয়া প্রাক্কালে একটা শূন্য দেওয়ালের দিকে মুখ করে কিছুক্ষণ চোখবুজে দাঁড়িয়ে থেকে তবে নামা। কারণটা কী? ঠাকুর দেবতার ছবি ফবিও নেই। ভাগ্যিস নেই। তাহলে ঘরের কী চেহারাই খুলত। একেবারে গাঁইয়া বাড়ীর মত লাগত।

কিন্তু নেই তো!

তবে?

বহু চেষ্টায় বুলু একদিন 'বাপাকে' পেড়ে ফেলে ওই তবের উত্তরটা আদায় করে ফেলেছিল। চোখ বুজে ধ্যানের মতো ভাবনার মধ্য দিয়ে নাকি পীযূষকান্তি তাদের সাবেকী বাড়ির ঠাকুর ঘরের দেওয়ালটা দেখতে পায়, যেখানে কালী-দুর্গা-নারায়ণের ছবি ঝোলানো আছে, আর তার নীচে পীযূষকান্তির মা, বাবা, দাদু, ঠাকুমার ছবি।

চোখ বুজলেই সে সব দেখতে পাও তুমি?

পাইই তো।

অফিস যাবার সময় ওই অত সবাইকে নমস্কার করে যাও?

নমস্কার নয় প্রণাম।

নমস্কার নয় প্রণাম!

হি হি হি।

এটা বুলুর কাছে হাসির খোরাক হয়েছিল।

নমস্কার নয় প্রণাম! এমন সিরিয়াস মুখ করে বলল বাপী।

উঃ!

ও বাড়িতে বড়োদের সম্বন্ধে 'করলেন বললেন' বলার নিয়ম ছিল, বুলুরা সেই সেকেলে নিয়মটা ভেঙেছে। ওদের মতো ওটায় নাকি পর পর লাগে। বাপীকে মাকে কি আমরা আপনি বলি? তাই করেছেন খেয়েছেন বলেছেন এই সব বলব?

এই যুক্তির দ্বারা ও ওর দাদা দিদির অভ্যাসও ভালো করে ফেলেছি। অতএব বুলু এঘরে এসে গড়িয়ে পড়ে বলেছিল। এমন সিরিয়াস মুখ করে বলল বাপী।

এতে সুরমা একটু বকেছিল, তা ও কথা নিয়ে এত হাসির কী আছে?

বুলু আরো হেসেছিল, কথার জন্যে নয়, বাপীর বলার ভঙ্গী দেখে। উঃ! বাপীকে না কোনো কিছুতে 'সিরিয়াস' দেখলে এত হাসি পায়!

সুরমা বলেছিল, আচ্ছা থাম্। ওর সামনে গিয়ে যেন হি হি করতে যাসনে।

তা তখন তো সুরমাকে পীযূষকান্তি এই জঙ্গলে এনে ফেলেনি। তখন সুরমা কোনো কোনো বিষয় ক্ষ্যামা ঘেন্না করত পীযূষকান্তিকে মমতা বসতই করত।.....এখন সুরমার অ্যাটিটিউডও আলাদা।

সুরমা নিজের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে চলে যায়, পীযূষ চুপচাপ বসে থাকে টেবিলের ধারে।

ঢাকা দালানের মাঝামাঝি একটা জায়গায় খাবার টেবিলটা পাতা হয়েছে, তাকে ঘিরে খান পাঁচ ছয় চেয়ার, সুন্দর সুদৃশ্য, কিন্তু এই টানা লম্বা দালানের পটভূমিতে কী অকিঞ্চিৎকর লাগছে দৃশ্যটা।.....টেবিলটাকেই ও বাড়িতে কত বড়োসড়ো মনে হ'ত।

দালানটার জায়গায় জায়গায় এক একটা লাইট ঝোলানো হয়েছে, তবু সবটা আলোকিত করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাই খানিকটা খানিকটা ছায়া ছায়া।

এই ছায়া ছায়া দালানে একা বসে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যায় পীযূষের।

টেবিলটা কেনা পর্যন্ত ফুলটুসিদের আর কোনদিন আসতে বা থাকতে বলা যায়নি। কি করে বলা যাবে? ফুলটুসি মানেই তো তার ছয় ছেলেমেয়ে, প্লাস বর। সর্বসাকুল্যে আটজন. টেবিলে ধরানো যায় না। এসে দু'দিন থাক বলাই বা যায় কোন্ সাহসে? জায়গা কোথায়? ফ্ল্যাট বাড়ির কারবার নিক্তিমাপা।

অথচ কি ভালোই বাসত ফুলটুসি রাঙাদাদের বাড়িতে আসতে! ঝামাপুকুরের বাড়িতে কত এসেছে, থেকেছে। মামাতো বোন হলেও নিজের বোনের মতো, ছেলেবেলাটা তো প্রায় ওই বাড়িতেই কেটেছে তার। পীযূষের মা বেঁচে থাকতে মা-মরা ভাইঝিটাকে অধিকাংশ সময় নিজের কাছেই এনে রাখতেন। ফুলটুসি জানত তার দাদার বাড়ি।

তবু অধিক প্রত্যাশাটা ছিল তার রাঙাদার কাছে। কারণ বরাবরই অন্য

ভাইয়ের থেকে পীযূষকান্তির উপার্জন বেশী। অতএব বোনেদের আনা নেওয়ার ব্যাপারে তার অবদানই বেশী, বিশেষ করে ফুলটুসি একটু বিশেষ প্রিয় ছিল। বিয়ের পর থেকে শুধু বরটিকে নিয়ে এবং একে একে ক্রমশ ছ'ছ'টি শাবককে নিয়ে অবলীলায় চলে এসেছে সে অদ্ভুত খোলামেলা মেয়ে। অদ্ভুত সরল।

এসেই সব ক'টা ছেলেমেয়েকে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে হি হি করে বেড়িয়েছে, তাস খেলেছে, থিয়েটার দেখতে যাবার ধুয়ো তুলে বাড়ির দু'চার জনকেও অন্তত টেনে বার করে চলে গিয়েছে থিয়েটার দেখতে, রাত্রে এক একজন বৌদির ঘরে দু'একটা ছেলেমেয়েকে চালান করে দিয়ে নিজে যেখানে সেখানে শুয়ে পড়েছে। বরকেও বলত শালাদের রান্না-ভাঁড়ার ঘরের আনাচে কানাচে কোথাও একটু জায়গা জুটিয়ে শুয়ে পড় না। এই রাত্তিরে কেন আর ট্রাম বাস ঠেলে বাড়ি যাবে?

বর অবশ্যি থাকত না।

হেসে একটু ঠাট্টার জবাব দিয়ে চলেই যেত। বলত দু' একটা রাত শান্তিতে ঘুমিয়ে বাঁচি।

ফুলটুসি বরকে অকৃতজ্ঞ বলে গাল পাড়ত বৌদিদের শুনিয়ে শুনিয়ে। আর ফিরে যাবার সময় বলে যেত, রাঙাদা তুমি মনে করে আন তাই, না হ'লে আর আসা হ'ত? ও আনত নাকি?

কিন্তু রাঙাদা তো নিজের আনন্দেই আনত। ফুলটুসি যে দুটো চারটে দিন থাকত, বাড়িটা তখন খুশির হাওয়ায় ঝলমল করত।

গড়িয়াহাটের ফ্ল্যাটে চলে আসার পর পরিস্থিতির বদল হ'ল।

এ ফ্ল্যাটে তো আর ঝামাপুকুরের বাড়ির মতো মাটিতে ঢালা বিছানা পেতে শোয়ার কথা ভাব যায় না, আসার সঙ্গে সঙ্গেই জনে জনে খাট কিনতে হয়েছে, ঠিক মাপে মাপে—টেবিলও মাপা। বড়োজোর একজন অতিথিকে ধরানো যায়। এতএব ছ-ছটা শাবক সম্বলিত বোন -ভগ্নিপতিকে ডেকে এনে 'খাও শোও' বলে আপ্যায়ন করার কথা ভাবা যায় না।

তাছাড়া সে আহ্লাদ করতে চাইলেই বা সুরমা রাজী হবে কেন? পুরনো বাড়িতে সে ছোট বৌ, মাথার-ওপর তিন তিনটে জা, সংসারে কে এল গেল তার দায়িত্ব সুরমার নয়। সুরমার বরই বেশী খরচপত্র করে, অতএব দায়িত্ব আরো হ্রাস।

নিজের ছেলেমেয়ের সঙ্গে আরো একটা বাড়তিকে মশারির মধ্যে নিতে

সম্মত হওয়াই তার পক্ষে যথেষ্ট উদারতা। সেইটুকু সে করেছে। অথবা ফুলটুসির ঢালাও আবদারে হতে বাধ্য হয়েছে।

কিন্তু এই ফ্ল্যাটবাড়িতে সে উদারতার প্রশ্ন ওঠে না। তিন ছেলেমেয়ের তিনটে সিঙ্গল খাট, নিজেদের মাপাজোপা ডবলবেড। এর মধ্যে কি আর একটা আলপিনও ঢোকানো যায়?

এক আধদিন ওদের খেতে বললেও হয়, প্রথম প্রথম এ ইচ্ছে প্রকাশ করতেও চেষ্টাটা করেছিল পীযূষ, কিন্তু কোথায় খেতে দেওয়া হবে অতগুলো লোককে, এই প্রশ্ন সে ইচ্ছে স্থগিত রাখতে হয়েছে পীযূষকে টেবিলের নীচে এমন জায়গা নেই যে আসনপীড়ি পাতা যায়। গেলেও সেটা দেখতে কী অড্ ভেবে দেখতে বলেছিল সুরমা, পীযূষ ভেবে দেখে চুপ করে গেছে।

এ পাশের দেওয়ালে আলোটা ঝুলছে!

ও দেওয়ালের গায়ে একটা ছায়া পড়েছে। চেয়ারে বসা পীযূষকান্তির পুরো অবয়বের।—সেই ছায়ায় পীযূষের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে নিরুচ্চারে বলে চলে পীযূষকান্তি, তার মানে—পয়সা দিয়ে দারিদ্র্য তুমি আজকেই কেনোনি হে পীযূষকান্তি বোস। অনেক দিন আগেই কিনেছ। তোমার কিছু অভাবের জন্যই তো তুমি তোমার প্রাণের খুব গভীরের ইচ্ছাটিকে পূরণ করতে পারনি; বল? আর সেই 'অভাব'টি তুমি পয়সা দিয়ে কিনেছিলে। 'অভাব' মানেই তো 'দারিদ্র্য' তাই নয় কি?

তুমি তোমার সেই অদৃশ্য দারিদ্র্যের ভারে পীড়িত মনটা নিয়ে তোমার একান্ত স্নেহের পাত্র সেই আহ্লাদী ছোট বোনটার ছেলেমেয়ের নাম করে অনেক খাবার-দাবার কিনে নিয়ে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছ বোকাটে হাসি হেসে, আর তোমার বোন যখন হৈ চৈ করে আহ্লাদের ঢেউ তুলে বরকে ডেকে ঝঙ্কার দিয়ে, দেখছ আমার ভাইয়ের টান? আর তুমি এমন আলসে কুঁড়ে যে বলে বলে হদ্দ হলাম, একবার রাঙাদার নতুন সংসারটা দেখিয়ে আন, তা আর এ পর্যন্ত পেরে উঠলে না, তখন তুমি বলে উঠতে পারনি, ঠিক আছে, পরের ছেলের খোসামোদের দরকার নেই, আমিই নিয়ে যাচ্ছি চল।

না, তা তুমি বলতে পারনি পীযূষকান্তি বোস। প্রায় মুখের বাইরে আসা কথাকে ফের গলার মধ্যে চালান করে ফেলে, তুমি ঘটা করে পুরুষের কর্মজীবনের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে তোমার ছোট-বোনকে অবহিত করতে বসেছ।

অর্থাৎ তুমি তার বরের সমর্থনেই যুক্তি খাড়া করে। এটা ওটা সেটা......নানা প্রসঙ্গ তুলে ওই রাঙাদার নতুন সংসারের প্রসঙ্গটা ভুলিয়ে দিতে চেষ্টা করছে।

নিজেকে কি তখন তোমার খুব গরীব গরীব দীনহীন মনে হয়নি পীযূষবাবু? তেল অফিসের হোমরা চোমরা বোস সাহেব।

শুধু জায়গার অভাবেই নয় পীযূষ, তোমার তখন সাহসেও অভাব। ঝামাপুকুরের সংসারে তুমি দুম করে একটা ভার চাপিয়ে দিতে পারতে, অসময়ে একরাশ তপসে মাছ কি একগাদা চিঙড়ি কিংবা ইলিশের জোড়া এনে নামিয়ে দিয়ে ঘোষণা করতে পারতে—ফুলটুসিদের বলে এলাম।

বলতে তোমার বুক কাঁপত না। কিন্তু গড়িয়াহাটে এসে তোমার বুকের সেই বল কমে গিয়েছিল। কারণ এখানে তোমার কোনো পৃষ্ঠবল নেই! ওখানে তিনবৌদি উদরতায় টেক্কা দিতে তোমার সহায় হয়েছে, তোমার আনা মাছ দেখে ধন্যি ধন্যি করেছে। কারণ তুমি তো সকলের জন্যেই এনেছ। বাড়িতে উপছে পড়া মাপে। এখানে সব ব্যাপারেই তুমি সুরমার প্রজা হয়ে পড়েছিল। রাজার ইচ্ছেই সব। এটাও তো তোমার পয়সা দিয়ে কেনা পীযূষ।...আবার পরে ক্রমশ তুমি যখন জানতে পেরেছ ফুলটুসির ঝামাপুকুরের দাদারা ফুলটুসির ভাইয়ের বাড়ি নেমন্তন্ন আসা বজায় রেখেছে, তখনও কি তোমার নিজেকে একটা অভাবী অভাবী পরাজিত পরাজিত মনে হয়নি? হয়তো ফুলটুসির প্রকৃতিগুণেই ওই বজায়টা থেকেছে। তবু থেকেছে তো?

আর সুরমা যখন হেসে হেসে বলেছে, তোমার মেজদাদার বাজার করা তো? বোন-ভগ্নিপতির ভাগ্যে কুচো চিঙড়ির চচ্চড়ি আর চারাপোনার ঝোলের উর্ধ্বে আর কিছু জোটে বলে মনে হয় না, তখন যে তুমি তার একটা উচিতমতো উত্তর দিয়ে উঠতে পারনি, সেটাই বা কী? দারিদ্র্য নয়?

তারপর অবশ্য ক্রমশঃ নিজেই তুমি মুক্ত পুরুষ হয়ে গেছ, তোমার নিখিল বিশ্ব একটি কেন্দ্রবিন্দুতে এসে ঠেকেছে। তাই যখন শুনেছ তোমার বড়দা রিটায়ার করে অবধি খুব অসুবিধেয় রয়েছেন, কারণ ঠিক তখনই তাঁর ছেলেদের পরীক্ষার ফী আর মেয়ের বিয়ের সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, তখন তুমি ভয়ে ঝামাপুকুরের ছায়া মাড়াতেঁ যাওনি। যেহেতু তুমি তখন তোমার ওই সুন্দর ফ্রীজটা কিনে বসেছ ইনস্টলমেন্টে।

তা ইনস্টলমেন্টে তো তুমি অনেক কিছুই কিনেছ পীযূষ বোস। তাই না? ওই রেকর্ড চেঞ্জারটা, ছোটমেয়ের হারমোনিয়ামটা, গিন্নীর শখের টেবিল কলটা

(যেটা পরে আর ছুঁয়েও দেখা হয়নি, দরকারী সব কিছু দরজির কাছে অর্ডার গেছে, মায় বালিশের ওয়াড় লেপের ওয়াড় পর্যন্ত) সোফা সেটগুলো, এমন কি তোমার নিজের শখের ডানলোপিলোর গদিটা পর্যন্ত।......ইনস্টলমেন্ট মানে কী? ধারে কেনা বললে ভুল হয়? ধারই তো, মাসে মাসে কি দ্বৈমাসিক ত্রৈমাসিক হারে তুমি সে ধার শোধ করেছ।—সত্যি বটে তাতে তোমার এখনকার মতো সব কিছুতে টান পড়েনি, তুমি দাঁড় বেয়ে নৌকা চালানোর মতো এগিয়ে গিয়েছে তরতরিয়ে।—এখন সেটা হচ্ছে না, কারণ এখন ধারের বোঝাটা অনেক বেশী। কিন্তু তার আরও একটা কারণ তুমি চাইছ যত তাড়াতাড়ি পারা যায় সেই বোঝাটা হালকা করে ফেলে, আবার নৌকাকে তরতরিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

অথচ এখন যখন তোমার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা তোমায় ধিক্কার দিচ্ছে পয়সা দিয়ে দারিদ্র্য কিনছ বলে, তুমি আত্মধিক্কারে ম্লান হচ্ছ। এই আত্মধিক্কারটা তোমার ঝামাপুকুরের ছায়া মাড়ানো বন্ধ হওয়ায় হয়নি। তার মানে—তুমি ততদিনে রীতিমতো গরীব হয়ে গেছ।

ছায়াটা হঠাৎ নড়ে উঠল।

পীযূষকান্তি চমকে উঠল।

তারপর টের পেল সে নিজেই নড়ে উঠেছে। উঠে দাঁড়িয়েছে। ছায়াটাকে উদ্দেশ্য করে বলল, ওঃ তোমার ছেলেকে তুমি বাড়িতে ঢুকতে দেখলে তাই নড়ে উঠলে।

কী আশ্চর্য, নড়ে ওঠে তুমি আবার বসে পড়লে কেন পীযূষ বোস? ছেলেকে সম্ভাষণ করতে ছুটলে না? নিদেন পক্ষে রাত করে ফেরার জন্য বকতে?—

পীযূষকান্তি আবার ছায়াটার উদ্দেশ্যে কথা বলল, বুঝেছি, ছুটে গিয়ে সম্ভাষণ করবে, এমন উছলে ওঠা পিতৃস্নেহ তোমার মধ্যে আর নেই, আবার দেরীর জন্যে বকতে যাবে, অভিভাবক জনোচিত সে সাহসও আর নেই। জান বকতে গেলেই তার থেকে অনেক বেশী কঠিন কথা তোমায় শুনতে হবে।

অতএব চুপ করে বসে শোন ওরা মায়ে ছেলেয় কী কথা বলছে।

ছেলে বলল, কী ব্যাপার জননী। এমন অশোকবনে সীতার মতো মুখ নিয়ে একা বসে যে?

টুটুর অবশ্য এটা নতুন নয়, বরাবরই ওর কথা বলার ধরন এই রকম। সুরমা বলেছে স্কুলের ছেলেদের কাছ থেকে শিখেছে।

নীলু বলেছে ইস্কুল সুদ্ধ ছেলে তোমার ছেলের কাছ থেকে শিখতে পারে মা। ইয়ার নম্বর ওয়ান তোমার ছেলেটি।

মা এখন বিরক্ত গলায় বলে, মায়ের সঙ্গে ঠাট্টার সম্পর্ক না?

টুটু বলে উঠল, গডেস কালীর দিব্যি মা, ঠাট্টা করিনি, তোমায় দেখেই আমার ওই ছবিটার কথা মনে এল। তবে একটা জিনিসের অভাব দেখছি। চেড়ি দুটি কোথায়? এখনো চরে ফেরেননি। নাকি?

মা আরো বেজায় গলায় বলে, তুই আর বাকতাল্লা মারিসনে। নিজে আজ সকাল সকাল ফিরেছিস বলে তাই—

আমার সঙ্গে তুলনা কেন জননী? আমি যদি হোলনাইট মাঠে চরে বেড়াই, ভাবনার কিছু নাই। কিন্তু তারা হচ্ছেন মহিলা। কেস আলাদা।

পীযূষকান্তির ছায়াটা দাঁড়িয়ে উঠল, তারপর দেয়ালের গা, দরজার কপাট সব বেয়ে এঘরে চলে এল। বলে উঠল, সেই কথাটাই তোমায় মনে করাতে আসছিলাম সুরমা! মেয়েরা যে মেয়ে সেটা তোমার ওদেরকে বোঝানো উচিত।

সুরমা হঠাৎ স্বামীর এই আকস্মিক আবির্ভাবে চমকে উঠেই সামলে গিয়ে কটু গলায় বলে, শুধু আমি বোঝালেই তো হবে না। ট্রাম-বাসদেরও বুঝতে হবে এরা মেয়ে, এদের দুঘণ্টার পথ আধঘণ্টায় পার করে দিই। গোলপার্ক থেকে তোমার এই সুখের স্বর্গে এসে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগে নিজেই হিসেব কর।

পীযূষ বাইরের দিকে তাকায়, ঝিমঝিম করছে রাত। রাস্তা নিশ্চয় জনবিরল। বাস থেকে নেমে সাত-আট মিনিটও তো হাঁটতে হবে। সেই দুটো তরুণী মেয়ে কোন সাহসে এরকম যথেচ্ছ রাত করছে?

গম্ভীর গলায় বলে পীযূষ, সেই হিসেবটা করেই গোলপার্ক ছাড়া উচিত।

কিন্তু সুরমা এই গম্ভীর গলার ধার ধারবে নাকি।

সুরমা কি কোনদিন সেই ভয়ের শিক্ষা পেয়েছে? পীযূষকান্তি বোস নামের লোকটা কি এযাবৎকাল পত্নীবৎসল স্বামীর ভূমিকাটি কত নিপুণ হতে পারে তার পরকাষ্ঠা দেখিয়ে আসেনি?

তবে?

তবে সুরমা কেন ঠোঁট বাঁকিয়ে বলবে না, ওঃ হিসেব! তো—সে হিসেব

কথতে হলে তো সবই ছাড়তে হয় ওদের। গান বাজনা লেখাপড়া কিছুই আর করে কাজ নেই, ঘরে বসে থাকুক। দুটো বরং গরু কিনে ফেল, মেয়েরা গো সেবার পুণ্য অর্জন করুক, সময় অন্তর ঘুটে টুটে দিক।

তাই বলছি আমি?

সুরমা বলল, বলনি, বলতে কতক্ষণ? নীলুর সাতটা অবধি ক্লাস বুলুর মাস্টার রাত অবধি পড়ান, জান না তুমি?

টুটু বলে ওঠে, মাগো জননী, ফাদার যা যা জানতেন, তা কি আর এখন মনে আছে ওনার? কিন্তু রসনা সংবরণ কর জননী, সিস্টাররা এলেন বলে মনে হচ্ছে। এসেই যদি শোনেন ওনাদের ক্রিটিসিজম হচ্ছে, খেপচুরিয়াস হয়ে যাবেন।

পীযূষকান্তি, এখন তুমি চেঁচিয়ে উঠে বলবে কিনা, নাঃ কারুর ক্রিটিসিজম করা চলবে না, শুধু যথেচ্ছ ক্রিটিসিজম চালিয়ে যাবে পীযূষকান্তি বোস। যেহেতু সে তার স্ত্রী পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবতে চেষ্টা করেছে।

ভুল করা হয়েছে।

ভারী ভুল করা হয়ে গেছে হে পীযূষকান্তি, এ ভুলের প্রতিকার করা যায় কিনা ভাব।

খুব যেন একটা মজার পদ্ধতি আবিস্কার করে ফেলেছে পীযূষকান্তি। ছায়ার সঙ্গে বাক্যালাপ। যা মনে আসছে বলা যাচ্ছে তর্জনী তুলে তুলে।

বাক্যালাপ স্থগিত রাখতে হ'ল।

বুলু পায়ের চটিটা দালানের এক ধারে, প্রায় ছুঁড়ে ফেলে বাড়িতে পরবার রবারের চটিটা পায়ে গলিয়ে হাতের বইগুলো একটা জানলার ধারের বেদীতে নামিয়ে রেখে ডাক দিল, মা।

এ বাড়ির দেওয়াল এত চওড়া যে জানালার বেদীগুলো টেবিলের কাজ করে।

ডাক শুনে মা বেরিয়ে এসে মাতৃস্নেহকোমল গলায় বলে উঠলেন, বুলু এলি?

এই মেয়েটি দুর্বাসা, তাই এর সঙ্গে কথোপকথনে সুরমা সর্বদাই স্নেহকোমল। কে বলবে এই কণ্ঠই ক্ষণপূর্বে নিদারুণ কঠোর হয়ে উঠেছিল।

বুলু এ স্নেহের মূল্য দিল না, যেন প্রতিশোধের গলায় উচ্চারণ করল একটু চা পাওয়া যাবে?

সুরমার আরো তোয়াজী গলা, ওমা, মেয়ের কথা শোন [illegible]
এলি, একটু চা পাবি না।

টুটু এতক্ষণ দালানের একধারে শূন্যে হাত ছুঁড়ে ব্যায়ামের ভঙ্গী করছিল, সেখান থেকেই উল্লসিত গলায় বলে ওঠে, মাইরি সিস্টার এই জন্যেই তোকে এত সেলাম ঠুকি। আমি তো সেই থেকে ভাবছি জননীর যদি একটু কৃপা হয়—

সুরমা চড়া গলায় বলে ওঠে, ওঃ কৃপার অপেক্ষায় বসেছিলে? মুখ ফুটে বলতে কী হয়েছিল? আমি জানি চা কফির দোকানেই আড্ডা তোমাদের।

টুটু আক্ষেপের গলায় বলে, ওঃ মাদার, সে দিন আর নেই হ্যায়। পকেট তো অলওয়েজ গড়ের মাঠ। মুখ ফুটে বলব কি, বলতে গেলেই যে হৃদয়ে বিবেকের কাঁটা ফোটে। হেলপার বলতে তোমার সেই গণেশের মা, কী কাজ করে গড জানে। তুমি তো স্বয়ং সারাদিন কী বলে ওই চণ্ডী সেলাই জুতো পাঠ সব চালিয়ে যাচ্ছ। তার ওপর আবার—

চণ্ডী সেলাই, জুতো পাঠ। টুটু তুই আর বাংলা বলতে আসিসনে।

সুরমা চড়া গলায় বলে তবু ভালো যে একজনেরও আমার অবস্থাটা নজরে পড়ে।

বুলু গম্ভীর গলায় বলে, নজরে সকলেরই পড়ে মা। তবে করবার কি আছে বল? স্বয়ং মালিকই যখন এই ব্যবস্থা বহাল করেছেন। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম ব্যাপারটা এ বাড়ির কর্তা যেমন দেখালেন, তেমন কম লোকই দেখাতে পারে।

নীলুও বুলুর সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকেছে, সে তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে এগিয়ে গিয়ে রান্নাঘর থেকে মাকে সরিয়ে চায়ের জল চাপিয়ে দিয়েছিল, বুলুর কথায় রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বিরক্ত গলায় বলে, তোর কথাটথাগুলো দিন দিন এত খারাপ হয়ে যাচ্ছে বুলু, যা মুখে আসে বললেই হ'ল?

বুলু ব্যঙ্গের গলায় বলে, তোমার মতো মহিমাময়ী হতে পারছি না দিদি, দুঃখিত। তবে বেশীদিন তোদের ভুগতে হবে না আমায় নিয়ে ; নিজের ব্যবস্থা আমি নিজেই করে নিচ্ছি শীগগির।

ওঃ সিস্টার, ব্রেভো!....টুটু বলে ওঠে, খুব শাঁসালো একখানা প্রেমিক ট্রেমিক জুটিয়ে ফেলেছিস বুঝি? মাইরি সকলের থেকে কনিষ্ঠ হয়েও তুই সকলের গুরু হয়ে গেলি।

টুটু বুলু খুব কাছাকাছি পিঠোপিঠি, বুলু কোনোদিন দাদা বলে না টুটুকে ছেলেবেলা থেকে দু'জনের ভাবও যত, খুনসুড়িও তত, কিন্তু বর্তমানের

পরিস্থিতি সেই হাল্কা খুনসুড়িকে প্রায় তিক্ততার পর্যায়ে তুলেছে। যদিও সেটা তোলে বুলুই।

এখনও বুলু কড়া গলায় বলে, ছোটলোকের মত কথা বলিস না, আমি একটা চাকরীর ব্যবস্থা করে ফেলেছি, এবং একটা মেয়ে হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থাও করে নিচ্ছি।

অ্যাঁ! একদিনে এতখানি! জননী, এই মেয়েকে তুমি মাথায় নিয়ে নাচছ না? দে মাইরি, পায়ের ধুলো দে। হোক কনিষ্ঠ তোর পদধূলি এখন গুরুর পদধূলি।

টুটু! বড্ড বাড় বেড়েছিস। বলল বুলু।

পীযূষকান্তি যেখানে বসেছিল, সেখানে একটা পিলারের ছায়া, ওরা জানে না বাবা এখানে বসে। পীযূষকান্তি সাড়া দিচ্ছে না। না, আড়ি পাতবার জন্যে নয়, পীযূষকান্তি কেমন আচ্ছন্ন হয়ে বসেছিল।

পীযূষকান্তি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছিল এরা আমার ছেলে মেয়ে? কিন্তু কোন ভাষায় কথা কইছে এরা? এ ভাষা কি আগে জানত?

এখন পীযূষকান্তি নিজের ছায়াকে বলল, নিজে যে তুমি কত কম জানতে এখন টের পাচ্ছ পীযূষকান্তি?

বুলুর কথা শেষ না হতেই সুরমা চেঁচিয়ে উঠল, বুলু কী বলছিস কী? হোস্টেল মানে?

হোস্টেল মানে হোস্টেল। বুলু অব্‌হেলা ভরে বলে, ভাবনার কিছু নেই। সম্পূর্ণ 'মহিলা নিবাস'। গার্জেনের শাসনের মতোই। আইনের কড়াকড়ি; রাত দশটার পর বাইরে থাকা বেআইনি। অতএব নির্ভয় হতে পারে।

সুরমা ব্যাকুল গলায় বলে, তবে আর তোমার স্বাধীনতারই বা কী হ'ল, যে বাড়ি ছেড়ে বাইরে থাকতে যাবে?

বুলু কাটা কাটা গলায় বলল, 'বাড়ি ছেড়ে বাইরে' বললে ঠিক হ'য় না মা, বলা উচিত জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে।

টুটু লাফিয়ে ওঠে এই, এইটা যা বলেছিস গুরুদেব, বাঁধিয়ে রাখার মতো কথা। এক মিনিটে কোথায় চাকরী জোটালি? আর এক আধটা পড়ে নেই?

নীলু এখন ট্রে সাজিয়ে চা এনে সামনে নামায়, বলে বাজে কথা শুনিস কেন টুটু, চাকরী পেয়ে গেছে। হুঁ, চাকরী অমনি গাছের ফল।

বুলু তীক্ষ্ণ গলায় বলে, যা জান না দিদি, তা নিয়ে কথা বলতে এস না।

নীলু শক্ত গলায় বলে, বাজে কথা বলতে এলেই আমি কতা বলব। চাকরী

তোমার এখন আকাশে। শুধু একটু আশ্বাস পেয়েই হোস্টেলে সিট দেখতে গিয়েছিলে, আমার কাছে লুকোতে এস না।

তাই বল।

সুরমা স্বস্তির গলায় বলে, বাবাঃ! বলে কিনা, একেবারে ঠিক করে এসেছি! ভয়ে আমার বুক কেঁপে গেছে। ওসব চিন্তা ছাড় বাবা!

বুলু তেমনি কাটা গলায় বলে, আমার পক্ষে এই জঙ্গলে পড়ে থাকা অসম্ভব।

সুরমা কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, একা তোর পক্ষেই অসম্ভব? আমার কথা ভেবে দেখেছিস? তোরা তো বেরোতে পাচ্ছিস, আর আমি? আমি সারাদিন তোদের বাপের এই শখের প্রাসাদ আগলাচ্ছি আর রন্ধনের বন্ধনে আটকে পড়ে আছি—

কি করা যাবে বল।

বুলু উদাস ভঙ্গিতে বলে, তোমার মালিক তোমায় যেভাবে রাখবেন, তুমি সেইভাবে থাকতে বাধ্য।

থাম বুলু, মালিক মালিক করিসনে। মাঝে মাঝে মনে হয়, পূর্ব জন্মের কোনো শত্রুতা ছিল ওর আমার সঙ্গে।

পীযূষকান্তি তার ছায়াকে বলল, কীহে, তুমি উঠবে না? তোমার যা বলবার বলবে না?

তারপর ছায়াটা উঠে এল।

বলল, কোন জন্মের শত্রুতা কোন জন্মে শোধ হয় বলা শক্ত। হয়তো তাই। তবে আমি তোমার ভবিষ্যতের কথা ভেবেই এটা করেছিলাম। হ্যাঁ, তোমাদের কথা ভেবেই—

পীযূষকান্তি যে এই লম্বা দালানেরই একাংশে কোথাও বসেছিল তা কেউ বুঝতে পারেনি, তাই ওর এই হঠাৎ উঠে এসে কথা বলায় চমকে উঠল ওরা। থতমত খেল!

তা সেটা সামলে নিতে সব থেকে কম সময় লাগল বুলুর। বুলু তার নতুন অভ্যাস করা কাটা গলায় একটু হাসির মতো করে বলে, বর্তমানটাকে বাঁধা দিয়ে ভবিষ্যৎ কোনটা কি খুব বিচক্ষণের কাজ, বাপী।

নয় যে, সেটা এখন বুঝতে পেরেছি বুলু। ঠিক আছে, এর প্রতিকারের চেষ্টা

পীযূষকান্তি বোসের লম্বা ছায়াটা শোবার ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। তার ডানলোপিলোর গদিটা নেচে উঠল কিনা অন্ধকারে বোঝা গেল না। হ্যাঁ ডানলোপিলোটিলোগুলো এখনো আছে। যে কদিন থাকে। তারপর হয়তো টিফিনের তোষক।

কে জানে পীযূষকান্তি বসল না শুল।

শুধু পীযূষকান্তির ছায়াটা তার গলার স্বর শুনতে পেল, কী আশ্চর্য। এমন সহজ সমাধানটা হাতের মধ্যে থাকতেও তুমি দেখতে পাচ্ছিলে না পীযূষকান্তি বোস। যাক এবার দেখতে পেয়েছ তো? ব্যস এরপর আবার যে রাজা সেই রাজা। এরপর থেকে আর তোমার শ্বাসে প্রশ্বাসে হিসেব কষতে হবে না। সত্যি কী বুদ্ধু আমি, ভেবে বসেছিলাম খাল যখন কেটে ফেলেছি তখন কুমীর আসবেই, খালটা যে বুজিয়ে ফেলা যায়, খেয়াল করিনি। যাক এবার তা হলে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও পীযূষকান্তি। তবে তোমাকে যে ওরা বোকা বলে, ভুল বলে না। চোখের সামনে সমাধান অথচ তুমি যন্ত্রণায় ছট্‌-ফটাচ্ছিলে। ছিঃ।

সে দিনের পরদিন—

যেদিন আপন ছায়ার সঙ্গে কথা বলতে বলতে পীযূষকান্তি তার জীবনের এই জটিল সমস্যার সমাধানটা খুঁজে পেয়ে গিয়েছিল অন্ধকার ঘরে শুয়ে। কী আশ্চর্য এতদিন এইটা মাথায় আসেনি তার। এই মাথায় না আসার জন্য এতদিন কী দুর্বহ বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে।

পরদিন ভোর সকালে ঘুম ভেঙে উঠে নিজেকে অদ্ভুত হালকা লাগল পীযূষকান্তির। মনে হল পৃথিবীতে নিঃশ্বাস নিতে কী অপর্যাপ্ত বাতাস। চোখ মেলে তাকাতে আকাশে কী অফুরন্ত আলো।.....চারিদিকে কী মুক্তির রোমাঞ্চ। উঠে পড়ে দেখল কেউ ঘুম থেকে ওঠেনি এখনো। ওঠাও না। পীযূষকান্তি চির অভ্যাসের বশে বরাবর ভোরবেলাই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েন।.....

বালিগঞ্জের ওখানে থাকতে উঠে পড়ে বারান্দায় এসে বেতের চেয়ারে বসতেন। অলক যখন আর সকলকে ঘরের মধ্যে বেড টী পৌঁছে দিত, তখন পীযূষকান্তিকেও এক কাপ দিয়ে যেত।.....এবং অন্য সময় মন্তব্য করত, মেসোমশাই যে কেন এই সাত সকালে উঠে বসে থাকেন।

হ্যাঁ, মেসোমশাই বলত অলক তার মনিবকে, অথবা—মনিবানীর বরকে। 'বাবাও' নয় 'সাহেব' ও নয় মেসোমশাই!

পীযূষকান্তি বলত ব্যাটার ব্যাকরণ জ্ঞান টনটনে। 'মাসিমা' অতএব মেসোমশাই? তা তোমায় যে বড়ো 'মা' বলে না?

সুরমা গাঁইয়াদের মতো গালেই হাত দিয়েছিল, মা। আছ কোথায়? এখানে আবার 'মা' বলা আছে নাকি? সবাই মাসিমা বলে।

তাই নাকি? কিন্তু কারণটা কী? মা ছেড়ে মাসি। ফাঁসি দেবার সুবিধেটা ভালো মতো হবে বলে?

আহা! তা কেন? 'মা' আর 'বাবু' শুনলেই যে কেমন মনিব মনিব লাগে। ওদেরও তাই আর 'চাকর-টাকর' বলা চলে না। হয় বলতে হয় 'লোকজন' কিম্বা 'বাজারের লোক' অথবা বলতে হয় 'হেলপার'।

এত তথ্যও জান তুমি! উঃ! সমাজ বিবর্তনের ধারাটি একেবারে মুখস্থ....আচ্ছা তাহলে ঝামাপুকুরের বাড়ির ওখানে ঠাকুর চাকররা কী বলে ডাকত তোমায়—বলতো?

আহা জাননা যেন। বৌদি বলত না? ছোট বৌদি! ওরা নাকি তোমার বৌদিদের বিয়ে দিয়ে নিয়ে এসেছে। তাই বৌদি—পীযূষকান্তি হেসে উত্তর দিয়েছে—তার মানে তোমার একেবারে ডবল প্রমোশন। ছোটবৌদি থেকে একেবারে—মা-সি-মা!

সুরমা কৌতুকের হাসি হেসেছে, ওই শুনতেই মাসিমা। মাসিমা কথাবার্তাতেই মাই ডিয়ারি।

পীযূষকান্তি চমকে বলেছে, তার মানে? এতে তুমি প্রশ্রয় দাও?

সুরমা অগ্রাহ্য ভরে উত্তর দিয়েছে এর আবার প্রশ্রয় দেওয়া দিইয়ি কী? হাসি খুশী ছেলেটা সবসময় একটু কায়দা করে কথা বলতে ভালবাসে, তাই বলে। তাতে আমার কী লোকসানটা? সর্বদা চোখের সামনে একটি রাম গরুড়ের ছানা ঘুরে বেড়ালেই বুঝি খুব ভালো লাগত? তোমার হঠাৎ হঠাৎ সিরিয়াস হয়ে যাওয়া দেখলে এত হাসি পায়। তুচ্ছ কারণে—

অথচ এখন?

এখন সুরমা ভুলে গেছে 'সিরিয়াস' হয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো ভাবে থাকা যায়।....তবে বলতে পারা যায়, সুরমার ওই 'সিরিয়াস' থাকাটার কারণ উচ্চ। পীযূষকান্তির মতো তুচ্ছ কারণে নয়।

* * * *

যাক! আর সেই কারণটা থাকবে না।

পীযূষকান্তি রাখবে না সেটা।

কী আনন্দ! নিজের যেন পাখির পালকের মতো দায়হীন ভারহীন হালকা লাগছে।

এখানে বারান্দা নেই, বেতের চেয়ার পাতা। আর বিউটীর প্রশ্ন নেই, কাজেই পীযূষকান্তি ভোরবেলা উঠে বাগানে গিয়ে বেড়িয়ে নেয় একটু।

'বাগান' বললে অবশ্য শব্দটার অবমাননা করা হয়, সুরমা যা বলে সেটাই ঠিক বলে, বাগানই বটে। বল যে জঙ্গল! তবে ভালো গাছও কিছু আছে বৈকি। পীযূষকান্তি তাই বলে বাগানে।

ঠাকুর দালানের পিছনে অনেকখানি খোলা জমি, সেটাই ওই জঙ্গুলে বাগান। পীযূষকান্তি ভোরবেলা ওখানেই গিয়ে ঘোরে খানিক।

আজও তাই গেল। রোজকার মতো আজও দালানের পাশের দিকে তাকিয়ে দেখল কেউ ওঠেনি, সব ঘর বন্ধ। আস্তে আস্তে লম্বা টানা দালানখানা পার হয়ে গিয়ে দালানের কোলাপসিবল গেটের তালা খুলে আস্তে গেটটা খুলে দাওয়ায় নামল।

চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। যেন নতুন দৃষ্টিতে কি নির্মল-মনোরম পরিবেশ।.....উঠোন ভর্তি গাছপালা, মেঝেটা সবুজ ঘাসের আস্তরণে ঢাকা। সামনে পিছনে চারিদিকেই সবুজের সমারোহ।

আচ্ছা, এই দৃশ্যটা কী ওরা কোনোদিন দেখেনি?......দেখেনিই মনে হয়। কী করে দেখবে? ওরা যখন ওটে, তখন ভোরের এই মনোরম শোভাময় দৃশ্যটিও থাকে না এবং কোন রকম 'দৃশ্য' দেখবার সময়ও ওদের থাকে না।

কিন্তু দেখলেহ কি ওদের এই দৃশ্যটুকুর জন্য মমতা আসত? যেমন আসছে পীযূষকান্তির। আসছে, বেশ আসছে?—

আসুক।

মমতাকে সরল মন থেকে ঝেড়ে ফেলবে পীযূষ বোস।—কিন্তু এখনও দু'চারদিনের মতো ওই জঙ্গুলে বাগানটায় গিয়ে মন কেমন করা মনটা নিয়ে একটু ঘুরে বেড়ালে ক্ষতি কী? কেউ কি বাইরে থেকে কিছু বুঝতে পারবে? হয়তো বুলু অভ্যস্ত ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে বলবে বাপীর বাগানে পরিদর্শন দেখলে মনে হয় যেন, 'গুলবাগিচায় সম্রাট সাজাহান। কী ম্যাজেষ্টিক ভাব।'

টুটু হয়তো বলবে, উঃ! ফাদারের শৈশবকালে ফাদারের ফাদার কী শিক্ষাই দিয়ে গেছলেন। একেবারে ছেনি বাটালি দিয়ে পাথরে খোদাই করে

ছেড়েছিলেন। ব্রাহ্মমুহূর্তে ঘুম থেকে উঠে তাই বেচারী ক্ষাদারের সারাজীবনে আর আয়েস করার সুখটুকু ঘটল না। রাত শেষ হবার আগে বিস্তরায় কাঁটা ফুটতে থাকে। তাই ঘুমের সব থেকে চমৎকার সময়টিতে বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে—কী বলে ওই নিঃসঙ্গ বিহঙ্গের মতো কাঁটাবনে ঘুরে বেড়ান।

ওখানেও বলত টুটু, বারান্দাটা তো আর চেয়ারগুলো নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে না, তবে ঘুমের সময় থেকে সময় কেটে নিয়ে ওটা দখল করতে আসা কেন।

বলে, এই রকম কথা বলে টুটু, তবে ওর কথায় তেমন হুলের জ্বালা নেই। সাপ যদি হয়েও গিয়ে থাকে ও হয়েছে জলসাপ।

নীলুই যা বরাবর সংসারের শান্তিরক্ষা প্রয়াসী, তাই নীলা যদি বলে তো বলে, তা মর্নিং ওয়াক তো ভালোই বাপু। আমরা পারি না তাই।

শুধু সুরমাই বলে, আসল উদ্দেশ্য তোরা ধরতেই পারিস না। তোদের বাপী ওই জঙ্গল হাতড়ে খুঁজে দেখতে যায় কোথায় দুটো কাঁচা লঙ্কা ফলেছে কিনা, কোনো গাছে দুটো কাগজি লেবু ধরেচে কিনা, পাতা লতার আড়ালে কোনোখানে লাউকুমড়ো কি শশা কাঁকুড় লুকিয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে কিনা, আর নারকেল গাছে ক'থাক ডাব ঝুলছে, কাঁঠাল গাছে কটা এঁচোড়ের আবির্ভাব ঘটেছে। এই সবেরই ইনস্পেকশান করতে যায়। দেখছিস তো প্রথম প্রথম পেয়ারা গাছে পেয়ারা ঝুলছে দেখে কী লাফালাফি। যেন ফলটল যে সত্যি সত্যি গাছে ধরে এ ওনার জানাই ছিল না!—অফিস ব্যাগে ভরে নিয়ে গিয়ে অফিসের লোককে বিলানো হয়েছে, যেন পেয়ারা কেউ কখনো চোখে দেখেনি। এ জ্ঞান হয়। এসব দেখলে লোকের ধারণা হবে, আমরা একটা অজপাড়াগাঁয় এসে পড়েছি।—বলে বলে তবে সে দুর্মতি ছাড়িয়েছি।

এসব শুনে গা সওয়া হয়ে গেছে পীযূষকান্তির, তাই আরো দু'চারদিন এই 'বাগানে' ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে যে তার ভিতরে কোনো বিশেষ মমতা রয়েছে সেটা ধরা পড়বে না তা জানে!

এখানে সবার কোনো জায়গা নেই, তাই পায়চারি করতে করতেই সেই নতুন শেখা মজার খেলাটায় মাতে পীযূষকান্তি।

নিজের ছায়ার নাকের সামনে তর্জনি তুলে তুলে বলে, বুঝলে হে পীযূষকান্তি, অনেক আক্কেল সেলামি দিয়েছি, এবার সামলে গেলে।

এখন, আজই, তোমায় সেই হিতৈষী বন্ধুটির নাকের সামনে এই রকম করে আঙুল তুলে বলবে, ঢের হয়েছে ভাই, আর নয়, তোমার ওই মোটা মোটা

থামওয়ালা বাড়িটিকে তুমি ফেরৎ নাও। বর্তমানকে বন্ধক দিয়ে 'ভবিষ্যৎ' কেনবার সুপারিশ আর দিও না কাউকে।—দেখলাম তো ওই 'ভবিষ্যৎ' কিনতে যাওয়া মানেই দারিদ্র্য কিনে ফেলা। তার সঙ্গে ফাউ অশান্তি অপমান লাঞ্ছনা গঞ্জনা। আর অনর্থক খানিকটা মায়ার জ্বালা, খানিকটা সেন্টিমেন্টের শিকার হওয়া দুর।

বেশ ছিল পীযূষকান্তি বোস এতদিনে হয়তো সেকেণ্ড হ্যাণ্ড গাড়িটাকে বদলে একটা ফার্ষ্টহ্যাণ্ডের স্বপ্ন দেখত। তার ছেলে গাড়ি চালানো শিখে ফেলে শহর পয়লট্ট করে বেড়াত, আর বলত নাঃ ফাদার লোকটা ভালো. মনটা দরাজ আছে। পেট্রোলের হিসেব কষে না।

স্ত্রী মৃদুমধুর কটাক্ষ হেনে বলত, যাই বল বাপু গাড়ী একখানা এসেনসিয়াল। বল, ঠিক বলেছিলাম কিনা?

বড় মেয়ে শান্ত গলায় বলত, সত্যি একটা গাড়ি থাকলে কিন্তু মনটা বেশ ভরাট লাগে।

আর ছোট মেয়ে পীযূষকান্তির গলা ধরে ঝুলে পড়ে বলত—বাপী, বাপী, তুমি কি সুইট।

এই সব সুখ থেকে তুমি আমায় বঞ্চিত করেছ যে বন্ধু কিন্তু আমি তোমার হাত পিছলে ফসকে পালিয়ে আসছি আবার।

কী মুক্তি! কী মুক্তি!

কিন্তু—

হঠাৎ একটা আশঙ্কায় কণ্ঠকিত হয় পীযূষ। যদি সুধাময় মুখের ওপর হেসে উঠে বলে, বাড়িটা ফিরিয়ে নেব মানে? জিনিসটা কি আমার? যার জিনিস সে তো টাকা কড়ি মিটিয়ে নিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে। আমি কে?

তাহলে?

তাহলে?

হঠাৎ ভারি উত্তেজিত হয়ে ওঠে পীযূষকান্তি, একটা মরা গাছের শুকনো ডাল তুলে নিয়ে একটা মোটা গাছের গুঁড়িকে আঘাত হানতে হানতে প্রশ্নোত্তরের মালা সাজায়—

তা বললে শুনব না। আমার খদ্দের জোগাড় কর তুমি। আমি লাভটাই চাই না, এমন কি রিপেয়ারিঙের খরচ হয়েছে, তাও ছেড়ে দিতে রাজী আছি। তুমি শুধু হিমালয় পর্বতকে আমার মাথা থেকে নামাও।

সুধাময় ঃ চট করে খদ্দের আমি এখন কোথায় পাব? এতো বড়ো বাড়ি কেনার মতো এলেমদার লোক সব সময় হাতের কাছে থাকে না।

পীযূষ ঃ ওঃ তাই! তাই আমায় একটা মস্ত এলেমদার দেখে অতো করে জপিয়ে জাপিয়ে আমার জীবনের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছ।

সুধাময় ঃ কী বললে? আমি তোমার জীবনের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছি? তোমার ক্ষতি করেছি? একেই বলে দুনিয়া। আমি তোমার ভবিষ্যতের কথা ভেবেছিলাম, তাই।

পীযূষ ঃ তা ভেবেছিলে ঠিকই। কিন্তু বর্তমানটার কথা ভাবিনি। সারাক্ষণ ওয়ান পাইস ফাদার মাদার করতে আমার কী কষ্ট জান? অফিসের গাড়ি থেকে নেমে প্রাইভেট বাসে চেপে আমি যে কী অবস্থায় বাড়ি যাই, ধারণা করতে পারবে না।

সুধাময় ঃ পারব না মানে, বল কী হে? আমিও তো যাই। আরও হাজার হাজার ভদ্র ব্যক্তি যায়। সবাই যায় বলেই অতো ভীড়। চিরকাল উড়নচণ্ডে বলেই এটায় তোমার এতো কষ্ট।

পীযূষ ঃ শুধু কি আমারই কষ্ট? আমার স্ত্রী-পুত্র কন্যারা? তাদের কী হাল হয়েছে ভাবতে পারবে না। নেচারগুলোও বদলে গেছে। রাতদিন সাপের ছোবল খাচ্ছি।

সুধাময় ঃ তাদের তুমি রাজার হালে মানুষ করেছ বলেই এ অবস্থা। তোমার ঝামাপুকুরের বাড়ির ছেলে মেয়েরাও তো এই ভাবেই হাড় পিষে স্কুল কলেজ করছে, কই 'খুব কষ্ট' বলে তো আক্ষেপ করছে মনে হয়ে না। আমার ভাই ওই পাড়াতেই থাকে।

পীযূষ ঃ জানি না ঝামাপুকুরের জীবনযাত্রা সম্পর্কে আমার আর এখন কোনো ধারণা নেই। আমি যে জীবনের অনেকগুলো বছর কাটিয়ে এলাম ফের সেই জীবনে ফিরে যেতে চাই।

সুধাময় ঃ বেশ! বলতো খদ্দের দেখতে চেষ্টা করব!

পীযূষ ঃ কিন্তু যত তাড়াতাড়ি পার। মুখ বেজার করো না, মনে রেখ; আমায় তুমি জোর করে—

হাতের ডালটা ভেঙে টুকরো হয়ে ছিটকে হাত থেকে পালিয়ে গেল।.... চমকে উঠল পীযূষকান্তি। তারপর হেসে উঠল, আরে আমি কি ওই গাছটাকে সুধাময় ভেবে ধরে ঠেঙাচ্ছিলাম নাকি!

যাক, আজই একটা জোর ধাক্কা দিতে হবে।

রোদ উঠে গেছে।

বাড়ির মধ্যে চলে এল পীযূষকান্তি।

দেখল ঠিক যেমনটি দেখে গিয়েছিল, এখনো তেমনি রয়েছে। সেই লম্বা চওড়া টানা দালানটা এখনো একটা দরাজ শূন্যতা নিয়ে পড়ে আছে।

মস্ত দালানটার মাঝখানে সেই খাবার টেবিলটা পড়ে আছে ক'খানা চেয়ারকে পর্যদ করে।

পীযূষ মনে মনে চেয়ার সমেত টেবিলটাকে ঠেলে উঠোনে নামিয়ে দিল। তারপর ওই দরাজ দালান জুড়ে সারি সারি অনেক আসন পাতল। সাধারণ সতরঞ্চের আসন, একসঙ্গে অনেক লোক খেতে বসলে যেমন পাতা হয়। তারপর মনে মনেই তার ওপর লোক বসিয়ে দিতে লাগল।

এই বাড়িটা বেচে দেওয়ার আগে একবার একসঙ্গে ফুলটুসিদের সবাইকে, আর ঝামাপুকুরের বাড়ি শুধু সকলকে নেমন্তন্ন করবে। নির্ভয়েই করবে, তখনতো আর ঋণের পাহাড় মাথায় চাপানো থাকবে না। একটা কিস্তি শোধ দেবার টাকাটা তুলে নিয়েই—

তাছাড়া এই বাড়িটায় এতো জায়গা, আশেপাশে এতো খোলামেলা যে সুরমা তার অসুবিধে'র প্রশ্ন তুলতে পারবে না। স্ত্রী কন্যার ওপর কোনো দায়দায়িত্বও চাপাবে না, হালুইকর ঠাকুর ডেকে আনবে।......

একটা উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠে পীযূষ।

যেখানে সেখানে ইঁট চাপিয়ে উনুন জ্বালবে, বড়ো বড়ো হাঁড়ি কড়া ওই টিউবওয়েলে মেজে আনবে। সারাদিন সবাই মাঠে—বাগানে ছুটোপুটি করবে, আর বলবে কী চমৎকার বাড়িই কিনেছ তুমি।

না, ওদের কাছে তখনও বাড়ি বেচে দেওয়ার কথা বলবে না পীযূষ। ওরা ভাববে এটা বোধহয় গৃহপ্রবেশের মুলতুবি নেমন্তন্ন। বৌদিদের, দাদাদের, ফুলটুসি আর তার বরের এবং ছেলেপুলেদের মুখগুলো যেন চোখের উপর দেখতে পায় পীযূষ। ওদের মুখে খুশির আলো, ওরা যেন বলছে, মাঝে মাঝে এখানে পিকনিক করতে আসব।

·হ্যাঁ, সুন্দর একটি পিকনিকের দিনের ছবি দেখছিল সেদিন পীযূষ ভোরবেলার আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে।

তারপর ঘুরে ঘুরে পুরো বাড়িটা দেখছিল।

আশ্চর্য! কত সব ফালতু জায়গা এখানে সেখানে। অকারণ সব ছোট ছোট ঘর। তাছাড়া ঠাকুর দালান।

টানা লম্বা অনেকগুলো সিঁড়ির উপর মোটাসোটা থামের গায়ে ভর দেওয়া দু'সারি খিলোনের ভিতর মূল দালান।

....না, এই দালানটাকে ড্রইং রুম করা হয়ে ওঠেনি। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘর রয়েছে বাড়িটায়। একখানা বড়ো ঘরের মধ্যে ড্রইং রুমের আসবাবগুলো ভরে রাখা হয়েছে, কিন্তু ঘরটা এতই বড়ো, সবই যেন অকিঞ্চৎকর লাগে। তাছাড়া গুছিয়ে বসেই বা কে?

নাঃ এতো বড়ো বাড়ির কোনো মানে হয় না, মনে মনে বলে উঠল পীযূষ, ছোট মাপের মানুষদের জন্য ছোটো খাটো বাড়িই ঠিক।

যে বাড়িতে মাপা টেবিলের বাইরে আর একটা পাত বেশি পাতা যাবে না, গোনা বিছানার বাইরে আর একটাও বিছানা পাতা যাবে না, তেমন বাড়িই সুরমার পক্ষে ভালো।

গড়িয়াহাটের সেই ফ্ল্যাটটা হাতছাড়া হয়ে গেলেও আশেপাশে আর একটা ফ্ল্যাট খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হবে না। কাঁকুলিয়ায়, বেলতলায়, গোলপার্কের ধারের কাছে কি সার্দান এভিনিউতে। ওইটাই যখন পীযূষের স্ত্রী-পুত্রের কাছে স্বর্গাঞ্চল।

পাঁচশো টাকায় হয়েতো পাওয়া যাবে না, তাতে কি? তখনতো ধারশোধ করেও অনেক টাকা হাতে থাকবে। তাছাড়া—শেষ বেস আরো একটা ভারি ইনক্রিমেন্ট তো আছেই তোলা।

এরপর তো আর পীযূষকান্তি বোসকে তার স্ত্রী সন্তানের ভবিষ্যৎ ভাবতে হবে না। কী শান্তি, কী সুখ।

মায়া? মমতা? একী পীযূষের সাতপুরুষের ভিটে? হ্যাঁ, বাড়িটার এই বৃহৎ আর বনেদী চেহারায় আকর্ষণ আছে।......যাক সেটা কাটানো যাবে।

* * * *

অফিসের বিভূতি রায় সুধাময় সরকারকে বলে, ব্যাপার কী সরকারদা? বোস সাহেবের সঙ্গে আর বাক্যালাপ দেখি না যে? এইতো কিছুদিন আগেও তো দু'জনে এক হলেই গুজগুজ ফুসফুস। আমরা বলাবলি করতাম, বোস সাহেব বাল্যবন্ধুত্বের মহিমা দেখাচ্ছেন বটে—

সুধাময় অকারণেই গলা নামিয়ে বলে, আর বোলোনা ভাই! কলিতে কারো

ভালো করতে নেই। অতগুলো টাকা মাইনে পায় লোকটা, একটা পয়সা রাখতে পারে না। তাই পরামর্শ দিয়েছিলাম, আখেরের কথা ভাব, একটা মাথা গোঁজার আশ্রয় কর।

বিভূতি খুব উৎসাহের গলায় বলে, যথার্থ বন্ধুর উপযুক্ত কথাই বলেছিলে। তা সাহেবতো কিনলেন বাড়ি।

সুধাময় বলে, সে একরকম আমার আপ্রাণ চেষ্টায় ভাই. কথা উড়িয়ে দেয়; গাড়ি কেনার জন্যে পাগল। তা আমিই উদ্যোগ আয়োজন করে—

বিভূতি বলে, জানি রাজপুরে না সোনারপুরে কোথায় একটা পুরনো বাড়ি কিনিয়ে দিয়েছিলেন!

মনে মনে অবশ্য বলে বিভূতি, নিশ্চয়ই মোটা দালালী পেয়েছিলে তাদের কাছে। খেয়েদেয়ে কাজ নেই রাজপুরে বাড়ি কেনা।

তা মনের কথা তো শোনা যায় না, তাই সুধাময় সরকার দু'হাত তুলে বলে, হ্যাঁ সেই হল অপরাধ? অতদূরে বাড়ি—পাড়া গাঁ; বৌ ছেলের পছন্দ নয়, বাড়িতে অশান্তি; অতএব সবকিছুর মূল আমি, তাই আমার সঙ্গে আর ভালো করে কথাই নেই।

বিভূতি বলে, এতোই যদি তো আবার বেচে দিননা বাড়িটা—

আমিও তাই বলব ভাবছি। সুধাময় বলে, আর একটা ভালো খদ্দের হাতে এসে গেছে। এক রিটায়ারড ভদ্রলোক, বরাবর বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী হয়ে থেকেছেন, এখন বঙ্গভূমিতে বাসা বাঁধতে চান, তবে শহরের ঘিঞ্জিতে নয়। শহরের কাছাকাছি কোনো শহরতলীতে খোলামেলা কিছু জমিটুমি সমেত বড়োসড়ো বাড়ি চাই বলে কাগজে অ্যাড্ভাটাইজ করেছিলেন ভদ্রলোক, আমার সঙ্গে এখন চিঠিপত্র চলছে।....কিছুকাল আগে হলে আর ওই মস্ত বাড়িটা পীযূষ বোসকে কিনিয়ে দিয়ে চোরের দায়ে পড়তাম না। যাক বলে দেখি, তখন তো 'এক-বুড়ির-বাড়ি' বলে জলের দরে পাওয়া গিয়েছিল। এখন ভালো দাম পাওয়া যাবে। ভদ্রলোক তো নিজেই ঘোষণা করেছেন, 'লাখ টাকার মধ্যে—'

বিভূতি রায় হেসে বলে, আপনার তাহলে দু'দিক থেকেই ভাল।

সুধাময় ফোঁস করে ওঠে, লাভের চিন্তায় এসব করতে যায় না সুধাময় সরকার। এখন পীযূষ বোসের কাছে মুখটা রাখতে পারলেই বাঁচি। তবে মনে রেখ ভাই, বাড়ি আর এ জীবনে করে উঠতে পারবে না পীযূষ বোস, ও জিনিস.

দু'বার হয় না। বাড়িটার গৌরব ছিল, আভিজাত্য ছিল।..... কত দোল দুর্গোৎসব হয়েছে এক সময়—

বিভূতি বলে, সাহেব তো একবার গৃহপ্রবেশের নেমতন্নও করলেন না। করলে নয় একবার দেখা হয়ে যেত।

ওই 'গৃহপ্রবেশের' নেমতন্নটা যে শুধাময়েরই বারণ, ভূত ভোজন করিয়ে খরচা না করে টাকাটা ধার শোধে লাগানোই সমীচীন, এ পরামর্শ সুধাময়েরই, কিন্তু সে কথা ফাঁস করে না সে। তাই দু'হাত উল্টে বলে, সাহেব মানুষ ওসব মানলে তো? যাক, সেই ভদ্রলোক তো সামনের সপ্তাহেই কলকাতায় আসছেন, এসে না কি শালীর বাড়ি উঠতে হবে, তাই চাইছেন যত শীগগির হয়—

বোস সাহেব রাজী হবেন তো?

শুধাময় বলে, রাজী করাতে হবে। বলব বাড়ি নিয়ে যখন তোমার এ তো অশান্তি—

কিন্তু সুধাময় ভাগ্যবান পুরুষ তার অনুকূলেই ঘটনার স্রোত প্রবাহিত হতে চলেছিল।

*　　　*　　　*　　　*

বাশী শেষরাত্তির থেকে অমন ভূতাশ্রিতের মতো সারাবাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছিল কেন মা?

চায়ের টেবিলে এসে বলে উঠল বুলু!

বুলু তার দৈনন্দিন পদ্ধতি প্রায় আগের মতোই রেখেছে। চা-টা অলকের বদলে দিদি দিচ্ছে, কি মা দিচ্ছে, তাকিয়ে দেখ না। তার কাছে কেউ সেটা প্রত্যাশাও করে না।

সুরমা বলল, তা সে কথা আমায় জিজ্ঞেস করছিস কেন? ভূতে যাকে পেয়েছে তাকেই জিজ্ঞেস কর।

দরকার নেই বাবা। তবে জানলা দিয়ে দেখলাম হল থেকে নেমে তোমাদের ওই কী বলে ঠাকুর দালানে ঢুকে ঘাড় তুলে তুলে কতক্ষণ দেখল, তারপর আবার বাগানে নেমে গেল। বাগান মানে আর কি ওই তোমার জঙ্গলটা।

টুটু তোয়ালেয় হাত মুছতে মুছতে বলল, জায়গাটা সত্যি বাগান করতে পারলে অনেক লাভ হয় কিন্তু। বাজার করে খেতে হয় না।

বুলু হি হি করে হেসে ওঠে, তবে লেগে যা। রায়বংশে সাজ থেকে নেমে

পড়ে বল, কোদাল চালাই ভুলে মানের বালাই, ঝেড়ে অলস মেজাজ—হি হি, হবে শরীর ঝালাই।

চায়ের টেবিলে হাসির রোল ওঠে।

অতঃপর আবার কথা।

এই, ফাদার কোথায়?

চানের ঘরে।

এক্ষুনি?

আর কী করবে। যা একখানা ভূখণ্ডে বাস করা হচ্ছে, সকালবেলা তো খবরের কাগজের মুখ দেখতে পাওয়া যায় না। কাগজ আসে বেলা ন'টায়।

পুওরম্যান, আর কি করবে? চা খেয়েই শেভিং করতে বসে, আর তারপরে চানের ঘরে ছোটে।

উপায় কি! দুটি ঘণ্টার পথ পাড়ি দিতে হবে তো? সত্যি দেখলে দুঃখ লাগে। নীলু বলে, আমার লাগে না।

নীলুর কথার উত্তরে টুটু বলে, কেউ যদি ইচ্ছে করে কষ্ট পায় করার কী আছে?

পীযূষ এসে খাবার টেবিলে বসে।

এতো সকালে ভাত খেতে পারে না সে, খায় দুখানা টোস্ট কিছু আলুসিদ্ধ, হয়তো একটু মাছভাজা। সুরমা সামনে এনে ধরে দেয়।

পীযূষ হঠাৎ বলে ওঠে, আবার পুরনো পাড়াতেই ফিরে যাবে, কী বল?

সকলেই চকিত হয়।

কী এ? ঠাট্টা?

পীযূষের মুখে এমন হালকা সুর তো কই আজকাল শোনা যায় না।—সুরমা ধরে নেয় ঠাট্টা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কোনো উচিত জবাব দিতে পারে না বলেই গুম হয়ে যায়।

পীযূষের মন আজ প্রজাপতির পাখার মত হালকা। কারণ পীযূষকান্তির ঘাড়ের উপর চেপে বসা গন্ধমাদন পর্বতটা কোন ফাঁকে গড়িয়ে গেছে। তাই পীযূষকান্তি সেই পূর্বেকার ভঙ্গিতে বলে ওঠে, নাঃ ভেবে ঠিক করেছি আর এখানে নয়। এখানের জলে তোদের মার গাত্রবর্ণ প্রায় ওই গণেশের মায়ের মতো হয়ে উঠেছে। এটা একটা দারুণ লোকসান।

পীযূষের কথায় ভঙ্গী তো এই রকমই, শুধু কাঠগড়ার আসামী হয়ে স্বাভাবিক বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে সে।

কিন্তু এই স্বাভাবিকতাটা গ্রহণ করা এখন অনভ্যাস হয়ে গেছে এদের তাই সুরমা কড়া গলায় বলে, গ্রামে বাস করছি, একটা গ্রাম্য প্রবাদই ব্যবহার করি, কেটে কেটে নুন দেওয়া বলে একটা প্রবাদ আছে না? শুনেছি কারো কারো স্বভাবে সেটাই একটা মজার খেলা।

ঠিকরে উঠে যায় সুরমা।

নীলু আস্তে আস্তে বলে, একেইতো মার কষ্টের শেষ নেই, এরকম ঠাট্টা করা তোমার উচিত হয়নি, বাপী।

পীযূষ আস্তে বলে, আমি কিন্তু ঠাট্টা করিনি নীলু সত্যই ঠিক করেছি—

টুটু অবজ্ঞার ভঙ্গিতে কাঁধ নামিয়ে বলে. সত্যিটা ঠাট্টার মতো শোনালে মুশকিল, বাপী!

পীযূষ হতাশ গলায় বলে, ঠাট্টার মতো শোনালেও বলছি—সত্যিই আবার ওই পাড়াতেই ফিরে যাব। এ বাড়িটা বেচে দেব।

ও মাই গড্! বাড়িটা বেচে দিয়ে! ওই আনন্দেই থাক, তোমার মতন এমন ইয়ে আর কেউ হবে না বাপী, কে এই প্রাচীন দুর্গটি ক্রয় করতে আসবে। খদ্দের পাবে তুমি?

পীযূষ একটু চমকে যায়।

আরে টুটুরও এ সন্দেহ হচ্ছে? হঠাৎ যেই ভেবেছে পীযূষকান্তি, বাড়িটা বেচে ফেললেই ঝঞ্ঝাট মিটে যায়, আতগুলো ক্যাশ টাকা হাতে এসে গেলেই ধারগুলো শোধ করে ফেলে আবার সে রাজা! সে আহ্লাদে ভাসছে.....বেচে ফেলাটা যে তার নিজের হাতে নয়, সে খেয়াল করেনি।.....

আবার মনমরা হয়ে গেল পীযূষ। অদৃশ্য সুধাময়কে ধরে ঠেঙানো যায়, কিন্তু সত্যি তো তা হয় না। যদি সহজে বিক্রি না হয়? কেমন করে বিক্রি করতে হয় তা তো আর জানেনা পীযূষ। ইদানীং তো আর দেখাই হয় না সুধাময়ের সঙ্গে। কী ভাবে বলা যাবে?

* * * *

তা পীযূষকান্তি বোসের কপালটা এখন বোধহয় ভালোর দিকেই। তাই সেই দিনই অফিসে সুযোগ বুঝে এক সময় সুধাময় সরকারই নিজে থেকে বলে উঠল, তোমাকে বাড়ি কিনিয়ে দিয়ে তো দেখছি প্রায় বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটে যাচ্ছে

ভাই। প্রাণে সুখ পাচ্ছি না। আমি বলি, বাড়িটা তুমি বেচেই দাও। বল তো খদ্দের দেখি।

পীযূষ সুধাময়ের মুখের দিকে একটুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকায়, সুধাময়ই তো! নাকি ছদ্মবেশী ভগবান?

কিন্তু বাইরে এই বিচলিত ভাব প্রকাশ করা চলে না, অবিচলিত গলাতেই বলতে হয়, তুমি বললে ভালোই হ'ল, আমিও ভাবছিলাম কথাটা তোমায় বলি। আমারও—

ইতিমধ্যে অবশ্য সুধাময় নতুন পার্টির সঙ্গে অনেকটা পাকিয়ে এনেছে, আর পীযূষকে রাজী করাতে কটা কাঠ খড় পোড়াতে হবে সেটা অনুমান করতে চেষ্টা করছে, তবু হঠাৎ এহেন অনুকূল প্রস্তাবে নিজেকে চট করে সামলে নিয়ে দুঃখু-দুঃখু মুখে বলে, আমি হঠাৎ বলে ফেলেছি বলে কিছু যদি মনে করে থাক ভাই কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি।

আরে দূর!

পীযূষ বলে, বলেইছি তো, আমার নানান অসুবিধে, বাড়িতে কেবলই অসন্তোষ। ও তুমি একটু চেষ্টা চালাও। তাড়াতাড়িই চালাও।

সুধাময় আরো করুণ হয়, আর একটু ভেবে দেখ ভাই, বাড়ি হচ্ছে লক্ষ্মী, লক্ষ্মীর দয়া না হলে বাড়ি হয় না।

পীযূষ উদাস হাসি হাসে, সবাইয়ের কপালে লক্ষ্মী সয় না হে, আমি মনকে ঠিক করে ফেলেছি।

সুধাময়ের গলা কাঁপে চোখ ছলছলিয়ে ওঠে, তুমি যখন বলছ, তখন আমার সাধ্যমত করব, উঠে পড়ে লেগেই করব, কিন্তু ভেবে আমার দুঃখ হচ্ছে পীযূষ, ওই বাড়িটা তুমি—যাক, তোমার কিছু লাভ আমি করিয়ে দেবই। পার্টি জোগাড় করে ফেলেই মোটা দর হাঁকব। আমার কোনো লাভ রাখতে চাই না।

পীযূষ তখন মনে মনে পীযূষের ছায়ার সঙ্গে কথা বলছে, ও পীযূষকান্তি বোস, হঠাৎ তোমার লাকটা এমন আকাশমুখী হয়ে গেল কী করে? তুমি যা চাইছ তাই পেয়ে যাচ্ছ, ব্যাপার কি? ঠিক আছে। এবার তোমার লোককে বল, যেন গড়িয়াহাটার কাছে একখানা ছবির মতো সুন্দর ফ্ল্যাট যোগাড় হয়ে যায়। এমনি একখানা ফ্ল্যাট যে, দেখে তোমার ওই হঠাৎ কেউটে গোখরো হয়ে ওঠা ছেলেমেয়েদের বিষ দাঁত ভেঙে যাবে। আর তোমার স্ত্রী আবার সোহাগের হাসি হেসে তোমার গা ঘেঁষে বসবে।

সুধাময় বলল, তবে একটা পরামর্শ দিই ভাই—

পীযূষকান্তি হাত তুলে বলল, থাক সুধাময়, এখন একটু ব্যস্ত আছি।

মনে মনে বলল, তোমার পরামর্শর আর দরকার নেই। আমার যথেষ্ট হয়েছে। তবে হ্যাঁ তোমার উপকারকে একেবারে অস্বীকার করতে পারি না। আমার চোখে একটা ভুল চশমা ছিল। তুমি সেটা বদলে দিয়ে একটা কারেক্ট চশমা সাপ্লাই করেছে। বেশ সুন্দর দেখতে পাচ্ছি তাতে, খুব ঠিক।

'ঠিক দেখার' আহ্লাদে সেই দিন থেকেই দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত পাড়ায় ভালো ফ্ল্যাটের সন্ধান করতে থাকে পীযূষকান্তি বোস। এখন আর কারো মুখাপেক্ষী হচ্ছে না পীযূষকান্তি, ব্যবস্থা নিজের হাতে নেবে।

অফিসের আড়ালে আলোচনা ওঠে, বোস সাহেবের ব্যাপারটা কী বলুন তো? যখন তখন অফিসের গাড়ি নিয়ে, নয়তো ট্যাক্সী নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন, অফিস আওয়ারে হরদমই যেন টেলিফোনে এমন সব বাতচিৎ করছেন যা অফিসের ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে না।

মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে হতে পারে।

আপনি আর হাসবেন না মশাই, আজকাল আবার ওনাদের মতো ঘরে ওই ভাবে ময়ের বিয়ে হয় নাকি? পাত্র ফাত্র ঠিক মেয়ের বাপ করে না, মেয়ে নিজেই করে। বিয়েও করে নেয়। 'ফর শো' একটা পাটি ফার্টি দেয় বাপ। আমার মনে হচ্ছে অন্য ব্যাপার। নিজে কোনো বিজনেস ফিজনেসে নামছেন কিনা কে জানে।

নিজেদের থেকে পদমর্যাদায় কিছু উঁচু এমন মানুষকে নিয়ে অকারণ আলোচনা করতেও লোকে ভালোবাসে।

পীযূষকান্তি অবশ্য এসব টের পায় না, কেউ তার গতিবিধির দিকে দৃষ্টি হানছে, ভাবেও না। শেষ পর্যন্ত মন্ত্রের সাধন করে ছাড়ে হ্যাঁ—সুন্দর ফ্ল্যাটে। কেউটের বিষদাঁত ভাঙার মতোই। দক্ষিণাটা অবশ্য অনেকটা মাত্রা ছাড়ানো, তা হোক। চিরদিনই তো পীযূষকান্তি মাত্রা ছাড়ানোর ওপরই থাবা বসিয়ে এসেছে, থাবার ভয়ে নিতেও পেরেছে। তার কারণ—স্ত্রী-পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবেনি।

এখানো আর ভাববে না।

ফ্ল্যাটটার তিন মাসের ভাড়া অগ্রিম দিতে হল।

হয়ে গেল ম্যানেজ, পুরো মাসের মাইনেটা পকেটে ছিল। অন্য কোনো

বাবুদের চিন্তা তো আর করতে হবে না। আগামী কালই সুধাময় তার নতুন পার্টিকে নিয়ে যাবে বাড়ির বায়না করতে। মোটা টাকা ক্যাশ দিয়ে বায়না করতে রাজী ভদ্রলোক, যদি খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে যান।

বাড়িটা না কি, ভিতরে না ঢুকলেও বাইরে থেকে ঘুরে ফিরে দেখেছেন, খুব পছন্দ। পীযূষ জিগ্যেস করছিল, ওনার স্ত্রী ছেলেমেয়ে এসব আছে?

সুধাময় অবাক হয়েছিল, থাকবে না? না থাকলে বাড়ি কাদের জন্যে? ভালো ভালো পাশটাশ করা ছেলেমেয়ে। একটি ছেলে তো বাইরে পড়তে গেছে। একটি ছেলে—

পীযূষ হাত তুলে বলে, থাক, ওসব শুনে কী হবে? তুমি তো আমার মেয়ের বিয়ের ঘটকালি করছ না।

সুধাময়কে একটু ডাউন করতে পেরে বড়ো খুশী হচ্ছে আজকাল পীযূষ।

আবার নিজের স্বভাব বশে ডাউন হয়ে যাওয়া সুধাময়ের ম্লান মুখটা দেখে একটু লজ্জিতও হল পীযূষ বোস। অতএব তাড়াতাড়ি ফুটো রিপু করতে বসল, বায়নার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার পার্টি গলা ধাক্কা দেবে না? দু'চারদিন থাকতে দেবে তো?

সুধাময় আবার কৃতার্থ হয়। সেও আবও তাড়াতাড়ি বলে, আরে বলছ কী? আইনতঃ তিনমাস পর্যন্ত সময় নেওয়া যায়, পার্টির ইণ্টাবেস্টেও নিতে হয় অনেক সময়, সম্পত্তির মালিকানা সত্ত্বে কোনো গোলমাল আছে কিনা খোঁজ নিয়ে দেখবার থাকে। তাছাড়া বিক্রেতারও তো বাড়ি ছাড়ার সুবিধে-অসুবিধে আছে।

একটু ইতস্ততঃ করে বলে, তবে ভাই তুমি বলেই বলছি, সে ভদ্রলোকের বড়ো আতান্তরের অবস্থা বলে আমি তিন সপ্তাহেব সময় দিয়েছি—

ও, যথেষ্ট যথেষ্ট! এনাফ!

উল্লসিত গলায় বলে ওঠে পীযূষকান্তি।

হাতের মধ্যে সেই ছবির মতো ফ্ল্যাটটার দাবি পেয়ে যাওয়ার দলিল। আর কে পায় তাকে?

সুধাময় বলল, তাহলে আবার ভাড়াটে ফ্ল্যাটে?

হ্যাঁ হে! তাই! তাছাড়া কী? যাকে যা মানায়!

অতঃপর চটপট অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ে একটা ট্যাক্সী ধরে অনেকদিন ভুলে থাকা [illegible] চিরপরিচিত রাস্তাটার দিকে রওনা হয়।

ফাদার আমাদের নাকের সামনে কাল একটা পাঁচ লাখ টাকার লটারীর টিকিট ধরে দিয়েছে, বুঝলি পপি।

টুটু পপিদের বাড়ি বসে চায়ের সঙ্গে নোন্‌তা বিস্কুট চিবোতে চিবোতে বলে, কাল সে কী দরাজ মেজাজ ফাদারের!

পপি ভুরু কুঁচকে বলে, আবার ফাদার? অভ্যেস আর ভালো করবে না তা হলে? কেন বাপী বললে কী হয়?

আরো বাবা, ও দুইই তো একই। বরং বাংলাটা কেমন পানসে পানসে, ইংরেজীটা বেশ গর্জাস। ধর না কেন, তোকে যদি ডার্লিং না বলে প্রাণেশ্বরী বলি, কোন্‌টা তোর—

আঃ টুটু, অসভ্যতা করবি না বলছি। কে কোথায় কান পেতে আছে, কে জানে।

ওঃ। তাহলে গলা খাটো করে অসভ্যতা করা চলে বলছিস?

টুটু মার খাবি বলছি! সবসময়ে তো পেঁচা মুখ করে থাকিস, আজ যে দেখছি ফুর্তির বান ডাকছে। লটারীতে ফাস্ট প্রাইজ পেয়ে গেছিস বুঝি?

পাইনি। পাব।

টুটু ভরাট গলায় বলে, বা—ইয়ে বাপী বলেছেন, ওই পাড়াগাঁয়ের বাড়িটা বেচে দিয়ে আবার এই পাড়ায় উঠে আসবেন।

ওঃ! এই কথা! পপি গিন্নীর মতো দুই হাত উল্টে বলে, রাধাও নেচেছে, সাতমণ তেলও পুড়েছে।

তার মানে?

মানে—ও বাড়িও বিক্কিরি হবে না, আর এ পাড়ায় ফ্ল্যাটও পাওয়া যাবে না।

টুটু করুণ মুখে বলে, যা বলেছিস পপি, আমারও তাই মনে হচ্ছে!..... বুলু শয়তানটা তো আবার বলছে, বাপীর ওসব স্রেফ ধাপ্পা। আমরা দারুণ খেপচুরিয়াস হয়ে আছি বলে ওই মিষ্টি বুলিটি দিয়ে ভাঁওতা দিয়েছে বাপী।

ধ্যেৎ! মেসোমশাই মোটেই ও-রকম লোক নয়, হয়তো সত্যিই তোদের দুঃখ দেখে মনে হয়েছে—

বেচারী ফাদার নিজেও তো কম কষ্ট পায় না।

টুটু সহানুভূতির গলায় বলে, কিন্তু কী করা যাবে বল? দেখে মায়ার বদলে রাগই হয়। এই যে স্বখ্যাত সলিল না কি বলে তাই তো।

পপি উঠে গিয়ে কোথা থেকে মুঠোয় ভরে চারটি ডালমুট এনে টুটুর প্লেটে দিয়ে বলে, আর একটু চা খাবি?

ভালোবেসে দিলে চা কেন, চিরোতার জলও খেতে রাজী আছি রে।

ওঃ, তার মানে আমার তৈরি চা চিরোতার জল কেমন? ঠিক আছে, দেব না।

বাঃ চমৎকার। বেশ সুবিধে মতো মানে খাড়া করেছিস তো? অফার করাও হল, আবার খাটতেও হল না। যা যা নিয়ে আয়, কোথায় তোর চা আছে। চাটটা ফুরিয়ে যাচ্ছে—

চাট? আহা! বলে সাধ মিটোচ্ছিস, না?

বলে একটা পাক খেয়ে উঠে গিয়ে আর দু'কাপ চা নিয়ে এসে গুছিয়ে বলে, সত্যিরে টুটু, মেসোমশাইয়ের কথাটা যদি ঠিক হয়, কী ভালোই হয়।

টুটু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, হলেই বা কী? ক'দিনের জন্যেই বা? তুই তো এ পাড়া থেকে হাওয়া হয়ে যাবি।

পপি উত্তেজিত গলায় বলে, উল্টোপাল্টা কথা বলছিস যে?

দূর। তোর মতো সোজা সরল বুদ্ধি তো আর সবাইয়ের নয়? তোর মা বাবা তুই যে মুক্তোর মালাটিকে আমার মতো একখানা বাঁদরের গলায় ঝোলাতে চাইছিলি তো?

দেখিস চাওয়াতে পারি কিনা।

খুব যে সাহস।

না তো কি, তোর মতন কাওয়ার্ড হব?

হুঁ। মাসিমা বোধ হয় বাড়ি নেই?

নেই তো কী? মা থাকলেই কি আমি ভয় পাই?

তার প্রমাণ একটু আগেই হয়ে গেছে। কোথায় গেছেন মাসিমা?

বাজারে।

আহা, শুনে মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। আমার মা জননী যে কতদিন এই স্বর্গসুখ থেকে বঞ্চিত।

সত্যি?

পপি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, পয়সা খরচ করে দুখু কিনেছিস তোরা?

ফর তোরা?

আচ্ছা বাবা আচ্ছা, না হয় মেসোমশাই, আর আজ থেকে প্রার্থনা করি, মেসোমশাইয়ের যেন সত্যি সুমতি হয়।

টুটু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, প্রার্থনা। হুঁ! ওতে যদি কোনো কাজ হত্ত এতোদিনে এ দুঃখের অবসান হত। নো হোপ! ওই তুই যা বলেছিস, সাতমণ তেল নাচলে তবে রাধার পোড়া!

টুটু! দোহাই তোর, আর বাঙলা বলতে আসিসনে। তোর মুখে ওই ফাদার মাদারই মানায়।

ঝামা পুকুরের সেই গলিটায় ঢুকেই দু'তিনটে আধা ছোট ছেলে খেলা ফেলে এগিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, কাকা! ছোটকাকা!

পীযূষ তাকিয়ে দেখল। মার্বেল খেলছিল ওরা।

গলির চেহারাটা অবিকল রয়ে গেছে, যেমন ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে।....

মনে হল যেন এর মধ্যে আর দেখেনি গলিটাকে। তাই ওই ছেলেগুলোর আরো যে দলবল হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, তাদের মধ্যে যেন হঠাৎ আর একটা হাফশার্ট আর হাফপ্যান্ট পরা ছেলেকে দেখতে পেল। ছেলেটার তখনকার নাম ছিল 'পীযূষ'।

এখন ওই নামটা সবাই ভুলে গেছে!

হ্যাঁ ভুলেই গেছে।

তাই অসুস্থ বড়দাও কোনমতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কাঁপা কাঁপা গলায় বলে ওঠেন, পীযূষ এসেছিল? পীযূষ? বাড়ির সব ভালো তো?

বড়ো বৌদির অবশ্য কাঁপা গলা নয়, বলতে পারা যায়, বাজখাঁই গলা। তিনি রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলেন, ব্যাপার কী গো, কার মুখ দেখে উঠেছি আজ? ডুমুর পুষ্পের দর্শন লাভ হল।.....ওরে কাকাকে বসতে দে।

আর বসতে দিতে হবে না—

পীযূষ দালানে পাতা আজন্ম দেখা তেল ধরা চৌকিটায় বসে পড়ে বলে, খুব লজ্জা দেওয়া হচ্ছে নিজেরাই বা একদিন যাও কই, বাবা!

ইত্যবসরে মেজ বৌদিও রঙ্গমঞ্চে এসে যান। বাড়ির সব সদস্যই জড়ো হয়ে যায়।

'ছোটকাকা' একটি দুর্লভ দৃশ্য তো।

মেজো বৌদি বলেন, আমরা? আমরা যাব?

কেন? যেতে নেই? কলকাতা শহরে যতোগুলো সিনেমা হল আছে, কোথায় না দুবার করে পদধূলি পড়েছে। তুমিতো পাণ্ডা।

মেজবৌদি খরখরিয়ে বলেন, সিনেমা হল ঠিকানা দিয়ে বিজ্ঞাপন দেয়, তুমি তোমার বাড়ি চেনার কোনো ব্যবস্থা রেখেছ? শুনি যে কোন পাড়াগাঁয়ে গিয়ে বাস করছেন নাকি সাহেব মেমসাহেব।

আর বোলোনা। মেমসাহেব এখন খাঁটি গিন্নী।

বলে একথা পীযূষ ইচ্ছে করেই বলে। এদের সঙ্গে এতাবৎকাল যে দূরত্ব সৃষ্টি করে চলেছে, সেটা সহজ করে নিতেই এই প্রয়াস।

বড়ো বৌদি বলে ওঠেন, ছোটবৌকে তুমি খাঁটি গিন্নী বানাতে পেরেছ? চোখে দেখলেও বিশ্বাস করব না।

আচ্ছা, তবে চোখেই দেখবে চল।

পীযূষ চৌকিতে একটা থাপ্পড় মারে। যেমন সেই কোন অতীতে মারত, বৌদিদির সঙ্গে ঠাট্টা তামাসার বাজি ধরায়। ভারী ভালো লাগে। অদ্ভুত রকমেব ভালো লাগে।.....এ বাড়ি ছেড়ে চলে পর্যন্ত যখনই এসেছে, নিজেকে কেমন অপরাধী অপরাধী লেগেছে। আজ যেন সেই অপরাধীর ভূমিকাটা থেকে বেরিয়ে পড়ে গেছে হঠাৎ।

আশ্চর্য। এরাও যেন এতোদিন আড়োআড়ো ছাড়োছাড়ো ভাবে দূবত্ব বেখে কথা বলেছে, কুটুম্বের মতো ভালো মিষ্টি আনিয়ে আপ্যায়ন করেছে।.... পীযূষ সেই দূরত্বটাকে দূর করতে এগিয়ে এল, এরাও সঙ্গে-সঙ্গে সেটা দূর করে ফেলল।

পীযূষ বলল, সেই অভাবিত দৃশ্য দেখাবার জন্যেই আমার আসা। সামনের রবিবারে চল সবাই।

চল সবাই? কোথায়?

আহা আমার সেই পল্লী কুটিরে। সবাইকে যেতে হবে কিন্তু কাউকে ছাড়ব না।

ভালো লাগছে। নিজের কথাই নিজের কানে মধুবর্ষণ করছে। পীযূষকান্তি নামের লোকটা তো আগে এই ভাষাতেই কথা বলত। মাঝে যেন সব ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। কথাতে যে এমন রস থাকে, তাই বা মনে ছিল কই?

সকাল বেলা যাবে, রাত্তিরবেলা আসবে। সারাদিনের বনভোজন!

পীযূষ কথায় আরো রস চাপায়।

পীযূষ যেন মাঝখানের বোস সাহেবকে ভুলে যায়।

উৎসুক শ্রোতাদের সমবেত প্রশ্ন উছলে ওঠে। কী হল! কী বলছে পীযূষকান্তি!

ব্যাপারটা কী! হঠাৎ একি? মেয়ের পাকা দেখা নয় তো?

আরে বাবা সেদিন সুদূরে? কিচ্ছু না, এমনি—

বলে পীযুষ লজ্জা লজ্জা গলায় ব্যক্ত করে—বাড়িই কিনেছি একখানা। 'গৃহপ্রবেশে'র কোনও আয়োজন তো করতে পারিনি। তাই একদিন সকলে জড়ো হয়ে হৈ হৈ করা আর কি?

খবরটায় একটু হকচকিয়ে গেল সকলে। তারপর বড়ো বৌদি উছল হয়ে উঠলেন—এতদিন বাদে এতোবড়ো খবরটা দেবার সময় পেলে ঠাকুরপো? আমরা কি—

পীযূষকান্তি লজ্জিত গলায় বলে, না তা ঠিক নয়, আসলে নানা ঝামেলায় ঠিক সময় করে উঠতে পারিনি। নয় তো—

এরপরই পীযূষ ফুলটুসিদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হল।

ফুলটুসি অবাক।

রাঙাদা! হঠাৎ!

তা বলতে পারিস। সময় টময় পাই না।

তুমি তো অনেক দূরে চলে গেছ।

গিয়েছিলাম, আবার কাছে আসছি।—তুই কিন্তু বেশ মুটিয়েছিস।

বাঃ একটু গিন্নী আকৃতি না হলে লোকে মানবে কেন?

ফুলটুসির বর বলে ওঠে আকৃতিতে কি আর মানে লোকে? মানে প্রকৃতিতে। তুমি হিমালয় পাহাড় হয়ে উঠলেও কেউ মানবে না।

ফুলটুসির ছটা ছেলেমেয়ে; বড়ো হয়ে গেছে সবাই। তাই সবাইকে নেমন্তন্ন করে পীযূষ আলাদা করে। ব্যাপার কী!

কিছু না একদিন পিকনিকের স্বাদ পাওয়া যাক।

ও বাড়ির মতো এ বাড়িতেও বারবার বলল পীযূষ। আর বলল সবাই মিলে একদিন হৈ চৈ করা যাবে। ঝামাপুকুরেও সবাইকে বলে এলাম।

ওমা, তাই নাকি? কী মজা!

ছেলেমানুষের মতো হাততালি দিয়ে ওঠে ফুলটুসি। সেই আহ্লাদের অনুরণনটুকু নিয়ে পীযূষ সেই ভবিষ্যৎ উৎসবের দিনটির ছবি দেখে উল্টে পাল্টে— ট্যাক্সিতে বসে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে।

পীযূষ যেন একটা মস্ত ঐশ্বর্য হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলেছে।

আশ্চর্য! এটা পীযূষের হাতে ছিল?

এই মস্ত ঐশ্বর্যটা?

অথচ পীযূষ কেবল পাশ কাটিয়ে পালিয়েছে। কারণ পীযূষকান্তি এযাবৎ নিজেকে পরিচালিত করছে কেবল অন্যের ইচ্ছের অঙ্গুলি হেলনে। হঠাৎ সেই পাশটাও উল্টে ফেলতে পেরেছে পীযূষ।

গড়িয়াহাটের ধারে ছবির মতো সুন্দর একটি ফ্ল্যাট আর মাসে মাসে অনেকগুলো টাকা ওদের হাতে দিয়ে পীযূষ এবার থেকে নিজের জীবনের কর্ণধার নিজে হবে।

কিন্তু বুঝতে দেবে না কাউকে।

ওরা ভাববে আমার চোখে বুঝি এখনো সেই পুরনো চশমাটাই আছে।

আজ দেরী হল না ফিরতে—

সুরমা অবাক হয়ে বলল, ট্যাক্সিতে এলে? অসুখ টসুখ করেনি তো?

পীযূষ হেসে বলল, শুধু কি অসুখেই গাড়ি চড়তে হয়? সুখে চড়া যায় না?

হঠাৎ এতো সুখটা কিসের?

বলব—বলব—সবাই একসঙ্গে হও।

সুরমা আর কথা বলল না।

সুরমা ভাবল, ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে না।

হঠাৎ কোন পার্টি ফার্টিতে মদ টদ খেয়ে এল না তো। এমন পার্টিতে তো হরদমই যায়, লোকটা খায় না তাই। তা মন না মতি।

সবাই একত্র হতে রাত্রি।

সবাই একত্র হলে কথাটা ভাঙল পীযূষ। বালিগঞ্জ প্লেসে ফ্ল্যাট ঠিক করে এসেছে, সামনের মাসের পয়লা উঠে যাওয়া যাবে।

শুনে প্রথমটা সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল।

পীযূষ যেন সহসা ওর পরিজনের ওপর একটা থাপ্পড় বসিয়েছে।

তারপর একটা অনাস্বাদিত ঢেউ বইতে লাগল। বিস্ময়ের, আবেগের, অবিশ্বাসের!

অবিশ্বাসটাই প্রধান, বাবা হয়তো ঠাট্টা করছে। পকেট থেকে দলিলটা বার করার পর আর অবিশ্বাস থাকে না।

বহুদিন পরে আবার পীযূষকে ঘিরে কল-কোলাহল ওঠে। বাপী তুমি কী সুইট বলে গলা ধরে ঝোলে না বটে বুলু, তবে বাপীর গা ঘেঁষে বসে, বাপীর এই সারপ্রাইজ দেওয়ার অভিনয় মহিমায় বিগলিত হয়।

সুরমা হাসি হাসি মুখে সেই ফ্ল্যাটের বর্ণনা বিবরণ শোনে আর বলে যাক জীবনে প্রথম একটা অদ্ভুত ক্ষমতা দেখালে তুমি। আমায় না জানিয়ে এমন একটা বৃহৎ ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছ?

পীযূষকান্তি বোস সুরমার অগোচরে আরো কত বৃহৎ একটা ঘটনা ঘটিয়ে বসে আছে, সুরমা কি তা জানে। বলবে পীযূষকান্তি সবই বলবে।

তবে চট করে ভাঙল না। আসতে আসতে ভাঙতে বসল, আরো একটা তাক লাগাবার মতো জিনিস দেখাব তোমাদের।

নীলু হেসে ফেলে বলে, সেটা আবার কী বাপী?

এটা? সেটা তোদের ফুলটুসি পিসি। সামনের রবিবারে আসবে দেখিস সেই টুনি পাখির মতো মানুষটা স্রেফ ফুটবল হয়ে গেছে। একদম গোল। বলে কিনা আকৃতি দেখে কেউ গিন্নী বলে মানে না তাই শরীরকে পাম্প করে ফুলিয়ে নিয়েছি।—তা তোদের পিসেমশাই বলে, আকৃতিতে কি আর কেউ মানে হে? মানে প্রকৃতিতে। তুমি একখানি গন্ধমাদন পর্বত হয়ে উঠলেও তোমায় কেউ মানবে না।.....বেশ আছে ওরা সবাই, হেসে খুশে ঠাট্টা তামাশা নিয়ে।

সুরমা এতোক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর আলো আলো মুখটার দিকে তাকিয়ে দেখছিল, এখন ভুরু কুঁচকে বলল, ফুলটসিদের বাড়ি কখন গেলে?

ওইতো সন্ধেবেলা।

ওঃ আড্ডা দিয়ে দেরী করে ফেরার খেসারৎ বুঝি ট্যাক্সি ভাড়া গেল।

না না আজ দুপুর বেলাই অফিস থেকে কাট মেরেছি।

ওঃ! তা হঠাৎ আসবার ইচ্ছে হল যে?

আরে বাবা, ইচ্ছে তো ওর হয়েই আছে, জান তো ওকে। বরের ওপর খুব ঝঙ্কার দিচ্ছিল, নিয়ে আসে না বলে। আমি বলে দিলাম, ঠিক আছে, রবিবার সকালে চলে যাবি ওখানে, পিকনিক হবে। ঝামাপুকুরের ওখানেরও সব্বাইকে বলে এসেছি। সবাই মিলে হৈ হৈ করা যাবে একদিন।

নীলু সকলের বড়ো, নীলুর স্মৃতিতে ঝামাপুকুরের বাড়ির ছবিটা স্পষ্ট। নীলু বলে ওঠে, ওমা কী মজাই হবে তাহলে। উঃ কতদিন যে দেখিনি ওঁদের। মুখ গুলোই ভুলে গেছি যেন।

কথাটা সত্যি।

আসা যাওয়া নেই।

প্রথম প্রথম সুরমার বড়জা পারিবারিক বার ব্রত নিয়ম লক্ষণ ষষ্ঠী মনসা ইত্যাদিতে নেমন্তন্ন করে পাঠাতেন। ক্রমশই সেটা শূন্যের অঙ্কে পর্যবসিত হয়ে গেছে। যে যাবে, তার সময় হয় না, যারা ডাকবে তারাও স্তিমিত হয়ে যায়।

অতএব নীলুর পক্ষে ওটা বলা ভুল নয়।

বুলু হঠাৎ বলে ওঠে, এত সব নেমন্তন্ন করে এলে? কী ব্যাপার বাপী? এত খাটবে কে? মাকে তো তাহলে বধ করা হবে।

এই দেখ, এত সব তোদের মার ঘাড়ে চাপাব? আমি কি এতই পিশাচ রে?....কথা বার্তায় নিজের ফর্মে এসেছে পীযূষ, একেবারে আমাদের ও পাড়ার কেশব ঠাকুরকে বলে এলাম, রবিবার ভোরবেলাই সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে চলে আসতে। স্রেফ দিশী রান্না। বড়দা তো আবার মাংস-টাংস খান না।.......বাজারটা আমি গড়িয়াহাট থেকে—জায়গার তো অভাব নেই এখানে। ধোঁয়া-টোঁয়া সব বাড়ির বাইরে হবে।

যত তাড়াতাড়ি পারে, কথাগুলো বলে পীযূষ। আরো কি বলতে যাচ্ছিল—

সুরমা সহসা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের কণ্ঠে বলে, এত সব হয়ে গেছে? এটা তো মনে হচ্ছে আরো তাক লাগবার মতো। ব্যাপারটা কী? কোন লটারিতে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়ে গেলে নাকি?

পীযূষ মৃদু হেসে বলে, তাই। এই বাড়িটাকে কাল বায়না করতে আসবে, বেশ মোটা টাকা দেবে। দামের উপর সেটা ফাউ। তাই ভাবলাম গৃহপ্রবেশে তো কাউকে—

সুরমা আরো তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, বাড়িটাকে বায়না মানে?

মানে? মানে বেশে একখানা খদ্দের ঠিক করে ফেলে বাড়িটা বেচে দিচ্ছি।

ধাক্কায় স্প্রীঙের মতো ছিটকে উঠল সুরমা, তার মানে? বাড়িটা বেচে ফেলার একেবারে ঠিকঠাক করে ফেলেছ? খদ্দের রেডি, অথচ আমায় একবার জানানোর পর্যন্ত দককার মনে করনি।

সুরমার এই অভিযোগের সঙ্গে সুরমার তিনটি সেনাপতিরও সমর্থন যুক্ত হয়।

সত্যি এ কী অন্যায়!

পীযূষ শান্তগলায় বলে, কিন্তু জানাইনি বলছ কেন? সে দিন তো স্পষ্ট করেই বলেছিলাম—

বাঃ সে তো একটা কথার কথা। সেটা কোন কাজের কথা নাকি! সকলেই তো ভেবেছিল, রাধাও নাচবে না, সাত মণ তেলও পুড়বে না। এক্ষুনি যে এতবড়ো বাড়িটার খদ্দের জুটে যাবে তা কে জানে।

পীযূষ আরো শান্ত গলায় বলে, তা তোমাদের এতে বিচলিত হবার কী আছে? এ বাড়িটাতো তোমাদের দু'চোখের বিষ।

বড়িটার কথা কে বলেছে! জায়গাটা।

সে একই কথা। তোমরা তো এখানে থাকবে না, তবে এটা রেখে লাভ!

সুরমা তীক্ষ্ণ গলায় বলে, একেবারে থাকব না, একথা কে জোর করে বলতে পারে। ভবিষ্যতের কথা বলা যায়?

ভবিষ্যৎ!

পীযূষকান্তি বোস কি এখন হেসে উঠবে? হো হো করে? সুরমাও ভবিষ্যতের কথা ভাবতে বসেছে?

না লোকের সামনে হাসা যায় না, হাসবে মনে মনে।

পীযূষকান্তি গম্ভীব হয়ে গিয়ে বলে, তা তোমার ওই 'ভবিতব্যটা' তুলে রাখতে হলে তো আবার সেই বর্তমানটাকেই বন্ধক দিতে হয়। সম্পত্তিটা বেচে না ফেললে তো আর—

হঠাৎ সকলকে চমকে দিয়ে সুরমা খিলখিল করে হেসে ওঠে। ছুরির ধারের মতো তীক্ষ্ণ তীব্র।

কিন্তু সম্পত্তিটা কার? কার সম্পত্তি কে বেচবে। বাড়িটা সুরমা বসুর নামে তা নিশ্চয় মনে আছে? এ সম্পত্তি সম্পর্কে কোন কিছু করার অধিকার আইনত তোমার নেই, তা জান?

পীযূষ ও কথাটাকে নস্যাৎ করে দেবার ভঙ্গীতে বলে, ওটা তো কোনো কথা নয়, ইনকাম ট্যাক্সের ঝঞ্ঝাট বাঁচাতে সবাই অমন স্ত্রীর নামে সম্পত্তি কেনে।

সুরমার মুখে তীক্ষ্ণ রহস্যময় একটু হাসি ফুটে ওঠে, যে জন্যেই যা করুক, সেই ভিন্ন তো আর বেচাকেনা যাবে না। বাড়ি বিক্রির ব্যাপারে সই আমি দিচ্ছি না।

টুটু হঠাৎ দাঁড়িয়ে ওঠে জোর জোর হাততালি দিয়ে বলে ওঠে, ওঃ জননী!

কী ফার্স্টক্লাস ব্রেন। কী একখানা প্যাঁচ বাতালে মাইরি। বোস সাহেব একেবারে ঠাণ্ডা। কিন্তু এই ইটের হিমালয়খানি নিয়ে কী করবে বলতো?

সুরমা মহেন্দ্রানীর ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে উঠে বলে, কিছু না করি, মাঝে মাঝে সবাই মিলে পিকনিক করতে আসতে পারি।—মোট কথা—আমার সম্পত্তি আমি হাতছাড়া করতে দেব না। সাতজন্মে তো তোদের বাপী আমায় একখানা দামী গয়নাও দেয়নি, নেহাৎ ইনকাম-ট্যাক্স ফাঁকি দেবার দরকারে সম্পত্তি আমার নামে বেনামী করা হয়েছে আমিই বা সে সুযোগ ছাড়ব কেন?—তোমার খদ্দেরকে বলে দিও—যাঁর জিনিস তিনি বেচতে রাজী নন। ব্যস।

ব্যস।

এরপর আর কথা নেই।

আর তবে তুমি কী করবে পীযূষকান্তি বোস? মাথা চাপড়াবে? মাথার চুল ছিঁড়বে? অথবা গিন্নীর পায়ে ধরবে?

না কি গিয়ে বন্ধুর পায়ে পড়েই বলবে, ভাই হে, আমার আর কিছু করার নেই। আমি নিরুপায়।....আর সেই নিরুপায়তা আমি পয়সা দিয়ে কিনেছি। অনেক পয়সা দিয়ে।.....

কেমন কিনে থাকি আমাদের সব দুঃখ আর অভাব, সব জ্বালা আর যন্ত্রণা। কিনে কিনে জড়ো করে চলি সারাজীবন ধরে। আর ভাবি খুব বুদ্ধির কাজ করছি।

—০—

শুক্তি সাগর

'—আপনারা নিশ্চয় বলবেন গল্পটা আজগুবি! বলবেন, তিরিশ বছরের নায়িকা আর তেরো বছরের নায়ক? এতটা চমক আপনিও আর নাই দিলেন অমুক মিত্তিরের মত। বলবেন, আপনাদের—অর্থাৎ, এই সব আপনাদের গিয়ে পঞ্চাশোর্ধ্ব সাহিত্যিকদের তো দেখছি, ভেতরের বস্তু ফুরিয়ে গেছে, তাই বিষয় বস্তুর চটক নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, যাতে বাজারটা থাকে।....কিন্তু মশাই, বাজার আপনাদের সহজে ফুরোবে না, অন্ততঃ যতক্ষণ পর্যন্ত কাগজওলারা আপনাদের নাম ভাঙিয়ে বিজ্ঞাপন জোটাতে পারবে, ততক্ষণ আপনাদেরও অন্ন জুটবে। তা সে যত ভুষিমালই চালিয়ে যান। অতএব এইসব বাজে চমক দিয়ে আমাদের গেরস্তর বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলোর মাথা আর নাই খেলেন।

বললেন, বা বলতে পারেন আপনারা। কেননা, আমাদের বিরুদ্ধে অনেক নালিশ জমা আছে আপনাদের মনে। কেন আছে, তার কারণও যে না জানি তা নয়। কারণ হচ্ছে, যে-আদর্শের ছবি আপনারা চান, বা যে আশার গান, সে ছবি, সে গান আমরা দিতে পারছি না।

কিন্তু পারছি না যে, তারও একটা কারণ আছে বইকি। জীবন আর সমাজ, এই তো সাহিত্যের উপজীব্য। সাহিত্যের তো কেবলমাত্র অতীত গৌরবের ইতিহাস, অথবা ভবিষ্যৎ স্বপ্নের ছবি হবার সাধ্য নেই। ওকে যা হবার তা হতেই হবে। যা হয়, তা দেখাতেই হবে। কাজেই—

কিন্তু তবু এ গল্পের পক্ষে একটা খবর জানাবার আছে। গল্পটা এ যুগের নয়। এই উদ্‌ভ্রান্ত আর বিশৃঙ্খল সমাজের যুগের। এ হচ্ছে সেই যুগের, যে যুগে গৃহস্থের বৌরা মাথায় কাপড় দিত, আর চট্ করে পরপুরুষের সামনে বেরোত না।

এত বড় একটি গৌরচন্দ্রিকা করে তবে গল্প শুরু করলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক সংবরণ চৌধুরী। 'সংবরণ' নামটা ওঁর ছদ্মনাম। পদবীটাও। কিন্তু ওটাই এখন আসলে দাঁড়িয়েছে। মা-বাপের দেওয়া নাম-পদবীটা কেবল অফিসিয়াল কাজে ব্যবহার হয়।

জনাকয়েক ভক্ত ঘিরে বসেছিল প্রবীন সাহিত্যিক সংবরণ চৌধুরীকে। না,

তরুণ সাহিত্যিককুল নয়। এ যুগে আর নবীনেরা প্রবীণের দরজায় প্রত্যাশার পাত্র নিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় না। উভয় পক্ষেই প্রেরণার অভাব। বসে ছিল তরুণ ভক্ত পাঠক কিছু। সংবরণকে ধরেছিল ওরা। মুখে গল্প বলার জন্যে।

'লিখে লিখে তো অনেক শোনালেন, আপনার মুখ থেকে একটা গল্প শুনতে চাই।' বলেছিল ওরা সংবরণকে নিজেদের কোর্টে পেয়ে। তা কোর্টেই পাওয়া। মফঃস্বলে সভা করতে গেলে, কেবলমাত্র 'সভা'র কাজ শেষ করে তো আর কর্তব্য শেষ করা যায় না। অনুরোধ-উপরোধ, আবেদন, ভক্তি-নিবেদনের চাপে আরো দু-একটা 'সভা'র ভার নিতে হয়, সে দেশের বিশেষ বিশেষ দ্রষ্টব্যগুলি দেখে যেতে হয়, হয়তো বা স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাড়িতে নেমন্তন্নও খেতে হয়। এসব মেটাবার পর আবার ট্রেনের সময়ের প্রশ্ন থাকে। কাজেই অকারণেই হয়তো থেকে যেতে হয় এক-আধবেলা। সেই 'বেলা'-গুলোই ওদের কোর্টে পাওয়া। এটা ওদের ক্লাবের লাইব্রেরি-ঘর। সন্ধ্যাবেলায় নিয়ে এসেছে ওরা সংবরণকে। অন্য কোনও ফাংশন নয়, শুধু গল্প শুনবে।

ঘরের আলো খুব জোরালো নয়, একটু মফঃস্বলী মিটমিটে। ইলেকট্রিক সরবরাহ নাকি এখানে যথেষ্ট নয়, সে অভিযোগ এসেই শুনতে হয়েছে সংবরণকে। তবু ভালই লাগছিল সংববণ চৌধুরীব।

এই একটু ম্লানছায়া ঘর, এই চাবিদিকের পুরনো-বই পুরনো-বই গন্ধের সঙ্গে, একসঙ্গে একমুঠো জ্বেলে-দেওয়া ধুপের গন্ধ আর সংবরণকে দেওয়া ফুলের মালার গন্ধ যেন আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল সংবরণকে।

তবু ওই স্পষ্ট আর কড়া গৌরচন্দ্রিকাটি করলেন সংবরণ। হয়তো এটা সকালের সভার প্রতিক্রিয়া। সেখানের যিনি সভাপতি ছিলেন, স্থানীয় একজন হোমরা-চোমরা, তিনি তাঁর ভাষণে আধুনিক সাহিত্যের মুণ্ডপাত করে, প্রধান অতিথি সংবরণ চৌধুরীকে প্রায় সবাসরি আক্রমণ করে বসেছিলেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ সাহিত্যিকরাও এখন নিজেদের মান-সম্ভ্রম বিসর্জন দিয়ে শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢুকছেন,.... আদর্শ ত্যাগ করে দেহবাদী সাহিত্য রচনা করছেন, জাতিকে নীতিভ্রষ্ট করছেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

সভাপতির ভাষণের পর আর কোনও বাদ-প্রতিবাদ শিষ্টাচার-সম্মত নয়, তাই চুপ করেই ছিলেন সংবরণ। অথবা চুপ থেকেছিলেন বাদপ্রতিবাদ তাঁর স্বভাব নয় বলেই। শুধু সভাভঙ্গের পর জিগ্যেস করেছিলেন, 'ভদ্রলোকটি কে?'

পরিচয়-দাতা আনন্দোজ্জ্বল মুখে উত্তর দিয়েছিলেন, 'আজ্ঞে স্যার, এখানের আই-জি-সি। ভারী সাহিত্যরসিক লোক—'

আই-জি-সি কী হওয়া সম্ভব সেটা নির্ধারণের চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে সংবরণ বললেন, 'লেখেন টেখেন?'

'আজ্ঞে লিখলে ভালই লিখতে পারতেন। কিন্তু সময় কোথায়! তবে সাহিত্যের ব্যাপারে উনি সর্বদা অগ্রণী। চাঁদা-টাদায় তো—যাকে বলে মানে মুক্ত হস্ত।

ওঁকে সাহিত্য-সভার সভাপতি করার রহস্যটা পরিষ্কার হয়েছিল সংবরণের কাছে। এবং বোধকরি সেই তিক্ততাটা সম্পূর্ণ পরিপাক করে উঠতে পারেন নি। তাই এখন ওদের গল্প বলতে বসে সম্পূর্ণ অবান্তর এই গৌরচন্দ্রিকাটা করে ফেললেন। অথচ এটা আশ্চর্য!

সংবরণ চৌধুরী খুবই আত্মস্থ পুরুষ। কাগজে তাঁকে গালাগাল দিলেও বিচলিত হন না, স্বর্গে তুললেও বিগলিত হন না। কিন্তু কখন যে মানুষের মনের কোন্ ঘরের জানালা খুলে পড়ে, কোন্ ঘরের দরজায় টোকা পড়ে!

ওরা কিন্তু ওসব শুনতে চায় না। স্রেফ্ গল্প চায়।

সংবরণ তাকিয়ে দেখলেন, দু-একটি মেয়েও এসে বসল। কলেজের ছাত্রী, অথবা কোনও 'সম্মিলিত তরুণ সঙ্ঘে'র সদস্য। এই মফস্বল শহরেও এই সন্ধ্যা-পার-হওয়া সময়ে ওরা অকুণ্ঠ ভঙ্গীতে এতগুলো ছেলের সঙ্গে এসে বসল। ভাবলেন সংবরণ।

সঙ্গে সঙ্গে ভাবলেন, ওই আই-জি-সি আর ভি-আই-পি-রা কি সমাজের চেহারা-বদল দেখতে পায় না? অনায়াসে উদাত্ত কণ্ঠে ভাষণ দেয়, 'আদর্শবাদ উঠে গেছে, দেহবাদই এখন সাহিত্যের আশ্রয়। মাতৃস্নেহের মধ্যে আর এ-যুগের সাহিত্যিকরা বিষয়বস্তু খুঁজে পান না, বয়স-নির্বিচারে সব ভালবাসাকেই তথাকথিত প্রেম বা প্রণয়ে পরিণত করেন।'

উচ্চপদের গৌরবে ওঁদের কণ্ঠও উচ্চ।

'স্যর, রাত হয়ে যাচ্ছে—'

সংবরণ বললেন, 'ও হ্যাঁ, কী বলছিলাম?'

'ইয়ে, বলছিলেন, তিরিশ বছরের নায়িকা আর তেরো বছরের নায়ক—'

—ও হ্যাঁ! সেই কথাই বলছি। ভালবাসার ক্ষেত্রে কী যে হয় আর কিবা না হয়! লিখলে তোমারা—তুমিই বলছি, ছেলেমানুষ তোমরা—ওদের ফাঁসির হুকুম দেবে, কিন্তু জগতে এসব ঘটে। সব যুগে, সব কালে। এটাও ঘটেছিল,

এ যুগে নয়। যখন বৌরা মাথায় কাপড় দিত। বানানো গল্প নয়, আমার নিজের চোখে দেখা।

তাই ওদের কথা যদি বলতে হয়, তাহলে ওই তেরো বছরের ছেলেটাকে নিত্যদিন ছোটাতেই হয় তিরিশ বছরের দরজায়। উপায় নেই আমার।

সে দরজা খোলাই থাকে। তিরিশ বছর দাঁড়িয়ে থাকে সে দরজায়।

আপন মনে গুণগুণ করে, 'কালা তোর তরে কদমতলায় চেয়ে থাকি। চেয়ে চেয়ে গেল আমার কাজলপরা জোড়া আঁখি।'

গাইতে গাইতে গুণগুণানি ঝঙ্কার হয়ে ওঠে, 'আমার চুল-বাঁধা হয় না, আমার গা ধোয়া হয় না, আরো হয় না কত কী!....তবু কদমতলায় চেয়ে থাকি—'

কিন্তু যে মুহূর্তে মোড়ের মাথায় একটি ডোরাকাটা শার্টের ডোরা ঝলসে ওঠে, ওর মুখের চেহারা বদলে যায়। মধুরা তখন প্রখরা হয়ে ওঠে। যদিও বুকে থাকে আঠারো বছরের আবেগ, আর মুখে-চোখে থাকে পনেরোর লাবণ্য, কিন্তু কণ্ঠ তীব্র ঝঙ্কার দেয়, 'এতক্ষণে সময় হল বাবুর? আয় শীগ্‌গির। সারা দুপুর ধরে চিংড়ির কাটলেট বানালাম তোর জন্যে, জুড়িয়ে একেবারে গুব্‌লেট হয়ে গেল!...দেরি কেন?'

তেরো বছর আরক্ত মুখে বলে, ক্লাসের পর আটকে রেখেছিল—'

'তাই না কি? কেন?'

'পড়া তৈরি হয় নি বলে—'

'এই সেরেছে! আমার নামে দোষ দেয় নি তো?'

'কেন? তোমার নামে কেন?'

'তা'তে কি, দিলেই পারে। হয়তো বলবে রায়গিন্নী আদর খাইয়ে খাইয়ে মিত্তিরদের ছেলেটাকে স্রেফ্ বাঁদর করে তুলছে—'

'রায়গিন্নী বলবে তোমায়! গিন্নী, য্যাঃ!' তেরো বছর হেসে ওঠে। ও বলে, 'বলবে না? গিন্নী নই আমি?'

'দূর!'

'তা না বলুক। পড়া-লেখা খারাপ করিস না বাপু। তাহলে আর মুখ থাকবে না আমার। তুই একটা দিগ্‌গজ হবি, এই আমার ইচ্ছে।'

'ভাবি তো—'

'আচ্ছা এরপর ভাবিস। এখন খাবি আয় দিকি। আয় আয়, শীগ্‌গির আয়।'

মুখরা নায়িকা, মুখচোরা নায়ক, তাই নায়িকার কাজ অনেক বেশি। হাত

ধরে টেনে এনে বাড়িতে ভরে ফেলতে হয়, কাকের বাসা চুলগুলোকে টেনে টেনে আঁচড়ে দিতে হয়, নয়তো বা ঘাড়ে গলায় পাউডারও দিয়ে দিতে হয় গরমে গলদঘর্ম ছেলেটাকে। স্কুল থেকে অনেকটা তো আসতে হয় রোদ্দুরে।

তেরো বছর বারে বারে লজ্জায় লাল হয়। হাত ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারবে কেন? একটি পুষ্ট যুবতীর পুরো জোরের সঙ্গে...

তাছাড়া গায়ের জোরেই তো সবটা নয়? মনের জোর কোথায়?

তিরিশ বছর হি হি করে হেসে বলে, 'হাত ছাড়িয়ে পালাবি ভেবেছিস? কার কবলে পড়েছিস জানিস? এ পুলিস না মরা অবধি আর তোর ছাড়ান নেই। ছাড়ব কেন? এমন একটি পছন্দসই মনের মানুষ কি ভাগ্যে সহজে জোটে!'

এরা কিছুক্ষণ উসখুস করছিল। একজন বলে উঠল,'স্যার, ওদের নাম?'

'নাম!'

'আজ্ঞে, ওই নায়ক-নায়িকার—'

'ও হো হো! নাম কিছু একটা বলা হয় নি বুঝি? তা, নাম চাই কেমন? আচ্ছা ধর, ছেলেটার নাম সাগর। সাগরময়। আর ওর নাম,...ওর নাম শুক্তি। কিন্তু ওকে আর নাম ধরে ডাকছে কে? বাড়ির বৌকে, বা স্বামীরা স্ত্রীকে নাম ধরে ডাকার চলন বিশেষ ছিল না তখন।

স্বামী 'এই,' 'ইয়ে,' 'শুনছো,' 'তুমি,' এইসব দিয়েই কাজ চালাতো। ননদ বলতো 'বৌ'।

হ্যাঁ, ঘরে বিধবা ননদ আছে. মান্যে বয়সে দু'দিকেই বড়।

সে মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে বলতো, 'তোমার না হয় ন্যাকরা করার সাধ মিটছে, কিন্তু পরের ছেলের কাঁচা মাথাটা যে চিবিয়ে খাওয়া হচ্ছে বৌ। ওইটুকু ছেলের সঙ্গে আবার ওসব কি ঠাট্টা?'

বৌ চোখ কপালে তুলে, গালে হাত দিয়ে বলে, 'ঠাট্টা কী গো ঠাকুরঝি? এ যে একেবারে জলজ্যান্ত সত্যি কথা। পতি পরম গুরু তো দুটো মন্তর পড়লেই মেলে, মনের মানুষ কি সহজে মেলে? বড় দুর্বল বস্তু।'

'গলায় দড়ি তোমার!' বলে উঠে যায় ননদ।

শুক্তি হাসে মুক্তোর মত দাঁত ঝিকমিকিয়ে। যে হাসিতে সাগর মোহিত মুগ্ধ।

বরও মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়। বলে, 'বাঁজা মেয়েমানুষদের পরের ছেলে নিয়ে মাতামাতি দেখেছি বটে, কিন্তু সে কি ওই অতবড় একটা ধাড়ি ছেলে? কেন, পাড়ায় বাচ্ছা ছেলে নেই কারুর?'

শুক্তি রহস্যভরা চোখ তুলে বলে, 'একটা বোতলে-দুধ -খাওয়া-শোওয়া ছেলের জন্যে মরে যাচ্ছি আমি, একথা কে বললো.....

'জানি না! তাহলে ওকে নিয়ে এত মত্ত হবারই বা কি আছে? যত সব পাগলামী!'

বাহুল্য কেউ ভালবাসে না। আতিশয্য কেউ পচ্ছন্দ করে না।

কিন্তু শুক্তির যেন সব কিছুতেই আতিশয্য। বাতুলতায়, বাচালতায়, চোপায়, স্পষ্ট কথায়, আর তামাশায়।

তাই স্বামীর অভিযোগে কাজল-না-পরা কাজল চোখে বিদ্যুৎ হেসে বলে, 'তা পরের ছেলেদের নিয়েই তো আমাদের মেয়েদের কারবার। শুধু মত্ত কেন, উন্মত্তও যে হয়ে উঠতে হয় মাঝে মাঝে । না হওয়াই বরং 'অপরাধ'—

বর আরো বিরক্ত হয়ে বলে, 'থামো, যত সব ইয়ে। আমার মতে এ হচ্ছে এক রকম মনোবিকার। নিজে তুমি তামাশা বলে চালাবে ভাবছ, কিন্তু ফ্রয়েড পড়লে—'

শুক্তি সহসা গম্ভীর হয়ে যায়। চোখে আর বিদ্যুৎ হানে না।

সহজ গলায় বলে, 'সবাই তোমরা এক ভুল করো কেন জানি না। আমি তো কোনদিনই 'তামাশা' বলে ভাবি না।'

বলে। তবুও সবাই সেই কথাই বলে। যার সঙ্গে 'ছেলে' পাতাবার বয়েস, তার সঙ্গে কোনও কিছু সম্পর্ক না পাতিয়ে রাখার মানেই হচ্ছে—

রঙ্গরসের সুবিধে। কিন্তু দেওর নয়, নাতি নয়—এত কিসের ঠাট্টা-তামাশা, রঙ্গ-রস?

যেন সম্পর্ক একটা খাড়া করতে পারলে সংসারের লোক বাঁচতো। পরের ছেলেকে যদি কাছে টানতে ইচ্ছে হয় তো সম্পর্ক পাতা বাবা একটা। এত রং-তামাশার সাধ থাকে, 'নাতি' পাতা। নিদেন পক্ষে দেওর। তবু যাহোক মনকে মানিয়ে নেওয়া যায়। তা নয় 'কিছু নয়' এ কী? 'কিছু নয়' আবার একটা ডাক?

সম্পর্কের সূত্র আবিষ্কার করতে না পাবলে লোকে ধরবার খুঁটি ভেবেছি।

ওই ননদেরই তো এক বাল্যবিধবা খুড়শাশুড়ী, বরাবর তাঁর এক ভাগ্নের ঘরের নাতিকে 'বর' বলে সম্বোধন করতেন। সেই সম্বোধনের সূত্রে যা বেহেড় ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতেন রসিকা মানুষটি যে, তাতে শুধু বর কেন বর্বরেরও কান লাল হয়ে উঠতে পারতো।

কিন্তু কই, সেটা তো এমন দৃষ্টিকটু লাগত না? বরং ওই 'বর বর' করে

ক্ষ্যাপানো নিয়ে সবাই মজা উপভোগ করতো। এমন কি সেই 'বর' পাতানোর কৌতুকের দাবিতে ননদের খুড়শাশুড়ী বুড়ো বয়েস পর্যন্ত সেই নাতিটার ওপরই বিশেষ দখলস্বত্তি করে এসেছেন। তাঁর যা কিছু কাজ-কর্মের দায়িত্ব যেন তারই। সামান্য যা পুঁজি-পাটা, তাকে খাটিয়ে সুদে বাড়াতে, আর সুদের টাকা ব্যাঙ্কে পোষ্টাপিসে জমা দিতে, জগতের আর কাউকে বিশ্বাস করতেন না ভদ্রমহিলা।

ছেলেটাও যেন অলিখিত চুক্তিতে মেনে নিয়েছিল, ওঁর দায় আমার। কোথাও নিয়ে যেতে আসতে, কিছু কিনে দিতে—

তা, সেই ঠাট্টা-তামাশা, আর ওই দায়-দায়িত্ব দেওয়া-নেওয়া কটু না ঠেকে স্বাভাবিক মনে হতো, নাতি-ঠাকুমা বলে একটা সম্পর্ক ছিল বলেই না?

সম্পর্কহীন ভালবাসা সংসারী লোক বরদাস্ত করতে পারে না। তাই না ভালবাসার রকমফের আশ্রয়ের জন্যে আমাদের সমাজে এমন বহু সম্পর্কের মালা গাঁথা, বহু রসের বিকিকিনির ছাড়পত্র।

যে সমাজে পরপুরুষের সামনে বেরোনো দোষ, সেখানে এ ছাড়পত্র না থাকলে?

কিন্তু এ কে? এ কী?

এর সঙ্গে সম্পর্কটা কোথায়? একদিকে পাড়ার একটা ভাড়াটে বাড়ির ছেলে, নেহাৎ মুখচোরা ছোটখাটো গড়ন সাগর, আর অপর দিকে মিলিটারী ডাক্তার জগদীশ রায়ের বিদুষী পূর্ণযৌবনা পত্নী শুক্তি।

কিসে আর কিসে। হাতী আর ইঁদুর!

টেনে বুনেও সম্পর্ক আনা যায় না। জাতেই এক নয়।

তবু শুক্তি বেলা তিনটে থেকে রাস্তার দিকের দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকে, চারটের সময় সাগর নামক ওই ছেলেটা স্কুল থেকে আসবে বলে।

আরো দু-চারটে ছেলে সঙ্গে থাকে।

তারা দূর থেকে দেখতে পেয়ে হি হি করে হাসে, 'ওই দেখ, তোর 'কিছু নয়' দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেক দিন ঠিক থাকবে। যা, এখন গরম গরম চপ-কাটলেট, নরম নরম পিঠে-পায়েস খেগে যা। বেশ আছিস বাবা, আমাদের ভাগ্যে এ-রকম একটা 'কিছুনয়' জোটে না! বাড়ি গিয়ে এখন রুটি আর আলু-চচ্চড়ি খেতে হবে।'

স্কুলটা গেরস্তালী, ছেলেগুলো গেরস্তর শুধু অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যার বার্তা জেনেছে।

কিন্তু মুখচোরা বেচারা ওদের ঠাট্টায় লজ্জা পায়। ঘাড় হেঁট করে ওদের ছায়ায় ছায়ায় তাড়াতাড়ি এই দরজার সামনেটা পার হয়ে যেতে চেষ্টা করে। কিন্তু সফল হয় না।

হবার জো কী?

একজোড়া সন্ধানী চোখ ঠিক বুঝতে পারে গতিবিধিটা মতলবী। খপ করে এগিয়ে আসে, একটা হাত ধরে ফেলে বলে, 'পালাচ্ছিস যে বড়?'

ছেলেগুলো হেসে ওঠে।

শুক্তিও হেসে হেসে বলে, 'দেখতো দেখতো, ক'টা মাথা আছে ওর একটা ঘাড়ে? দু-চারটে বেশি না থাকলে এত সাহস হয়?'

ওরা ঠেলাঠেলি করতে করতে চলে যায় সাগরকেও একটু ঠেলে দিয়ে। সাগর লাল লাল মুখে ঢুকেই পড়ে। বলে, 'ওদের সামনে অমন হাত ধর কেন? ওরা হাসে' আগে 'আপনি বলতো, শুক্তি চড় মেরে 'আপনি' ছাড়িয়েছে। তাই 'তুমি' দিয়েই বলে সাগর।

কিন্তু ওর অভিযোগে লজ্জার লেশ নেই শুক্তির। বলে, 'ওমা। শোন কথা! লোকের সামনে হাত ধরবো না? আড়ালে আবডালে ধরবো তাই চাস না কি?'

'ধ্যেৎ' বলে বইগুলো রাখে ও।

কোন কোন দিন আবার 'মাথা'র কথাটা অন্যভাবেও বলে শুক্তি। ছেলেগুলোকে হাতের ইশারায় থামিয়ে বলে, 'দাঁড়া-দাঁড়া, দেখি সব শুদ্ধ কটা মাথা। পাঁচ ছয় সাত! হয়ে যাবে। কুলিয়ে যাবে। 'পার হেড্' দু'খানা করে। ইয়া ইয়া মাংসর চপ বানিয়েছি। আয় আয়, ঢুকে পড়।'

কিন্তু ওরা কেউ ঢুকে পড়ে না।

হি হি করে হাসতে হাসতে পালায়। ঢুকে পড়তে হয় তাকেই যার হাতটা আটকানো আছে একখানি কুসুমকোমল বজ্রমুষ্টির মধ্যে।

শুক্তি বলে 'তোর বন্ধুগুলো অমন অসভ্য কেন রে? ডাকলাম—এল না।'

সাগর বলে, 'বন্ধু আবার কি! শুধুতো এক ক্লাসে পড়ে।'

'বাঁচলাম বাবা, বন্ধু নয়। আমি ভয়ে মরি, আমার বুঝি ভাগ কমে যায়। কিন্তু যাই বলিস ছোঁড়াগুলো বোকারাম! বাড়ি গিয়ে গরম গরম চপগুলোর কথা ভেবে নির্ঘাৎ নিশ্বাস পড়বে।'

হ্যাঁ, এই রকমই কথা।

তেরো বছরের নায়কের সঙ্গে আর কোন্ কথাই বা হবে। তবে মুখ

চোরাটারও মুখ খোলে এক এক দিন। বিষয়বস্তু হয়তো কোনো স্যারের কথা, হয়ত স্কুলের মাঠের খেলার কথা, হয়তো বাড়িতে ওর জ্যেঠামশাইয়ের প্রবল দাপটের কথা। কিন্তু উজ্জ্বল বাকবিস্তার আর উজ্জ্বল মুখের গুণে সে যেন মস্ত কথা হয়ে দাঁড়ায়।

শুক্তিও হাসি হাসি মুখে শোনে, মাঝে মাঝে টীকা-টিপ্পনি দেয় চোখ বড় বড় করে, সারা বিকেলটা কোথা দিয়ে কেটে যায়।

বিধবা ননদ বার কতক ঘোরাঘুরি করে যায় ঘরের সামনে দিয়ে, তারপর এক সময় ডেকে বলে 'কী গো বৌ, এদিকটা একটু দেখবে? আমার তো 'পাঠে' যাবার সময় হয়ে এল।' শুক্তি অবিচলিত থেকে বলে, 'পাঠে যেতে তো তোমার এখনো দু'ঘণ্টা দেরি ঠাকুরঝি।'

কথাটা সত্যি, তাই ঠাকুরঝি ঠিকরে চলে যায়। আর বেশ জোর গলায় স্বগতোক্তি করে যায়, 'গাল টিপলে দুধ বেরোয় একটা ছোঁড়ার সঙ্গে বুড়ো মাগীর কী যে এত গল্প বুঝি না।'

শুক্তিও চেঁচিয়ে স্বগতোক্তি করে, 'ঠাকুর আছে, চাকর আছে, একটা গিন্নী-বান্নী মানুষ আছে, তবু যে দুটো মানুষের সংসারে এত কী কাজ বয়ে যায় তাও বুঝি না।'

সাগর কিন্তু তারপর এক মিনিটও স্বস্তিতে নেই। উঠে পড়তে চায়।

শুক্তি হাত চেপে ধরে। প্রায় ধমকে বলে, 'না এখুনি উঠবি না। তাহলে হার হবে আমার।'

তবু উঠতে হয় এক সময়। পড়ন্ত বেলায়। সন্ধ্যে-হবো-হবো মুখে।

আস্তে আস্তে চোরের মত পা টিপে টিপে বাড়ি ঢোকে।

বলা বাহুল্য, বাড়ির লোকের এটা পছন্দ হবার কথা নয়, হয়ও না। কিন্তু সরাসরি বারণ করাও চলে না। কারণ, শুক্তি পাড়ার মধ্যে সবচেয়ে পদস্থ ব্যক্তির স্ত্রী। সে যে নিতান্ত অধম একতলার ভাড়াটেদের ছেলেটাকে এত 'পেয়ার' করে সেটা তো কম সৌভাগ্যের কথা নয়। তাছাড়া শুক্তির বয়েস? সাগরের বয়েস?

বিরক্তি প্রকাশের সোজা পথটা কোথায়? অথচ মনের মধ্যে যে মন, সেখানে রীতিমত বিরক্তি আসে, একটু যেন অপমান-বোধ।

'রোজ রোজ খেয়ে আসবে কেন বড়মানুষদের বাড়ি?' রাগ করেন ঠাকুমা।

মা অপ্রতিভ ভাবে বলেন, 'কী করবো! ভালবাসে, ছেলেপুলে নেই, ঘরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। প্রাণ হু হু করে—'

জেঠিমা বলেন, 'তা এত যদি তো মাঝে মাঝে বস্তির ছেলেদের ডেকে দরিদ্রনারায়ণের সেবা করুক না। তাতে বরং পরকালের কাজ হবে, পরের ছেলের মাথাটা খাওয়া হবে না।'

'মাথা খাওয়া আবার কি—' মা অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

জেঠিমা ঠোঁট উল্টে বলেন, 'নয়ই বা কি? বুড়ো একটা মাগীর সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি, রঙ্গ-রস, ডাক্তারের বৌটা তো বেহায়ার রাজা।'

'এত কথা তোমায় কে বললো দিদি?' মা বলেন।

জেঠি বলেন, 'বলতে ওর নিজের ননদই বলেছে। পাঠবাড়িতে দেখা তো হয় রোজ। তা, এতই যদি ভালবাসা তো পুষ্যি নে না বাবা। ওই কোঠা-বালাখানা বিষয়-সম্পত্তির ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী হোক তোমার ছেলে! তা নয়। শুনে ঘেন্নায় মরি, মা নয়, মাসী নয়, দিদি নয়, কি না 'বন্ধু'! এখন তুমি বুঝছ না ছোটবৌ, ছেলের গোঁফ গজাক, তখন বুঝবে।'

ছেলে সম্পর্কে এ হেন ইশারাময় ভবিষ্যৎবাণী মায়ের কাছে প্রীতিকর নয়, ছোটবৌও প্রীত হন না। অথচ ঝগড়া করবারও মুখ নেই। 'পরাজয়' তাঁর নিজের ঘরে। অতএব আড়ালে তাকেই গঞ্জনা দেন।

অন্য কথা বলা যায় না, লেখাপড়ার ক্ষতির কথাই তোলেন, বড়মানুষের বাড়ি রাজভোগ খেয়ে অভ্যাস খারাপের কথা তোলেন। ওসব আদর যে পোষা পাখি অথবা পোষা কুকুর-বেড়ালের সমগোত্র, একথা বুঝিয়ে ছেলের চৈতন্য-সম্পাদন করতে চেষ্টিত হন।

সাগর মুখ নীচু করে বসে থাকে। চোখ দিয়ে জল পড়ে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে আর যাবে না।

কিন্তু আর কথা দিয়ে যাবে তবে? আর যে রাস্তা নেই।

কিন্তু রাস্তা থাকলেই কি সব সমস্যার সমাধান হতো?

স্কুলের ছুটির দিনে তবে ও-বাড়িতে মহোৎসব কেন?

সকাল থেকে গোঁফ-না-গজানো একটা ছেলের প্রাণেই বা অমন করে অভিসারের সুর বাজে কেন?

মিলিটারী ডাক্তার অতিষ্ঠ বোধ করেন।

না করবেন কেন?

ওই ডোরাকাটা শার্ট-পরা লাল লাল মুখ একটা বাচ্ছা ছেলের আবির্ভাবে

তাঁর স্ত্রীর মুখে যে অলৌকিক আলো ফুটে ওঠে, সে তো তাঁর চোখ এড়ায় না।

যা অসম্ভব, যা অবিশ্বাস্য, যে সন্দেহ ব্যক্ত করলে লোকের কাছে হাস্যাস্পদ ছাড়া আর কিছু হবেন না, সেই কটু সন্দেহটাই তাঁকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। ছেলেটাকে দেখলেই ইচ্ছে হয় চাবুক মেরে বের করে দেন।

না, ওই তেরো বছরের ছেলেটা তখন অত সব বুঝত না। কিন্তু চিরদিন তো সে তেরো বছরের রইল না। অতীতের সেই দিনগুলো।

আর দুর্বোধ্য ঘটনাগুলো, সমস্ত দুর্বোধ্যতা হারিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠল তার চোখে।

কিন্তু তখন বুঝতে পারত না।

মিলিটারী ডাক্তারের রক্তচক্ষু আর রূঢ় কণ্ঠস্বরকে সে 'মিলিটারী' বলেই গণ্য করতো। তার সামনে পড়ে গেলে সহজে আর ঘাড় তুলতে পারতো না।

শুক্তি বলতো, 'তুমি তো বাপু ডাক্তার মানুষ, এই ছেলেটার রোগ সারিয়ে দিতে পারো? এই 'ঘাড়-গোঁজা রোগ?' এ রোগের ওষুধ আছে তোমাদের শাস্ত্রে?'

ডাক্তার স্ত্রীর দিকে কিছুক্ষণ নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলতেন, 'আছে।'

'তবে কর না চিকিৎসা!' হেসে গড়াত শুক্তি।

ডাক্তার এই নিরতিশয় স্পর্ধার দিকে তাকিয়ে উষ্ণ নিশ্বাস ফেলে বলতেন, 'উচিত ওষুধ প্রয়োগের একটা স্টেজ থাকে, সে স্টেজ এলে করবো চিকিৎসা।'

শুক্তি বলতো, 'কথাবার্তাগুলো যেন রহস্যজনক ঠেকছে রে 'কিছু নয়'! ঘাড় গোঁজা রোগের ওষুধটা ঘাড়ে ধাক্কা নয় তো?'

মিলিটারী ডাক্তার মিলিটারী রেগে উঠে চলে যেতেন ঘর থেকে।

সাগর ভয়ে ভয়ে বলতো, 'উনি অত রাগী, তবু ওঁকে অত রাগাও কেন?'

শুক্তি মুখ টিপে হাসতো। বলতো, 'কেন? রাগীকে রাগানোতেই তো মজা। বাঘকে ক্ষেপিয়েই তো সুখ।'

সাগর এই 'মজা'র, এই সুখের মর্মগ্রহণ করতে পারতো না। ভয়ে বুক টিপ্ টিপ্ করতো তার। তবে সুখের বিষয়, এই লোকটা কলকাতায় থাকত না বেশী দিন। মানে, থাকতে পেত না। প্রায়ই চলে যেতে হতো তাকে বাইরে। এক মাস, দেড় মাস, তিন-চার মাস।

সেই সময়গুলিই সাগরের কিছুটা নিশ্চিন্ততার সময়। ওই নন্দদের ঘোরা-
ফেরা ছাড়া বাড়িতে আর অস্বস্তির কিছু নেই।

অবিশ্যি মনের অস্বস্তি।

সে তো সঙ্গের সাথী।

অথচ সেই অস্বস্তিই দুর্বার বেগে এক প্রবল আকর্ষণে টানতে থাকে। তাছাড়া অভিমানের ভয়ও আছে দুরন্ত অভিমান শক্তির।

একদিন না গেলে পরদিন ঢুকতে বুক কাঁপে। নিশ্চয় জানে প্রথমটা কথা কইবে না শুক্তি, তারপর গম্ভীর মুখে খাবারটা এনে বসিয়ে দিয়ে একটি-আধটি কথা। তারপর সাগর খাবারে হাত না দিয়ে চুপ করে বসে থাকলে, হঠাৎ তেড়ে উঠে একেবারে যাচ্ছেতাই বকুনি।

তারপর আবার সাগরের অভিমান ভাঙানো।

ঠিক সমান বয়সের নায়িকার মতই এই রাগ আর অনুরাগ। অবিশ্বাস্য হলেও অসভ্য নয়। কিন্তু ওদিকে রাগ চড়ছে গার্জেনদের।

বকুনি লাঞ্ছনা গালমন্দ ধিক্কার কিছুতেই তো ওই উৎকট নেশা ছাড়ানো যাচ্ছে না ছেলের। সেই স্কুল থেকে ফিরতে দেরি, সেই ছুটির দিনে টুপ করে বেরিয়ে যাওয়া, সেই গেরস্তর একটা কাজ করতে, বোরোলে ও-বাড়ির জানালার সামনে দাঁড়িয়ে পড়া।

'ছেলেটা এত পেটুক! এত লোভী!'

জ্যেঠামশাই চটি চটপটিয়ে ফুঁসে বেড়ান। রাগে তাঁর গায়ের রোমগুলো যেন খাড়া হয়ে ওঠে।

বলেন, 'গেরস্ত ঘরের ছেলে, গেরস্তালী খাওয়া মুখে রোচে না! ভাল ভাল খাবার জন্যে বড়লোকের বাড়ি মোসাহেবী করতে যায়। ছি ছি! লোকে বলবে, বাপ নেই জ্যেঠা ভাল করে খেতে দেয় না। কী বলব, ছোটবৌমা মনে কষ্ট পাবেন তাই, নইলে হ্যাংলা পাজী ছেলেটাকে চাবকে হাড় একদিকে মাস একদিকে করে ছাড়াতাম।'

সাগর বাড়ি না থাকলেও, এসব টের পেত। খবর সাপ্লায়ার ছিল তার ছোট বোন ঝুমি। সে বলতো, 'তা, জেঠিমা জ্যেঠাবাবুকে বলল, তুমি যেমন সরল তাই ভাবছ ভাল ভাল খাবার জন্যে! তা নয় গো নয়। ও ছেলে আরও অনেক পেকেছে, ডেঁপোর শিরোমণি হয়েছে। ওই রকম ভিজে বেড়ালের মত থাকে তাই। লেখাপড়া তো চুলোর দোরে যাচ্ছে।'

সাগরের ইচ্ছে করতো ঝুমিকে জিগ্যেস করে—উত্তরে জ্যাঠাবাবু কি বললেন, কিন্তু পারতনা। লজ্জায় বাধত, আত্মসম্মানে বাধত। তাই রাগ দেখিয়ে বলতো, 'যা যা পালা। বাড়িতে যে যা বলছে, সব মুখস্থ করে রেখেছে বাঁদরী। পড়ার সময় কেবল বকবক।'

বলাবাহুল্য পিঠোপিঠি বোন ঝুমিও ছেড়ে কথা কইতনা। সেও রেগে লাল হয়ে উঠে বলতো, 'বেশ বেশ বলবনা। বয়ে গেছে আমার বলতে বাড়িসুদ্দু লোক তোকে নিন্দে করে, তাই বলতে আসি। বলুক সবাই যার যা ইচ্ছে। মা কেঁদে মরুক. তুমি বাবুসাহেব বড় লোকের বাড়ি গিয়ে আদর খাও।'

সাগরের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটতো।

হয়তো ঠাশ করে একটা চড় বসিয়ে দিত ঝুমির গালে, হয়তো হাতের বইয়ের শক্তমলাটের কোণটা মাথায় ঠুকে দিত, নয়তো বা চুলের গোছাটা ধরে মোক্ষম একটা টান দিয়ে বলতো, 'চুপ কর বলছি পাজীমেয়ে! এতটুকু মেয়ে পাকার ধাড়ি হয়েছে!'

ঝুমিও সতেজে উত্তর দিত, 'হবে না কেন? তোমারই বোন তো! নিজেও তুমি কম পাকা নও বুঝলে? জানতে তো আর বাকী নেই কারুর।'

সাগরের আর মেজাজের ঠিক থাকতনা, ঠাশ ঠাশ করে চড়িয়ে ঘর থেকে বার করে দিত ঝুমিকে। সংসারে এই একটা মাত্রই তো জায়গা, যেখানে সাগরের পদমর্যদা বেশী। যেখানে রাগ ফলানো চলে।

জ্যেঠামশাইয়ের ওপর শাসনকর্ত্তার ভূমিকা নেওয়া যায়না, জ্যেঠিমা তা হলে আস্ত রাখবেন না। কাজে কাজেই নিজের বোন ঝুমি। মেয়ে আবার চোখে জল আসত, আহা বেচারা তার ভলোর জন্যেই বলতে এসেছিল, কিন্তু এমন বিশ্রী করে বলে!

আশ্চর্য্য বাড়ির প্রত্যেকটি লোক যেন সাগরের দিকে বাঁকা চোখে তাকায়। মা অবশ্য ঠিক ওরকম নয়। কিন্তু মার যা ভঙ্গী সেটা আরো কষ্টকর, মা চোখের জল ফেলেন।

'জ্যেঠা জ্যেঠি যাতে অসন্তুষ্ট হন, তা কেন করিস তুই? কী দরকার বড়লোকের সঙ্গে মেশামিশিতে? ও অকে গরীব বলে দয়া করে, কিন্তু খোকা, গরীব হলেই যে লোভী হতে হবে তার মানে নেই। তুইই আমার ভরসা, তুই যদি—'

এই সব কথা মার।

কী অসহ্য সেই কথাগুলো!

ইচ্ছে করতো চেঁচিয়ে বলে ওঠে, কী আমি করেছি বলতে পারো? এত বলার মত কী করেছি? আমি কি তাদের বাড়ি গিয়ে চেয়ে চেয়ে খেয়ে আসি, না কি তাদের জুতো ঝাড়ি? দয়া করেন উনি আমায়? এই তোমাদের ধারণা? হায়! যদি দেখাতে পারতাম!

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনটা যেন হালকা হয়ে যেত, বরং হাসিই আসতো। দয়া? কে কাকে দয়া করে! গিয়ে যদি দেখ তো বুঝতে পারো! সাগরই দয়া করে খেয়ে আর যত্ন নিয়ে কৃতার্থ করে অতবড় মানুষটাকে।

বাড়িতে নিজের অকিঞ্চিৎকর পোষ্টটা যেন এক এক সময় গভীর বেদনাময় একটা বিস্ময়ের সমুদ্রে ডুবিয়ে দিত সাগরকে। অবাক হয়ে ভাবত ও, এই তো আমি! যতক্ষণ বাড়িতে থাকি, হয় কাজ করি নয় বকুনি খাই। তাছাড়া কিছু না। দু'পয়সার পাঁচফোড়ন দরকার হলেও তো সেই, 'সাগর যা দোকানে' সারা সকাল দোকানে যা আর দোকানে যা! পড়বার সময়ই হয় না।

ভাগ্যিস ওই দোকান বাজারের রাস্তাটা 'কিছুনয়'-এর বাড়ির সামনে দিয়ে নয়। হ'লে কী লজ্জাই করতো। সাগর ভাবতে চেষ্টা করতো, 'কিছু নয়' জানলা দিয়ে দেখছে সকাল থেকে সাতবার সাগর হাঁটাহাঁটি করছে চারপয়সার পান হাতে, দু'আনার দইয়ের ভাঁড় হাতে, কেরোসিনের বোতল হাতে, একপো' গুড়ের বাটি হাতে।

ছি ছি!

ভাবাই যায়না।

কী অদ্ভুত! কী করে এমন হয়! এক জায়গায় যার অগাধ মূল অন্য এক জায়গায় সে এত মূল্যহীন!

সাগরের ব্যাপারটা যে সকলের মত নয়, সে তো বুঝতে পারছে সাগর, কিন্তু কেন? কী গুণে সাগরকে 'কিছু নয়' অত ভালবাসে?

জানেনা, নিজের কী গুণ আছে সাগর জানেনা, বুঝতে পারে না। আর এও বুঝতে পারে না বাড়ীর সকলের নির্দ্দেশ অনুযায়ী কাজ কী করে করা সম্ভব? কী করে সম্ভব 'কিছু নয়'-এর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করা।

অথচ এঁরা তাই চান। কারণ? কারণ নির্ণয় করেছে সাগর। কারণ সবাই যেমন তেমন করে আছে, আর বাড়ির একটা মূল্যহীন সদস্য অন্য এক ঠাঁই গিয়ে রাজকীয় আদর পাচ্ছে, এ অসহ্য।

অতএব রাতদিন 'ওবাড়ী' নিয়ে খোঁটা।

কিন্তু কী করে ওবাড়ী থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবে সাগর? সাগর একটা মানুষ তো? না কি জানোয়ার?

জানোয়ারেই কি পারে এমন অপরিসীম স্নেহকে তুচ্ছ করতে। নিজেদের বাড়ির লোকগুলোকে ভারী নীচ আর নোংরা মনে হতো সাগরের।

কিন্তু শুধুই কি নিজেদের বাড়ীর?

ওবাড়ীর সব্বাই কি 'কিছুনয়'-এর মত হৃদয়ভরা মমতা নিয়ে আর প্রাণভারা আকুলতার জোর নিয়ে পথে চোখ ফেলে দাঁড়িয়ে থাকে?

নাঃ।

ওবাড়ির অন্য সব চোখের আর এক দৃষ্টি আর এক ভাষা। সে ভাষা পরুষ কঠিন, নিষ্ঠুর ব্যঙ্গময়, ক্রুর কুটিল, সে দৃষ্টি তীব্র, জ্বলন্ত, কড়া।

'কিছু নয়'-এর সেই ননদ না কে, তার চোখে রূঢ়তার চরম অভিব্যক্তি। যেন সুযোগ পেলেই বলে উঠবে—'তুই কে রে হতভাগা ছোঁড়া? যা বেরো, খবরদার আর আসবিনে।'

ওদের বাড়ির চাকর ঠাকুরগুলোর দৃষ্টি কী প্রখর! সাগরের এই সম্পর্কের দাবিহীন দাবি দেখে সাগরের জন্য খাটতে হচ্ছে দেখে তারা রেগে আগুন হয়। আর ওবাড়ীর কর্ত্তা? তাঁর চোখ দিয়ে শুধু অগ্নিকণা ঝরে। সেই অগ্নিঝরা চোখ নিয়ে কিন্তু হাসেন তিনি। তীব্র কুৎসিত একটা হাসি। হাসি মেশানো কথা, 'এই যে সুবল সখা এসে গেছেন! চন্দ্র সূর্য্যের নিয়ম! ইউনিভার্সাল ট্রুথ্! না কি কষ্টকরে আর আসতে হয় নি, স্কুল পালিয়ে সারাদিন এখানেই তোয়াজে কাটছিল!'

তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ করে উঠতে ইচ্ছে হতো সাগরের। কিন্তু এমনি অদৃষ্টের পরিহাস ওর সামনে কিছুতেই মুখ দিয়ে কথা বেরোতনা। শুধু অপমানে চোখে জল আসতো।

মিলিটারী আবার বলে উঠত, 'ও, তাহলে তাই! শাস্ত্রেই আছে মৌনং সম্মতি লক্ষণম্। তা' যাক ডানহাতের কাজটি মিটেছে তো? বাড়ির কর্ত্রীর আশ মিটিয়ে?'

তবু—তবু কথা বলতে পারত না সাগর। বলতে পারতনা আমি কি তোমাদের বাড়িতে শুধু খেতেই আসি? আবার মাথা ঠাণ্ডা হলে ভাবতো, তা' আসিনা সত্যি, কিন্তু কেনই বা আসি? এই লজ্জা, এই অপমান সব সয়ে?

উত্তর পেত না।

কেবল মাত্র 'কিছুনয়'-এর আকুলতা, শুধু তো এই? কিন্তু এখানে না আসার জন্যে মাও তো কম আকুলতা করেনা। তবে? মা বেশী আপনার না 'কিছু নয়' বেশী আপনার? নিজের মনকে বিস্তার করে করে দেখবার অভ্যাস সেই বয়েস থেকেই হয়েছিল সাগরের।

কিন্তু প্রশ্নের উত্তর পাবার ক্ষমতা হয়নি।

তাই 'মিলিটারী' ডাক্তারের ওই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ আর কটু মন্তব্যের আঘাতে ঘাড়গুঁজে চলে যাবার সময় যতই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করুক আর আসবনা, পরদিন ঠিকই এসে হাজির হতো। হয়তো অঙ্ক কসে লোকটার অনুপস্থিতির সময়টা হিসেব করে। চুপি চুপি পা টিপে।

বাড়ি থেকে বেরোনোর সময়ও সেই একই সমস্যা। ঠিক বেরোনোর মুহূর্তে কেউ যেন না দেখতে পায়। স্কুল থেকে ফেরার পথে আসা নিয়ে অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা, তাই সময় বদলানো।

শুক্তির কাছে এই দু'বাড়ির বিমুখ চিত্তের বাধার কথা প্রকাশ না করলেও বুঝতে শুক্তি ঠিকই পারতো। আর হেসে হেসে বলতো, 'তোর হয়েছে শাঁকের করাত, কি বল? না এলে আমি আস্ত রাখিনা, এলে ওরা খোঁচা মারে তাই না?'

সাগর প্রতিবাদের চেষ্টা করতো, 'খোঁচা আবার কি? কেউ তো কিছু বলে না।'

শুক্তি ফের হাসতো, 'আহা কিছু যে বলেনা, সেটাই তো খোঁচা মারা। বললে তো বলাই হল, হয়ে গেল। এ বাড়ির ডাক্তারাবু তো ইনজেক্‌শনের ছুঁচ নিয়ে ঘোরে, সুবিধে পেলেই টুক্ করে বিঁধিয়ে—'

সাগর অবাক হয়ে বলতো, 'ইনজেকশন' ছুঁচ, কী বলছো পাগলের মত।'

শুক্তি হঠাৎ হাসি থামিয়ে ফেলে গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলতো, 'পাগলের মত, তাই না? সত্যি আমি কি তা'হলে পাগলই হয়ে যাচ্ছি?'

'আ' কী যা তা সব বল ঃ ভয় করে।'

'ভয় করে। আমি পাগল হয়ে গেলে তোর ভয় করে?'

'বাঃ তা করবে না?'

'করবে। তাই করা উচিত, কী বলিস?' শুক্তি হঠাৎ কেমন হতাশ হতাশ গলায় বলতো, 'কিন্তু ডাক্তারবাবুর ভয় করে না।'

'ডাক্তারবাবুকে তোমার ভয় করেনা?'

বোকা সাগর এই এক চরম বোকামীর প্রশ্ন করে বসেছিল একদিন। বড়

হয়ে যাওয়া সাগর যার জন্যে সেই বাচ্চা অবোধ সরল ছেলেটাকে মনে মনে করুণা করেছে।

কিন্তু তখন বড় হয়ে যায়নি।

তখন প্রশ্ন করে ফেলেছিল।

কিন্তু শুক্তি হেসেও ওঠেনি রাগও করেনি। শুধু বলেছিল, 'ভয় করলে চলবে কেন বল? ভয় করলে তো আরোই পেয়ে বসবে।'

সাগর ভাবতো—এ বাড়ীতে ওই ডাক্তারটা আর তার বোনটা যদি না থাকতো!

তা' সাগরের ঠাকুর নৈবেদ্য খেলেন একদিন। বাড়ি ফিরল খুব একটা উৎফুল্ল মন নিয়ে। অপ্রত্যাশিত এক শুভ খবর, 'মিলিটারী' নাকি তিন বছরের জন্যে মেসোপটেমিয়ায় যাচ্ছে। পল্টনের খবরদারির ভার নিয়ে। অতএব—

নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরল সাগর।

যদিও খবরটা দেবার সময় শুক্তিকে যেন একটু মনমরা মনমরা দেখাচ্ছিল। এক-আধমাসের জন্যে যখন যায়, তখনকার মত উৎফুল্ল মনে হচ্ছিল না। তবু সাগরের প্রাণে স্রেফ্ মহাসমুদ্রের হাওয়া।

বাবাঃ, তিন তিনটে বছর ওই লাল চোখ আর রূঢ় ভারী গলার থেকে তফাতে থাকতে পাবে। সেই আনন্দের আভাস চোখে-মুখে নিয়ে বাড়ি ঢুকল সাগর। আর পড়ল কিনা একেবারে জ্যেঠার সামনে।

কোন কথা না বলেই তিনি আগেই গোটা দু-তিন গাঁট্টা মারলেন মাথায়। তারপর ক্রুদ্ধ গলায় বললেন, 'কি, বাড়ির কথা মনে পড়ল? দেখছি, তোর জ্যেঠি যা বলে, মিথ্যে নয়। বখেই যাচ্ছ তুমি হতভাগা ছেলে। স্কুল থেকে কী চিঠি এসেছে? বল বল, রাস্কেল পাজী!'

স্কুল থেকে চিঠি! কি চিঠি! কখন এল, কে আনল!

জানে না তো সাগর। জানে না, কিন্তু অবাক হল না। উত্তর পেয়ে গেল। জ্যেঠামশাইয়ের ছোট ছেলে অজয় ওই স্কুলে পড়ে। অতএব চিঠিটা তার দ্বারা বাহিত হয়ে এসেছে সন্দেহ নেই।

বুকের রক্ত হিম করে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকল সাগর, মাথায় হাতটা বুলোবার সাহস হল না। সাগরের মা রান্নাঘর থেকে তীব্র ক্ষুব্ধভাবে বললেন, 'বটঠাকুরকে বল দিদি, হতভাগা ছেলেকে আজ এমন মোক্ষম শিক্ষা দিয়ে দিন, যাতে ভবিষ্যতে আর না কোনদিন—'

তা, গাঁট্টার ওপর আর গেলেন না জ্যেঠামশাই, শুধু চড়াগলায় বলে গেলেন, 'মাস্টার লিখছে হাফ-ইয়ার্লিতে ফেল করেছ, পড়ায় একদম মনোযোগ নেই, কোনদিন টাস্ক্ করে নিয়ে যাও না, এখন থেকে চেষ্টা না করলে ক্লাস প্রমোশনের আশা নেই। শুনছো? শুনতে পাচ্ছ? তোমার বাবা, বুঝলে, তোমার বাবা, যে সাতসকালে মরে গিয়ে আমার বুকে বাঁশ ডলে দিয়ে গেছে, সে প্রত্যেক বছর ক্লাসে ফার্স্ট হতো। এনট্রান্সে সেকেণ্ড হয়েছিল সে। আর তুমি তার গুণধর পুত্র, এই বয়সে একটা বদ মেয়েলোকের কবলে বড়ে—' হঠাৎ কথা থামিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লেন জ্যেঠামশাই।

আর সাগরের চারদিকে সমস্ত পৃথিবীটা লাট্টুর মত ঘুরতে লাগল বন্‌বন্ করে।

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে হাতের ঘড়ির দিকে তাকালেন সংবরণ চৌধুরী। বললেন, 'গল্পটা একটু মন্থরগতিতে ধরা হয়ে গেছে। রাত হয়ে যাচ্ছে। থাক এই পর্যন্ত।'

ওরা চমকে উঠে 'সে কি,' 'সে কি,' করে উঠল। শেষটা কই? গল্পের শেষ?

সংবরণ একটু হেসে বললেন, 'গল্পের শেষ? সে তো দেখছি অনেক দূর।'

এ গল্প ফাঁদা ঠিক হয় নি। যাক, আমার বক্তব্য হচ্ছে এই—মানুষের মন এত বিচিত্র যে, সাহিত্যে—'এ হয় না, ও অসম্ভব' বলে কোন কথা নেই। শুনতে অসম্ভব অথচ দেখতে স্বাভাবিক এ রকম ঘটনা নিয়তই ঘটছে। আর মনের সেই বিচিত্র গতি নিয়েই তো সাহিত্যিকের কারবার।'

'তবু স্যার, শেষ না করলে—'

হঠাৎ পিছনের সেই মেয়ে দুটোর একটা মেয়ে চটুল গলায় বলে উঠল, 'আধকপালে ধরবে।'

সংবরণ একটু হেসে বললেন 'পোড়া-কপালে আধকপালে ধরলেই বা কি?'

'না না, ছাড়ব না।'

সংবরণ এবার তাকিয়ে দেখলেন পরিবেশটার দিকে. ধূপগুলো অনেকক্ষণ পুড়ে গেছে, ধূপদানীর নীচে তার ভস্মকণিকাগুলো ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। রাত্রি হয়ে যাওয়ার জন্যে আলোটা আরো মিটমিটিয়ে এসেছে, আর শ্রোতাদের মুখে রসাভাসের আভাস মাত্র নেই।

না, এ গল্পের মধ্যে ওরা প্রবিষ্ট হতে পারে নি। অন্ততঃ এখনো পর্যন্ত পারে নি, তাই শেষটার জন্যে উদগ্রীব হচ্ছে।

হঠাৎ এ গল্প শুরু করলেন কেন সংবরণ চৌধুরী? নিজেও জানেন না,

নেহাৎ দৈবাৎই। অথবা হয়তো এ গল্প কোনদিন কাউকে বলবার ইচ্ছে ছিল তাঁর। লিখে নয়, মুখে। আজকে—এই নিজের পরিচিত পরিমণ্ডল থেকে অনেকটা দূরে একটা ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশে, কতকগুলো আগ্রহী শ্রোতা দেখে সেই ইচ্ছেটা রূপ নিতে চাইল। কিন্তু কোথায় শেষ করবেন এ গল্পকে? কোথায় দাঁড়ি টানবেন?

'আচ্ছা বলছি,' সংবরণ চৌধুরি ফুলের মালাটাকে তুলে নিয়ে একবার দু'হাতে লোফালুফি করে আবার বলতে শুরু করলেন।—'সেদিনের সেই লাঞ্ছনার পর সাগর প্রতিজ্ঞা করল আর কোনদিন ও-বাড়ি যাবে না। জীবনে না। সাগরকে সবাই পেটুক ভাবছে, কী হ্যাংলা ভাবছে বলে নয়, স্কুলের চিঠি এসেছে বলেও নয়, শুক্তির নামে যে সব খারাপ খারাপ কথা বলছে এরা, সেই জন্যে।

সাগরের জন্যে 'কিছু নয়'-এর এত নিন্দে! ওই ডাক্তারটা যে সব সময় 'কিছু নয়'কে বাঁকা বাঁকা আর কড়া কড়া কথা বলে তার কারণও যে সাগর, সেও সাগর বুঝতে পারছে আজকাল। আর অশরীরী একটা ভয় যেন তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে।

কিন্তু স্কুলে যাওয়া বন্ধ না করলে তো ও-বাড়ি যাওয়া বন্ধ হয় না! কোন্ পথ দিয়ে যাবে আসবে? পেট-ব্যথা একদিনের অসুখ, জ্বরটা প্রমাণ-সাপেক্ষ। তাহলে? আর কি অসুখ আছে যা ধরা-ছোঁওয়া যায় না?

পরদিন থেকে হঠাৎ পায়ে এক দুর্দান্ত ব্যথা হল সাগরের। হাঁটতে পারে না। দাঁড়ালে কনকন ঝনঝন করে।

পায়ে একটু ব্যথায় ডাক্তার আসবে, এমন বড়লোকের বাড়ি নয়, বড় জোর গরম জলের ফোমেণ্ট, কি চুন-হলুদ। কোথায় কখন পড়ে গিয়ে পা মচকেছে, বলে নি, এই ভাবে বকাবকি করে সবাই।

মা বলে, 'ভালই হয়েছে। দু দিন তবু আড্ডা বন্ধ হয়েছে।'

সাগর শুয়ে থাকে। ভয়ানক একটা যন্ত্রণা বোধ করে।

পায়ে নয়, মাথায় কি কোথায় যেন। 'কিছুনয়' কী ভাবছে! 'কিছুনয়' কী মনে করছে!

কিন্তু ক'টা দিন? ক'দিন কেটেছিল সেই অবস্থায়? বোধহয় চার। হয়তো পাঁচ।

তারপরই ঘটল এক অঘটন।

পাড়ার মধ্যে সবচেয়ে কেষ্ট-বিষ্টুর স্ত্রী এলেন পাড়ার এই দীন-হীনদের বাড়িতে। সাগর ঘরে শুয়েছিল।

হঠাৎ ঝুমি ছুটে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে আর ফিস-ফিসিয়ে বলল, 'এই শুনছিস, সে এসেছে।'

সাগরের বুকের মধ্যেটা ধড়াস্ করে উঠল। কোন কিছু না ভেবেই উঠল। হয়তো ওর বলার ভঙ্গীতেই। তাকিয়ে রইল ফ্যাল ফ্যাল করে।

বোন ঠেলা মেরে বলল, 'কিছু বললি না যে?'

'কি বলব?'

'বলবি তো রাম গঙ্গা কিছু? হি হি হিঁ !'

সাগর সাহসে বুকে বেঁধে বলল, 'কে এসেছে?'

'ওমা! সপ্তকাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতা কার পিতা! ডাক্তারবাবুর বৌ এসেছে। যে তোকে খুব ভালবাসে, খাওয়ায় ভাল ভাল। যার জন্যে এত কথা। তুই পায়ে ব্যথার জন্যে যেতে পারিস না বলে, খবর নিতে এসেছে।'

'কী বলছে?'

'কি জানি! মা-র সঙ্গে তো কথা বলছে। যাই বাবা, দেখি গে।'

বলে পালায় সে।

আর সাগর কাঠ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকে। কিন্তু কী বলছে শুক্তি তা কি জিজ্ঞেস করে জানতে হবে? শুক্তির মাজা চাঁছা অথচ সুরেলা গলা কি জানিয়ে দিচ্ছে না সে বার্তা?

সাগরের মাথার মধ্যে ঝন ঝন করে বাজছে সেই স্বর।

'বললাম তো, ঠিক বুঝেছি। আমার মনই বলেছে নিশ্চয় অসুখ করেছে ছেলেটার। তা নইলে জানে তো সে, আমি কী রকম হা-পিত্যেশ করে বসে থাকি ওর জন্যে! খাবার তৈরী করতে ভালবসি, ঘরে খাবার লোক নেই। কত ছেলে বাড়ির সামনে দিয়ে যায়, ডাকলে যদি একটা আসে! হি হি করে হেসে পালায়। আপনার ছেলেটিই মাসিমা যা একটু সরল! তা, পায়ের ব্যথা সারলে পাঠিয়ে দেবেন মাসীমা।'

সাগর তার মা-র গলা শুনতে পায়। বিগলিত গদগদ স্বর।

'তা দেব। দেব বৈ কি! আপনি এত ভালবাসেন—'

'আপনি! আমাকে আপনি বলছেন? তার মানেই বলছেন, আমি যেন আর না আসি।'

'ওমা—সে কি!' জ্যেঠিমার গলা। 'গরীবের বাড়ি তোমার পায়ের ধুলো পড়েছে—'

'নাঃ। বসতে আর দিলেন না দেখছি। ছেলেবেলা থেকে মা-মরা, আপনাকে দেখে মনে হল এবার বুঝি ভগবান মাতৃস্নেহ জুটিয়ে দিলেন। তা দেখছি কপালে নেই।'

সাগর আশ্চর্য হল। জ্যেঠিমাকে দেখে কারো মনে মাতৃস্নেহ পাবার আশা উদয় হতে পারে, এটা তাজ্জব।

কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে সাগর সেই সুরেলা গলার ঝঙ্কার শুনতে পেল। মা-র সঙ্গে, জ্যেঠিমার সঙ্গে, ছোট ওই বোনটার সঙ্গে।

ওখান থেকেই চলে যাবে তাহলে?

তবে আর সাগরেকে দেখতে আসার দরকার কি?

ভয়ানক একটা অভিমানে চোখে জল এল সাগরের। আর ঠিক সেই সময় দরজার বাইরে সেই ঝঙ্কার ধ্বনিত হল, 'ওমা, একেবারে শয্যাগত অবস্থা! কার বাড়ীতে হাঁড়ি খেয়েছিস, কে ভেঙেছে ঠ্যাং!' সাগরের মাথার মধ্যের সেই শব্দটা যেন সমস্ত পৃথিবী কেঁপে বাজতে লাগল ঝম ঝম ঝম! গায়ের চাদরটা গলা অবধি টেনে দিয়ে হঠাৎ গভীর ঘুমে সে অচেতন হয়ে পড়ল। ঘরে যা যা কথা হল কিছু শুনতে পেল না।

কতক্ষণ 'ঘুমিয়েছিল' সাগর? সাতদিন সাত রাত?

ঘুম ভাঙল কখন? ঘেমে গলদঘর্ম হয়ে? না, মায়ের ডাকে?

চাদরটা ঠেলে আস্তে উঠে বসল সাগর।

মা বললেন. 'অসময়ে এমন ঘুমিয়ে পড়লি যে! বাবাঃ, একেবারে কুম্ভকর্ণের ঘুম! মানুষটা এলো, সাতশো ডাক ডাকলাম, তুই একেবারে অজ্ঞান অচৈতন্য! সন্ধ্যে রাত্তিরে এত ঘুম তো কখনো ঘুমোষ না!'

সাগর কথা বলতে পারল না, হাঁ করে তাকিয়ে বসে থাকল।

আর মা বলে যেতে লাগলেন, দূরে থেকে মানুষ চেনা যায় না। বড়মানুষ বলে বরং কত ইয়েই করেছি। বাবা, কী চমৎকার মানুষ! যেমন রাজেন্দ্রাণীর মত চেহারা, তেমন মিষ্টি স্বভাব। তোর জ্যেঠির মত মানুষও স্বীকার পেল যে, হ্যাঁ, সাগর অমনি ছেদ্দা করে না।...... তুই যাস নি বলে মান খুইয়ে ছুটে এসেছে। নইলে আমাদের মতন বাড়িতে ওদের মত লোকের পায়ের ধুলো! অজয়কে ঝুমিকে ধরে ধরে কী আদর করা, রাশিকৃত খাবার খেলনা—বাবা

অমন ঘরে একটা ছেলে নেই। সাধে কি আর বলে, 'কান কাঁদে সোনা রে—সোনা কাঁদে কান রে—'

সাগরের সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যায়। সাগরের বুকের মধ্যে সমুদ্র তোলপাড় করতে থাকে।

তারপর ঝুমি আসে। সে বলে, 'তুই অমন মিছিমিছি ঘুমুলি যে দাদা?'

সাগর হঠাৎ চড়ে উঠে রুক্ষ গলায় বলে, 'মিছিমিছি মানে?'

'মিছিমিছি না? সেই তো তক্ষুণি কথা বলছিলি।'

'আমার মাথা-ব্যথা করছিল না?'

'মাথা-ব্যথা? তা কি জানি ছাই! ভাবলাম মটকা মেরে পড়ে আছিস।'

তারপর ঝুমির মুখে শুনতে পায় সাগর ডাক্তারবাবুর বৌ ঝুমিকে ইয়া বড় একটা 'ডল' দিয়ে গেছেন। অজয়কে এতবড় ফুটবল। বাড়ির জন্যে মিষ্টি। আরো শুনলো, তিনি নাকি রান্না-ঘরে মা-জ্যেঠিমার কাছে খুরসি পিঁড়িতে বসে চেয়ে চেয়ে চা আর বড়া-ভাজা খেয়ে গেছেন। বলে গেছেন, এমন আনন্দ নাকি জীবনে পান নি তিনি। এবার থেকে নাকি কেবল এসে আদর খেয়ে যাবেন।

শুনতে শুনতে কেন কে জানে ভয়ানক একটা ঈর্ষার জ্বালা অনুভব করে সাগর। মনে হয়, 'কিছু নয়' যেন তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

প্রতিজ্ঞা করে, 'কক্ষনো না, আর কক্ষনো যাব না ও-বাড়ি' অথচ দেখা হলে কি কথা বলে রাগ প্রকাশ করবে তার রিহার্সাল দেয় মনে মনে।

'না, এ গল্প এখন শেষ হবার নয়।'

সংবরণ চৌধুরী সত্যিই সহসা সভাভঙ্গ করলেন। বললেন, 'আধকপালেই রয়েছে এবার কপালে। একঘণ্টার বেশি হয়ে গেছে—আর না।'

সত্যি বলতে, এ গল্প কারুর মনেই তেমন রেখাপাত করতে পারছিল না। নায়ক-নায়িকার বয়সের তারতম্য তাদের 'ভাল লাগা'র দরজায় যেন একখানা পাথর চাপিয়ে রেখেছিল। আর, সকলেই ভাবছিল, এত পুঙ্খানুপুঙ্খয় যাবার কী ছিল সংবরণের? বর্ণনার স্রোতটা একটু সংবরণ করলেই তো পারতেন!

ভাবছিল, গল্প লেখার ক্ষমতা আর গল্প বলার ক্ষমতা এক নয়। ও দুইয়ের টেকনিক্ আলাদা। সংবরণ চৌধুরী এত অপূর্ব গল্প লেখেন, কিন্তু গল্প বলতে গিয়ে ফেলিওর হলেন।

তবু ওরা 'দেখানো আগ্রহে' বলল, 'গল্পটা লিখে কোনও পত্রিকায় দেবেন তো স্যর?'

স্যর বললেন, 'দূর।'

'আমাদের কিন্তু মনে অস্বস্তি হয়ে রইল শেষটার জন্যে। ভাবছি, এ গল্পের কী শেষ হতে পারে?

সংবরণ হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলেন, 'তোমরাই বলতো কী শেষ হতে পারে? কী হওয়া উচিত?

বুঝতে পারছি না স্যর! মানে, দুজনের বয়েস—'

সংবরণ হঠাৎ ও-প্রসঙ্গে যবনিকাপাত করে বলে উঠলেন, 'তোমাদের এখানকার ফার্স্ট ট্রেন ক'টায়?'

'ফার্স্ট ট্রেন। ফার্স্ট ট্রেনের কথা কেন, কাল তো থাকবেন আপনি—'

সংবরণ বললেন, 'কথা দিতে পারছি না। হয়তো চলেও যেতে পারি।'

ওঁকে মোটরে উঠিয়ে দিয়ে এরা বলল, 'দূর, জমাতে পারল না।'

বলল, 'এমন এক গল্প ফাঁদল যে শেষই করতে পারল না।'

'না ভেবে-চিন্তে খুব একটা স্টাণ্ট দিয়ে শুরু করে উপসংহার খুঁজে পেল না, মাঝে থেকে আমাদের সন্ধ্যেটা উপসংহার করে গেল।'

'আচ্ছা, উপসংহার কী হতো বল দেখি?'

'কিছু না। কাঁচকলা। শেষ কিছু হবার নেই বলেই অমন কায়দা করে উঠে গেল। গল্প তেমন জমাতে পারলে রাত বারটা অবধি সবাইকে বসিয়ে রাখতে পারত।'

'গল্প শেষ না করতে পেরে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল। এ বাবা আমরা তাই, কলকাতার ছেলে হলে—'

ক্রমশঃ সংবরণ চৌধুরী 'অপরাধী'র খাতায় উঠলেন। ওঁর অক্ষমতাটা অপরিসীম অন্যায়ের পর্য্যায়ে পড়লো প্রায়।

এ কী! মফস্বলের ছেলে পেয়ে তাদের এই ভাবে ঠকালেন উনি।

সেই চটুল মেয়েটা হি হি করে হেসে বলে উঠল, 'লেখকদের শুনতে পাই অনেকেরই একটু-আধটু পানাসক্তি আছে, নইলে মুড্ আসে না। ওনারও হয়তো 'টাইম' এসে গেছল, তাই অমন চঞ্চল হয়ে উঠে সরে পড়লেন।'

গতকাল যে রাত্র নটা অবধি 'সভা' আর সাড়ে দশটা অবধি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছিল, এবং সংবরণ চৌধুরী বেলা পাঁচটা থেকে পুরোপুরি অনুষ্ঠানটা গলাধঃকরণ করেছিলেন, সে আর মনে পড়ল না কারুর। পান-দোষ নিয়ে মজাদার আলোচনা চালাতে লাগল। ওই ডেঁপো মেয়েটা কোথা থেকে যে 'লেখক'দের সম্পর্কে এই মনেরম তথ্যটি সংগ্রহ করেছে, তা কেউ জিগ্যেস করল না। প্রতিবাদও করল না।

তা, এই রকমই হয়। শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে হঠাৎ অশ্রদ্ধা করবার সুযোগ পেলে এমনি অন্ধই হয়ে ওঠে লোকে। ওটা মনুষ্যধর্ম।

সংবরণ চৌধুরী যদি এ আলোচনা শুনতে পেতেন ক্ষুব্ধ হতেন হয়তো, বিস্মিত হতেন না। আকাশ থেকে পড়তেন না। সংবরণ চৌধুরী মনস্তত্ত্বের সন্ধানী। তাই না এত নাম-ডাক সংবরণের।

কিন্তু আজকে নিজের মনস্তত্ত্বের হদিস পেলেন না সংবরণ চৌধুরী।

ভেবে পলেন না হঠাৎ সাগরের গল্পটা ওদের কাছে বলতে বসলেন কেন? এটা যে ছোট গল্প নয়, বলবার মত গল্পও নয়, এ কী উনি জানতেন না?

গল্পকে মাঝপথে ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন, কিন্তু গল্প ওঁকে ছাড়তে চাইছে না—সেই বালক নায়ক যেন তাড়া করে ফিরছে সংবরণ চৌধুরীকে।

বহুকাল থেকেই তো মাঝে মাঝেই সেই সাগর ওঁকে বলেছে, 'এত গল্প লিখছ, আমার গল্পটা লেখ না একদিন?' আমল দেন নি সংবরণ।

আজ সাগর ওঁকে ধাক্কা দিচ্ছে।

আশ্চর্য! এটা হচ্ছে কেন? সংবরণ কি তবে এতদিন পরে আজ সাগরের অনুরোধ রাখতে কলম ধরবেন?

এখানের কলেজ-হোস্টেলের নবনির্মিত ভবনের একপ্রান্তের একটি ঘরে থাকতে দিয়েছে এরা সংবরণকে। কম্পাউণ্ডের অপর প্রান্তে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কোয়াটার্স থেকে আদর-আপ্যায়ন সরবরাহ করা হচ্ছে। হোস্টেলে এখনও ছাত্রদের পদার্পণ হয় নি। ছুটির পরে হবে বুঝি।

টানা লম্বা বারান্দাটা এদিক ওদিক পর্যন্ত যেন একটা বিরাট শূন্যতার ছবির মত প্রসারিত হয়ে আছে, যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু উন্মুক্ত প্রান্তর। ওই প্রান্তরের

ওপারে নাকি নদী আছে। দেখা যাচ্ছে না—শুধু আকাশ আর মাঠের মোহানাটায় একটা গাঢ় অন্ধকার রেখা টেনে দিয়েছে।

হু হু করে বাতাস এসে ধাক্কা দিচ্ছে বারান্দার কোলের ঘরগুলোর বন্ধ দরজা-জানলায়, আবার ফিরে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত এই বারান্দায় পায়চারি করতে লাগালেন সংবরণ। সুপারিন্টেণ্ডেন্টের স্ত্রী একঘুম থেকে উঠে হঠাৎ জানলায় তাকিয়ে অবাক হলেন। ভাবলেন একটা আগুনের স্ফুলিঙ্গ আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে, আবার পিছিয়ে আসছে, এর মানে কি? কী ওটা? জোনাকি?

তারপর বুঝলেন। সিগারেটের আগুন।

ঘুমন্ত স্বামীকে উদ্দেশ করে বললেন, 'লেখক মানুষরা রাত্তিরে ঘুমোয় না না কি গো?' উত্তর পেলেন না। আশাও করেন নি। শুয়ে পড়লেন। কিন্তু সংবরণ শুয়ে পড়লেন না।

দেখলেন সাগরের হাত থেকে কিছুতেই আজ নিস্তার নেই তাঁর। এর আগে গল্পের চরিত্র কখনো এমন ভাবে তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে টেবিলে বসায় নি। নিজ টেবিলে বসে তিনি তাদের পেড়েছেন।

আত্মস্থ আর স্থির-স্বভাব লেখক সংবরণ চৌধুরী।

আজ এই প্রকাণ্ড নির্জন বাড়ি, এই যতদূর-চোখ-যায় খোলা মাঠ আর বিশাল আকাশ সব যেন তাঁকে স্পন্দিত করে তুলেছে। আর কোথা থেকে যেন শুক্তি আর সাগর তাদের করুণ চোখ মেলে সংবরণের দিকে তাকাচ্ছে।

সাগরকে শুক্তি প্রথম দেখেছিল কবে? কোন্‌খানে? খেলার মাঠে? স্কুলের খেলার মাঠে?

হ্যাঁ, স্কুলের খেলার মাঠে। শুক্তির এক বোনপো না ভাগ্নে পড়তো সাগরদের স্কুলে। তাদের স্পোর্টসের দিন শুক্তি গিয়েছিল শখ করে দেখতে।

শুক্তির বিধবা ননদ বলেছিল, 'মেয়েমানুষ যে ইস্কুলে খেলো দেখতে যায়, সাতজন্মে শুনি নি এমন কথা।'

শুক্তি বলেছিল, 'খেলতে তো আর যাচ্ছি না বাপু, দেখলে কি আর আমি দেহ বদলে পুরুষ হয়ে যাবো?'

সাগরের কাছে পরে হেসে হেসে গল্প করেছে শুক্তি, 'ভাগ্যিস গিয়েছিলাম! তা নইলে তুই হেন গুণনিধি হয়তো চিরদিনই আমার চোখের বাইরেই থেকে

যেত।'......বলতো, 'আহা, গুণনিধির কী মূর্তি তখন। মুখটা জবাফুলের মত, সর্বাঙ্গে ঘাম দরদর, জিলিপি কামড়ে ছুটে আসছেন দুশো গজ। দেখেই ইচ্ছে হল ছোঁড়াটাকে জলের কলের তলায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিই।

'ইস। তাই বইকি—' সাগর বলেছিল, 'আমায় দেখে তোমার 'ছোঁড়া' মনে হয়েছিল?'

'ওমা। তা না তো কি একটি মহিলা মনে হবে?'

কিন্তু—

সংবরণ ভাবলেন, 'ওদের কাছে আমি সাগরকে কোন্‌খানে এনে দাঁড় করিয়েছিলাম? ওই লাইব্রেরির ছেলেদের?'

ঠিক মনে করতে পারলেন না।

শুধু মনে পড়ল, কবে থেকে যেন শুক্তি হরদম আসতে লাগল সাগরদের বাড়ি। নেমন্তন্ন করে নিয়ে গিয়ে খাওয়াতে লাগল সাগরের জ্যেঠামশাইয়ের তিন-চারটে ছেলেমেয়েকে, ফল আর মিষ্টি দিয়ে যেতে লাগল যখন-তখন কর্তা-গিন্নীর নাম করে। আর সাগরকে কেবল বলতে লাগল, 'দেখ 'কিছু নয়' লেখাপড়ায় ভাল হতে হবে। তা নইলে মুখ থাকবে না আমার। তুই করলি ফেল, আর দোষ হবে আমার।'

সাগর রাগ করে বলতো, 'আর এখন কে দোষ দেবে তোমায়? যা খাওয়াতে শুরু করেছ! অত ঘুষ খেলে কি আর কেউ দোষ খুঁজে পায়?'

শুক্তি তার সেই ঝরণার মত হাসি হাসতে থাকতো। বলতো, 'আহা, ঘুষ বলছিস কেন বাপু? তোর আপনার লোকেদের খাওয়াতে ইচ্ছে হতে পারে না আমার?,

সাগর বলতো, 'অন্ততঃ জ্যেঠিমাকে নয়।'

তারপর কবে যেন একদিন শুক্তি খবর দিল, তার একজন কে আত্মীয়দের ছেলে বি, এ, পাস করে বেরিয়েছে, স্কুলে মাস্টারী করবে, হাত পাকাবার জন্যে টিউশনি খুঁজছে। আর প্রস্তাব করল সাগরের জন্য যদি—এইতো সামনের বছর ম্যাট্রিক দেবে, একটু সাহায্য পেলে—

সাগরের মা-র চোখ দিয়ে জল পড়েছিল। বলেছিলেন, 'দেখতেই তো পাচ্ছ মা অবস্থা। ভাসুর যা করছেন তাইতেই তো মরমে মরে আছি—'

শুক্তি গালে হাত দিয়েছিল—'ওমা, সে কি মাইনে নেবে? না না, মাইনে চায় না সে, একটা লেখাপড়ায় অমনোযোগী ছেলে চায় শুধু—'

সাগরের মা-ও গালে হাত দিয়েছিলেন সেই অদেখা গ্র্যাজুয়েটের চাহিদার খবরে, 'অমনোযোগী ছেলে চায়?'

'তবে না তো কি? সেটাই তো ট্রেনিং। ভাল ছেলেকে পড়ালে আর শিক্ষা হল কি? পড়ায় অমনোযোগী অন্যমনস্ক ছেলেকে বশে আনতে শিখলে তবে না ভাল মাস্টার!'

সাগরের মা ভাবলেন, ঈশ্বর স্বয়ং এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর সামনে সেই সদ্য বি. এ. পাসের মূর্তি ধরে।

জ্যেঠামশাই-জ্যেঠিমাও প্রথমে শুনে হাঁ হয়ে গিয়েছিলেন, বিশ্বাস করেন নি। শুক্তির ওই সব বাকচাতুরী বিশ্বাস জন্মিয়ে পড়ল তাঁদের।

কিন্তু সাগরদের বাড়িতে জায়গা কোথায়? যেখানে সাগরদের মত একটা আশ্রিত জীব প্রাইভেট টিউটর নিয়ে বসতে পারে? জায়গা নেই।

তাছাড়া গোলমালের অন্ত নেই। অতএব অন্য ব্যবস্থা খুঁজতে হয়। শক্তও হয় না খোঁজা।

শুক্তিদের বাড়িটাই তো পড়ে রয়েছে অগাধ শূন্যতা নিয়ে। ছেলেমেয়ে তো নেই-ই, বাড়ির কর্তাও তো সেই মেসোপটেমিয়ায়। তাঁর ফিরতে ফিরতে পরীক্ষা হয়ে যাবে সাগরের। তাছাড়া, মাস্টার শুক্তির বোনপো না কে যেন, ও বাড়িটা তার পক্ষেও আরামের।

ব্যবস্থা হয়ে যায়। সাগর ও-বাড়ি গিয়ে মাস্টারের কাছে পড়ে। সাগরের মা শুক্তিকে আশীর্বাদ করেন, 'জন্ম-এয়োস্ত্রী হও মা। পাকা চুলে সিঁদুর পর।'

সাগরের জ্যেঠিমা চুপি চুপি সাগরের জ্যেঠামশাইকে বলেন, 'মুখে বললেই পাপ, কিন্তু জেনো এ সমস্তই সাগরকে কাছে টানবার চেষ্টা।'

সাগরের জ্যেঠামশাই বিব্রত হয়ে বলেন, 'তা, সে তো বোঝাই যাচ্ছে। ছেলের মত ভালবাসে ছেলেটাকে—'

বিব্রত হওয়ার কারণ আছে।

মেয়েটা তাঁকেও 'জ্যেঠামশাই', 'জ্যেঠামশাই' করে প্রায় হাত করে ফেলেছে। উনি নাকি ঠিক শুক্তির মরে-যাওয়া পিসেমশাইয়ে মতন দেখতে। আর পিসেমশাইকে নাকি শুক্তি একগাদা ভালবাসত।

জ্যেঠিমারও চুপি চুপি ছাড়া চেঁচিয়ে বলার উপায় নেই। কারণ, সম্প্রতি পুজোর সময় লাল ভোমরা-পাড় গরদ দিয়েছে তাঁকে শুক্তি। নিতে আপত্তি করায় মুখ শুকিয়ে বলেছে, 'মা নেই, শাশুড়ী নেই, গুরুজন বলতে ওই এক

বিধবা ননদ। ইচ্ছে হলে একখানা লাল-পাড় শাড়ি দেয়ার লোক পাই না জ্যেঠিমা—'

তা, শুক্তির সেই ইচ্ছে-পূরণের খাতে জ্যেঠাইমার উচ্চস্বরকে ব্যয় করতে হয়েছে। অবশ্য শুধু তাই নয়, আরও একটা লোকসান হয়েছে তাঁর—একটি বান্ধবী হারাতে হয়েছে। পাঠবাড়ীর যাত্রা সঙ্গিনী!

শুক্তির ননদ আর তেমন করে মন খুলে কথা বলেন না। সেই যবে থেকে শুক্তির ও-বাড়িতে 'ঢল নেমেছে।' শুক্তির ও-বাড়িতে যাতায়াতের বহরে প্রাণ খুলে শুক্তির নিন্দে করবার সাহস তাঁর গেছে।

তবে আর কোন প্রসঙ্গ নিয়ে প্রাণ খুলবেন?

শুধু পাঠ-বাড়িতে শোনা তত্ত্ব-কথা নিয়ে?

শুধু ভগবদ প্রেম নিয়ে?

মানুষ বই তো দেবী নন তিনি!

অতএব জ্যেঠিমার কণ্ঠস্বর খাদে নেমে গেছে।

সেই খাদে-নামা গলায় তিনি বলেন, 'থামো তুমি! ছেলের মতন। একবারও 'বাবা বাছা' বলতে শুনেছ? 'ভাই' পর্যন্ত বলে না। নইলে—'ধর্মছেলে', 'ধর্মভাই' দেখি নি কখনো? এই তো আমারই মাসীকে তো দেখেছি? শরৎদা! মাসীর ধর্মছেলে তো? গুষ্ঠি-শুদ্ধু সবাই আমরা দাদা বলেছি তাঁকে। মাসীমাও 'শরৎ' বলে মরে যেতেন একেবারে। জীবন-ভোর টেনেছেন তাঁকে, তাঁর সব দায়-দৈব, বিয়ে-থাওয়ায় দেখেছেন, অথচ নিজে যে বাঁজা তা নয়। ছেলে মেয়ে সবই ছিল। তারা একটু-আধটু হিংসে করলে বলতেন, 'ওরে বাবারে, শরৎ হল আমার সকলের আগে।'

'ধর্মভাইও দেখেছি আমার গঙ্গাজলের, আজীবন সেই ধর্মভাই ওকে দেখেছে। নইলে কোথায় ভেসে যেত গঙ্গাজল। ষোলো বছরে বিধবা, ভাইয়ের আশ্রয়ে এসে পড়েছিল, সেই ভাইও গেল। তা, সেই ভাইয়ের মৃত্যু-শয্যাতেই—ও যখন ডাক ছেড়ে কাঁদছিল 'ও দাদা, আমায় কে দেখবে' বলে, ওই সে ভাইয়ের বন্ধু না কে বলল, 'ও দাদা, আমায় কে দেখবে' বলে, ওই সে ভাইয়ের বন্ধু না কে বলল, 'ভেবো না, আমি রইলাম তোমার দাদার জায়গায়।'

তা সেই 'দাদা দাদা' সার হয়েছিল গঙ্গাজলের।

এসব হল আলাদা।

আর ডাক্তারের বৌয়ের ধরন আলাদা। একবার 'বাবা' বলে না, একবার

'দাদা' বলে না। এ হচ্ছে আর এক প্রকার আসক্তি, বুঝলে? সেকালে যেমন নবাব-বাদশারা পাকাচুল বুড়ো হয়েও সুন্দরী ছুঁড়ি দেখলে লোভে মরতো—'

এসব কথা সাগরের কাছে সরবরাহ করতো জ্যেঠতুতো বোন টুনি। হি হি করে হেসে হেসে মরতো, আর বলতো, 'সব শুনি বুঝলি, সমস্ত। কিন্তু এমন মটকা মেরে পড়ে থাকি, মা ভাবে ঘুমোচ্ছি। অত গজ গজ করলে ঘুম আসে?'

তারপর হঠাৎ হয়তো বলে বসতো, 'আচ্ছা দাদা, আসক্তি মানে কি?'

আসক্তি মানেটা যে কি, সে কথা বোঝাবার ক্ষমতা হয়তো তখন ছিল না সাগরের। কিন্তু আসক্তি যে কি, তা তো হাড়ে হাড়ে বুঝতো। যেখানে আর জীবনেও যাবে না বলে প্রতিদিন প্রতিক্ষণ প্রতিজ্ঞা করেছে, সেখানে রোজ না গিয়ে পারছে না, এর চাইতে অদ্ভুত আর কী আছে?

অথচ—প্রতিজ্ঞা না করেও পারত না।

প্রতিক্ষণই যেন একটা অপরাধবোধের ভারে চিত্ত ভারাক্রান্ত হয়ে থাকতো। টুনির আর ঝুমির মুখনিঃসৃত সংবাদ, প্রত্যেকের মুখের একটু ব্যঙ্গাত্মক বাচন, শুক্তির ননদের সংশ্লেষ উক্তি, আর সর্বোপরি শুক্তির বেপরোয়া চালচলন তাকে যেন বিভ্রান্ত করে তুলত।

পড়া শেষ করে ফিরে যাচ্ছে, মাস্টার উঠে পড়েছেন, শুক্তি বলে উঠতো, 'ওহে মাস্টার, খেয়ে যেতে হবে আজ।'

সে না না করতো, বিব্রত হতো, অস্বস্তি পেত, শুক্তি জবরদস্তির জোরে ধরে রাখতো। আর তার সঙ্গে নিশ্চিত নিয়মে বলতো, 'সাগর তুইও। তোর বাড়িতে খবর পাঠিয়েছি।'

সাগরের মাথা জোরে নড়ে উঠত। আর শুক্তি হেসে গড়িয়ে পড়ত, 'আহা হা, কী সুন্দর! খোকাবাবু! জট নড়ে তেঁতুল পড়ে!'

থাকতেই হতো। খেতেই হতো। যা সব অভিনব রান্না রাঁধত রান্নাবাতিক মেয়েমানুষ শুক্তি!

কিন্তু তারপর?

আড়াল-আবডাল থেকে ননদের মন্তব্য শুনতে হত, 'ভাইটা আমার কোথায় গিয়ে পড়ে আছে, কী খাচ্ছে তার ঠিক নেই, একটা পরের ছেলে নিয়ে সোহাগ! তাকে সোনার সামগ্রী খাওয়ানো! আদিখ্যেতার শেষ নেই।'

আবার বাড়ি গিয়ে শুনতে হত জ্যেঠির অভিযোগ—'সেই যদি খাওয়াবেই তো একটু আগে বললেই হত। গেরস্তর ভাত-তরকারিটা ফেলা যেত না।'

হরদমই এই সব। 'কিছু নয়'-এর ওপর রাগে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে যেত তার।

সত্যিই তো এত কি!

বলে ফেলল একদিন।

তখন টেস্ট দিয়েছে সাগর। স্কুলে আর যেতে হয় না। মাস্টারমশাই সপ্তাহে চারদিনের ডিউটি বদলে প্রতিদিন করে নিয়েছে।

সাগর বলল, 'প্রতিজ্ঞা করেছি, তোমার কাছে আর খাব না।'

'কী বললি? কী বললি শুনি?' ঝলসে উঠল শুক্তি।

সাগর বলা কথাটাই পুনরাবৃত্তি করল। বেশ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে করল।

শুক্তির মুখটা হঠাৎ যেন কেমন হয়ে গেল। ইলেকট্রিকের সুইচ নিভিয়ে দিলে হঠাৎ ঘরটার যেমন চেহারা হয়ে যায়, তেমনি মুখের চেহারা হয়ে গেল শুক্তির। বলল, 'কেন রে?'

'কেন আবার? এমনি।'

'এমনি বলে কোনও কথা হয় জগতে? কারণ একটা থাকবেই। বল কী হয়েছে?'

সাগর বলল, 'বললাম তো এমনি। ভালো লাগে না—

'ভাল লাগে না তোর আমার হাতে খেতে?'

'লাগে না-ই তো!'

নিষ্ঠুর হবে প্রতিজ্ঞা করেছে সাগর। সে প্রতিজ্ঞা শিথিল করবে না। তাই আবার বলল, 'লাগে না-ই তো!'

শুক্তি একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আচ্ছা।'

'তোমার খালি খাওয়ানো—'

'ব্যস্! বলেছি তো—আচ্ছা।'

তারপর ক'দিন কেমন একরকম নির্লিপ্ত হয়ে থাকল শুক্তি।

সাগর আসে, মাস্টারমশাই আসেন। পঠন-পাঠন চলে, শুক্তির দেখা পাওয়া যায় না। তা, সেও তো আর এক বিরাট অস্বস্তি। সেও তো বুকের ওপর পাষাণভার। চলে আসার সময় কি রকম যেন অপমান অপমান লাগে।

অনেকগুলো দিন কেটেছে সেই রকম দুঃখে অপমানে, বুঝি বা ভয়ে। অথচ ঠিক সেই সময়ই পড়ার চাপ বেশি।

হঠাৎ মেঘ ভেঙে বর্ষা নামল।

মাস্টার আসবার একটু আগেই গিয়েছিল সেদিন সাগর। হঠাৎ শুক্তি একখানা আর্শি এনে ওর মুখের সামনে ধরল।

সাগর চমকে গিয়েছিল। বলে উঠেছিল 'কি?'

সাগর সেই আর্শি-ধরা হাতটা ধরে ফেলেছিল।

শুক্তি আস্তে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'খুব তো তেজ দেখালি। তোমার হাতে খেতে ঘেন্না করে, জীবনে আর তোমার হাতে খাব না, হেন তেন, চেহারাখানা কী খোলতাই হয়েছে দেখেছিস?'

সাগর তখন তেরো বছরের নেই, ষোলয় পড়-পড়।

বেশ কিছু কথা শিখেছে তখন সাগর। তাই বলেছিল, 'তোমার হাতে খেতে ঘেন্না করে এ কথা বলেছি যদি বল, সে তো বানিয়ে বলছ। খাওয়ানো ছাড়া, তোমার আর কোন আদর নেই সেই কথাই বলেছিলাম।

হঠাৎ শুক্তির মুখটা অদ্ভুত রকম বদলে গিয়েছিল।

সাগরের চোখ দিয়ে সেই মুখ যেন দেখতে পাচ্ছেন সংবরণ চৌধুরী।

অদ্ভুত এক আলো জ্বলে-ওঠা রহস্য-হাসি-আঁকা মুখ। চোখের দৃষ্টি যেন কত কি কথা বলছে।

মুখে শুধু বলেছিল, 'তা তোকে আর কি করে আদর করবো বল্?'

সাগর হঠাৎ ভয় খেয়ে গিয়েছিল।

তার ষোল বছরের মর্যাদা ভূমিসাৎ করে, 'দেরি হচ্ছে, মাস্টারমশাই এলেন না' বলে তাড়াতাড়ি উঠে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তারপর সাগর উদয়াস্ত পড়া শুরু করল। দিন নেই রাত নেই, সকাল নেই সন্ধ্যে নেই—শুধু পড়া।

অজয় বলে, 'ম্যাট্রিকে ফার্স্ট হবি ভেবেছিস বুঝি?'

ঝুমি বলে, 'ফার্স্ট হলে খাওয়াবি তো দাদা?'

জ্যেঠামশাই আস্তে বলেন, 'আমি জানতাম, আমি জানতাম। ওর বাবা—'

জ্যেঠিমা বলে, 'তবু ভাল যে মায়াবিনীর আকর্ষণটা একটু কেটেছে।'

মা বলেন, 'স্বর্গ থেকে তিনি দেখবেন সাগর। আমার আর কি আছে বল, ওঁর আশীর্বাদই আমার আশীর্বাদ।'

শুক্তি প্রাণপণে নিজেকে সরিয়ে রাখে।

শুক্তি ওদের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করে না। শুধু মাস্টারের কাছে জেনে নেয় ও কী করছে না করছে।

কিন্তু মায়াবিনীর আকর্ষণ কী যাবার? পাকে-চক্রে আবার পাক পড়ে।

পরীক্ষার দিন মা জ্যেঠিমা জ্যেঠামশাই সবাইকে প্রণাম সারা হয়েছে, কপালে দধি-চন্দনের টিপ্, হঠাৎ মা বলে উঠলেন, 'ও-বাড়িতে ডাক্তারের বৌকে একটা প্রণাম করে যাওয়া উচিত তোর সাগর! বলতে গেলে ওর ইয়েতেই সব, নইলে আমাদের কী সাধ্যি ছিল বল মাস্টার রাখবার! নিশ্চিন্তি হয়ে একটু পড়তে জায়গা দেবারও ক্ষমতা ছিল না।' কথাটা এতই অকট্য যে কেউই প্রতিবাদ করতে পারল না।

কিন্তু সাগরের মাথায় বজ্রপাত। প্রণাম! 'কিছু নয়' কে?

প্রণাম নেবে সে? অদ্ভুত ভাবে ব্যঙ্গ-হাসি হেসে উঠবে না?

না বাবা! সে পারা যাবে না।

অগত্যাই অন্য পথ ধরে। বলে, 'দেরি হয়ে যাবে।'

মা বলে, 'না, না, অনেক সময় আছে এখনো। এ যদি না করিস, সাগর, বুঝবো তুই মহা অকৃতজ্ঞ।'

অতএব যেতে হল সাগরকে।

দেখল সেইখানে দাঁড়িয়ে আছে শুক্তি। সেই তার চিরদিনের জায়গায়। সদরের গেটের কাছে। সাগরকে দেখে নড়ল না, কথা বলল না।

সাগর বিমূঢ়ভাবে একটু হেসে বলল, 'পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি—'

শুক্তি ভুরু কুঁচকে বলল, 'তুই বলবি তবে জানবো?'

'তা নয় মানে—'

'মানে বোঝাবার কিছু নেই। আমি বুঝে নিয়েছি।'

'কি বুঝেছ?'

'যা বোঝবার! কিন্তু হঠাৎ এলি যে? তুই তো আর আমায় ভালবাসিস না।'

সাগর দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করল, 'তা কি করে বাসবো! মিথ্যে কথার রাজা তুমি।'

'মিথ্যে কথার রাজা?'

'নয়তো কি? মাস্টার আমায় অমনি পড়াত? সে তোমার বোনপো? আমার মতন একটা গবেট ছাত্তর চাইছিল সে বিনি পয়সায় পড়াবে বলে? এসব সত্যি কথা?'

শুক্তি হঠাৎ আগের মত হেসে উঠে বলে, 'মোটেইনা! সব মিথ্যে! একটা কিন্তু মিথ্যে নয়। ছাত্তরটা গবেট—'

'ইস্! দেখো! পড়তাম না তাই সেবার—

'পড়তিস্ না, না আমি পড়তে দিতাম না?' বলে মুখ টিপে কৌতুকের হাসি হাসল শুক্তি।....ক্ষণে ক্ষণে মুখের রং বদলায় ওর।

ক্ষণে ক্ষণে হাসির রকম বদলায়। তাই আবার শান্ত কোমল হাসল।

'কিন্তু দাঁড়িয়ে দেরি করিস না, সময় হয়ে গেছে। বলেছিলাম আমাদের গাড়িতে পৌঁছে দেবে, তা তোর মা বললেন বন্ধুদের কাছে লজ্জা পাবে।'

'হ্যাঁ তাই তো! যা ঠাট্টা করে ওরা!'

'ঠাট্টা করে?'

'করে না? চিরদিন করে।'

'তুই কি বলিস?'

'বলবো আবার কি? আচ্ছা—' বলেই হঠাৎ আবার সেই একটু বিমূঢ় হাসি হেসে বলে, 'মা বলে দিয়েছিলেন—'

'কীরে? কী বলেছেন মা?'

'বললেন—বললেন তোমায় প্রণাম করে যেতে—'

'প্রণাম? আমায় প্রণাম?' ঢেউ দিয়ে হেসে উঠল শুক্তি, আর হঠাৎই কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, 'তাহলে কর।'

'নাঃ য্যাঃ!' বলে পালাল সাগর।....প্রণাম করে নি।

ডাক্তারের বৌকে প্রণাম করে নি সাগর। শুধু গুরুজনদের করেছিল।

আর বোধকরি তারই জোরে তরে গিয়েছিল। রীতিমতই তরেছিল!

স্ট্যাণ্ড করেছিল ম্যাট্রিকে।....সংবরণ কলম রাখলেন।

সিগারেট ধরালেন একটা। অনেকক্ষণ ধরে উড়িয়ে দিলেন ধোঁয়ার কুণ্ডলী। তারপর আবার কলম তুলে লিখলেন, 'সেই হল কাল সাগরের!'

ভাল করে পাস করার জন্যে জ্যেঠামশাই একটি ঘড়ি উপহার দিলেন সাগরকে। নিকেল-প্লেট পকেট ঘড়ি। যে ধরনের জিনিস হয়তো জ্যেঠামশাইদের যৌবনকালে ফ্যাশনের ঘরে গণ্য হতো।

বলা বাহুল্য, ঘড়িটা পছন্দের যোগ্য নয়।

তবু জ্যেঠামশাইয়ের স্নেহ-উপহার। আহ্লাদে চোখে জল এল সাগরের।

প্রণাম করল জ্যেঠামশাইকে, আর ঠিক সেই মুহূর্তে টুনি বলে উঠল, 'ইঃ, ভারী জিনিসই দিলে বাবা তুমি! দাদার ওইঁ উনি যা একখানা হাত-ঘড়ি দিয়েছেন দাদাকে! সোনার ব্রেসলেটের মত। হাত-ঘড়িকে রিস্টওয়াচ বলে বাবা?'

পাথর হয়ে গিয়েছিল সাগর। পাথর হয়ে গিয়েছিলেন জ্যেঠামশাই।

ঘরের মধ্যে থেকে পাথর হয়ে গিয়েছিলেন সাগরের মা।

তারপর জ্যেঠামশাই হাত বাড়িয়ে ছিলেন সাগরের দিকে। কালো অন্ধকার মুখে বলেছিলেন 'দাও, ওঠা দিয়ে দাও তাহলে।'

সাগরের ইচ্ছে হচ্ছিল 'জ্যেঠামশাই' বলে চিৎকার করে ডেকে ওঠে। পারে নি। গলা দিয়ে শব্দ বেরোয় নি।

জ্যেঠামশাই আরো গম্ভীর আর মৃদুস্বরে বলেছিলেন, 'দাও। এখনো দোকানে ফেরৎ দিলে পঁচিশটা টাকা পাওয়া যাবে। দশজোড়া ধুতি হবে আমার। সারা বছরের সংস্থান।'

অনেকদিন পর্যন্ত ভেবেছিল সাগর, কী করে তখন পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল সে। অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় নি কেন?

যায় নি। হাত বাড়িয়ে ঘড়িটা দিয়ে দিয়েছিল জ্যেঠামশাইয়ের হাতে।

জ্যেঠামশাই রান্নাঘরের দরজার কাছে গিয়ে বার দুই পায়চারি করে ধরা ধরা গলায় বলেছিলেন, 'আমি শাসন করলে নিন্দে হবে ছোটবৌমা, তুমি ভাববে 'ভাত দিচ্ছেন তাই', হয়তো ভাববে ছেলে আমার বিবাগীই হয়ে যাবে। কিন্তু এইটি মনে রেখো—একজামিনে ফার্স্ট হওয়াটাই সব নয়। ছেলেকে শিক্ষা দিতে হলে—'

ঘরে ঢুকে গিয়েছিলেন জ্যেঠামশাই। কথা শেষ করেন নি।

ছোটবৌমার হুঁশ হয়েছিল বোধহয় কড়ার তরকারি পুড়ে যাওয়ার গন্ধে।

না, মাকে লুকোয় নি সাগর।

বরং মা-ই লুকিয়েছিলেন আর সকলের কাছ থেকে। সাগর এসেছিল বটে দুরু দুরু বুক নিয়ে। তবু তখনো ঠিক বুঝতে পারে নি জিনিসটা অত দামী। এনে মাকে দেখিয়েছিল, বলেছিল 'এই দেখ মা কাণ্ড! আমি কিছুতেই নেব না, অথচ ছাড়বেও না—'

মা শঙ্কিত চোখে চুপ করবার ইশারা করেছিলেন। তারপর চট্ করে নিজের বাক্সয় তুলে ফেলে বলেছিলেন, 'কারুকে দেখাস নে সাগর, কারুকে না। তোর জ্যেঠামশাই তোকে ঘড়ি দেবেন বলে ঠিক করেছেন—'

'জ্যেঠামশাই!' স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে ছিল সাগর।

মা বলেছিলেন, হ্যাঁ। বলেছিলেন সেদিন—তোর বাবার নাম করে বলেছিলেন, অমুক যখন স্কলারশিপ্ পেল, বাবা ঘড়ি কিনে দিলেন তাকে। ঘড়ি ঘড়ির চেন। ওর বাপ নেই, তবু গরীব জ্যেঠা আছে। ঘড়ি একটা দেব আমি ওকে। এই সোনার ঘড়ি দেখলে বড় দুঃখু পাবেন।'

তা, সেই দুঃখের হাত থেকে রক্ষা করা গেল না তাঁকে। টুনি যে কোন্ ফাঁকে সেই দৃশ্য অবলোকন করেছিল, এবং সেই কথোপকথন গলাধঃকরণ করেছিল, ঈশ্বর জানেন। আর ঈশ্বর জানেন, ন্যাকা সেজে কেন বলে দিয়েছিল অমন করে।

হয়তো এই মজাদার খবরটা অজয়কে বলেছিল, হয়তো বদমাইস অজয়টা ওকে হাটে হাঁড়ি ভাঙবার পরামর্শ দিয়েছিল। বুঝল না, মজাটা কোথায় গিয়ে পৌঁছল।

মরমে মরে গেছেন জ্যেঠামশাই তাতে আর সন্দেহ রইল না।

আর সাগরের মা-র সমস্ত সদিচ্ছা একটা কদর্য রূপ নিয়ে সংসারের সামনে মাথা হেঁট করে চোখের জল ফেলতে লাগল।

ঘড়িটা বার করতে হল তাঁকে।

আর মা-ছেলের 'ষড়' নিয়ে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি করলেন জ্যেঠিমা। এ সন্দেহও প্রকাশ করলেন, তলে তলে এই রকম আরো কত কীই দেয় বড়লোকের গিন্নী। হয়তো টাকাই দেয় গোছা গোছা। তাই ছোটবৌয়ের 'ওদের বৌ', 'ওদের বৌ' করে মুখে লাল পড়ে, আর তাই ছোটবৌ,—হ্যাঁ, স্পষ্টই বলেছিলেন জ্যেঠিমা—তাই ছোটবৌ ওই মায়াবিনীর কবলে কচি বাচ্ছা ছেলেটাকে নির্বিবাদে ধরে দিয়েছে। কে জানে ওই রঙ্গিণী ছেলেটার কাঁচা মাথাটা খেয়ে শেষ করছে কি না। 'ডাইনের কোলে পো সমর্পণ' আর কাকে বলে?

এও বলেছিলেন, ডাক্তার যেমন ভ্যাবাগঙ্গা, ওই চৌনেভৌনে বৌকে কখনো এমন করে একা রেখে যেতে আছে? সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হয়, চোখে চোখে রাখতে হয়।

সব কথার মানে তখন বুঝতে পারে নি সাগর। পরে বুঝতে পেরেছিল, অনেক দিন পরে।

সে রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন মা সাগরকে ডাকলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'মনে দুঃখ করিস না বাবা, আমার একটা হুকুম তোকে মানতে হবে।'

সাগর পরে বুঝেছিল ইচ্ছে করেই 'হুকুম' শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন মা।

সাগর শঙ্কিত চোখে তাকিয়েছিল।

মা দেখতে পান নি। ঘর অন্ধকার ছিল।

তবু বুঝতে পেরেছিলেন মা। বলেছিলেন, 'বুঝছি তোর খুব কষ্ট হবে, লজ্জা

পাবি, ভালবেসে ভাল মনে দিয়েছে সে, কিন্তু সব দিক ভেবেই বলছি—ঘড়িটা কাল ফিরিয়ে দিয়ে আসবি।'

ফিরিয়ে! ঘড়িটা! সাপে-কামড়ানো রুগীর মত আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল সাগর।

বলেছিল 'মা!'

মা বলেছিলেন, 'বুঝতে পারছি সাগর! তবু এ তোকে করতেই হবে। সংসারের লোক বড় নোংরা।'

সাগর অনেকক্ষণ পরে বলেছিল, 'কী বলব?'

মা বলেছিলেন, 'বলবি আপনার জিনিস আমি মাথায় করে নিয়েছি, কিন্তু মা বলেছেন এ আমার হাতে মানাবে না। আমার নাম করিস।'

অনেকক্ষণ জেগে বসেছিল সাগর।

মা বলেছিলেন 'শুয়ে পড়। ভগবানের নাম কর।'

তারপর আরো অনেকক্ষণ পর মা বোধকরি বুঝতে পেরেছিলেন সাগর জেগে আছে, সেই ভেবেই বলেছিলেন, 'তা, তুই ওকে মাসী পিসি কি দিদি বৌদি কিছু বলিস না কেন? শুধু 'এ ও তা' করে কথা কয়ে সুবিধেও তো নেই।'

সাগর এ কথার উত্তর দেয় নি, ঘুমের ভান করে পড়েছিল।

সাগরের তখন সেই অনেকদিন আগের কথা মনে পড়েছিল। যেদিন সেই বারো বছরের সাগর বলেছিল, 'আপনাকে দিদি বলব না, বৌদি বলব?'

না, মাসী পিসি বলবার কথা ভাবে নি সাগর, ওই সম্বোধন দুটোই গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল তার।

কিন্তু শুক্তি উড়িয়ে দিয়েছিল। বলেছিল 'কিছু নয়' বলবি। সে কথাটা মনে পড়ল। তারপর ভাবল ঘড়িটা ফিরিয়ে দেওয়ার চাইতে অনেক সহজ ফেলে দেওয়া। ফেলেই দেবে সে।

কথাটা যতবার ভাবতে চেষ্টা করল ততবারই বুকের মধ্যেটা 'হু হু' করে উঠল সাগরের।

ফেলে দেবে!

ঘড়িটা হেদোর জলে ফেলে দেবে!

জগতে এর চাইতে মর্মান্তিক কথা আর কি থাকতে পারে?

জীবনে প্রথম পাওয়া উপহার!

আর কী অপূর্ব উপহার!

সাগরের এতাবৎ কালের যত কিছু সঞ্চিত সম্পদ এ উপহার তার মাঝখানে যেন কোহিনুর-হীরে। মাটির ঢেলার রাজ্যে সাগর-ছেঁচা মণি! শ্রেষ্ঠ মূল্যবান বস্তুর যত কিছু উপমা এ পর্যন্ত বা পড়েছে সাগর, সব কিছু মনের মধ্যে ডুকরে ডুকরে উঠছিল।

সাগরের জীবনে যে জিনিস স্বপ্নের কল্পনাতেও ছিল না, সে জিনিস হাতের মধ্যে পেয়েছিল সাগর, আজ তাকে হাতে করে জলে ফেলে দিয়ে আসতে হবে।

বাঁধভাঙা নদী কূল ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়ে, ঝরে পড়ে টপ্‌টপিয়ে। অনেকক্ষণ লাগে সেই উচ্ছ্বসিত আবেগ সামলাতে।

ঘড়িটা মার কাছ থেকে নিতে গিয়েও ঠোঁট কাঁপল, গলা বুজে এল। হয়তো বা মারও তাই এল। মাও ভাল করে কথা বলতে পারলেন না, বাক্স খুলে আস্তে তুলে দিলেন ছেলের হাতে।

হাতে নিয়েই সাগর ছুটে বেরিয়ে যাবে ভেবেছিল কিন্তু পা যেন পাথর হয়ে বাদ সাধল। মা বোধ হয় বুঝলেন, আস্তে ওর মাথায় হাত রেখে বললেন, 'আমার আশীর্বাদের কোনো মূল্য নেই বাবা, সে আমি জানি, তবে ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করে তোকে যেন অনেক অনেক বড় করেন, যেন এমন জিনিস নিজে তুই একশোটা কিনতে পারিস—'

মায়ের এ সান্ত্বনায় মন বিগলিত না হয়ে কেন কে জানে হঠাৎ ধৈর্যচ্যুতি ঘটল সাগরের। ভাঙা ভাঙা তীব্র গলায় বলে উঠল, 'ভগবান ছাই করবে, কচু করবে। জিনিসের জন্যেই যেন মরে যাচ্ছি আমি—'

তারপর ছুটে বেরিয়ে গেল।

গেল শুক্তির কাছে নয়, হেদোর দিকে।

'জিনিসের জন্যে নয়—' সে কথাটা মিথ্যাও নয় কিন্তু। প্রথমটায় অবিশ্যি জলে ফেলে দেবার সংকল্পে 'জিনিসটা' বলেই প্রাণটা ফেটে যাচ্ছিল, তারপর আর এক দিক থেকে উঠেছে আলোড়ন।

'কিছু নয়' যখন বলবে 'কই ঘড়িটা হাতে পরলি না?' তখন কি বলবে সাগর? একদিন দু'দিন এটা ওটা বলে চালানো যায় কিন্তু কোনও দিনই যখন আর ঘড়িটা চোখে দেখতে পাবে না 'কিছু নয়?'

কী ভাববে?

হয়তো ভাববে হারিয়ে ফেলেছে। কী লজ্জা! কী দুঃখ! 'কিছু নয়' এর

দেওয়া উপহারটা হাতে না পরেই হারিয়ে ফেলল সাগর, এ কথা ভেবে 'কিছু নয়' এর কী মনের অবস্থা হবে?

সাগর কি তখন তবে বলবে চুরি গেছে!

সেটাই কি শুনতে সুন্দর?

বাড়ির আর কোনো জিনিস চুরি গেল না, গেল ওইটাই। তার মানে সাগর ঘড়িটা যেখানে সেখানে ফেলে রেখেছিল। তাঁর মানে সাগর জিনিসটার মূল্যই বোঝেনি। না বা টাকার, না বা ভালবাসার।

তবু হঠাৎ শুক্তির ওপরেই ভীষণ রাগ হতে লাগল সাগরের।

কেন!

কেন এত বেশী দামী জিনিষ দিয়ে ঘটা দেখাতে গেল 'কিছু নয়?' সাগর কী বা মানুষ, কী বা তার অবস্থা, তাকে একখানা দু'খানা গল্পের বই দিলেও তো যথেষ্ট হতো। নাম লেখা বই দুটো বরং যত্ন করে তুলে রাখতে পারতো সাগর, এমন করে জলে ফেলে দিতে হতো না।

·

জলে ফেলে দেবার কথা যতবারই ভাবে, জল উপছে আসে চোখে। তারপর হেদোর ধারের কাছে এগিয়ে আসে।.......

বিকেলের আলো তখনো শেষ হয়ে যায় নি, সারা পার্কটা জুড়ে লোক। কেউ বসে কেউ শুয়ে, কেউ আধ শুয়ে, যারা সাঁতার শেখবার, তারা তা' শিখছে, ছোটরা খেলা করছে, ঘুগনিওলা আর কুলপিওলা ঘোরাঘুরি করছে, মোটের ওপর সমস্ত জায়গাটা জুড়েই একটা জীবন চাঞ্চল্যের লীলা।

সাগর ভাবল, এত লোক এত আহ্লাদে ভাসছে, শুধু আমিই এসেছি প্রাণটাকে ছিঁড়ে উপড়ে বিসর্জন দিতে!

তারপর ভাবল, এত লোকের সামনে ফেলা চলবে না। তা' হলে লোকে হৈ হৈ করে উঠবে। হয় তো ওই যারা সাঁতার দিচ্ছে, তারা কুড়িয়ে লুটে নিয়ে আসবে। কার জিনিস কার জিনিস করে একটু রব তুলে কেউ একজন নিজের পকেটস্থ করবে। যার জিনিস, সে তার জ্বালা জ্বালা করা চোখটা নিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে।

নাঃ, এত লোকের মাঝখানে নয়।

চলে যাক ওরা।

ওই একেবারে সামনে ওই কলেজের ছেলের দলেরা। চলে যাক সাঁতারুরা।

বসে রইল সাগর।

যেন আচ্ছন্নের মত বসে রইল।

ক্রমশঃ হালকা হয়ে এল ভীড়, সাঁতারের ছেলেরা উঠে পড়ল। ঘুগ্‌নিওলারা চলে গেল, কুলপিওলারা ছুটোছুটি ঘোরাঘুরি বন্ধ করে এক একটা জায়গায় হাঁড়ি নিয়ে গুছিয়ে বসল।

সাগর তখন সংকল্পে বুক বেঁধে উঠে দাঁড়াল।.......

ঘড়ি হাতে ছেলেটাকে হেদোর ধারে দেখতে পেলেন সংবরণ। আর দেখে একটু করুণ হাসি হাসলেন। দেখলেন কিনা, শেষ্ পর্যন্ত ছেলেটা পারল না প্রাণ ধরে ফেলতে।

দেখলেন, বার বার কেস খুলে সে ঘড়িটাকে দেখছে আবার বন্ধ করছে। ম্লান থেকে ম্লান হয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত নিয়ে ফিরে গেল।

সংবরণ আর একবার সিগারেট ধরালেন। দেখতে লাগলেন—

বলির পাঁঠার মতই সেই চিরপরিচিত গেটওয়ালা বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল সাগর। বাড়িটায় আজ যেন একটি চাঞ্চল্য।

ঠিক কি তা বুঝতে পারল না। তবু মনে হল। হয়তো দোতলার সমস্ত জানলাগুলো খোলা হয়েছে বলে, হয়তো চাকর ঠাকুর দুটোর বার দুই ব্যস্ত ভাবে বাড়ি থেকে বেরোনো দেখে, হয়তো বাড়ির সামনে দু'খানা গাড়ি দাঁড়ানো দেখে।

এ চাঞ্চল্য কিসের? অসুখ করল না তো 'কিছু নয়'-এর? ইতস্ততঃ করে ঢুকে পড়ে চলে যাচ্ছিল সোজা ভিতরে, হঠাৎ একটা ঝি দেখতে পেয়ে আকর্ণ হাসি হেসে বলল, 'আজ আর গপ্‌পো হবে না, বাবু এসেছেন।'

বাবু এসেছেন!

সাগরের মনে হল সারা পৃথিবী দুলে উঠল যেন। বাবু এসেছেন! কই, সাগর তো একবর্ণও শোনেনি আসার কথা। গতকালও তো এসেছিল। 'কিছু নয়' তাহলে ইচ্ছে করেই গোপন করেছে সাগরের কাছে। সাগরকে অপ্রস্তুতে ফেলে মজা দেখবার জন্যে। নইলে কাল যখন বিদায় নিয়েছে, শুক্তি তো যথা নিয়মেই গেট অবধি এসেছে, আর যথারীতিই ওর হাতটা চেপে ধরে বলেছে, 'আসছিস তো কাল?'

তাই বলে শুক্তি।

এখন আর রাস্তা থেকে হিড় হিড় করে টেনে আনতে হয় না সাগরকে হাত চেপে ধরে, এখন তো এমনিই আসে সাগর।

চারাগাছগুলো যেমন ঝড়-জল-বাতাস ইত্যাদি প্রকৃতির শত রকম প্রতিকূলতার মধ্যে থেকেও নিজেকে ঠিক বাড়িয়ে নেয়, মনে হয় ভেঙে গেল বুঝি তবু ভাঙে না—শুক্তির কাছে তার আসা-যাওয়াটা ঠিক ওই ভাবেই বজায় থেকে গেছে। সংসারের প্রতিকূলতায় অজস্র বার 'আর না আসবার' যে প্রতিজ্ঞা করেছে, অজস্র বারই সে প্রতিজ্ঞা চূর্ণ হয়েছে।

দুদিন, চারদিন, খুব জোর সাত দিন। সেটাই শেষ সীমা।

হয় শুক্তি গিয়ে হানা দিয়েছে, নয় সাগরই যেন পথ চলতে দাঁড়িয়ে পড়েছে—এই ভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে নেহাৎই প্রতিবেশীর খবরটা নিতে যাচ্ছি ভঙ্গীতে ঢুকে পড়েছে।

তারপর প্রথমটা খানিকটা অভিমানের ঝড়, অবশেষে খুশির বন্যা।

আবার নতুন জোয়ারে নিত্য হাজিরা।

আবার বিদায়কালে 'আসছিস তো কাল'-এর প্রতিশ্রুতি। আসে, কোথা দিয়ে কেটে যায় সময়।

পরীক্ষার পর এই তিনটে মাস তো জলের মত কেটেছে। একটা দাবা কিনে ফেলেছিল শুক্তি, সেই দাবার নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল সাগরকে।

সাগর বলতো, 'কাকে বলে ঘোড়া, কাকে বলে নৌকো—তাই জানতাম না, আর এখন সকাল থেকে মনে হয় কখন খেলতে যাব। এমন নেশা ধরিয়ে দিয়েছ তুমি!'

শুক্তি ওর সেই ঈষৎ-বিস্ফারিত বড় বড় চোখদুটো তুলে যেমন তাকায় তেমনি তাকিয়ে, মুখ টিপে হেসে বলেছিল, 'কি আর করা? আমার নেশাটা তো ধরাতে পারলাম না, তাই তাস-দাবা—'

এসব ঠাট্টা এখন সাগরের গা-সহা হয়ে গেছে। তাই বলে, 'তাসের থেকে দাবা অনেক ভাল।'

হ্যাঁ, তাসের আড্ডাও বসে মাঝে মাঝে।

সাগর থাকে, অজয় আর ঝুমি আসে, শুক্তি তো আছেই। খুব যে একটা উঁচুদরের খেলা হয় না, তা বলাই বাহুল্য। হয়তো টোয়েনটি নাইন, হয়তো ব্রে। কিন্তু তাস-কাড়াকাড়ি, হুড়োহুড়ি, চেঁচামেচি, পরস্পরকে জোচ্চোর বলে গাল—এগুলো তো পুরোমাত্রায় হয়।

বিধবা ননদ দরজায় এসে বলেন, 'আমার ভাইয়ের যে দু খানা চিঠি এসে গেল বৌ, একটা জবাব দিয়েছিলে?'

শুক্তি হেসে গড়িয়ে পড়ে বলে, 'জবাব? তোমার ভাইকে? আহা সে আইন যদি থাকতো গো আমাদের দেশে! কবে জবাব দিয়ে বসতাম।'

ননদ মুখ বাঁকিয়ে বলে যেত, 'শিঙ ভেঙে বাছুরের দলে! গলায় দড়ি! এক ফোঁটা এক ফোঁটা ছেলেমেয়েগুলো যেন সমবয়সী ইয়ার।'

বলা বাহুল্য, স্বগতোক্তিগুলো বেশ সশব্দেই হতো।

ঝুমি হয়তো বলে উঠতো, 'আপনার ননদ কী রাগী, বাবাঃ!'

অজয় বলে উঠত, 'এমন বিচ্ছিরি কথা!'

শুক্তি বলতো, 'তা বাপু, কথাগুলো বিচ্ছিরি হলেও সত্যি। সত্যিই তো, আমার কি তোদের সঙ্গে খেলার বয়েস? কিন্তু কি করবো, ঠাকুরঝির সখীদের সঙ্গে 'গ্রাবু' খেলবার কথা আমি ভাবতেই পারি না। ডাকে মাঝে মাঝে। আমি বলি 'ঘুম পেয়েছে', বলি 'একটা বই পড়ছি, ভারী মন লেগে গেছে।....শুনে হেসে উঠতো এরা।

আর শুক্তি খুব একটা চিন্তিত মুখ করে বলতো, 'আচ্ছা, তোরাই বল দিকি আমার কেন বয়েস বাড়ে না? নিজেকে সত্যিই তোদের সমবয়সী মনে হয় কেন?'

আচ্ছা, অজয় আর ঝুমি, সাগরের কাছাকাছি বয়সী যে দুটো, তারাও তো কম যত্ন-আদর-প্রশ্রয় পায় না শুক্তির কাছে? ভাবতো সাগর।

তবু ওরা অমন কুটিলতা করে কেন? বাড়িতে শুক্তির নামে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ হতে দেখলে তাতে ফোড়ন কেটে ইন্ধন জোগায় কেন? সাগরের ওপর আক্রোশ-আক্রোশ ভাব কেন?

সাগর ভাবতো। সংবরণ ভাবছেন না।

সংবরণ জানেন এমনিই হয়। ওদের পাওনাটা যে ফাউ মাত্র, সাগরের প্রাপ্যের প্রসাদ-কণিকা, এ ওরা বুঝে ফেলেছে। প্রখর বুদ্ধির জোরে নয়, সহজাত বুদ্ধির জোরে। তাই অমন নিমকহারামি। তাই ঝুমির ওই হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেওয়ার চাতুরী, ন্যাকামির ছল করে। এ এক প্রকার নিরীহ হিংস্রতা।

আর ঝুমির সেই নিরীহ হিংস্রতাই আজ সাগরকে হাঁড়িকাঠের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। ঝুমি যদি ঘড়ির কথা না বলতো!

বাবু এসেছেন! বাবু এসেছেন!

যেন একটা অর্থহীন শব্দ সাগরের মাথার মধ্যে পাক দিতে থাকে। সেই বড়

একজোড়া গোঁফ আর একজোড়া রক্তচক্ষু-সংবলিত মুখ, সাগরের স্মৃতিপট থেকে যেন মুছেই গিয়েছিল।

সে মুখ যে সহসা এমন করে দেখতে হবে দুঃস্বপ্নেও তা জানা ছিল না সাগরের। ওই মুখ দেখলে শুধু যে ভয়ই হয় তা নয়, নিজেকে যেন চোর চোর মনে হয়। কেন হয় কে জানে! তবু হয়।

অথচ 'কিছু নয়' এই বিশ্বাসঘাতকতা করল সাগরের সঙ্গে!

চোখ ফেটে জল এল সাগরের।

আর ঠিক এই সময় সেই স্মৃতিপট থেকে মুছে যাওয়া মুখখানা একেবারে সাগরের মুখের সামনে এসে একটা বিশ্রী হাসি হেসে উঠল।

'তুমি কে হে? আমার স্ত্রীর সেই 'বাছুর-প্রেমিক'টি না সেই রকমই মনে হচ্ছে যেন! তা, দিব্যি চেহারাখানা তো বাগিয়েছ দেখছি! আর সেই 'গো-বৎস গো-বৎস' ভাবটি দেখছি না, বেশ ষাঁড়িয়ে উঠেছ মনে হচ্ছে।'

অসভ্য কথা, অসভ্য ভঙ্গী। তবে—সাগরের কানের মধ্যে শুধু একটা প্রবল করতাল-ধ্বনি ছাড়া আর কিছুই স্পষ্ট হয়ে ঢোকে নি।

ডাক্তার হেসে ওঠেন। হা হা করা হাসি।

সাগরের মনে হয়, এর চাইতে কুৎসিত ভঙ্গীর হাসি আর কুশ্রী লোক বোধকরি আর কখনো দেখেনি সাগর। অথচ ডাক্তার যাকে বলে সুপুরুষ। লম্বা-চওড়া জাঁদরেল গড়ন, লালচে ফর্সা রঙ, মাথার চুল কালো চকচকে, মুখের গড়ন হিসেব করলে নিখুঁৎ।

'তা, কই? তোমার বান্ধবীটি কোথায়? দেখা হয় নি বুঝি এখনো? কই রে কে আছিস, তোদের মাকে ডেকে দে—'

সাগরের মুখ দিয়ে কথা বোরোবার কথা নয়। তবু বোধকরি মরিয়া হয়েই বলে ফেলেছিল সাগর, 'না না থাক। আমি যাই।'

আবার সেই হাসির ঝড়ের সামনে পড়তে হল সাগরকে।

'কেন? কেন হে প্রেমিক? আমায় দেখে ভয় খেলে নাকি? গুলি করবো ভাবছ? ফাইট? নো নো! ছুঁচো মেরে আর হাতে গন্ধ করবো কি? থেকে যাও, থেকে যাও। একমুঠো নিরিমিষ্যি প্রেমের সঙ্গে, একবাটি মুরগীর মাংস খেয়ে যাও। বাড়ির কর্তার অনারে আজ তোফা রান্না-বান্না হচ্ছে বাড়িতে।'

মরিয়া সাগর বলে ওঠে, 'আমি খেতে আসি নি।'

তারপর ঠিক কি হয়েছিল মনে পড়ে না সাগরের। শুধু মনে পড়ে ভয়ানক একটা উত্তেজিত অবস্থায় বেরিয়ে এসেছিল ও-বাড়ি থেকে।

ঘড়িটা ফেলে দিয়ে এসেছিল ও-বাড়ির টেবিলে।

এই জায়গাটা সংবরণকে বলতে পারেনি সাগর। সংবরণ তাঁর সৃষ্টিশক্তির জোরে আর সাহিত্যিকের দৃষ্টি ক্ষমতায়, গড়ে ফেলেছিলেন জায়গাটা।

কলম কামড়ে ভেবে নিলেন সেই গড়নটা।

ডাক্তারের সেই প্রবল হাস্যরোলেই বোধকরি শুক্তি এসে পড়েছিল, আর ডাক্তারেব দিকে একটা অসহায় ভৎসনার দৃষ্টি মেলে বলে উঠেছিল, 'কী হচ্ছে? ছেলেমানুষটার পিছনে আবার লাগতে এলে কেন?'

'ছেলেমানুষ! ও হো হো, মনে ছিল না। তা, তোমার ওই নামাবলী-ঢাকা মদের বোতলটি তো আর নামাবলীর অন্তরালে থাকতে চাইছে না গো! এ তো দিব্যি একখানি নব-কার্তিক হয়ে উঠেছে। দেখে আমারই প্রেম করতে ইচ্ছে করছে।'

'আঃ, তুমি থামবে?'

'থামবো! থামবার হুকুম হচ্ছে? থেমেই তো ছিলাম গো। থেমেই তো আছি। তোমাকে যত ইচ্ছে এগিয়ে যেতে দিয়েছি। কিন্তু মাত্রাটা বড্ড বেশি ছাড়িয়ে যাচ্ছে না মিসেস? দূরে থাকি বলে কি আর খবর পাই না?'

সাগবের মনে হয়েছিল লোকটার কথাবার্তা যেন থিয়েটারের সাজা মাতালেব মত। সম্প্রতিই একদিন ওদের পাড়ায় রক্ষেকালী পুজো উপলক্ষ করে পাড়ার ড্রামাটিক ক্লাব 'প্রফুল্ল' নাটক করেছিল। তাতে—

হঠাৎ বরফের ছুরির মত একটা ঠাণ্ডা ছুরি যেন সাগরের অনুভূতির মধ্যে এসে ঢুকল। দেখতে পেল শুক্তি ডাক্তারের দিকে পাথরের চোখের মত নিষ্পলক চোখ তুলে প্রশ্ন করছে, 'কি কি খবর পেয়েছ তুমি?'

সেই আগা-ছুঁচলো গোঁফ দুটো যেন খাড়া হয়ে উঠল। আর সেই গোঁফের নীচে একটু হাসি ঝলসে উঠল, 'আহা, চটছ কেন? সে কি আর আমি লিস্ট করে রেখেছি? না, তার জন্যে দফায় দফায় আইন-প্রয়োগ করছি?'

'করবে না কেন? কর! বলতেই হবে তোমায় কি কি শুনেছ আমার নামে?'

'এই দেখ, তুমি ক্ষেপে যাচ্ছ। রাখ রাখ রাগ,রাখ। তোমার এই পোষ্যটিকে অফার করছিলাম একটু মুরগীর মাংসে খেয়ে যাও—'

শুক্তি তীব্রস্বরে বলে উঠেছিল 'সাগর, তুই বাড়ি যা।'

'কী আশ্চর্য! বাড়ি যাবে কি? আমি বাড়ির কর্তা, আমি নেমন্তন্ন করছি—'।

শুক্তি শান্ত গলায় বলে, 'ও মুরগীর মাংস খায় না।'

'খায় না! বল কি গো? তবে কিসের মাংস খায়? মানুষের? এই বয়সেই—'

'সাগর! কী শুনছিস হাঁ করে? উঠে যা বেহায়া ছেলে কোথাকার! এত অপমানেও লজ্জা নেই! আর যদি কোনদিন ঢুকিস এ বাড়িতে—'

অসহ্য বিস্ময়ে চোখ ফেটে জল আসে সাগরের। এতক্ষণ ডাক্তারের মাতলামির মধ্যে বিতৃষ্ণাকর ছাড়া আর কিছু খুঁজে পায় নি সে।

কিন্তু এ কী! 'কিছু নয়' এর নিজে এই অপমান করা! তাও ডাক্তারটার সামনে?

বুঝতে দেরি হয় না সাগরের, স্বামীর সামনে সুয়ো হবার জন্যেই শুক্তির এই অভাবনীয় ব্যবহার।

তাহলে! সাগর কেউ নয়! সাগরের মনটা মন নয়!

যখন নিজের ইচ্চে ছিল, সুবিধে ছিল, তখন সাগরকে আদর দেখানো হয়েছে। সেই আদরের মান রাখতে বাড়িতে কম লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয় নি সাগরকে। কই, একদিনের জন্যে তো সাগর নিজের গা বাঁচাবার জন্যে 'কিছু নয়'কে কিছু বলে নি। কারুর কাছে বলে নি, 'অত আদর যত্ন আমার ভাল লাগে না, কী করব বাধ্য হয়েই—'

না, শুক্তির মনে কষ্ট হতে পারে, এমন ব্যবহার কখনো করে নি সাগর। সাগরের ফেল হওয়ায় শুক্তির নিন্দে হয়েছিল বলে, দিন-রাত ভুলে পড়েছে সে। অনিচ্ছুক মনকে মেরে মেরে বইয়ের পাতায় বসিয়েছে। তারপর অবশ্য নিজেরই নেশা লেগে গিয়েছিল পড়ার। যার জন্যে—

হ্যাঁ, যার জন্যে কম যন্ত্রণা সইল না সাগর!

ভাল করে পাস না করলে তো আর এই ঘড়ির যন্ত্রণা পোহাতে হত না। জ্যেঠামশাইয়ের সঙ্গে কি জীবনে আর মুখ তুলে কথা বলতে পারবে সে? জ্যেঠামশাই কি জীবনে আর কখনো কোন জিনিস উপহার দিতে আসবেন সাগরকে?

যে দুর্লভ সম্পদ সাগরের কল্পনার স্বর্গকে ছাপিয়ে গিয়েছিল সেই সম্পদ হারাতে হয়েছে সাগরকে শুক্তির জেদে আর আবদারে। জ্যেঠামশাইয়ের সেই ঘড়ি-ফেরত চাওয়া হাতটা সাগরের সারাজীবনের চেতনার মর্মমূলে লেগে থাকবে না?

তবু 'কিছু নয়'কে সে মনে মনে দোষ দিতে পারে নি। বরং মায়ের অনুরোধে

ঘড়িটা ফেরত দিতে এসেও হেদোয় চলে গিয়েছিল ফেলে দিতে। 'কিছু নয়'কে মনোকষ্ট থেকে বাঁচাতেই এমন অনাসৃষ্টি কল্পনা মাথায় এসেছিল তার। আর, 'কিছু নয়' কিনা তাকে বিনা দোষে এই ভাবে—

চোখের জল মুছলে ধরা পড়া। তাই মোছে না।

গালের ওপরে গড়িয়ে পড়ে।

উঠে দাঁড়িয়ে রুদ্ধ গলায় বলে, 'ঢুকতে আমি চাইও না। তুমিই সেধে-সেধে—। আর আসব না। এইটা ফিরিয়ে দিতে এসেছিলাম—'

ঘড়িটা প্রায় আছড়ে টেবিলে রেখে দিয়ে চলে এসেছিল সাগর।

আর, এই প্রথম তার মনে হয়েছিল, সে ছেলেমানুষ বলে, বোকা বলে, শুক্তি তাকে নাচিয়ে মজা পায়, আসলে বড়লোকের ভালবাসা সব বাজে বিচ্ছিরি।

কি করে যে কেটেছিল সেই সন্ধ্যাটা, সে কেবল সাগরের ভগবানই জানেন।

মা বলেছিলেন, 'হ্যাঁরে ঘড়িটা ফেরত দেওয়ায় খুব মনক্ষুণ্ণ হল বোধহয় শুক্তি?'

সাগর বলেছিল, 'আমার কথা বলতে ভাল লাগছে না, মাথা ধরেছে।'

তারপর কি আর দেখা হয়েছিল সাগরের শুক্তির সঙ্গে?

ওইখানটা যেন তাল-গোল পাকিয়ে যায়। দেখা হওয়াটা ওই জঘন্য দিনটার আগে না পরে? পরে।

পরেই।

আগে তো কত অজস্রবার, হয়তো বা কত সহস্রবার দেখা হয়েছে। সে দেখায় তো শুধু একপক্ষের বেপরোয়া জবরদস্তি, আর অপর পক্ষের নিরুপায় আত্মসমর্পণ। ওই দিনের আগে শুক্তি অমন উন্মাদ হয়ে উঠেছিল কবে?

না, আগে নয়। পরে। ক'দিন পরে মনে করতে পারে নি সাগর। তবে শুক্তির সেই আসাটা মনে আছে।

উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা, উস্কো-খুস্কো চুল যেমন-তেমন শাড়ি পরা।

ছুটে এসেছে এ বাড়িতে।

'মাসীমা, সাগর আছে?'

'আছে তো। কেন কী হয়েছে?'

'মাসীমা, এইমাত্র খবর পেলাম আমার ছেলেবেলার এক সই মর-মর,

এক্ষুণি না গেলে শেষ দেখাটা হবে না। সাগর যদি একটু নিয়ে যায়। উনি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছেন—'

উদ্‌ভ্রান্ত, কিন্তু আট-ঘাট বেঁধে কথা।

মাসীমা, অর্থাৎ জ্যেঠিমা, প্রশ্ন করেছিলেন, 'হ্যাঁ গা বাছা, তা সে জায়গা কত দূরে? সাগর চিনে নিয়ে যেতে পারবে তো?'

'পারবে। পারবে। আমি চিনিয়ে দেব। একা চাকরেব সঙ্গে যেতে ভরসা পাচ্ছি না—'

জ্যেঠিমা ডেকে দিয়েছিলেন। সাগরকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল।

নিতান্ত গোঁজ হয়েই ঘোড়ার গাড়ির মাথায় উঠতে যাচ্ছিল সাগর, শুক্তি হাত চেপে ধরল। বলল, 'আমার এই দুঃসময়ে তুই আর জ্বালাস নে 'কিছু নয়'।'

শুক্তির নির্দেশে অনেকক্ষণ গাড়ি চলার পর, শুক্তি একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলে, 'এইখানে।'

সাগর অবাক হয়ে বলে, 'এটা তোমার বাপের বাড়ি, না?'

হ্যাঁ এ প্রশ্ন করা সম্ভব হয়েছিল সাগরের পক্ষে। শুক্তির বাপের বাড়িটা চেনা ছিল তার। একদা চিনতে হয়েছিল।

মিলিটারী ডাক্তার তখন কলকাতায় নেই। শুক্তির দাদার অসুখ করেছে, শুক্তি ব্যাকুল হয়ে বলল, 'কিছু নয়' শোন আমার সঙ্গে চল এক জায়গায়।'

'যাবো! কোথায় যাবো!'

বিমূঢ় প্রশ্ন করেছিল সাগর।

শুক্তির যদি মন ভাল থাকতো, নিশ্চয় শুক্তি হেসে বলতো, 'চল্ বিলেত যাই। নয়তো হয়তো বা বলতো চল গোলকপুরীটা একবার ঘুরে আসি।' কিন্তু এখন মন খারাপ, তাই ব্যস্ত হয়ে বলল, 'চল্‌না, গাড়িতে উঠে বলছি। একা ড্রাইভারের সঙ্গে যাচ্ছি দেখলেই তো, আমার বরের দিদি 'হাঁ হাঁ' করে উঠবে।'

সাগর তখন আর তেরো বছরেরটি নয়। দুটো বছর পার করে এসেছে তখন। মুখচোরা মুখে কথা ফোটে মাঝে মাঝে। তাই সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, 'তোমার বরের দিদি তো আমার সঙ্গে যেতে দেখলেও হাঁ হাঁ করে উঠবেন।'

ঝপ্ করে মুখের রং বদলে গিয়েছিল শুক্তির, সেই বদলানো রং মুখে বলেছিল, 'সে কথা বুঝতে পারিস তুই?'

সাগর বলেছিল 'বুঝতে আবার পারব না কেন? দেখতেই তো পাই।'

'দেখতে পাস? এসব দেখতে পাস তুই?'

শুক্তির কণ্ঠে আর এক ধরণের ব্যাকুলতা। সে ব্যাকুলতা ভাইয়ের অসুখের দুশ্চিন্তার নয়।

সাগর অবশ্য একটুও অবাক হয় নি, কারণ শুক্তির এই ব্যাকুল ভাবটা তার বড় বেশী পরিচিত। মাঝে মাঝে অকারণেই ব্যাকুল হয়ে ওঠে শুক্তি।

অতএব নির্লিপ্ত গলায় বলেছিল, 'না পাবার কি আছে? চোখ থাকলেই দেখা যায়!'

অবিরত একজন মহিলার সঙ্গে বাক্যবিনিময়ের ফলে কি সাগরের কথার ধরন মেয়েলি হয়ে গিয়েছিল? মেয়েলি না হোক, একটু বয়েসওয়ালা পুরুষের মত? সাগরের বয়সের ছেলেরা কি ঠিক এ ভাষায় কথা বলে?

হয়তো বলে, হয়তো বলেনা।

সাগর বলে।

সাগরের কথার উত্তরে কিন্তু শুক্তি ছেলেমানুষে পরিণত হ'ল। ঘাড় দুলিয়ে চোখ নামিয়ে বলল, 'চোখ থাকলে অবিশ্যিই দেখা যায়, জগতের অনেক বস্তুই দেখা যায়, কিন্তু চোখ কি আছে তোর?'

'চোখ নেই? চোখ নেই আমার?'

'না না নেই। মোটেই নেই। থাকলে কি আর—'বলেই সুর পাল্টে নিয়েছিল শুক্তি। বলেছিল, 'থাকগে মরুকগে। তোর চোখ আছে কি নেই, তাতে আমার কি? বেল পাকলে কাকের লাভ? তুই আমার সঙ্গে যাবি কি না বল।'

'যাবনা কেন? যেতে তো ভালই লাগে। বেশ মটরগাড়ি চড়া হয়। কিন্তু—'

'শুধু মটরগাড়ি চড়া হয় বলে আমার সঙ্গে বেড়াতে যেতে তোর ভাল লাগে?'

'বাঃ তা কেন? সাগর ঢোক গিলে বলে, 'কত জায়গাও তো দেখা হয়। সেই সে দিন তুমি আর তোমার ওই ননদ যেখানে নিয়ে গেলে? কী চমৎকার জায়গা! বাড়ি ফিরে যখন ঝুমিদের কাছে গল্প করলাম, 'আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের তপস্যার জায়গা পঞ্চবটি দেখেছি—ওরা তো বিশ্বাসই করেনা। অজিতটা আবার এত বোকা, বলে কি, 'তপস্যার জায়গা তো সব হিমালয়ে। তুই অমনি দেখে এলি? এত বাজে চাল মারিসনা।' তা'ছাড়া—'

থেমে গিয়েছিল সাগর।

শুক্তি নির্বেদ প্রকাশ করেছিল, 'থামলি কেন' প্রশ্নে।

তারপর বলে ফেলেছিল সাগর, 'ওরা তোমার নিন্দে করে।'

ভেবেছিল 'কিছু নয়' বুঝি চমকে উঠবে, শিউরে উঠবে, রেগে উঠবে। কিন্তু সে সব কিছু হল না।

কিছু নয় মৃদু হেসে বলল। 'তা তো করবেই। বোধ হয় বলে, 'কী বেহায়া, কী বাচাল! তাই না?'

সাগর এই হাস্যোদ্ভাসিত মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থেকেছিল। যাতে রাগবার কথা, তাতে হাসি কেন! তারই যে ওদের ওই সব অসভ্য কথায় রাগে হাত পা কাঁপে! কম রাগ করেছিল একদিন? ঝুমিকে 'ঠাঁই ঠাঁই' করে চড় কসিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'বেহায়া উনি না তোরা? গিয়ে গিয়ে খেয়ে আসতে পারিস তো বেশ! এখন আবার নিন্দে করা হচ্ছে।'

অজিত বলেছিল, 'খাই বলে দোষ দেখবনা? তোর মতন হ্যাংলা নাকি?'

সে দিন রাগের চোটে মনে হয়েছিল সাগরের,' বলে দেবে 'কিছু নয়' কে। বলবে ওই নেমকহারামদের সঙ্গে আর খেলো না তুমি, খেতেও দিও না।'

কিন্তু বলতে পারে নি।

শুক্তির মনে কষ্ট হবে বলেই পারেনি।

কিন্তু আজ দেখল কষ্টের বালাই মাত্র নেই 'কিছু নয়' এর। দিব্যি হাসছে। কথার শেষ করল এবার।

বলল 'ওই সব ভাল ভাল জায়গা দেখা হয়, ভাল লাগবে না?'

'তা বটে।'

শুক্তি নিশ্বাস ফেলে বলেছিল, 'আজ অবশ্যি ভাল টাল কোনো জায়গায় নয়। আমার বাপের বাড়ি যাবো। দাদার অসুখ—'

সাগর ম্লান মুখে বলেছিল, 'তোমার বাপের বাড়ি? সেখানে আমি গেলে কী বলবে তারা?'

'কী আবার বলবে? শোনো কথা!'

'বাঃ তারা কি আমায় চেনে?'

'চেনে না! চিনবে!'

'আমার লজ্জা করে।'

'লজ্জা করে!'

দপ্ করে জ্বলে উঠেছিল শুক্তি, 'বেটাছেলের এত লজ্জা কিসের রে? আমি মেয়েমানুষ লজ্জা সরম বিসর্জন দিয়ে বসে আছি, আর উনি বাবু ঘোমটা টেনে এক পাশে সরে বেড়াবেন লজ্জা করে বলে! নে নে চল্! তোর লজ্জা আমি ভাঙছি।'

হিড় হিড় করে টেনে গাড়িতে তুলেছিল সাগরকে।

সেদিনের কথা মনে পড়ে গেল সাগরের এই বাড়িটার দরজায় এসে।

সেদিন শুক্তির বৌদি সাগরকে দেখে বলে উঠেছিলেন, 'তোমার এই বাহনটিকে যেন নতুন দেখছি ঠাকুরঝি? কবে থেকে রাখা—'

সাগর চমকে উঠেছিল।

কথা শেষ না হলেও মানে বুঝতে দেরি হয় নি তার। উনি তা হলে সাগরকে চাকর ভেবেছেন?

নিজের ডোরাকাটা শার্ট আর লালচে ফর্সা ধুতিখানার দিকে তাকিয়েছিল সাগর, সরমে মরে গিয়েছিল।

কিন্তু শুক্তি ততক্ষণে হৈ চৈ করে উঠেছে।

'সত্যি বৌদি, কী করে জানলে বলতো এটি আমার বাহন? বাহনই। সর্বত্র আমায় বহন করে নিয়ে বেড়াবে, এই ওর সঙ্গে অলিখিত চুক্তি। কি রে 'কিছু নয়', তাই না?'

বলাবাহুল্য সাগর নির্বাক।

ভাজ বলেন, 'ওমা এটি কি সেই ছেলেটি নাকি?'

'সেই ছেলেটি।'

শুক্তি ভুরু কুঁচকে বলে উঠেছিল, 'কোন ছেলেটিকে মনে করছ বৌদি?'

—'আরে বাবা সেই যে তোমাদের পাড়ার কোন ভাড়াটেদের ছেলেকে তুমি পুষ্যি না কি নিয়েছ। তা সে কি এই এতটুকু ছেলে নাকি!..... বাবাঃ তোমার ননদ সেদিন কত কীই বলল। সে একেবারে মশা মারতে কামান!'

প্রথমটা এই সব কথায় বড় খারাপ লেগেছিল সাগরের, তারপর ভালই লেগেছিল। গ্রামোফোন বেজেছিল ওদের বাড়িতে, শুক্তির দাদা ভাল করে কথা বলেছিলেন।

সেই সেদিন বাড়ি চিনেছিল।

আজ তাই সহজেই বলে উঠল, 'এটা তো তোমার বাপের বাড়ি।'

'তাই তো। এরা সবাই কাশী গেছে, শুধু ঝি আছে—'

'তা, সেই যার অসুখ করেছে—'

শুক্তি ওকে টেনে এনে নীচের একটা ঘরে হাতল-ভাঙা একখানা চেয়ারে বসিয়ে বলে, 'অসুখ তো আমারই করেছে, আমিই তো মর-মর। হয়তো আজ-কালই মরতে পারি। তোর সঙ্গে শেষ দেখা করব বলে—'

সাগর দাঁড়িয়ে ওঠে।

বিরক্ত স্বরে বলে, 'ছেড়ে দাও আমায়। বুঝেছি, সব তোমার মিথ্যে কথা।'

শুক্তি ওর দিকে অদ্ভুত অসামান্য একটা গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল, তারপর হঠাৎ হেসে উঠে বলেছিল, 'বুঝে ফেলেছিস, তুইও বুঝে ফেলেছিস আমার সব মিথ্যে কথা? তোরা এত সহজে সব ধরে ফেলিস কি করে বল দিকি?'

ওই দৃষ্টির সামনে সাগর কেমন এক রকম হয়ে গেল।

আস্তে আবার চেয়ারে বসে পড়ে বলল, 'বললে কেন বন্ধুর অসুখ?'

শুক্তির সেই ক্ষণ-পরিবর্তনশীল মুখে সহজ হাসি নামল।

বলল, 'বুঝতে পারছিস না, একটু চালাকি করে তোকে আমার বাপের বাড়ি বেড়াতে নিয়ে এলাম। দাদা-বৌদি বলেছিল, আমরা কাশী যাচ্ছি, বাড়িটা এক-আধবার দেখ—। তাই—'

'তা, সেকথা বললেই পারতে?'

'আহা, সেকথা বললে কি তোর জ্যেঠি অমন এককথায় ছেড়ে দিত! সাত-সতেরো কথা বলত না? তা, বলি সেদিন তো খুব রাগ দেখিয়ে ঘড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেলি, দেখে মনে হল মস্ত লায়েক হয়ে গেছিস। তা বেশ, লায়েকের মত একটা কাজ কর না?'

সাগর ভুরু কুঁচকে বলে, 'কি? কি কাজ?'

শুক্তি মুখ টিপে হেসে বলে, 'আমায় নিয়ে পালিয়ে চল।'

'কী?'

'আমায় নিয়ে পালিয়ে চল।'

'আঃ!' সাগর আবার উঠে পড়ে।

আচমকা ওই রকম ছলনা করে বাড়ি থেকে প্রায় উড়িয়ে এনে, নির্জন একটা বাড়িতে বসিয়ে এমন কিম্ভূত পরিহাস করার অর্থ খুঁজে পায় না সাগর। ভয়ে গা ছমছম করে ওঠে ওর। মনে হয়, ভয়ানক একটা বিপদ যেন গ্রাস করতে আসছে ওকে।

'যত সব অসভ্য ঠাট্টা!' বলে ওঠে সাগর মুখটা সিঁদুর-বর্ণ করে।

'ঠাট্টা ভাবলি তুই—'

শুক্তি যেন হতাশ হয়ে পড়েছে, তাই বসে পড়ে। নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'আমি ভাবলাম, বললে বুঝি হাতে স্বর্গ পাবি। বেশ বড়-সড় মনে হচ্ছিল কি না তোকে সেদিন। ভুল ভুল। শরতের মেঘ গর্জায়—বর্ষায় না। কিন্তু তুই

বিশ্বাস কর, আমি ঠাট্টা করছিলাম না। কী বোকামী! ঠাট্টা ছাড়া আর কিছুই যে কোনদিন ভাবতে পারবি না তুই, এ খেয়াল হয় নি। চল্, বাড়ি চল।'

'তোমাদের বাড়ি?'

'নাঃ। আমাদের বাড়ি আর যেতে বলব কোন্ মুখে? তোকে তো ঢুকতেই বারণ করেছি।'

সাগর অপ্রতিভ ভাবে বলে, 'তার জন্যে নয়।'

'তার জন্যে নয়?'

'না। তোমার ওই বরকে আমার ভাল লাগে না।'

'এই সেরেছে! ভাল লাগে না? আমার এত ভাল লাগে, আর তোর লাগে না?' শুক্তি হাসতে থাকে। বেদম হাসি। হাসির ধমকে চোখ দিয়ে জল পড়ে যায়। অনেকক্ষণ লাগে সেই ঝোঁক কাটতে।

বলে, 'চল্। তোদের বাড়িতেই চল। বাড়ি গিয়ে বলবি যার অসুখ করেছিল, সে মারা গেছে।'

গাড়িতে উঠে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে শুক্তি বাইরের দিকে চেয়ে। তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'আচ্ছা সাগর, তোর এখনো কোন সময় খুব ছোট হয়ে যেতে ইচ্ছে করে না?'

সাগর হঠাৎ এ কথায় চমকে ওঠে।

তারপর বলে, 'ছোট হতে! পাগল নাকি আমি যে ছোট হতে ইচ্ছে করবে? আমি তো দিন গুণি কবে বড় হব বলে—'

শুক্তি বলে 'আমার কিন্তু ছোট হতে ইচ্ছে করে। খুব ছোট। ফ্রক পরে রাস্তায় খেলে বেড়ানোর মত ছোট।'

'তোমার সবই অদ্ভুত!'

'আমার সবই অদ্ভুত। তাই না? তা হবে। কিন্তু শত ইচ্ছেতেও মানুষ কিছু করতে পারে না, দেখেছিস মজা?'

সাগর অবশ্য এর মধ্যে কোন মজা খুঁজে পায় না। কথাটার ঠিক মানেও পায় না।

বাড়ির দরজায় নেমে শুক্তি ওর দিকে ফিরে ঘুরে দাঁড়ায়। বলে 'মনে আছে তো? বলবি যার অসুখ করেছিল সে মারা গেছে।'

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন সংবরণ চৌধুরী।

ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। দ্রুত পায়চারি করতে লাগলেন।

শুক্তির কথার শেষটা বহুযুগের ওপার থেকে যেন সমুদ্রের ঢেউয়ের মত এসে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে বার করে দিল তাঁকে।

মারা গেছে। মারা গেছে!

বহুদিন আগের পরিচিত একটা পাহাড়, পাড়া সুদ্ধ সমস্ত লোক যেন সেই শব্দটা উচ্চারণ করতে লাগল। 'মারা গেছে..... মারা গেছে.....।'

কী করে?

বিষ খেয়ে।

বিষ কোথায় পেল?

দূর! এ আবার একটা কথা নাকি? আদি অনন্তকাল ধরেই তো মানুষ বিষ খায়। কোথায় পায়?

কিন্তু কেন? অত সুখ, অত ঐশ্বর্য!......

কাল নাকি কোন্ এক ছোটবেলাকার সইয়ের মারা যাওয়া দেখে এসেছে।

সই!

ছোটবেলাকার?

তাইতো এত এমন—

বলা যায় না। মানুষের মন, আচমকা কখন যে কী হয়। অসুখ দেখতে গিয়েছিল, গিয়ে দেখতে পেল না।

তা বাপু যাই বল, এটা কোন কাজের কথা নয়। মনে হয় ভেতরে কোন ব্যাপার আছে।

মিত্তিরদের ছেলেটাকে নিয়ে ডাক্তার নাকি রাগারাগি করেছিল—

আরে ধ্যেৎ! সেটা একটা কথা নাকি? ছেলেটার বয়েসটা ভেবেছ? রাগারাগি করছিল দেড়শো টাকা দিয়ে একটা ঘড়ি দিয়েছে বলে। যতই নিজের ছেলে-পুলে না থাক, পাড়ার ছেলেকে অত টাকা দিয়ে—

এ সমস্ত কথাই শুনতে পেয়েছিল সাগর। খুব জ্বরের মধ্যে কানে এসেছিল। হ্যাঁ জ্বর সত্যিকারেরই জ্বর। যার জন্যে নতুন কলেজে ভর্তি হতে দু-মাস দেরি হয়ে গিয়েছিল তার।

এক হাজার বোলতা যখন 'মারা গেছে' 'মারা গেছে' রব তুলে সাগরের মাথার মধ্যে হুল ফুটিয়েছিল, তখন হঠাৎ পড়ে গিয়েছিল সাগর।

পড়ে নাকি মাথায় লেগেছিল। সেই তাড়সে জ্বর।

না, সাগর মারা গেল না।

শুধু ক'টা দিন শুয়ে থাকল বিছানায়। শুধু সেই ক'দিন অবিরাম শুনতে লাগল 'বিষ, বিষ!'

আলো-জ্বলা ঘরে ভোরটা ধরা পড়ে না চট করে। ধরা পড়ল, আতিথেয়তার উৎকট আগ্রহে। বেড্-টি নিয়ে এসেছে নীচের ওদের চাকর সংবরণের জন্যে। সে মুখ বাড়িয়ে বলে, 'বাবু তো দেখি সারারাত ঘুমান নাই। সাধে কি আর লোকে আপনাগো ফুলের মালা পরায়ে ধেই ধেই কর‍্যা নাচে! রাতভোর লিখছ্যান?'

সংবরণ শুধু হাত বাড়িয়ে পেয়ালাটা নেন। তারপর বলেন, 'দেখ, আমি এই পাঁচটা পঁয়ত্রিশের গাড়িতে চলে যাচ্ছি, তোমার বাবুদের আর ডাকাডাকি করে তুলে কাজ নেই। জাগলে বলো, আমি চলে গেছি। আজ আর খাবার-দাবার ব্যবস্থা করো না।'

লোকটা হাঁ করে বলে, 'চলে যাবান? কন কি? আজই তো রাতে থেটারের পালা। আসল দিনেই—'

সংবরণ হাসেন একটু।

'থেটারের' পালাটাই যে আসল, এটা আর সংবরণ চৌধুরীর অবিদিত নেই। যেখানে আর যে কারণে সভা আয়োজিত হোক, তার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আকর্ষণটাই শুধু এদের নয়, সকলের কাছে আসল। বক্তৃতা-রূপ অসংস্কৃতিগুলো একটা অবান্তর প্রথা-পালনের চিহ্নমাত্র। জনেন সংবরণ। তবু আসতে হয়। নিজের অনেক কাজের ক্ষতি করে এদের ডাকে সাড়া দিতে হয়— সভার শোভাবর্ধন করতে। এগুলো মেনে নিতে হয়, হয়েছে।

তাই ঈষৎ হাসলেন সংবরণ।

বললেন, 'পালা আমরা অনেক শুনি বাপু। আমার আজ কাজ আছে।'

সুটকেসের মধ্যে টুকিটাকি সব ভরে নিয়ে বলেন, 'আর শোনো, ওই যা বললাম তোমার বাবুকে আর ডাকাডাকি করে কাজ নেই, এত ভোরে, জাগলে বোলো কোন বিশেষ দরকার পড়ায়—'

কিন্তু সংবরণ পাগল হতে পারেন, বুড়ো চাকরটা তো পাগল নয়! সে জাগাবে না তার বাবুকে? বাবু উঠে দেখবেন কলকাতার বাবু নিশ্চিহ্ন? সংবরণ যখন হোস্টেলের কম্পাউণ্ড পার হচ্ছেন, দেখলেন ওঁরা দুই স্বামী-স্ত্রী বেরিয়ে আসছেন ওঁদের কোয়ার্টার্স থেকে। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আর তাঁর স্ত্রী। স্ত্রী বেশী কিছু

বললেন না, শুধু বড় বড় চোখ তুলে বললেন, 'এইভাবে হতাশ করলেন আমাদের?'

স্বামী প্রবল হৈ হৈ করে ওঠেন।

বলেন, 'কী হল? আপনি আজ পালাচ্ছেন যে! কাল আশ্বাস দিলেন—'

সংবরণ সপ্রতিভ ভাবে বলেন, 'মানে, ব্যাপার হচ্ছে হঠাৎ একটা কাজ মনে পড়ে যাওয়ায়—'

'একটা দিনে আর কী এসে যেত আপনার?'

'আপনাদেরই বা' সংবরণ হাসেন, 'একটা দিনে কী এসে যাবে?'

'বড় ভাল লেগেছিল, আপনাকে এই দুদিন নিজস্ব করে পেয়ে।'

সংবরণ মৃদু হেসে বলেন, 'যাক, আপনি তবু স্বীকার করলেন নিজস্ব করে পেয়েছিলেন আমায়। আমার কিন্তু ভারী বদনাম আছে মিশতে পারি না বলে। আচ্ছা চলি—' ছোট্ট সুটকেসটা হাতে এগোতে থাকেন সংবরণ।

স্টেশন এত কাছে যে গাড়ির কথা ওঠে না। আর সদ্য নিদ্রাভঙ্গের অবস্থা নিয়ে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট-দম্পতিরও কথা ওঠে না পৌঁছে দেবার।

উনি অদৃশ্য হয়ে যাবার পরও ওঁরা দুজন দাঁড়িয়ে থাকেন কিছুক্ষণ।

অলসভাবে ওঁর কথাই আলোচনা করেন।

কর্তা বলেন, 'হঠাৎ কী হল বল দেখি?'

'কি জানি। কেমন যেন রহস্য লাগছে। তুমি জানো না, কাল রাত্রে দেখেছি, সারারাত বারান্দায় পায়চারি করছেন।'

'তাই নাকি? দেখেছিলে বুঝি?'

'সিগারেটের অগ্নিকণাই দেখিয়ে দিয়েছিল। ঘুম আসছিল না বোধহয়—'

'তা, অন্য জায়গায় এলে অনেকের ঘুম আসে না।'

'কাল কিন্তু 'আই. জি. সি.' ওঁকে সরাসরি অ্যাটাক করেছিলেন, অনেকেই অস্বস্তিবোধ করছিল। উনি হয়তো তাইতেই—'

'আরে না না। তার পর তো দিব্যি হাসলেন, গল্প করলেন, খেলেন। কোনও বৈলক্ষণ্য দেখলাম না।'

'আহা, সে কি আর উনি জানতে দেবেন? বুদ্ধিমান লোকেরা তা দেয় না।'

'যাই বল, ওঁর এই হঠাৎ চলে যাওয়াটার কোন হদিস খুঁজে পাচ্ছি না।'

'তার মানেই হদিস নেই। সম্পূর্ণ মুডের ব্যাপার! তাছাড়া—ব্যাচিলার বুড়োরা একটু খামখেয়ালি উল্টোপাল্টা হয়েই থাকে।'

'ব্যাচিলার না কি?'

'হায় কপাল, তাও জানো না? ওয়াই. এম. সি. এ-তে থাকেন, খান দান, আর বই লেখেন।'

'যাক, এতক্ষণে হদিস পেলাম। তা, তোমার তো সব লেখকদের ঠিকুজি-কুলুজি মুখস্থ, ভদ্রলোকের আসল নামটা কি?'

'বারীন মিত্তির না কি যেন।'

'পিকিউলিয়ার। একেবারে পদবী টদবী সমেত নাম পালটানো—ছদ্মনাম তো অন্য রকম হয়, যেমন বনফুল যাযাবর—ইয়ে—'

'যাক, অনেক কষ্টে দুটো নাম তবু মনে এনেছ। পদবী সুদ্ধ ছদ্মনামীও অনেক আছে—'

'সাধে আর বলি—সাহিত্যিক, কবি, ছবি-আঁকিয়ে, এরা সব এক একটি জীব! নইলে কোন কিচ্ছু না, সারারাত জেগে পায়চারী করে ভোর রাত্তিরে বলে উঠলেন, মশাই চললাম। তাও যদিবা তরুণ বয়েস হতো তো বলতাম যে—'

'কী বলতে? থামলে কেন? কী বলতে শুনি?'

'বলতাম, তোমায় দেখে বাণাহত হয়ে পালিয়ে গেল—

'তার মানে?'

'মানে একটু যেন কেমন কেমন—'

'যত সব অসভ্যতা!'

'কিন্তু কিছু যদি মনে না কর তো বলি। দুদিন ধরেই দেখছি, তোমার মুখের দিকে বার বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিলেন, মনে হচ্ছিল পুরনো চেনা, মনে করতে চেষ্টা করছেন—'

'আহা! কই তখন তো বললে না? দেখে নিতাম সেই হারানো দৃষ্টি। আসল কথা, তোমরা পুরুষরা হিংসুটের অবতার। তোমাদের স্ত্রীর দিকে কেউ একবার তাকালেই অমনি সে তাকানোর অর্থ আবিষ্কার করতে বসো। দৃষ্টিনিক্ষেপকারীর বয়সের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর না।'

'বয়েস। হা হা হা, হাসালে তুমি। প্রেমের আবার বয়েস আছে নাকি?'

'বয়েস নেই?'

'নো নো! বয়েসটা বেঁধে রেখেচে লোকে শুধু লোকলজ্জার খাতিরে। নইলে বৃদ্ধ বাদশারা তরুণী বেগম গ্রহণ করতেন না।'

'থামো! সেটা বুঝি প্রেম? প্রেমের নামে কলঙ্ক দিও না।—'

'আচ্ছা, উল্টো দিক থেকে দেখ তবে—তোমাদের চির-কলঙ্কিনী চিরপ্রেমিকা রাধিকা তো দিব্যি একটি বিবাহিতা মহিলা। কোন না বয়েসও হয়েছে। আর শ্রীকৃষ্ণ? 'নওল কিশোরে'র বাংলা কি?'

'হয়েছে, সক্কালবেলা আর তোমায় প্রেমতত্ত্ব আওড়াতে হবে না। সংবরণ চৌধুরী মেজাজটা খারাপ করে দিয়ে গেলেন। ভেবেছিলাম, আজ নিজে দু-একটা রাঁধব।'

'দেখ, হয়তো হঠাৎ কোনও প্লট মাথায় এসেছে, গিয়েই লিখতে বসবেন। তার মানে, তোমাদেরই ভবিষ্যতের খোরাক। হা হা হা!'

অত ব্যস্ত হয়ে এসে ষ্টেশনে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল সংবরণকে। প্লাটফরমে পায়চারি করতে লাগলেন।

ঘুমন্ত নির্জন ফুলগাছে সাজানো আর মেহেদির বেড়ায় ঘেরা ছবির মত সুন্দর ষ্টেশন, সদ্য-ভোরের অলৌকিক আলো আর অপূর্ব মিষ্টি হাওয়ায় যেন পরীর দেশের আবেশ এনে দিচ্ছে।

যেদিন এসে নেমেছিলেন সংবরণ, সেদিন সময়টা ছিল চড়ারোদে ঝকঝকে, আর অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যের দল অতিবিনয়ের কণ্ঠ আর অতিসেবার হাত নিয়ে উপস্থিত ছিল। কোনোদিকে তাকিয়ে দেখেননি। আজ সবদিকটা দেখতে পাচ্ছেন।

দেখতে দেখতে হঠাৎ ভারী আশ্চর্য লাগল সংবরণের।

ভাবলেন এমন করে চলে এলাম কেন আমি? কেন হঠাৎ নিজের ওপর কন্ট্রোল হারালাম?

ওই মূর্খ আই. জি. সির কয়েকটা মন্তব্যে উত্তেজিত হয়েই কি আমি—? না কি অদ্ভুত সুন্দর দুটি চোখ দেখে? যেন বহুকালের যবনিকা ঠেলে কে দুটি ঈষৎ বিস্ফারিত দুষ্টুমী মাখা চোখ মেলে সংবরণকে তাকিয়ে দেখছিল, সংবরণ সেই চোখের জাদুতে আবিষ্ট হয়ে ভুলে গেলেন বর্তমান কালটাকে। হারিয়ে ফেললেন নিজেকে, হারিয়ে গেলেন অতীতের মধ্যে।

অথচ কিছুই নয়।

শুধুই সাদৃশ্য।

সেই সাদৃশ্যটুকু মাত্রই তোলপাড় করে তুলেছে সারাদিন ধরে। ঘুমন্ত সাগরে

তুলেছে তরঙ্গ। তাই হঠাৎ সন্ধ্যায় ওই কটা ছেলে মেয়ের আসরে সাগরের গল্পটা শুরু করে বসলেন সংবরণ।

লেখক সংবরণ চৌধুরী ক্রমশঃ নিজেকে খুঁজে পাচ্ছেন, তাই ভাবতে পারছেন সাগরের ঋণ শোধ করতে হবে, সাগরের উপর এতকাল যে অবহেলা করে এসেছেন, তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

আর শুক্তি?

সমুদ্রমন্থনের বিষের ভাগটাই শুধু তার ভাগ্যে? তাকে কেউ জানবে না? কেউ বুঝবে না?

শুধু ভাববে বড়লোকের বৌয়ের খামখেয়াল?

ভাববে বরের উপর মান অভিমান?

বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে যে বহু বৈচিত্র্য থাকে, থাকে বহু বর্ণকৌশল, একথা কিছুতেই কেউ বুঝতে চাইবে না। প্রত্যেকটা মানুষ কেন নির্দিষ্ট ছাঁচে ঢালা নয়, তাই নিয়ে সমালোচনা করবে, বিরক্ত হবে।

ট্রেন এসে গিয়েছিল।

ফার্ষ্টক্লাস একখানা কামরায় উঠে বসলেন সংবরণ চৌধুরী। চলন্ত গাড়িতে লেখবার জন্যে বৃথা চেষ্টা করলেন না, জানলার বাইরে দৃষ্টি ফেলে শুধু ধারাবাহিকতাটাকে অনুসন্ধান করে ফিরেত লাগলেন।

বিষ! বিষ! বিষ!

ভয়ঙ্কর ওই শব্দের হাতুড়িটা একেবারে চৈতন্যের গভীর মুলে একটা প্রচণ্ড ঘা দিয়েই যেন সব অন্ধকার করে দিয়েছিল। সেই গাঢ় অন্ধকারের জমাট দেয়াল ভেদ করে আস্তে আস্তে আলোর আভাষ দেখা দেয়, অসাড় চিত্ত চেতনার স্তরে উঠে আসে ; একটা অন্তহীন বিস্ময় আর অপরিসীম অভিমান বোবা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে এক অজানা জগতের দিকে।

কেন? কেন? কেন?

এই তীব্র প্রশ্নের ছুরি কুরে কুরে খেতে থাকে স্তব্ধ নিস্পন্দ একখানা কিশোর দেহের মধ্যে অবস্থিত সদ্যোন্মেষিত মনকে।

বালিখসা বহুবিধ দাগে কলঙ্কিত ময়লা দেওয়াল, জরাজীর্ণ আধময়লা বিছানা, মাথার কাছে একটা কেরোসিন কাঠের টুলের ওপর পলকাটা মোটা

কাঁচের গ্লাসে একটু কাগজ চাপা দেওয়া আধগ্লাশ দুধবার্লি, ছোট একটা পাথর বাটিতে গোটাকয়েক শুকিয়ে ওঠা পানিফল, অথবা করাটে কোঁকড়ানো একটা ন্যাসপাতি!

চোখ খুললেই এই দৃশ্য।

কে তবে চাইবে চোখ খুলতে?

তবু চোখ খুলতে হয়।

শীর্ণ মাতৃমুখ অশ্রুসজল দুটি চোখ মেলে আস্তে আস্তে ডাকে, 'খোকা, খোকা, সাগর! বাবা আমার, চোখ খোল, খা একটু।'

ফল নয়, শুধু সেই দুধ বার্লিটা।

বিকৃত মুখে সেটা গলায় ঢেলে রোগী আবার পাশ ফিরে শোয়। যেন মৌনব্রত নিয়েছে।

কিন্তু মৌনব্রত নেব বললেই কি নেওয়া যায়? নিতে পারা যায়? যায় না। জগত এত দয়ালু নয় যে বলবে, 'আহা থাকগে ওর পড়ে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে তো পড়েই থাক! কথা বলতে মন নেই তো না বলুক কথা।'

বলবে না তা জগত সংসার।

সে অবিরত তোমাকে খোঁচাবে, 'কী হয়েছে? কী হয়েছিল?'

মা ও সেই প্রশ্নই করেন, 'কী হয়েছিল সাগর! বল কী হয়েছিল?'

কিচ্ছু হয় নি?

কে বিশ্বাস করবে সে কথা? অতবড় একটা ঘটনা কি অকারণে ঘটে?

তাই মা কাছে এসে বসলেই ভয় করে সাগরের। জানে মা তার কঙ্কালসার দেহখানায় খানিকক্ষণ হাত বোলাবেন, দুটো দীর্ঘশ্বাস ফেলবেন, তারপর বলবেন, 'তোকে টেনে হিঁচড়ে বার করে নিয়ে তো গেল, তারপর কী হল বল দেখি? কোথায় গেল? কী করল সেখানে? কারা ছিল সে বাড়িতে? কাদেরই বা বাড়ি? যার অসুখ দেখতে গিয়েছিল তার খবর কি দেখলি?'

ঝাঁক ঝাঁক প্রশ্ন।

প্রতিটি অবসর মুহূর্তে।

মা যেন ডুবুরি নামিয়ে সমুদ্রের তলার রহস্যটা ভেদ করে নিতে চান। যেন সাগরের সমস্ত মুহূর্তগুলো টোকা দিয়ে দিয়ে দেখতে চান কোন মুহূর্তটা দুর্বল খিন্ন। যেন তেমনি কোনো একটা দুর্বল অসতর্ক মুহূর্ত পেয়ে গেলেই কাজ মিটে যায় মার।

কিন্তু সাগর কেন তা মিটোতে দেবে?

সাগর কি মৃত্যুর কাছে বিশ্বাসঘাতক হবে?

বলে দেবে, 'কোথায় গিয়েছিলাম জানো? ওর বাপের বাড়িতে—

না, সে কথা কিছুতেই বলা যায় না। অন্ততঃ সাগর পারবে না।

সাগরকে তাই কথা বানাতে হয়।

বলতেই হয় 'কোথায় গিয়েছিলাম জানি না। কলকাতার সব রাস্তা কি আমি চিনি?'

'তবু?'

'তবু বলে কিছু নেই। অজানা জায়গা অজানাই থাকে।'

'কিরকম দেখতে বাড়িটা?'

মা ক্রমশঃ সন্দেহে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছেন।

কিন্তু সমস্ত পৃথিবী তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলেও কি সাগর বলবে কোথায় গিয়েছিল সেদিন? শুক্তির বাপের বাড়ির পুরণো চাকরটাই মন্ত্রগুপ্তি করে রেখেছে, তো সাগর!

অবশ্য তার মন্ত্রগুপ্তির কারণ আলাদা। প্রতিক্ষণ, প্রতিনিয়ত যে সে পুলিশের ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে।

তবু আছে তো মুখে তালাচাবি দিয়ে।

সাগর পারবে না তা?

পুলিশের ভয়ের উর্ধ্বে কি কিছু নেই?

তাই সাগর বিরক্ত হয়ে ওঠে।

বলে, 'বাড়ি আবার কি রকম দেখতে? বাড়ির মত।'

'সব বাড়ি কি সমান? এই তোদের বাড়িটাও বাড়ি, ওদের বাড়িটাও বাড়ি!'

'ওদের' অর্থে অবশ্য শুক্তিদের।

হঠাৎ মাকে একটা কুৎসিত শ্মশানচারিণীর মত মনে হয় সাগরের। মার ওই জল ভরা-ভরা চোখের নীচে যেন কী এক ক্রূরতার আগুন, ওই করুণ করুণ শীর্ণ মুখের অন্তরালে এক ক্রোধাতুরা হিংস্র নারী—যেন মৃত্যুর ওপার পর্যন্ত ধাওয়া করে কাউকে শাস্তি দিতে চায়। যেন চুলের মুঠি ধরে তাকে টেনে এনে নিষ্ঠুর কঠোর প্রশ্ন করতে চায় 'কেন কেন কেন তুই আমার ছেলেটাকে— ?'

ওই হিংস্রতার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে না সাগর। পাশ ফিরে শোয়।

কিন্তু মা হার মানতে রাজী নয়।

শিখিয়ে পড়িয়ে এক সময় মেয়েটাকে পাঠান।

ঝুমি সরলতার প্রতিমূর্তি হয়ে এসে কাছে বসে।

'উনি তারপর তোকে কি বললেন রে দাদা? যখন তুই ওঁর সঙ্গে গাড়িতে উঠলি?'

সাগর ধড়মড় করে উঠে বসে।

তীব্র স্বরে বলে, 'তোরা আমায় একটু শান্তিতে থাকতে দিবি?'

রোগা শরীর সহসা উত্তেজনায় ঘেমে ভিজে কেঁপে একসা হয়। তবু সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন বিদ্রোহে ফেটে পড়তে চায়। আর কানে এসে বাজে, 'কেন মিথ্যে ওর কাছ থেকে কথা আদায়ের চেষ্টা করছ ছোট বৌ? দেখছ না তোমার ওই ছেলেটি ভাঙবে তবু মচকাবে না। আমি বরাবর বলিনি ছেলেটি তোমার বয়সে খোকা, ভেতরে খোকা নয়।' এ গলা জ্যেঠাইমার।

শুনতে পায় জ্যেঠামশাইয়ের ভারী ভারী বিরক্ত কণ্ঠ, 'পাড়ার লোকের কাছে মুখ দেখানো দায় হয়েছে আমার। সবাইয়ের এক প্রশ্ন 'আপনার ভাইপোকে নিয়ে কোথায় যেন গিয়েছিলেন উনি আগের দিন। কী হয়েছিল সেখানে?' অথচ ভাইপোর মুখ থেকে একটা ওয়ার্ড বার করতে পারা গেল না।

বুড়ি ঠাকুমার ভাঙা-ভাঙা গলার আক্ষেপও শোনা যায় মাঝে মাঝে। বাতের ব্যথায় ঘর ছেড়ে বেরোতে পারেন না তিনি, ঘর থেকেই চেঁচান, 'তোমরা কেউ আমার কথা কানে নিচ্ছনা বৌমা, কিন্তু এই তোমাদের বলে দিচ্ছি সেই সর্বনাশীর 'দৃষ্টি' লেগেছে ওর ওপর! নইলে জ্বর নয় জ্বারি নয়, ছেলে বিছানা থেকে উঠতে পারে না, পড়ে পড়ে কঙ্কালসার হচ্ছে? একবার যদি কেউ ওতোরপাড়ার 'যোগিনী মার' কাছে যেতে তো একটা রামকবচ দিতেন—'

কিন্তু কে শুনছে তাঁর কথা? কে যাচ্ছে উত্তরপাড়া?

সাগরের মার প্রাণটা হয়তো ছুটে যায়, কিন্তু শুধু প্রাণের ক্ষমতা কতটুকু? অতএব যোগিনী মার রামকবচ সাগরের অঙ্গে ওঠেনা।

আচ্ছা উঠতে চাইলেই কি উঠত? উঠতে পেত? সাগর বারণ করতো সেই কবচ অপঘাতে মরা অপদেবতার হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে?

যে সাগর মায়ের নির্দেশে ঘড়ি ফেরৎ দিতে গিয়েছিল, সেই সাগর কি আছে? সেই বয়সের সাগর?

এক রাত্রির মধ্যে অনেকগুলো বছর পার হয়ে আসে নি কি সে?

আচ্ছা সাগর যে অবোধ ছিল, অজ্ঞান ছিল, ছেলেমানুষ ছিল, সেটাই কি অস্বাভাবিক নয়। অস্বাভাবিক বলেই একরাত্রির মধ্যে বয়েস বেড়ে গেল না কি ওর?

ও যদি অজিতের মত স্বাভাবিক হতো? তা হলে?

অজিতের তো বয়েস বাড়বার জন্যে ভয়ানক একটা কিছু ঘটেনি? অজিত তো এই ছোট গণ্ডিটুকুর মধ্যেই আছে। হ্যাঁ তাই আছে, তবু অজিত যখন তখন সাগরের ঘরে এসে হানা দেয়।

মুখটাকে কুৎসিত হাসিতে পাকা পাকা করে বলে—'নেববাবা' বিরহে যে একেবারে শয্যে নিলি! খুব দেখালি বটে যা হোক! উঠছে আর মাথা ঘুরে ঘুরে পড়ছে! হি হি হি! ইস্কুলের ছেলেরা শুনে হি হি—মাষ্টাররা শুদ্ধ হি হি—জিগ্যেস করছিল 'ব্যাপারটা কি হে অজিত?' হি হি হি মাষ্টারদের তো বলতে পারিনে শোক লেগেছে সাগরের! তাই হি হি হি বললাম কি, স্যার ঠাকুমা বলছে অপদেবতায় ভর করেছে সাগরকে। পাড়ায় একজনা বিষ খেয়ে মল তো? হি হি মাষ্টারদের কী কৌতূহল, 'কেন বিষ খেলো, মেয়েছেলটার বাড়িতে কে আছে, সাগরের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক—'হি হি হি ইচ্ছে হচ্ছিল বলি, 'সম্পর্ক কি তা জানিনা স্যার, তবে সাগর যা করছে বৌ মরার বেশী, হি হি হি বললাম না। শুধু বললাম সম্পর্ক কিছু না স্যার। সাগরকে একটু সুনজরে দেখতেন।'

সাগরের যদি তখন দেহে শক্তি থাকতো, সাগর কি উঠে প্রচণ্ড একটা ঘুসি মেরে অজিতের নাকটা থেঁতো করে দিত? ভেঙে গুঁড়ো করে দিত ওর ওই সাতজন্মে ভাল করে না মাজা হলদে হলদে দাঁতগুলো?

কি করতো কে জানে।

প্রমাণ হল না কিছু।

শক্তি ছিলনা তখন সাগরের। তাই সমস্ত প্রচণ্ডতাকে ভিতরে সংহত করতে হল। আর তাই করতে করতেই ক্রমশঃ বড় হয়ে যেতে লাগল সাগর। বড় হয়ে উঠলে অবোধ ছেলেটার চোখের সামনে থেকে যেন একটা অন্ধকারের যবনিকা গুটিয়ে যেতে লাগল আস্তে আস্তে।

'মানুষ কেন এমন?'

এই ভাবতে ভাবতে মানুষের হৃদয় গহ্বরের সমস্ত তত্ত্ব যেন ক্রমশঃই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল তার কাছে।

গাড়ী ছুটছিল।

এবং যথানিয়মে মনে হচ্ছিল পথটাই ছুটছে। ছুটছে গাছপালা মাঠ পুকুর। সংবরণ চৌধুরী ভাবছিলেন ছেলেবেলা থেকে এই একই রহস্য। জানি আমিই ছুটছি, তবু মনে হচ্ছে আমি অচল বসে আছি ওরাই দ্রুত দৌড়চ্ছে।

আচ্ছা কবে আমি প্রথম রেলগাড়ি চড়েছিলাম?

সংবরণ কি ভুলে গেছেন?

প্রথম রেলগাড়ি চড়ার স্মৃতি কি কেউ ভোলে?

হতভাগ্য শিশুদের শৈশব স্মৃতি কী লজ্জাকর, কী গভীর দৈন্যে নিষ্করণ।

কিন্তু সংবরণ চৌধুরীর শৈশবটাও অমন মুখ চুণ করে দাঁড়িয়ে আছে কেন?

সংবরণ কি সার্থক সাহিত্যিকের মত তাঁর গল্পের নায়ক সাগরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাচ্ছেন?

সাগরকে কোথায় যেন ছেড়ে এসেছিলেন?

ভাবতে লাগলেন সংবরণ।

ঠিক মনে পড়ল না।

চোখের সামনে একটা ছবি ভেসে উঠল।

পড়ন্ত বিকেলের আলো গায়ে মুখে মেখে একটা ছেলে হেদোর ধাবে বসে আছে। রুগ্ন চেহারা, শুকনো মুখ, মাথার চুলগুলো কুচি কুচি করে ছাঁটা। রক্ত-শূন্য হাত পাগুলো এই পড়ন্ত রোদে যেন আরও হলদে দেখাচ্ছিল।

ছেলেটা কি কিছু ভাবছিল?

ভগবান জানেন সে কথা।

তবে মুখ দেখে মনে হচ্ছিল না কিছু ভাবছে। শূন্য দৃষ্টি মেলে পশ্চিম আকাশের দিকে তাকিয়েই ছিল শুধু।

যে আকাশ দেখে কবি লিখেছিলেন

'ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা।'

আশ্চর্য অনুভূতি।

আশ্চর্য অপমা।

হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন বাঘের থাবার মত একটা থাবা রাখল সাগরের কাঠির মত সরু কণ্ঠার হাড়টার উপর।

চমকে ফিরে তাকাল সাগর, আর সঙ্গে সঙ্গে যেন হিম হয়ে গেল।

বুঝল মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

এ থাবার কবল থেকে বেঁচে ফেরা সম্ভব হবে না সাগরের পক্ষে। কয়েকটা মুহূর্ত নিশ্চিত মৃত্যুর হিম শীতল স্পর্শের মধ্যে কাটাল সাগর, মায়ের কথাটা মনে পড়ল একবার, তারপর সহসাই ভিতর থেকে শক্ত হয়ে উঠল।

মরে তো মরবে, কী এসে যাবে তাতে পৃথিবীর। মা দু'দিন কাঁদবে, আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। কোনো মৃত্যুরই সাধ্য নেই পৃথিবীকে থামিয়ে রাখতে পারে, সংসারকে স্তব্ধ করে দিতে পারে।

সাগরের যখন বাবা মারা গিয়েছিল, সাগর তখন নিতান্তই বালক, তবু স্পষ্ট মনে আছে সাগরের, দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল সে, বাবা মারা যাবার পরদিনই সাগরের মা বিশ্রী শাদা শক্ত খড়খড়ে একটা কাপড়ের টুকরো সর্বাঙ্গে জড়িয়ে ভাত রান্না করতে বসেছেন। তাও রান্নাঘরের মধ্যে লোকের চোখের আড়ালে নয়। দালানের একধারে সবাইয়ের সামনে বিশ্রী একটা ইটের উনুনে কাঠ জ্বেলে জ্বেলে।

সেই কাঠের ধোঁয়ায় চোখ জ্বলে যাচ্ছিল সাগরের, জল পড়ছিল গরম আগুন আগুন। রান্না ঘরের উনুনটাও কি বাবার সঙ্গে ফেলে দেওয়া হয়েছে? ভেবেছিল সাগর। আর ভেবেছিল, কাল যখন মা পাগলের মত মাথা ঠুকে ঠুকে মাটিতে পড়ে কাঁদছিল, তখন কি সাগর ভাবেনি জীবনে মা আর 'ওই মাটিটা' থেকে উঠবে না।

অতএব মার জন্যে ভাবনার খুব বেশী কিছু নেই।

ঝুমি?

ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও সকলের কথা। ওদের ছেড়ে যেতে হবে এ জন্যে তিলমাত্রও দুঃখ নেই সাগরের।

ক্ষতির মধ্যে সাগরের কলেজে পড়াটা হবেনা, স্কলারশিপটা পাওয়া হবে না। না হোক। চুলোয় যাক সব। মরতে কোনো দুঃখ নেই সাগরের। বরং মরতে পেলেই বেঁচে যায়।

অতএব একঝটকায় থাবামুক্ত হয়ে দৃঢ়ভাবে উঠে দাঁড়ানো যায়।

ঘুরে দাঁড়িয়ে তীব্র স্বরে বলা যায় 'কী? কী বলছেন?'

বাঘের থাবার মালিকের সেই লালচে লালচে মুখটা যেন একটু তামাটে হয়ে গেছে, ফুলো ফুলো নাকটা যেন একটু কুঁচকে গেছে।

কেন?

কী ক্ষতি হয়েছে ওর? কতটা লোকসান? কিছুনা, কিছুনা, স্রেফ্ থানা

পুলিশের ঝামেলা। সাগর শুনেছে পুলিশ এসেছিল সেদিন ওর বাড়িতে। মিলিটারী বলেও ছেড়ে কথা কয়নি।

'কী! কী বলছেন?'

এই প্রশ্নে ও বোধকরি একটু চকিত হল। বোধকরি এই তীব্রতাটা ওর ধারণায় ছিল না। একটু যেন অবাক হল, তারপরে, মুহূর্ত পরেই কটু কুৎসিত একটা হাসির সঙ্গে বলে উঠল, 'বলব আর কী! বলবার আছেই বা কী? হতভাগ্য প্রেমিকের বিরহ বেদনা দেখছিলাম দূরে দাঁড়িয়ে।'

সাগর ছিটকে খানিকটা সরে গিয়ে বলে ওঠে, 'আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে আসবেন না।'

'কথা বলতে আসব না? তাই নাকি? কিন্তু তোমার সঙ্গেই যে এখন আমার কথা বলার দরকার হে।' 'মিলিটারী' তেমনি বিশ্রী আর খানিকটা হেসে বলে ওঠে, 'তা' ছাড়া তুমিই তো এখন আমার ভরসা! বৌ মরে গেলে বৌয়ের লাভারই সবচেয়ে নিকট জন! কি বল হে তাই না? তবু তো বৌয়ের সঙ্গের, বৌয়ের অঙ্গের, বৌয়ের প্রেমরঙ্গের আস্বাদ কিছুটা পাওয়া যায়।'

'আপনি চলে যান!'

'আরে ব্যস! এ যে দেখছি ব্যাঙাচি থেকে ব্যাঙ হয়ে উঠেছে। চেহারাটা তো বানিয়ে তুলেছ পচা পোকার মত। কিসে হল? শোকে, না রোগে?'

'আপনার কোনো কথার আমি উত্তর দেব না।'

'উত্তর দেবে না? বল কি হে প্রতিদ্বন্দ্বী! তোমার কাছে যে প্রশ্ন ছিল গোটাকতক।'

'উত্তর দেব না! আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমার ঘেন্না করে।'

'ঘেন্না! একেবারে ঘেন্না? কথাটথাগুলো বড্ড বেশী কড়া হয়ে যাচ্ছে না ছোকরা? নেহাৎ তুমি আমার প্রেয়সীর 'লাভার' তাই এমন বেচাল বোলচাল দিয়েও এ যাত্রা তরে গেলে। কিন্তু বেশী বাড়াবাড়ি করলে—

'তরতে আমি চাইনা। যা পারেন করুন না। কী করবেন, মারবেন? মেরে ফেলবেন? ফেলুন! তাতে কিচ্ছু ক্ষতি হবে না আমার!'

এই দৃশ্যটা দেখতে দেখতে হঠাৎ যেন অবাক হয়ে গেলেন সংবরণ, ওই রোগা হ্যাংলা, হলদে পোকার মত দেখতে হয়ে যাওয়া ছেলেটা তার কুণ্ঠিত ত্রস্ত ভয় ভয় ভাবটা ত্যাগ করে হঠাৎ এমন দৃপ্ত হয়ে উঠল কি করে? কে দিল এই সাহস?

ভাবলেন।

তারপর ঈষৎ কৌতুক বোধ করলেন।

ভাবলেন, একেই বোধ করি 'মরীয়া' বলে। ওই লোকটাকে চিরদিনই এমনি ঘেন্না করেছে সাগর। চিরদিনই ইচ্ছে হয়েছে ওর মুখের ওপর যা তা করে শুনিয়ে দিতে, ধিক্কারে জর্জরিত করে দিতে, কিন্তু পারেনি। কখনো পারেনি। অবচেতনে টের পেয়েছে সে ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় যন্ত্রণা পাবে আর একটা মানুষ।

হ্যাঁ শুধু সেই মানুষটার মুখ চেয়েই ওই বদমাইস লোকটাকে এতদিন ভয় করে এসেছে সাগর। নিজের জন্যে নয়।

কিন্তু আর এখন কিসের ভয়?

আর কার মুখ চাইবার আছে?

দিক না ও সাগরের গলা টিপে। টিপে টিপে মেরে ফেলুক। ফেলে দিক এই হেদোর জলে। কোনো দুঃখ নেই সাগরের। আছে শুধু আনন্দ। তারপর তো পুলিশ আসবে? ধরে নিয়ে যাবে ওকে থানায়। বিচার হবে খুনের।

আর খুনের শাস্তি যে কী, তা ভাল করেই জানে সাগর।

লোকটার ফাঁসি হবে ভেবে ভয়ানক একটা উল্লাস অনুভব করল সাগর।

মৃত্যুদণ্ড! হ্যাঁ উচিত শাস্তি।

জজ যদি মৃত্যুদণ্ড দিতে ইতস্ততঃ করে, মরে যাওয়া সাগর প্রেতলোক থেকে দৈববাণী করবে, 'স্যার ও শুধু একটাই খুন করেনি, দু'দুটো খুন করেছে।'

মিলিটারী ডাক্তার কিন্তু আর রেগে উঠলনা। হঠাৎ ভয়ানক একটা শব্দে 'হা হা' করে হেসে উঠল। দমকে দমকে হাসি।

তারপর ভুরুটা উর্ধ্বে তুলে ধরে বলল, 'বটে নাকি? এতদূর? মরে গেলেও ক্ষতি হবে না? এ যে সংঘাতিক ডেঞ্জারাস অবস্থা হে। কেঁচো কেন্নোর মধ্যেঃ এমন গভীর প্রেম। তাজ্জব লাগিয়ে দিচ্ছ যে। এই বয়সে এত পাকা হয়ে উঠেছ কি করে বল দিকি? ঘুড়ি উড়িয়ে আর ডাংগুলি খেলে বেড়াবার তো বয়েস। সেই বয়সে একটা রেস্‌পেকটেবল্ ভদ্রমহিলার সঙ্গে প্রেম, তার শোকে মৃত্যু ইচ্ছা, এসব আসছে কোথা থেকে?'

সাগরের ইচ্ছে হয় ওই লোকটাকে ঠেলে জলে ফেলে দেয়। কিন্তু সেই অসম্ভব ইচ্ছের আর মূল্য কি?

অতএব দাঁতে ঠোঁট চেপে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে।

মিলিটারী ডাক্তার আবার তেমনি ব্যঙ্গ হাসি হেসে বলে, 'তা জগতে সবই

সম্ভব। একটা রেসপেক্টেবল্ ভদ্রমহিলাই যদি তোমার মত একটা গুবরে পোকাকে 'মনের মানুষ' বলে ভাবতে পারে, তোমার আর দোষ কি? মাথা ঘুরে গেছে। তা' যাকগে, ক্ষমাই করে ফেলছি তোমাকে। তোমার মত নিকৃষ্ট জীবকে—'সাগর ঝট করে ঠিকরে ওঠে, ঝলসে ওঠে, ক্ষমা! ক্ষমা করতে এসেছেন আমাকে? আচ্ছা নির্লজ্জ লোক তো আপনি! কে চায় আপনার মত নিকৃষ্ট লোকের ক্ষমা? বলছি তো যদি সাহস থাকে, তো মেরে ফেলুন আমাকে! তা সাহস থাকলে তো! ফাঁসি যাবার ভয় আছে যে! তাই ক্ষমা করতে এসেছেন।'

সাগর কি নিজেই নিজের বীরত্বে মুগ্ধ হচ্ছে? তাই ক্রমশঃই সেই মুগ্ধতায় মোহগ্রস্ত হচ্ছে, নেশাচ্ছন্ন হচ্ছে? নইলে নিজে সাগর কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছে ওই লোকটার মুখের ওপর এভাবে কথা বলবে? বলতে পারবে?

'কিছু নয়' কি ওই আকাশ থেকে দেখতে পাচ্ছে? সে কি তার পাজী বরটার অপমান দেখে মুখ টিপে হাসছে? না কি ভুরু কুঁচকে ভারী ভারী মুখে বলে উঠতে চাইছে, 'সাগর! কী অসভ্যতা হচ্ছে?'

নাঃ কক্ষণো না।

কক্ষণো 'কিছুনয়' ওই লোকটার অপমানে বিচলিত হচ্ছে না। আর ভুরুও কুঁচকাচ্ছে না! ওসব তো ছিল তার সংসারের লোককে দেখাবার জন্যে। এখন আর দেখাবার প্রশ্ন কোথায়? এখন তো সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছেয় চলা। তবে আর মুখ টিপে হাসবেনা কেন 'কিছুনয়!' কেন সেই চাপা হাসি হাসি মুখ বলে উঠবেনা 'সাবাস! সাবাস দিচ্ছি তোকে সাগর খুব বলেছিস, বেশ বলেছিস!'

সংবরণ দেখলেন—

সাগর চমকে উঠল।

চমকে উঠল নিজের ভাবনার প্রতিধ্বনি শুনে।

শুক্তি নয়, শুক্তির সেই পাজী বরটাই বলছে, 'বাঃ! বাঃ! সাবাস! বেশ বলেছ, খুব বলেছ। হুঁ। যেমন মিনমিনে নেংটি ইঁদুরটি ভাবতাম, তেমন তো নয় দেখছি. তা হলে তোমার মতে ক্ষমা করতে না চেয়ে ক্ষমা চাওয়াটাই উচিত ছিল আমার? মন্দ নয়। তবে না হয় সেটাই চাওয়া যাক হে গিনিপিগ্! এই অভাগা পত্নীহারা প্রবঞ্চিত স্বামীকে না হয় ক্ষমাই করে ফেল তুমি। অনেক দিন

পরে বাড়িতে আজ তোফা মুরগী রান্না হচ্ছে দেখে এসেছি, চল এক টেবিলে বসা যাক।'

সাগর বেপরোয়া।

সাগর নিশ্চিত।

সাগর টের পেয়েছে মরে যাওয়া 'কিছুনয়' আকাশ থেকে সব দেখতে পাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছে। আর ওর ওই বদমাইস বরটার দুর্দশায় হেসে কুটি কুটি হচ্ছে।

অতএব সাগর চালিয়ে যাবে। যতক্ষণনা ওই লোকটা, ওই বদমেজাজি গোঁয়ার লোকটা সাগরকে মেরে ফেলবে, ততক্ষণ চালিয়ে যাবে সাগর। তাই সাগরও ব্যঙ্গ হাসি হেসে বলে ওঠে, 'কেন? গুলি করে মারবার সাহস নেই, তাই খাদ্যে বিষ মিশিয়ে? যা আপনার নিজের বৌকে—'

'ব্যস! ব্যস!' মিলিটারী ডাক্তার ভরাট ভরাট গলায় বলে ওঠেন, 'পাড়ায় যা রাষ্ট্র হয়েছে তুমিও সেটাই সত্যি বলে ধরে নিয়োনা। বিষ সে নিজেই খেয়েছিল, আমি খাওয়াইনি। বুঝলে হে আরশোলা। আমি যদি ঘটনাকে নিজের হাতে নিতাম তা হলে অনেক আগেই সব কিছু ফিনিস্ হয়ে যেত। গুলিতেই হতো। কিন্তু সত্যিই তো আর একটা ব্যাঙাচিকে আমার 'রাইভ্যাল' ভাবতে পাবিনা? আমার একটা প্রেস্টিজ আছে তো? তাছাড়া ব্যাপার কি জানো? সেই নোংরা যাচ্ছেতাই মহিলাটিকে আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম তাকে আমি স্রেফ্ অবহেলা করি! সে উচ্ছন্ন গেল কি চুলোয় গেল তাতে কিছু এসে যায় না আমার! বুঝলে? বুঝতে পারছ? প্রেম বোঝো, প্রেমতত্ত্বই কি আর না বোঝো?'

সাগর বুঝতে পারেনি, কিন্তু সংবরণ বুঝতে পারছেন লোকটা মদ খেয়েছে, প্রাণভরে মদ খেয়েছে। তাই অমন বেসামাল কথাবার্তা।

সাগর বোঝেনি।

সাগর একটু অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। লোকটাকে এত বেশী কথা বলতে সে কোনোদিন দেখেনি। বৌ মরে কি আরো পাজী হয়ে গেল লোকটা? না কি একটু 'পাগল পাগল?'

'কি হল চুপচাপ হয়ে গেলে যে? তাহলে মৌনং সম্মতি লক্ষণম্? এক প্লেট মুরগীর ঝোল চলবে?'

'আপনার বাড়িতে খেতে যাব? আমি? বলতে লজ্জা করছে না আপনার?'

'লজ্জা? বল কি হে? হা হা হা। লজ্জা করবে আমার? বলি কথাটা বলতে লজ্জা হওয়া তো তোমারই উচিত ছিল। আমার বাড়িতে কিবলে তোমার গিয়ে খাওয়া দাওয়া তো বেশ রামরাজত্ব করেই চলতো দেখেছি।'

সাগর সহসা মাথার মধ্যে তীব্র একটা যন্ত্রণা বোধ করে। সাগর সহসা অসহায়তা অনুভব করে। এতক্ষণ ধরে যে জোর নিয়ে লোকটাকে কড়া কড়া কথা শোনাচ্ছিল সেই জোরটাকে আর খুঁজে পায় না।

আর—

আর সঙ্গে সঙ্গে 'কিছু নয়' এর ওপর একটা তীব্র অভিমানে সমস্ত মনটা আলোড়িত হয়ে ওঠে।

কেন, কেন 'কিছু নয়' সাগরকে ধরে ধরে রাজ্যের জিনিস গেলাতো। ওই খাওয়ার জন্যেই তো নিজের বাড়িতে প্রতিনিয়ত হেয় হয়েছে সাগর। আর আজ আবার তার হাজারগুণ হেয় হতে হল। এই লোকটা, এই লোকটা তো জানে সাগর তার বাড়িতে খেতো। তার পয়সাতেই খেতো। সাগর যে মাষ্টারের সাহায্যে ভাল করে পাশ করল, সে মাষ্টারের খরচ জুগিয়েছে 'কিছু নয়' কার পয়সায়? ওই পাপ ঘড়িটা, শনি রাহু শয়তান ঘড়িটা কার পয়সার কিনেছিল কিছু নয়? সব তো এই পাজীটার পয়সা।

তবে?

তবে কেন সাগরকে সেই সব নিতে খেতে এত সাধ্যসাধনা করেছে 'কিছু নয়?' শ্রেফ সাগরকে হেয় করে রাখতে ছাড়া আর কি! এই যে লোকটা আজ সাগরের মুখের ওপর খাওয়ার খোঁটা দিতে পারল, কার দোষে সেটা?

সাগরকে নীরব হয়ে যেতে হল ওর ব্যঙ্গ হাসিতে, ওর বিদ্রূপ বাক্যে।

এতক্ষণ পরে চোখে জল এল সাগরের। আকাশের দিকেও চাইতে ইচ্ছে হল না তার। তাকিয়ে রইল জলের দিকে।

মিলিটারী ডাক্তারও একটু ক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে রইল। তারপর কেমন যেন ভাঙা ভাঙা গলায় বলে উঠল, 'তা' মাঝখানের মূল বস্তুটাই যখন রইলনা, তখন আর তোমার সঙ্গে আমার মেলামেশায় আটকটা কি বল?

'মেলামেশা!'

সাগরের কণ্ঠে আবার তীব্রতা আসে।

মিলিটারী মৃদু হেসে বলে, 'আহা না হয় মেলামেশা না হলো। কিন্তু শত্রুপক্ষ

ভাববার কারণটাও তো নেই আর? তবে? তবে আর আমার দু একটা কথার জবাব দিতে তোমার আপত্তি কি?'

সাগরের মত বয়েসের ছেলের পক্ষে গলার সুরে যতটা তাচ্ছিল্য হানা সম্ভব, তা হেনে সাগর বলে, 'আমি জানি আপনি কী প্রশ্ন করতে চান, আমি তার উত্তর দেব না।'

'জানো? আমি কি প্রশ্ন করবো তা তুমি জানো? বল কী হে? তুমি যে ক্রমশঃই তাজ্জব করছ আমাকে। বল তো আমার প্রশ্নটা কী?'

সাগর যেন এবার এই লোকটার ওপর প্রভুত্ব করছে, যেন এই লোকটাকে খেলাতে পাচ্ছে, তাই সাগর চলে যাচ্ছে না এর সঙ্গ ত্যাগ করে। সাগরের জীবনে এ এক নতুন আস্বাদ। নিজের এই নতুন রূপে নিজেই বিহ্বল হচ্ছে সাগর।

নিজের প্রেমে পড়ে যাচ্ছে যেন।

সেই অসহায়তাটা আর অনুভব করছে না সাগর। তাই সাগর ওর কথার জবাব দিচ্ছে—'প্রশ্ন আবার কি! 'সেদিন কি হয়েছিল, কোথায় গিয়েছিল সে তোমার সঙ্গে, শেষ কি কথা হয়েছিল, এই সব তো? জানি। কিন্তু উত্তর আমি দেব না।'

'হুঁ! একখানি জিনিয়াস! এখন যেন ধীরে ধীরে অনুমান করতে পারছি ভদ্রমহিলা কেন এত পেয়ার করতেন। কিন্তু উত্তরটা দেবেনা কেন বল দিকি?'

'দেব না। আমার ইচ্ছে নেই।'

'আর আমি যদি বলি বাড়ি থেকে সরে পড়ে দুজনে একটু নোংরা আমোদ করতে গিয়েছিলে! বেশ ইয়ংম্যানটি তো হয়ে উঠেছে—'

হঠাৎ থেমে পড়তে হয় মিলিটারী ডাক্তারকে।

সাগর তার বাহুর একটা অংশ কামড়ে ধরেছে।

সংবরণ দেখতে পাচ্ছেন, হিংস্র জন্তুর মত দেখাচ্ছে সেই নিতান্ত দুর্বল রোগা ছেলেটাকে। চোখ দুটো জ্বলছে ধ্বক্ ধ্বক্ করে। ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসে পাতলা জিরজিরে বুকটা ওঠা পড়া করছে তার।

কিন্তু মিলিটারী ডাক্তারের মুখটাও তো হিংস্র হয়ে ওঠার কথা। তা হলনা কেন? কামড় খেয়ে প্রসন্ন হয়ে উঠল কেন তার দীর্ঘোন্নত শরীরের উপরে অবস্থিত সেই দীর্ঘনাসা দৃপ্ত মুখটা।

কারণ বোঝা না যাক দেখা তো যাচ্ছে।

মুখটা বাস্তবিকই প্রসন্ন দেখাচ্ছে ডাক্তারের।

কণ্ঠে কৌতুকের আভাস।

'থাক! থাক! এ 'মাস্‌লে' দাঁত বসাতে গেলে তোমার ওই পোকায় খাওয়া দাঁতগুলো 'পটপট' করে ভেঙে যাবে হে খোকা? বেশ তো দোষের যদি কিছু না থাকে, বলতে তোমার আপত্তি কী? অন্ধকারে হাতড়ে মরে মরে প্রাণটা যে গেল আমার!'

সাগর অবশ্য একবার কামড় দিয়েই ছেড়ে দিয়েছিল। হাঁপাচ্ছিল সরে এসে। এবার বিদ্রূপ হাস্যে বলে ওঠে, 'প্রাণ? আপনার প্রাণটা গেল? ও প্রাণ যাবার নয়।'

ডাক্তার হাতের ওপরকার সেই কামড়ানো জায়গাটার জামার কোঁচকানো গুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলে, 'ব্যাপারটা কী বলতো হে! সব বুঝে ফেলেছ? তুমি যে ক্রমশঃই আমাকে আকৃষ্ট করে ফেলছ হে। আমার সেই মৃতা স্ত্রীর মত আমিও তোমার প্রেমে পড়ে যাব নাকি শেষ পর্যন্ত! নাঃ বাস্তবিকই তোমার দৃঢ়তায় মোহিত হচ্ছি আমি। কিন্তু ব্যাপারটা জানা আমার বড় দরকার ছিল হে! তুমি বড় নিষ্ঠুরতা করছ। মরতেই যখন রাজী তুমি, তখন আর ভয়টা কি দেখাবো। কিছু টাকা চাও? চাও তো চল। একশো দুশো পাঁচশো, হাজার! হাজারটা টাকা পেলে তাই থেকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতে বালক। বৃথা জেদটা ছাড়লেই ওটা পেয়ে যাও।'

হাজার টাকা!

কেমন না জানি দেখতে সেটা। সত্যিই হয়তো বাকী জীবনটা তাই দিয়েই সামলে নেওয়া যাবে। হয়তো সেই টাকাটা দিয়ে একটা ব্যবসা ফাঁদলে, রাজার মত বড়লোক হয়ে যাবে সাগর।

মুহূর্তকালের জন্য এই ধাক্কাটা যেন মগজের মধ্যে একটা তোলপাড় কাণ্ড ঘটাল, কিন্তু সেটা মুহূর্তের জন্যই। পরমুহূর্তেই সাগর শুনতে পেল সাগরের গলা বলছে, 'আপনার টাকা গঙ্গায় ফেলে দেনগে যান। কেউ ছোঁবেনা— আপনার টাকা।'

আশ্চর্য!

সংবরণ যেন সাগরের কাহিনীটা সব স্পষ্ট চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছেন! কি করে পাচ্ছেন? সে সব কোন জন্মের শোনা কাহিনী। সাহিত্যিক বলেই কি সংবরণ চৌধুরীর এই অন্তর্দৃষ্টি?

তা হয়তো সেই অন্তর্দৃষ্টির বশেই দেখতে পাচ্ছেন সংবরণ দূরে লোকটার-মুখটা যেন ঝুলে পড়ল। ঘাড়টা নাড়তে নাড়তে আস্তে আস্তে বলল সে, 'কিন্তু তোমাকে কিছু দেবার ছিল আমার। টাকা নয় ছেঁড়া কাগজ। তোমার সুইট হার্ট যে লিখত গো বসে বসে খাতা ভর্তি করে করে। মরবার আগে খাতাগুলো ছিঁড়ে কুচি কুচি করে সারাঘরে ছড়িয়ে রেখে গিয়েছিল। গুটিয়ে প্যাকেট করে তুলে রেখেছিলাম, ভেবেছিলাম দেখব কী রহস্য লুকোনো আছে তার মধ্যে। পারলাম না। ধৈর্য হল না। ছেঁড়া পাতা জুড়ে জুড়ে পাঠোদ্ধার করবার ধৈর্য হল না। আর কাকেই বা দেখাতে যাবো বল? কে বলতে পারে ঝাঁপির ভিতর কেউটে বসে আছে কি না! একমাত্র তোমাকেই—কথার মাঝখানে পকেট থেকে ছোট ফ্লাস্ক বার করে গলায় ঢেলে নেয় ডাক্তার। আর দেখে হেসে ওঠেন, সংবরণ, বোকা সাগরটা শিউরে উঠে বলছে, 'মদ খান আপনি!'

প্রচণ্ড একটা হাসির শব্দে আশপাশের লোকগুলো সচকিত হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে সাগরও সচকিত হয়ে দেখল শেষ বিকেলের আলো কখন বিদায় নিয়েছে, গ্যাসের আলোগুলো জ্বেলে দিয়ে বিদায় নিয়ে গেছে মই ঘাড়ে করা লোকগুলো। এখানে ওখানে কিছু লোক বসে।... .. জটলা করে কয়েকজন, একা একা কেউ। মিলিটারী ডাক্তারের হাসিতে তারা চমকে উঠেছে মনে হচ্ছে।

'কী বললে? মদ খাই! বল কী হে! এ খবরটুকুও জানতে না এতকাল? তোমার বান্ধবী তবে কী ছাই গল্প করতো তোমার সঙ্গে? মদ খাই তাই না টিকে আছি পৃথিবীতে। বিনা মদে যারা এ পৃথিবীতে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে পারে আমি তাদের ঘৃণা করি, বুঝলে ঘৃণা করি।'

আবার পকেটে হাত দেয় ডাক্তার, আরও খানিকটা গলায় ঢালে। তারপর সহসাই একেবারে চুপ করে গিয়ে একটা বেঞ্চে বসে পড়ে। মুখটা বুকের সঙ্গে ঠেকে আসে, পা দুটো ঘাসের ওপর ঘসতে ঘসতে বিজবিজ করে কি যেন বলে। অথবা কিছুই বলে না, শুধু নিঃশ্বাসের শব্দটাই—

এই থেমে যাওয়া মূর্তির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকে সাগর। এতক্ষণে বুঝি টের পায় সাগর—লোকটা মদ খেয়েই অত কথা বলছিল। ভিতরেব কথা, গোপন কথা।

কিন্তু সাগর তো মদ খায় নি। সাগর তবে এ কী করে বসল? অধৈর্য হয়ে অসহিষ্ণু হয়ে হারিয়ে ফেলল হাতে আসা রাজৈশ্বর্য! সেই ছেঁড়া খাতাগুলো তো সাগরকেই দেখাতে চেয়েছিল লোকটা। দেখাবে বলেই খাওয়ার ছুতো করে

বাড়িতে ডেকে নিয়ে যেতে চাইছিল।...... ও বলবে, 'আর কাকে দেখাতে যাব বল? এক তোমাকেই—

হঠাৎ লোকটার ওপর থেকে ঘৃণা বিদ্বেষ আর রাগের তীব্রতাটা যেন অনেকখানি কমে যায় সাগরের। মনে হয় ওর মধ্যেও বুঝি কেবল মাত্র .পেজোমোই নেই, কিছু দুঃখও আছে। গভীর দুঃখ। হয়তো সব লোকের সঙ্গে মেলে না, নিজের ধরণে আছে।

আছে।

থাকে।

সকলের মধ্যেই কিছু না কিছু গভীরতা থাকে, দুঃখ থাকে, থাকে সূক্ষ্ম অনুভূতি। যাকে নিতান্ত স্থূল মনে হয়, নিষ্ঠুর মনে হয়, তার মধ্যেও থাকতে পারে বিষণ্ণ বেদনা। কোনও একটি বিশেষ মুহূর্তে ধরা পড়ে সেটা।

নইলে সাগর কি জানতো সাগরের জ্যেঠামশাইয়ের মধ্যে তেমন একটা বস্তু আছে। মাঝে মাঝে কটু কঠোর মন্তব্য আর বেশীর ভাগ গম্ভীর নীরবতা, এই তো চেহারা জ্যেঠামশাইয়ের। ঘড়ির ব্যাপারে প্রথম একদিন চমক লেগেছিল, আর একদিন লাগল সে চমক।

জ্যেঠামশাইদের বাড়ি থেকে চলে এসেছিল তখন সাগর। সাগর একটু রোজগার করতে শেখা মাত্রই সাগরের মা পাগল করে তুলেছিল সাগরকে আলাদা হবার জন্যে। ঝুমির তখন বিয়ে হয়ে গেছে ; শুধু মা আর ছেলে।

মা বলতো, 'একবেলা একমুঠো তো খাই, তোর সংসারে গিয়ে তাও বরং আমি ছেড়ে দেব সাগর, তুই আমায় একবারের জন্যে অন্ততঃ এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যা। এই নরকের বাইরে গিয়ে যেন মরণ নিঃশ্বাসটা ফেলতে পাই আমি।'

সাগর ভেবেছিল, এটা স্বার্থপরতা হবে। এতদিন এখানে থেকে, গোটা পঞ্চাশ টাকা রোজগার করতে না করতেই অহঙ্কার দেখিয়ে চলে যাওয়াটা বড্ড বেশী দৃষ্টিকটুও হবে।

কিন্তু মার জেদেই শেষ পর্যন্ত অন্য পাড়ায় একখানা ঘর জোগাড় করতে হয়েছিল সাগরকে।

হ্যাঁ অন্য পাড়াতেই।

মা বলেছিল তাই।

বলেছিল, 'একেবারে অন্য পাড়ায়। যাতে বাজার' দোকান করতেও পথে ঘাটে এদের সঙ্গে দেখা না হয়ে যায় তোর।'

বলেছিল, 'অন্নঋণ মস্তঋণ তা মানি। কিন্তু সাগর, মাতৃঋণও কম ঋণ নয়। সেই ঋণটা তুই আগে শুধে ফেল বাবা, এরপরে আর সময় পাবিনা। অন্যঋণ শুধিস তারপর। ভগবান তোকে রাজা করুন, তুই তোর জ্যেঠার নাতির সংসার পর্যন্ত পুষিস ভবিষ্যতে। শোধ হবে না তাতে?'

নিরুপায় হয়েই সেই পঞ্চাশটি টাকার থেকেই তেরো টাকা দিয়ে একখানা ঘর ভাড়া করতে হয়েছিল সাগরকে। আর নিরুপায় হয়েই একদিন একটা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে মাকে আর মার বিয়ের সময়ের সম্পত্তি রংচটা তোরঙ্গ টা আর ডালা ভাঙা ক্যাশ বাক্সটা নিয়ে গাড়িতে উঠতে হয়েছিল।

বাড়ির কেউ সেদিন কথা বলেনি সাগরের সঙ্গে। 'এক গেলাশ জল খেয়ে যাও' একথাটুকুও বলেনি। মা ছেলেতে অমনি মুখে বেরিয়ে এসেছিল এতকালের বাসাটা থেকে।

জ্যেঠামশাইকে দেখতে পায়নি বেরোবার সয়ম। বাড়িতেই ছিলেন না তিনি তখন। সাগরের মা বেরোবার সময় বড় জায়ের পায়ের ধূলো নিতে গিয়েছিলেন, জা এই দুঃসহ স্পর্দ্ধার দিকে তাকিয়ে বিদ্যুৎবেগে পা-টা সরিয়ে নিয়েছিলেন।

গাড়িতে উঠে মা বলেছিল, 'দেখলি তো সাগর? তোর জ্যেঠির ব্যবহার দেখলি? আর তোর জ্যেঠারও দেখ। ভাসুর গুরুজন বলা আমার শোভা পায় না। কিন্তু না বলেও পারছি না। জানতেন তো আজ আমরা জন্মের শোধ বিদেয় হচ্ছি। আজও কি মানুষেব দাবার আড্ডায় না গেলে চলছিল না? মন নেই প্রাণ নেই এ বাড়ির কারুর, বুঝলি?'

কিন্তু সাগর জেনেছিল আছে, অন্ততঃ জ্যেঠামশাইয়ের মধ্যে আছে। অবাক হয়ে গিয়েছিল সেদিন সাগর। সে দিনও বোকার মত হাঁ করে দাঁড়িয়ে ছিল সেই নোটের গোছাটা হাতে করে।

হ্যাঁ তখনকার মনে সেটাই 'গোছা।' দেখেছিল তো দুশো খানি টাকা। সংবরণ চৌধুরীর কাছে হয়তো সংখ্যাটা নিতান্ত তুচ্ছ। দুটো ছোট গল্প লিখলেই ও টাকাটা এসে যায়, কিন্তু সাগরের কাছে তো ওই দু'শো অগাধ সমুদ্র।

সেই সমুদ্রের মধ্যে যেন তলিয়ে যাচ্ছিল সাগর আস্তে আস্তে।

জ্যেঠামশাই চলে যাবার পর শুধু সামনের রাস্তাটাই নয়, সমস্ত পৃথিবীটাই ফাঁকা—শূন্য লাগল।

কিন্তু জ্যেঠামশাই? জ্যেঠামশাই কোথায়? কবে?

হ্যাঁ জ্যেঠামশাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল পরে। ক'দিন পরে বাড়ি খুঁজে খুঁজে এসে হাজির হয়েছিলেন সাগরের বাসায়। কেমন যেন হাসির মত করে বলেছিলেন, 'বেশ করেছিস, ভাল করেছিস। মায়ের দুঃখ দূর করাই তো সন্তানের কাজ। অনেক দুঃখে ছিলেন ছোটবৌমা, অনেক অপমান লাঞ্ছনার মধ্যে।'

জ্যেঠামশাইয়ের শীর্ণ পেশী পেশী মুখটা আরো টান্ টান্ দেখাচ্ছিল, আর জ্যেঠামশাইয়ের ঠোঁটটা যেন কাঁপছিল।

সাগর হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে ছিল সেই দিকে। সাগরের মা রান্নার চালা থেকে বেরিয়ে এসে দেখেছিল। গলায় আঁচলটা জড়িয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করেছিল।

ঠোঁটটা আরো কাঁপছিল জ্যেঠমশাইয়ের।

কথা বলতে সময় লেগেছিল।

আর যখন বলেছিলেন, এদের দুই মা ছেলের মনে হয়েছিল ঘটনাটা কি সত্যিই ঘটছে, না স্বপ্ন দেখছে তারা?

ওই দু'-শোটি টাকা আস্তে আস্তে সন্তর্পনে পকেট থেকে বার করেছিলেন জ্যেঠামশাই, বাড়িয়ে ধরেছিলেন সাগরের মার দিকে, 'এটা ধর ছোট বৌমা।'

একগলা ঘোমটার মধ্যে ডুবে থাকা ছোট বৌমা নিথর হয়ে দাঁড়িয়েছিল, হাত বাড়ায়নি।

কে জানে লজ্জায় না আকস্মিকতার বিমূঢ়তায়।

জ্যেঠামশাই একটুক্ষণ অপেক্ষা করে থেকে আস্তে নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'ছোট বৌমার বোধহয় বুড়োটাকে বিশ্বাস করতে বাধছে। বাধাই স্বাভাবিক, কিন্তু এইটুকু জেনে রাখো বৌমা, মানুষ অবস্থার দাস। যাক তুই-ই ধর সাগর। ভাল করে তুলে রাখিস। তোর বিয়ের সময় বৌকে আশীর্বাদ করতে একখানি ভালমত গহনা গড়াব বলে, দুটি চারটি করে পয়সা জমিয়ে ছিলাম, ঝুমির বিয়েতে পর্যন্ত বার করিনি। আজ পর্যন্ত প্রকাশও করিনি একথা। তা' তোর বিয়ের সময়—' জ্যেঠামশাই একটু হাসলেন। বললেন, 'কোথায় থাকবো ভগবানই জানেন। ইহলোক কি পরলোকে। তুই-ই গড়িয়ে মায়ের হাতে দিয়ে দিস—'

'জ্যেঠামশাই!'

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে শুধু এইটুকু বলতে পেরেছিল সাগর।

জ্যেঠামশাই বলেছিলেন, 'থাক থাক, ও নিয়ে আর কথায় কাজ নেই। কারুর জানারও দরকার নেই, বুঝলি!'

এই 'কারু'টা যে কে, বুঝতে দেরী হয়নি সাগরের, আর হয়তো মনে মনে বিদ্রোহী হয়ে উঠছিল, জ্যেঠামশাই থামালেন। বললেন, 'তুই যা ভাবছিস বুঝেছি। কিন্তু আসল কথাটা কি জানিস? ভয় মানুষকে নয়, ভয় অশান্তিকে ভয় কেলেঙ্কারীকে। যাক সুখে থাকিস, ভাল থাকিস, মাকে শান্তিতে রাখিস এই প্রার্থনা। জানি তা তুই রাখবি। দুশ্চিন্তা অজিতের মার ভবিষ্যৎ ভেবে। হতভাগাটা আজ দুদিন বাড়ি আসেনি। কোথায় যে খুঁজতে যাব!'

মরমে মরে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সাহস করে বলতে পারেনি, 'আমি খুঁজতে যাবো জ্যেঠামশাই?'

ও বাড়ি থেকে চলে এসে সে কথা বলার দাবী বুঝি হারিয়েছে সাগর।

সেদিন জ্যেঠামশাই সম্পর্কে একটা নতুন দরজা খুলে গিয়েছিল সাগরের।

কিন্তু শুধুই কি জ্যেঠামশাইয়ের সম্পর্কে?

সাগরের মার সম্পর্কে নয়?

মাকে কি সেদিন বড় বেশী স্বার্থপর মনে হয়নি সাগরের? মনে হয়নি নীচমনা? তাই মনে হয়েছিল। ভেবেছিল পরে আবার ওই কথাটা না বললে চলতো না মার?

কে জানে চলতো কি না।

তবে বলেছিল সাগরের মা, টাকাগুলো বাক্সয় তুলে রাখতে রাখতে।

'ভাসুর গুরুজন, বলা আমার উচিত নয়। তবে এও বলি বাবা, এত টাকা হঠাৎ কোথায় পেলেন উনি? আর কষ্ট করে জমানো টাকা যে উনি দান খয়রাৎ করতে সুরু করছেন, এও বিশ্বাসের যুগ্যি নয়। আমার মন নিচ্ছে এ টাকা তোর বাপের ছিল। এতদিন সরিয়ে রেখেছিলেন হঠাৎ বোধহয় একটু চৈতন্য হয়েছে।'

শুনে ভারী বিরক্তি এসেছিল সাগরের, সেদিন মাকে নিতান্ত ছোটমন মানুষ মনে হয়েছিল।

তারপর থেকে এযাবৎ দেখে এসেছে সাগর, মানুষের সম্পর্কে যেখানে যত ধারণা ছিল সবই বদলে যাচ্ছে।

জ্যেঠামশাই একটা মস্ত কথা বলে গেলেন, মানুষ অবস্থার দাস।

মিলিটারী ডাক্তারেরও হয়তো অবস্থা অনুকূল হলে ওরকম অবস্থা হতো না।

ট্রেন একটা স্টেশনে এসে ইন্ করেছে। সংবরণ মুখ বাড়িয়ে দেখলেন। কলকাতার কাছাকাছি এসে গেছেন।

নেমে একটু পায়চারি করলেন।

একটা সিগারেট ধরালেন ; মনে হল একটু চা খেয়ে নিলেও হতো। কিন্তু যতক্ষণে উৎসাহ প্রকাশ করে চা'ওলাকে ডাকতে গেলেন, ততক্ষণে ট্রেন নড়ে উঠেছে।

লাফিয়ে উঠে পড়লেন সংবরণ।

বয়সে প্রৌঢ় হলেও এসব এখনো পারেন।

ট্রেনে চড়তেই সেই অনেকক্ষণ আগের প্রশ্নটা মনে এল। জীবনে কবে প্রথম রেলগাড়িতে চড়েছিলেন সংবরণ? কোথায় গিয়েছিলেন?

মনে আছে প্রথম রেলগাড়ি চড়েছিলেন সতেরো বছর বয়সে। গিয়েছিলেন কাটোয়ায়।

হঠাৎ হেসে উঠলেন সংবরণ চৌধুরী।

কী হল তাঁর?

সাগরের জীবন কাহিনী ভাবতে ভাবতে বারে বারে নিজেকে সাগরের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছেন কেন? তিনি অবস্থাপন্ন, জীবনে প্রতিষ্ঠিত, দেশজোড়া নাম তাঁর, লোকে তাঁকে একটু নিজেদের কাছে নিয়ে যাবার জন্যে কী আকুতিই জানায়। সভাপতি অথবা প্রধান অতিথি সংবরণ চৌধুরীকে শুধু ফার্স্ট ক্লাস ট্রেনে কেন, প্লেনে চড়িয়েও নিয়ে যেতে চায় লোকে।

সংবরণ কেন সাগরের মত দীন হতে যাবেন?

•

সতের বছর বয়সে প্রথম রেলগাড়ি চড়েছিল সাগর। ভয়ানক একটা মানসিক যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে 'কোথায় পালাই কোথায় পালাই' করে ক্লাশের একটা বন্ধুর দেশের বাড়িতে চলে গিয়েছি ক'দিনের জন্যে।

সবেমাত্র কলেজে ঢুকেছে সাগর। নতুন পাওয়া বন্ধু।

সাগর অবশ্য বলতো, 'একটা পরিচয় দিতে হয় তাই 'বন্ধু' বলা। নইলে বন্ধু টন্ধু নেই আমার। আলাপী লোক, চেনা লোক। এই পর্যন্ত।'

তবু সেই নতুন আলাপীকেই যেচে বলেছিল সাগর, 'সামনের গুড্‌ফ্রাইডের ছুটিতে তুমি কোথায় যেন বেড়াতে যাবে বলেছিলে?

'বেড়াতে?'

ও হেসে উঠেছিল।

'বেড়াতে কি? বাড়ি যাব। কাটোয়ায়। হোষ্টেলে পড়ে থাকি, দু' একদিন ছুটি হলেও প্রাণ পালাই পালাই করে। তোমার মতন তো না—'

কিন্তু ও কি জানতো সাগরেরও প্রাণ ছুটে পালাতে চাইছে এই শহর থেকে। অত অস্থিরতা না এলে সাগর কখনোই মান খুইয়ে সহপাঠিকে বলে বসতে পারতো না—'তা' আমারও তোমার দেশটায় একবার ঘুরে এলে মন্দ হয় না। অবশ্য তোমার যদি আপত্তি না থাকে। বাংলা দেশের পাড়াগাঁ দেখিনি কখনো।

যেন বাংলা দেশের বাইরের সব কিছু দেখেছে সাগর।

আপত্তি।

ছেলেটা 'হাঁ হাঁ' করে উঠেছিল।

'আপত্তি? বল কি? কী খুশি যে হবো তা'হলে। আমার মা বাবা সবাই খুশি হবেন। তোমার মত এমন একটি স্কলারশিপ পাওয়া ভাল ছেলে—'

সাগর থামিয়ে দিয়েছিল।

.তবু কথা দিয়েছিল যাবে বলে।

তখনো তো সাগর সেই তাদের পুরানো বাড়িতে। তখনো প্রতিটি ব্যাপারে শ্লেষ আর খোঁটা।

জ্যেঠিমা চোখ কপালে তুলে বলেছিলেন, 'বন্ধুর সঙ্গে একলা রেলে চড়ে বিদেশে বেড়াতে যাচ্ছে! তুমি যে অবাক করলে ছোট বৌ? সাধে বলি চিরকেলে পাকা পক্কান্ন ছেলে। নইলে তোমার ওই মিন্‌মিনে ছেলেরই বা আদি অন্তকাল এত বন্ধু জোটে কি করে? কই আমার অজিতকে তো কেউ কোনদিন বলেনা 'আমার দেশে বেড়াতে চল।' ভগবান জানেন কেমন ধারা বন্ধু, কোথায় নিয়ে যেত চায়। এই বয়সে এক লায়েক করে তুললে ছেলেকে ভবিষ্যতে পস্তাতে হবে ছোট বৌ।'

ছোট বৌ বলেছিল, 'অত ভাববার কি আছে দিদি? সে ভাল ঘরের ছেলে, বড় লোকের ছেলে। সেখানে তাদের বাড়িঘর বাগান পুকুর পাঁচটার সংসার। তিনটে দিন সেখানে গিয়ে থাকলে, ক্ষয়ে যাবে না সাগর।'

'ক্ষয়ে সাগর যাবে না, যাবে নিজেদের মান মর্যেদা। এই বয়সেই বড়লোকের ছেলের মোসাহেবী করতে শিখছেন ছেলে, তাতে অগৌরব বৈ গৌরব নেই। তা' ছেলে তো, তোমার চিরকালই বড়লোকের 'পা চাটা'।'

সাগরের মা এ ইঙ্গিত বোঝে, কিন্তু ছেলেকে গিয়ে নিষেধ করতেও পারে না। দেখেছে তো সেই অসুখের পর থেকে কেমন যেন হয়ে গেছে সাগর। সম্প্রীতি যেন আরো বেড়েছে।

দু'দিন যদি বেড়িয়ে আসে তো আসুক। শোনা যাচ্ছে ওই বৌমরা ডাক্তারটা বাড়ি বিক্রী করে দিয়ে বিদেশে কোথায় চলে যাচ্ছে। দিদিটাকে তো আগেই ভাগিয়েছে। শূন্য বাড়ি 'হাঁ হাঁ' করছিল। তার ওপর অপঘাতে মরা বৌয়ের 'দৃষ্টি'। টিকতে পারল না। যাক সাগরের মার পক্ষে শাপে বর হচ্ছে। বাড়ির মালিক বদলালে, দৃশ্য পরিবর্তন হলে, সাগরের ওপর থেকেও সে দৃষ্টি যাবে। নইলে এই যে বছর ঘুরতে চললো, ছেলের মনতো ঘুরছে না।

সাগরের অনুপস্থিতিতে ডাক্তারটা বিদেয় হোক, এই চেয়েছিল সাগরের মা। ভেবেছিল ঠেলা গাড়ি বোঝাই দিয়ে যখন জিনিস পত্র বার করে নিয়ে যাবে, দেখে সাগরের শোক আবার নতুন করে উথলে উঠবে। দেখেছে তো সেই সব খাট বিছানা চেয়ার টেবিল আর্শি আলমারি।

সাগরের মা প্রার্থনা করেছিল।

আর ভেবেছিল জীবনে এই প্রথম ভগবান আমার একটা প্রার্থনা কান পেতে শুনেছেন। কিন্তু সাগরের মা জানতো না, সাগর ডাক্তারের বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার দিনক্ষণ শুনেই চেষ্টা করে পাড়া ছেড়ে পালাচ্ছিল দু'দিনের জন্যে।

শুনেছিল সাগর।

শুনেই হঠাৎ দিশেহারা হয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে ওবাড়ির গেটের মধে ঢুকে পড়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল গাড়িবারান্দার নীচে, থামের গায়ে ঠেশ দিয়ে।

অনেকক্ষণ পরে বাড়ির সামনে পরিচিত গাড়িটা থেমেছিল। উর্দিপরা চাকর ছুটে গিয়ে গাড়ির দরজা ধরেছিল। সাহেবের ফেরার সময় তার অনেক কর্তব্য, অনেক কাজ।

কিন্তু সেদিন সাহেব তাকে 'তাড়া' দিয়েছিল, 'যা যা পালা। ধরতে হবে না। ঠিক আছি। তোর চাইতে ঠিক। নিজের পায়ে হেঁটে যাবো। যা ভাগ!

চাকরটা অগত্যা গাড়ির মধ্যে সাহেবের কিছু জিনিস আছে কিনা তল্লাসে লেগেছিল। আর সাহেব বাড়ির মধ্যে ঢুকতে এসে থমকে দাঁড়িয়েছিল, বলে উঠেছিল, 'নটবরের মত দাঁড়িয়ে কে?'

সাগর বুকে বল বেঁধেছিল।

সাগর মরীয়া'র সাহস নিয়ে তৈরি হয়েছিল।

সাগর বলেছিল, 'আমি! মিত্তিরদের সাগর—

'সাগর! আই মীন্ তুমি! তুমি যে হঠাৎ, এই গরীবখানায়?'

সাগর ঠিক করে এসেছিল নার্ভাস হবে না, গৌরচন্দ্রিকা করবে না, সোজা স্পষ্ট বলে বসবে, 'সেদিন যে সেই ছেঁড়া খাতার কথা বলেছিলেন সেই খাতা—'

বলে ফেলেছিল সে কথা।

আর বলা মাত্রই সাহেব হেসে উঠেছিল।

আরে ব্যস! এ যে একেবারে রাজা বাদশাই মেজাজ। রাণীকে কেটে রক্তদর্শনের পর, আবার দেখতে চাওয়া! বাড়ি বেচে চলে যাচ্ছি, যেখানে যত কাগজ পত্র চিঠি পত্তর ছিল, সব একসঙ্গে জড় করে বুঝলে কিনা, একেবারে দেশলাই কাঠি। একটি কাঠি। সেই যে কি যেন একটা গান আছে তোমাদের, 'আগুনের পরশমণি।' না কি, তাই হয়ে গেল আর কি।

'পুড়িয়ে ফেললেন!'

বড্ড বোধ হয় করুণ শুনিয়েছিল সাগরের গলাটা। না হলে মিলিটারী ডাক্তারের গলার স্বরটাও নরম নরম ভিজে ভিজে হয়ে গিয়েছিল কেন?

সেই ভিজে ভিজে নরম নরম গলায় বলেছিল সে, 'তা' এতদিন কি ঘুমোচ্ছিলে বাপু? সেদিন অত সাধলাম, তখন কী তেজ বাবুর! এখন মুখ কালি করলে আর কি হবে? কি করবো বল? এখন তো অবস্থা হাতের বাইরে। তোমার জন্যে দুঃখিত হওয়া ছাড়া আর কিছু করার দেখছিনা।'

সাগর অনেকক্ষণ মাথা নীচু করে থেকে বলেছিল, 'কবে ছেড়ে দেবেন বাড়ি?'

'এই তো ইষ্টারের ছুটিতে। তা' বাইরে প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে? চলনা ভিতরে গিয়ে বসা যাক। স্মৃতি চিহ্ন মণ্ডিত মন্দির দেখেও সুখ—'

সাগর হঠাৎ দৃপ্তভঙ্গীতে মুখ তুলে বলে উঠেছিল, 'সব সময় আপনি আমাকে উপহাস করেন কেন? কী করেছি আমি আপনার?'

'কী করেছ? কী করেছ?'

মিলিটারী ডাক্তার হেসে উঠে বলে, 'কী করেছ তা' তোমাকে বলে বোঝানো তো সম্ভব নয় বালক, তবে কিছু যদি করতে, অনেক উপকার করা হতো আমার!' তা হলে হাতের সুখ করে গোটা কতক গুলি অন্ততঃ করতে পারতাম তোমাকে! বাঘ শিকারে উল্লাস আছে, উত্তেজনা আছে, আনন্দ আছে। কিন্তু

একটা ছুঁচো মেরে কি হাতে গন্ধ করবো আমি? নিরীহ একটা ছুঁচো! ছিঃ! তাই তোমার গিয়ে ওই কি বললে? উপহাস! হ্যাঁ একটু উপহাস ছাড়া বেশী কি করবার আছে। যাক্ গে, সব কিছুরই তো পরিসমাপ্তি হয়ে যাচ্ছে। পাড়া ছেড়ে দেশ ছেড়ে চলেই তো যাচ্ছি, প্রায় 'বিবাগী বিবাগী' মনে হচ্ছে নিজেকে ; কি বল, তোমার কি মনে হচ্ছে?'

সাগর নীরব।

কিন্তু সাগর কেন ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে না? সাগর কেন নির্বোধের মত দোতলার খোলা জানলাটার দিকে তাকিয়ে আছে?

মিলিটারী ডাক্তার একটু কাছে এসে আস্তে বলে, 'দেখ হে আমার কথার ধরণটাই ওই রকম, ও কি আর সহজে বদলায়? তা' উপহাস টুপহাস নয়, এমনিই বলছি, যমের পিছনে ছুটে সত্যবানেদের জীবন ফেরানো যায়, সাবিত্রীদের যায়না। তারা বড় ঘুঘু। নিজেরাই শিকলি কাটবার তালে থাকে, যমদূত বেচারা শুধু সাহায্যকারী। কাজে কাজেই ও তোমার উদভ্রান্ত প্রেমিকের পার্ট প্লে করে লাভ কিছু নেই। ছেলে বয়েস, লেখাপড়া শিখে মানুষ হওগে, গরীব মা বাপের দুঃখ ঘোচাওগে, আলেয়ার আলোয় ঘুরে মরতে যেওনা। খেলাধুলো কর একসাসাইজ কর, লেখাপড়া কর, ঘোড়ারোগ সেরে যাবে।'

'আপনার উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ!'

বলে তীব্র ঝটকায় বেরিয়ে আসে সাগর গেটের মধ্যে থেকে। পিছনে ভয়ানক একটা হাসির রোল উঠবে ভেবেছিল সাগর, কিন্তু উঠলনা। পিছন ফিরে না দেখেও অনুমান করতে পারল সাগর—লোকটা স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে আছে।

সাগর কেন গিয়েছিল?

সাগর কেন ফিরে এল?

সাগরের সমস্ত প্রাণটা কি একবার ওই দোতলার ঘরখানায় যাবার জন্যে ছটফটিয়ে মরছিল না?

বাড়িটা বিক্রী হয়ে যাবে!

সমস্ত সাজসজ্জা তচ্‌নচ্ করে ফেলে সমস্ত স্মৃতি ধুয়ে মুছে দিয়ে অপর আর একজনরে হাতে তুলে দিয়ে যাবে ওই নির্মম দৈত্যটা!

সাগরের যদি অনেক টাকা থাকতো? বাড়িটা কিনে ফেলত সাগর।
বড় হয়ে, মানুষ হয়ে সাগর টাকা জমাতে পারবে না? অনেক টাকা?

তার পরের দিন জীবনে প্রথম রেলগাড়ি চড়ল সাগর। কাটোয়ায় গেল। তারপর আরো কত জায়গাই গেল সাগর, কিন্তু জীবনের সেই প্রথম রেলগাড়ি চড়া ভুলবে না। সেই রেলগাড়িতে চড়েই প্রথম আবিষ্কার করেছিল সাগর গতিই জীবন। সমস্ত গ্লানি সমস্ত দুঃখ, সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করে নেওয়া যায়, কেবলমাত্র গতির মধ্যে।

সেই প্রথম দেখেছিল, আশেপাশে সামনে সব কিছু ছুটছে, ছুটন্ত মাঠ বাগান নদী পুকুর ক্ষেত খামার পাহাড় বন, আমি শুধু দর্শকের ভূমিকা নিয়ে অচল আছি। আমিই বা ছুটবো না কেন?

সাগর কি বড় হয়ে অনেক বড়লোক হয়েছিল?

সেই বাড়িটা কি আবার কিনে নিয়েছিল সাগর তার নতুন মালিকের কাছ থেকে?

পাগল!

সাগর পাগল নয়।

সাগর তো সে পাড়া ছেড়ে চলে গেল কতদিন যেন পরে। আস্তে আস্তে ভুলে গেল বাড়িটার কি রং ছিল, দোতলার সেই সামনের ঘরটায় কটা জানলা ছিল। তারপর সাগরও তো হারিয়ে গেল। লুপ্ত হয়ে গেল কালস্রোতের তরঙ্গ আবর্তে। শুধু সাহিত্যিক সংবরণ চৌধুরীর কাছে সাগরের কাহিনীটা রয়ে গিয়েছিল।

বিষণ্ণ ম্লান একটু হাসির সঙ্গে সাগর বলেছিল, 'তা' লিখলেও পারো। তুমি লেখক মানুষ, তোমার কলমের গুণে হয় তো এই তুচ্ছ কাহিনীটাই একটা উপন্যাস হয়ে দাঁড়াবে।'

সেই অতীত যুগে একবার বোধ হয় চেষ্টা করেছিলেন সংবরণ!

ট্রেন থেকে নেমে ট্যাক্সীতে বাড়ি ফিরবার সময় ঝট্ করে মনে পড়ে গেল সেই চেষ্টার ইতিহাস।

কিন্তু সে কি শুধু সাগরের কাহিনী শুনে? সেই চিঠিটা পেয়ে নয়?

বহু ছাপমারা একখানা ডাকের খাম বহুপরিচিত একটি হাতের লেখায়, লেখা

ঠিকানা বহন করে হঠাৎ যেদিন একদিন এসে হাজির হয়েছিল, সেদিনও কি এমনি বিচলিত হয়ে ওঠেননি সংবরণ?

আর সেই বিচলিত মুহূর্তে সংকল্প করে বসেন নি, সেই যে ছেঁড়া খাতার টুকরো পাতাগুলো নিতান্ত অসতর্ক নির্বুদ্ধিতায় হারিয়ে ফেলেছিল সাগর, সংবরণ চৌধুরী তাকে নতুন করে গড়বেন? গড়বেন লেখকের কলম দিয়ে শিল্পীর কল্পনা দিয়ে?

ঐতিহাসিক উপন্যাস কী করে লেখে লেখকরা? কী করে সাজায় পুরাণ উপপুরাণের কাহিনী? শুধু এতটুকু একটু ছায়া, দু'টি একটি কিংবদন্তীর গল্প, কোথাও কোনোখানে খোদিত একটি শিলালিপি। এমনি সামান্য কিছু মাল মশলা, এই তো?

অনুমান আর অনুভব!.

কল্পনা আর মনের মাধুরী!

রচিত হয় ইতিহাস আর ঐতিহাসিক গল্প। বিরাট বিরাট খণ্ডে বিপুলাকৃতি।

তবে? সংবরণই বা সেই এক পৃষ্ঠা চিঠির মশলা থেকে একশো পৃষ্ঠা ডায়েরি লিখতে পারবেন না কেন?

লিখতে বসেছিলেন।

কিন্তু পেরে ওঠেননি। সম্পূর্ণতা দিতে পারেন নি। 'ফেলিওর' হয়েছিলেন লেখক সংবরণ চৌধুরী।

অনুমান আর অনুভবের সঙ্গে মনের খাপ খায়নি।

খাপ খায়নি, হয় তো অদ্ভুত একটা বেখাপ্পা ব্যাপার বলেই। ব্যর্থ চেষ্টার নিদর্শন গোছাদুই কাটাকাটিতে জর্জরিত কাগজ এখনো তোলা আছে সংবরণ চৌধুরীর 'দরকারি' নামাঙ্কিত ফাইলে। ফেলে দেননি, দিতে পারেননি।

আজকের এই উদ্বেলিত মনটাকে নিয়ে আবার কি সেই কাগজগুলো নিয়ে বসবেন সংবরণ? যদি সাগরের কাহিনী সম্পূর্ণ করতে পারেন? তা, সম্পূর্ণ করতে চাইলে নিয়ে বসতে হবে বৈকি।

শুক্তির একান্ত অন্তরের কথাকে ধরতে না পারলে সাগরের কাহিনী সম্পূর্ণ হবে কি করে?

অনেক রাত্রে আলো জ্বালিয়ে ঘরের ছিটকিনি তুলে দিয়ে খাটের তলা থেকে একটা ট্রাঙ্ক টেনে বার করলেন সংবরণ চৌধুরী। ওয়াই, এম, সি এর এই

ঘরটাই সংবরণের বহুদিনের সংসার। কালো-রঙা চৌকো এই ট্রাঙ্কটাই তাঁর চিরকালের 'সাহিত্যিক ভাঁড়ার।'

নতুন পাণ্ডুলিপি, বাতিল লেখা, অসমাপ্ত রচনা, অবসর মুহূর্তের 'কবিতা কবিতা' খেলা সব এই ট্রাঙ্কটার মধ্যে।

সব নীচে একেবারে সমস্ত কাগজ পত্রের তলা থেকে সেই কাটাকুটিতে ভরা অসমাপ্ত লেখাটা বার করলেন সংবরণ। সিগারেট ধরালেন।

নিজের পুরনো লেখা আবার পড়া কম ধৈর্যের নয়, তবু সংকল্প করলেন সংবরণ ও থেকে একটা কিছু করবেনই।

না করলে বুঝি ঋণ শোধ হবে না সাগরের। ঋণ শোধ হবে না শুক্তির! আচ্ছা সাগর তাঁকে শুক্তির যে ছোট্ট একটা ফটো দিয়েছিল, সেই ফটোটা কোথায়?

কবে যেন কোথায় কোন মেলা-তলায় একটা অক্টোফটোর দোকান খুলেছিল, মেলা ঘুরতে ঘুরতে দাঁড়িয়ে পড়েছিল শুক্তি সেই দোকানের সামনে। চোখে মুখে খুসির আলো মেখে বলে উঠেছিল, 'ওরে কিছু নয়' এরা বলে কি? আধ ঘন্টার মধ্যে ফটো তুলে ছেপে হাতে দিয়ে দেবে? আয় আয় এই আশ্চর্য ঘটনাটা একবার ঘটিয়ে নিই।'

সাগর?

হ্যাঁ সাগর গিয়েছিল।

শুধু সাগরই নয়, ঝুমি, অজিত, অজিতের ছোট ভাইটা আর বোনটা।

শুক্তি নিয়ে এসেছিল ওদের মেলা দেখাতে।

জনে জনে সকলের ফটো তোলানো হয়েছিল, শুক্তির দু'তিনটে। ফেরার সময় যার যার ফটো তার তার হাতে দিয়ে নিজের একখানা ফটো ঝুমির হাতে গুঁজে দিয়েছিল শুক্তি। বলেছিল. 'নে আমার একখানা ফটোও নিয়ে রাখ। যখন মরে যাব দেখলে মনে পড়বে। ইচ্ছে হলে ফুলের মালা দিয়ে পূজো করতেও পারিস।'

সেই ফটো আর সেই 'কথা' বাড়িতে নিয়ে এসে হেসে কুটি কুটি হয়েছিল ঝুমি। সবাইকে দেখিয়েছিল 'আধ-ঘন্টার অক্টোফটো।'

তারপর ঝুমির হস্তচ্যুত হয়ে কবে যেন ধূলোয় গড়াগড়ি খেতে লাগল ছবিটা, কবে যেন সাগরের সংগ্রহশালায় ঠাঁই পেল, কে তার হিসেব রেখেছে?

যার হারিয়ে গেল সে কি খোঁজ করেছে, গেল কোথায়?

করেনি।

তা সাগরও তো একবার হারিয়ে ফেলেছিল।

আবার এল সেই ছবি অপ্রত্যাশিত, অভাবিত।

তারপর সংবরণ চৌধুরীর কাছে চলে এসেছিল সেই আশ্চর্য অপূর্ব ছবি।

তা সংবরণও কি সে ছবিটা হারিয়ে ফেললেন শেষ পর্যন্ত?

আর সেই চিঠিটা?

ট্রাঙ্কের জিনিস লণ্ডভণ্ড করে খুঁজলেন সংবরণ, কাগজ পত্র তচ্‌নচ্‌ করলেন, হতাশ হয়ে আবার চেয়ারে এসে বসলেন।

কাগজগুলো টেবিলে রাখলেন।

অলস হাতে ওল্টাতে লাগলেন।

কাগজগুলো লেখা সম্পূর্ণ হলে, কি নাম দেবেন তা-ও ভেবে ঠিক করে রেখেছিলেন সংবরণ। 'শুক্তির অন্তরালে।'

কী থাকে শুক্তির অন্তরালে?

মুক্তা?

শুক্তির যন্ত্রণা থেকে যার উদ্ভব!

কিন্তু অনেক উল্টেও প্রথম সুরুটা খুঁজে পেলেন না সংবরণ। ছিঁড়ে ফেলেছিলেন কি? আবার নতুন করে লেখার জন্যে?

হয়তো তাই!

কতদিন আগের যেন ব্যাপার এসব।

মাঝখান থেকেই একটা পাতা দেখতে লাগলেন সংবরণ।

শুক্তির হাতের লেখা নয়, সংবরণের নিজের হাতেরই লেখা। মনের লেখাটাই শুধু বুঝি শুক্তির।

কিন্তু শুক্তির মনের সত্যিকার হদিস কি পেয়েছেন সংবরণ? অনুমানে, অনুভবে? সাগর কতটুকু সন্ধান দিতে পেরেছে তাঁকে?

কলমটা কাছে রাখলেন সংবরণ, পাখার স্পীড্‌টা বাড়ালেন, সেই দ্বিতীয় পৃষ্ঠা খানা চোখের সামনে তুলে ধরলেন।

....

'যাই বাবা পালাই। উঠে পড়ি খাতা পত্তর তুলে। ডাক্তার এক্ষুনি এসে পড়বে। অবিশ্যি আমার খাতার ওপর ঝুঁকে পড়ে, পড়ে ফেলতে ও আসবে না। আমার এই ছেলেমানুষীতে ওর ভারী অবহেলা। শাপে বর আমার।

কিন্তু সেই পাজী হতভাগা ছোঁড়াটা আজ এলনা কেন? পাজীটা তো জানে, না এলে আমি কী 'হালুচালু' করি!

তবুও মাঝে মাঝেই কামাই করে।

এ মাসে তো এই এক্ষুণি একদিন, এখনো মাসের সাতদিন বাকী। গেল মাসে দু' দুটো দিন। সে দিন খুব রাগ দেখিয়ে ছিলাম। তা' চালাক দুষ্টুটা বলে বসল কিনা 'আমি তোমার ঝি না চাকর? যে 'কামাই' বলছ। কামাই টামাই শুনলে আমার বিচ্ছিরি লাগে।'

রেগে একেবারে লাল।

রাগলে বোকাটাকে এত মিষ্টি দেখতে লাগে! দেখে দেখে আশ মেটেনা। তাই তো যখন তখন রাগাই।

তা রাগলে যাকে ভয়ঙ্কর দেখায়, তাকেই কি আমি রাগাতে ছাড়ি? সে যত রেগে জ্বলে মরে, আমার ততই মজা লাগে।.....

ননদ বলে 'ধন্যি দিই তোকে বৌ, কী বুকের পাটা! অতবড় একটা রাশভারী মানুষ, বাইরে না কি যার দাপটে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খায়, তার অপছন্দসই কাজ তারই নাকের সামনে করিস কি করে?'

ওই গিন্নীটিকেও রাগিয়ে দিই আমি। ওর কথার উত্তরে অবাক অবাক ভাব দেখিয়ে বলি, 'ওমা, বাইরে আপিসে আদালতে রাশভারী বলে কি ঘরে পরিবারের কাছেও রাশ দেখাতে আসবে? কথায় আছে—'গিন্নীর কাছে জজও জুজু!'

ননদ কালিমুখ আরো কালো করে বলে, 'ও তেমন বেটাছেলে নয়। বোয়ের পাদপদ্মে আত্মনিবেদিত ভেড়ুয়া-পুরুষ নয় ও। কোন্ দিন যে কী অপমান করে বসবে তোমাকে সেই ভয়েই কাঁটা হয়ে থাকি।'

ওব কথা শুনলে এত হাসি পায় আমার। কী সাংঘাতিক বোকা বাবা।

বোকাদের ক্ষেপিয়ে সুখ আছে। আমিও তাই সুখ করি। বলি, 'শোনো কথা! আমার বর আমাকে চাবুকই মারুক আর কোতলই করুক, তোমার তাতে ভয়ে কাঁটা হবার কি হল?'

ও রেগে বলে যায়, 'জানি গো জানি তোমারই বর। জানি এ সংসারের সর্বেসর্বা তুমি। তবু ও আর আমি এক মায়ের গর্ভে জন্মে ছিলাম, সেটা ভুলে যেও না। একটা—কচি খোকা ছেলে নিয়ে যে ন্যাকরা কর তুমি, তাতে তোমাদেরই গায় বিষ ছড়ায়, আর ও একটা দুঁদে পুরুষ—'

এই, এইটাই হল আসল জায়গা।

ওই সাগর।

ওকে নিয়েই দুটি 'এক মায়ের গর্ভের' ভাইবোনের যত আক্রোশ, যত বিষ!

নিজেমুখে বলে 'কচিখোকা', কিন্তু আক্রোশে তো কম দেখিনা। ও ওই কচিখোকা না হয়ে একটা জোয়ান পুরুষ হলেই বা আর কী বেশী আক্রোশ করতে পারতে বাবা? অথচ আমিও—

পাতা ওল্টালেন সংবরণ।

...সাগরকে একটা কবচ পরাতে ইচ্ছে হয় আমার! রক্ষাকবচ। এক মায়ের গর্ভের দুটি ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্করীর যা 'দৃষ্টি' ওর ওপর! ও দৃষ্টি ডাকিনীর চাইতে কম নয়, শয়তানের চাইতে হালকা নয়। অহরহ ওই ছোট ছেলেটার দিকে ওই বিষদৃষ্টি হানে ওরা। ওই বিষদৃষ্টির সামনে থেকে ওকে নিয়ে কোথাও যদি পালিয়ে যেত পারতাম আমি।

সাগর! বেচারা সাগর! ওর যন্ত্রণা আমি বুঝি। বাড়িতে লাঞ্ছনা গঞ্জনা, এখানে অগ্নিবাণ, অথচ আমি আছি পুলিস সাহেব, হাজরে খাতায় রোজ সই না পেলেই রসাতল তলাতল করে ছাড়ি। জীবন অতিষ্ঠ ছোঁড়ার।..... কিন্তু আমিই বা কি করবো? আমি যে ওকে একদিন না দেখতে পেলে বিশ্ব অন্ধকার দেখি।'

আবার পাতা ওল্টালেন সংবরণ।

সুরে কি খাপ খাচ্ছে?

এ ভাষা সংবরণের এযুগের নায়িকার মত হয়ে যাচ্ছে না তো? শুক্তি তো সেই যুগের মেয়ে, যে যুগে বৌরা মাথায় কাপড় দিত।

শুক্তিও দিত।

বড়লোকের বৌ, বারোমাস বাড়িতেই চমৎকার চমৎকার শাড়ী পরতো। দুধের মত শাদা, মাখনের মত জমি, সুন্দর নক্সার পাড়। সেই সুন্দর পাড়টি সর্বদাই তো বেষ্টন করে থাকতো তার সুন্দর মুখটাকে ঘিরে।

মুখটা কি খুব সুন্দর ছিল শুক্তির?

সংবরণ জানেন না।

সংবরণ তো তার সেই ছবিটাও হারিয়ে ফেলেছেন। শুধু সাগরের কাছে শুনেছিলেন সে মুখ অনির্বচনীয়।

অনির্বচনীয়কে কি রেখায় বন্দী করা যায়? লেখায় ফোটানো যায়? লাবণ্যকে কি নিখুঁৎ বর্ণনায় বোঝানো যায়?

তবে?

সংবরণ কি বৃথা শ্রম করছেন?

বড্ড বেশী কাটাকুটি।

সংবরণ চৌধুরীর পাণ্ডুলিপিতে কাটাকুটি দৈবাৎ, অথচ এই সামান্য কখানা পৃষ্ঠা বিদারণ রেখায় একেবারে ক্ষত বিক্ষত।

নিজেরই অবাক লাগল সংবরণের।

অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন একখানা পাতা তুলে ধরলেন চোখের সামনে।

.....রূপকথার গল্পে উপকথার গল্পে কতরকমই শোনা যায়। মন্ত্রবলে মানুষ অদৃশ্য হয়ে গেল, পাখী হয়ে গেল, মাছ হয়ে গেল, গাছ হয়ে গেল, আবার মায়া সরোবরের জলে ডুব দিয়ে এসে কুরূপ সুরূপ হয়ে গেল, বুড়ো যুবো হয়ে গেল, বোবার বোল ফুটল, কানার চোখ ফুটল, আরো কত কী ই না আছে গল্পে। হায় জীবনে যদি তার ছিটে ফোঁটাও হতো। কোন একটা মন্ত্র পড়তাম কি মাথায় একটা ভস্ম গুঁড়ো মাখতাম আর সঙ্গে সঙ্গে এই বাইরের খোলসটা উপে যেত আমার।

মিলিটারী ডাক্তারের বৌ হঠাৎ যেত হারিয়ে, আর হঠাৎই পাড়ার খেলার মাঠে, গলির মোড়ে ছোট একটা মেয়েকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত। মেয়েটাকে কেউ চিনতে পারত না, বলতো, 'তুমি কে বল তো? কাদের মেয়ে?'

মেয়েটা হেসে কুটি কুটি হয়ে চুল দুলিয়ে ছুটে পালাতো! তারপর মেয়েটা লাল লাল মুখ একটা ছেলেকে ডেকে বলতো, 'এই তোর নাম কি রে?'

ছেলেটা নিশ্চয় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো ওই মেয়েটাকে অগ্রাহ্য করতো, নিশ্চয় নেহাৎই অবহেলায় নামটা বলতো। তখন মেয়েটা আবার হেসে কুটি কুটি হতো, 'সাগর! সাগর! সাগর আবার একটা নাম নাকি?'

ছেলেটা রেগে আগুন হতো, 'নাম নয়? সাগর মানে সমুদ্র তা জানিস? 'সমুদ্রগুপ্ত' নামে একজন রাজা ছিলেন তা জানিস?

সাগরের রাগ দেখে ও আবার হেসে উঠতো।

সংবরণ আবার কলম কামড়ালেন।

খুব কি খাপ খাচ্ছে?

...টারী ডাক্তারের বৌয়ের খাতাটা যদি অমন নষ্ট না হতো, যদি সাগর দেখতো সে খাতা। আর সেই বৌ যদি দেখতো তার বেনামীতে লেখা এই হিজিবিজি! সে কি সংবরণের এই লেখা সংশোধন করতে আসতো? বল তো, 'এ তুই কি লিখেছিস? ধ্যেৎ!'

হয় তো বলতো।

কিন্তু সাগর তো দেখেনি সে খাতা! আর কেউ দেখেনি সংবরণের লেখা। সংবরণের লেখা তবে সংশোধন করতে আসবে কে? লেখক সংবরণ আবার আত্মস্থ হলেন, ভাবলেন শুক্তি আর সাগরের কাহিনী আমায় শেষ করতে হবে।

মিলিটারী ডাক্তারের বৌ শুক্তি। 'ষোলো সুখের' মধ্যে বসে থেকে যে দুম্ করে একদিন বিষ খেয়ে বসেছিল।

কিন্তু শক্তি বিষ খেতে চায়নি।

শুক্তি শুধু ছেলেমানুষ হয়ে যেতে চেয়েছিল। শুক্তি সেই সাগর বলে ছেলেটার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে লাট্টু ঘোরাতে চেয়েছিল, মার্বেল খেলতে চেয়েছিল, ঘুড়ি ওড়াতে চেয়েছিল। কিন্তু একাল সেকাল নয়। একালে রূপকথার গল্প সত্যি হয় না। তাই শুক্তির খোলসে ঢাকা সেই মুক্তো কণাটুকু ক্রমশঃ শুকিয়ে কঠিন হয়ে উঠতে থাকে।

তার সেই হিজিবিজি কাটা খাতার পাতায় মাঝে মাঝে সেই কাঠিণ্যের ছাপ।

... ...

...সক্কাল বেলা আমি গঙ্গাস্নান করে এলাম। গাড়ি নিইনি, সুখীর মাকে সঙ্গে করে চলে গিয়েছিলাম পায়ে হেঁটে।....ননদ বলল, 'মা গঙ্গার হঠাৎ এমন কপাল জোর যে!'

বললাম 'রাতে স্বপ্ন দেখলাম গঙ্গায় ডুব দিচ্ছি আর মুঠো মুঠো সোনা পাচ্ছি, তাই লোভে পড়ে ছুটে ছুটে গেলাম।'

ননদ চোখ গোল করে বলল, 'স্বপ্ন দেখলে রাতে না ভোরে?'

ওকে নাচাতে ইচ্ছে হল। বললাম 'ঠিক ভোরে নয় এই শেষ রাত্রে।'

ননদ চমকে বলল, 'শেষ রাত্তিরই তো মোক্ষম সময় বৌ। তা তুমি একটু গভীর জলে নেমেছিল তো? না কি পৈঁঠেয় বসেই ঘটি করে জল তুলে মাথায় ঢেলেছ?।......বললাম 'ওমা সে কি, কতখানি চলে গেলাম! গলা জল, আর একটু হলেই নাক পর্যন্ত ডুবে যেত।'

'তা' ডুব দিতে বসে মাটি হাতড়েছিলে?' চকচকে চোখে বলে ওঠে ননদ।

আমি ভুরু তুলে বলি, 'কত! তা এমনি পোড়া ভাগ্য যে যতবারই মুঠো করে তুলি, দেখি মাটি আর বালি, শামুক আর মড়ার কয়লা!'

'দুগ্‌গা দুগ্‌গা!' ননদ শিউরে বলে, 'সধবা মেয়ে মানুষ কোন মুখে উচ্চারণ করলে 'পোড়া ভাগ্যি!' জ্ঞানগম্যি কি আর তোমার কখনো কিছু হবেনা বৌ? ওই মেলেচ্ছপনার জন্যেই স্বপন পেয়েও রতন পেলেনা। আশ্চয্যি, আমি তো ছাই জন্মে এমন স্বপন দেখিনা!'

আহা বেচারা! ওর মুখ দেখে মনে হল ও যদি ডুব দিত, নির্ঘাৎ দু'চার মুঠো সোনা কুড়িয়ে আনতো।.....ননদ চলে গেল! কে জানে গঙ্গাতেই গেল কি না।.... কিন্তু আমি কি ভোর না হতেই মা গঙ্গার কাছে ছুটেছিলাম সোনা কুড়োতে?

নাঃ সোনা কুড়োতে যাইনি আমি, গিয়েছিলাম দাহ জুড়োতো। আমার অগ্নিসাক্ষী করে বিয়ে করা বরের আদরের অগ্নিদাহ যে মাথার চুল থেকে পায়ের নখ অবধি লঙ্কাবাটার জ্বলুনি ধরিয়ে দিয়েছে! সে জ্বলুনি ফ্যানের হাওয়াব ঠাণ্ডা হলনা, ছাতের হাওয়ায় শীতল হলনা, সারারাত ছটফটিয়ে তাই না গিয়েছিলাম মা গঙ্গার কাছে!

শীতল হতেই গিয়েছিলাম, কিন্তু হতে পারলাম কই? সোনা মুঠির বদলে বালি মুঠি তুললাম, বাড়ি ফিরে এলাম। কিন্তু দাহর নিবৃত্তি হচ্ছে না। দেহ থেবে মনে, মন থেকে আত্মায় সঞ্চারিত হচ্ছে ক্রমশঃ।

এ জ্বালা জুড়োবার নয়। জুড়োবে কখন? জ্বালার ওপর জ্বালা ধরবে।......

তবু মাঝে মাঝে ভাবি ভাগ্যিস মাঝে মাঝে ছুটি পাই, ভাগ্যিস মিলিটারি ডাক্তারদের বদলীর নিয়ম আছে!

... .

...লোকে বলে 'বাঁজা?'

আমি বলি 'ভগবানের আশীর্বাদ'।....হ্যাঁ তাই বলি। ভগবান তুমি জানো প্রতি মুহূর্তে এর জন্যে কৃতজ্ঞতা জানাই তোমাকে।..... তবে এই একটা কারণে কৃতজ্ঞতা আমি আমার 'নারায়ণ সাক্ষী' বিয়ের বরকেও জানাই। সেই তো নিমিত্ত। ঈশ্বরের আশীর্বাদটা তো এসেছিল তারই হাত দিয়ে।

বিয়ের কনে, কি বা বয়েস, কিসে কি হয় জানিনা, ওষুধটা দিয়ে বললে

'খেয়ে ফেল'। ডাক্তারের হাতের ওষুধ খেতে আপত্তি হবার কথা নয়, তবে আশ্চয্যি হয়েছিলাম। বলেছিলাম অসুখ নেই ওষুধ খাবো কেন?

ও হেসে উঠেছিল। বলেছিল, 'অসুখ নেই, কিন্তু হতে কতক্ষণ? আগে থেকে প্রতিষেধক দিয়ে রাখলাম। খাও ভাল হবে।'

খেলাম, নাক সিঁটকোলাম, বললাম, 'কিন্তু কোন্ অসুখের ভয়ে? কলেরা বসন্ত টাইফয়েড্ এই সবের জন্যে তো টিকে দেয় দেখেছি আর কোন—'

ও সেদিন আমার দিকে ভয়ঙ্কর একটা কটমটে দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। বলেছিল, 'সবকাজে এইরকম জেরা করা স্বভাব না কি? ওসব আমি পছন্দ করি না। যা বলবো শুনে যাবে, ব্যস! তবে শুনে রাখো, যাতে 'ফিগার' নষ্ট না হয় এ তারই ওষুধ! চিরকাল এই রকম টাইট্ থাকবে।'

জ্ঞানবুদ্ধি ছিল না, পরদিন বৌদিকে বলেছিলাম।

শুনে বৌদি আমার দিকে অনেকক্ষণ ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলনে, 'মুখ্যু বোক নির্বুদ্ধির ঢেঁকি, নিজের হাতে নিজের এই সর্বনাশ করলি?'

ভয় পেয়ে গেলাম।

দারুণ ভয়।

বৌদির ওই দৃষ্টিতে ওই নিঃশ্বাসে ওই কথায় যেন কোন এক ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের ইঙ্গিত! ক্ষীণকণ্ঠে বললাম, 'কেন বৌদি? কী হবে?'

বৌদি সামলে গেলেন। হয়তো আমার বয়েসটা ভেবে করুণা হল, বললেন, 'আরে বাবা, অত ভয় খাবার কিছু নেই, আমি জানি ও ওষুধের কথা। ওতে মাথার চুল সব উঠে যায়।'

'চুল উঠে যায়? সব?'

চোখে জল এসেছিল আমার।

বৌদি বলেছিল, 'না না সব কি আর? তবে ওঠে। যাক তুই মাকে যেন বলিসনি ঠাকুরঝি, ওই সব ওষুধ পত্তরের কথা, মা রেগে যাবেন। 'চুল চুল' করে অস্থির হন মা। কাউকেই বলিসনি, বুঝলি? নতুন বর এত যত্ন করছে, সেটা হাসির কথা।'

না, চুল আমার ওঠেনি।

বৃথা ভয় পাওয়া নিয়ে বৌদিকে ঠাট্টা করেছিলাম। তারপর....... আস্তে

আস্তে বুঝেছিলাম কেন বৌদি 'সর্বনাশা' কথাটা উল্লেখ করেছিল। কিন্তু বৌদি তো আমাকে জানে না, বোঝেই না আমাকে। আমি ওই 'সর্বনাশা'কেই 'সর্বরক্ষে' ভেবেছি। শাপে বর হয়েছে আমার। নইলে তো আমাকে আমার ওই ননদের পিতৃবংশ রক্ষার দায়িত্ব নিতে হতো।

আর, আর হয় তো সাগরের সঙ্গে একক্লাশে পড়তে পারে এত বড় একটা ছেলে থাকতো আমার। থাকতো আরো অনেকগুলো কুচো কাচা। তা'হলে আর খাবার তৈরি করে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে পেতাম না আমি, যাকে ইচ্ছে হবে তাকে খাওয়াবো বলে।

তাই তো ভাবি শাপে বর, ঈশ্বরের করুণা।

সংবরণ চৌধুরী আবার উঠে ঘুরে বেড়ালেন কিছুক্ষণ। ভাবলেন, শুক্তির মনস্তত্ত্ব বোঝবার সাধ্য কি আছে আমার....শুক্তি কি সেই ছোট্টবেলায় ভয়ঙ্কর একটা অক্টোপাসের কঠিন কর্কশ বাহুবন্ধনে বন্দী হয়ে গিয়েছিল বলে, আপন মনের নিটোল মুক্তাটিকে একেবারে লুকিয়ে ফেলেছিল গভীরতার অন্তরালে? তাই আর সেই মনের বয়েসটা বাড়ল না শুক্তির?

কিন্তু এদিকে ক্রমশঃ কেমন করেই যে অমন দুর্বার হয়ে উঠল শুক্তি।

ছুঁচলো গোঁফওলা মিলিটারী ডাক্তারের মুখের ওপর অনায়াসে হেসে উঠতে পারছে, তার বোনকে রাগিয়ে মজা দেখতে পারছে। আর খাতায় লিখছে.....

'আমার ননদটিকে রাগিয়ে দিতে কী মজাই লাগে। আজ ওকে দেখিয়ে দেখিয়ে সাগরের চুল আঁচড়ে দিচ্ছিলাম, দাড়ি ধরে মুখটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, দেখি যে ঘরের বাইরে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে সাপিনীর মত ফুসছে ও।

'তা' রেগে সাগরও যাচ্ছিল।

'আঃ আঃ' করে মাথাটা সরিয়ে নিচ্ছিল। ননদ সেটা দেখে আর থাকতে পারলনা, ঘরের দরজাটা এসে বলে উঠল, 'আচ্ছা বৌ, ছেলেটাকে অমন যন্ত্রনা দিচ্ছ কেন? দেখছ ছটফট্ করছে তোমার কবলমুক্ত হতে?'

আমি হেসে উঠে বললাম, 'শোনো কথা, আমি ওকে কবলে ফেলেছি? হ্যাঁরে সাগর, আমার কবলমুক্ত হবার জন্যে ছটফটাচ্ছিস তুই?'

বলে কিন্তু ভয়ে মরছি, যে হাঁদা ছেলে, এক্ষুণি হয় তো কি একটা কি বলে

বসে ননদের কাছে আমার মুখটা হেঁট করাবে। রেগেই তো যায় আদর করলে। রেগে আগুন হয়ে ওঠে......অথচ আবার দেখ রোজ আসে ঠিক। বেচারার ওপর আমার যেন রাহুর প্রেম। বুঝি তো! তবু ছাড়িয়ে নিতে পারি কই? মিলিটারীরও বোধকরি সেই দশা। রেগে জ্বলে যায়, মনে হয় আমাকে বোধ করি এক্ষুণি গুলি করবে, কিন্তু আশ্চর্যি, করে না। বন্দুক আছে গুলি আছে, তবু কেন নিজেকে সামলায় বুঝতে পারি না। কি করেই বা সামলায়?

আসলে ওরা ভেতরে ভীরু।

ভাই বোন দু'জনেই।

তা' নইলে ওই ননদই কি পারতনা আমায় কোনো রকমে জব্দ করতে? সাহস থাকলে করতো। কিন্তু সাহস নেই। সাহসের মধ্যে শুধু শুনিয়ে শুনিয়ে দুটো কথা।

তা সেই তখন কিন্তু সাগর আমার মুখ রাখল।

বলল, 'ছটফট করতে যাবো কেন? তোমার হাতে চিরুণীর তেল তাই—'

ননদ চলে গেলে বললাম, 'এই পাজী তখন মিছে কথা বললি যে?' ও রেগে উঠল, বলল, 'বলবনা তো কি ওই বুড়ির মনের মতন কথাটি বলব?' আমি বলি, 'কিন্তু তুই ওই বুড়ির ভাইয়ের কাছে অমন ভয়ে কাঁটা হয়ে যাস কেন বল দিকি? পারিস না চোট পাট শুনিয়ে দিতে?'

সাগর কেমন অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে, তারপর আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়ল।

আমার ঝোঁক চেপেছে, বলি 'কেন পারিস না? ভয়টা কি? মারবে? সে ভয় করিস না। সে সাহস নেই ওর।'

সাগর আস্তে বলল, 'সে ভয় করি না। উনি এমন অপমান করা অপমান করা কথা বলেন! সেটাই বিচ্ছিরি লাগে। তোমাকেও যাতা বলবেন তো!'

অপমানের ভয়ে সাগর ওর কথার জবাব দেয় না। নিজের অপমান আমার অপমান। কিন্তু আমার ইচ্ছে করে সে ভয় না করে জবাব দিক সাগর।...... মিলিটারী রেগে যাক, আরো রেগে যাক, রেগে মারুক ওকে, আমি তার নামে আদালতে গিয়ে নালিশ করি। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সবাইকে ডেকে বলি, এই দেখুন, এই ছেলেটা! আর ওই আমার স্বামী। একে নিয়ে সন্দেহ বিষে জর্জরিত হচ্ছেন ইনি।

জজ সাহেব সর্বসমক্ষে খুব কড়া কড়া কথা বলে, বেশ কিছুকাল ঘানি টানায়, বেশ হয়। কিন্তু এ সবের তো কিছু হবে না।......

সাগর পারবে না ওর রাগের মুখে দাঁড়াতে, আর ও পারবে না চরম কিছু একটা করে বসতে। যেই ভয়ঙ্কর একটা রাগের মুহূর্ত আসবে, সেই হঠাৎ 'হেঁ হেঁ' করে হেসে সামলে যাবে।

কতবারই তো দেখলাম রাগিয়ে দিতে চেষ্টা করে। চরম কিছু একটা করে বসে না। বসতে পারে না।

কিন্তু এ কথা কি কেউ বিশ্বাস করবে, আমি চাই আমার স্বামী আমাকে মারুক, গালাগাল করুক, গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দিক।

না বিশ্বাস করবে না।

অথচ সেই ইচ্ছেই হয় আমার।

কিন্তু কেন?

আমি কি তবে পাগল?.....

আচ্ছা এসব আমি লিখি কেন?

আমি মরে গেলে কেউ পড়বে বলে?

কে পড়লে লেখাটা সার্থক হয় আমার?

আমার স্বামী?

আমার আদরের ননদ?

আমার দাদা? বৌদি?

এর তো শুধু একটাই উত্তর পাচ্ছি মনের কাছে, না, না, না!

তবে কি আমি এত কষ্ট করে বসে বসে এত সব লিখছি ওই পুঁটকে ছেলেটার জন্যে?....ও বড় হবে এই আশায়! আমি মরে যাব, ও থাকবে।

ও পড়তে পড়তে অবাক হয়ে ভাববে, 'কিছু নয়'কে দেখে তো বোঝা যেতনা ওর মধ্যে এত কথা আছে, ওর খাতায় এত লেখা আছে। তারপর ভাববে, উঃ কী বোকাই ছিলাম আমি।'

বোকা! সত্যি ভারী বোকা!

একেবারে অবোধ। কিন্তু ওই বোকা বলেই তো মিষ্টি। এত মিষ্টি। সাগর

যদি তার জ্যেঠির ছেলেটার মত পাকা-চোকা হতো, আমি কি সাগরকে এমন করে ভজতাম?

আচ্ছা আমি কি ওর ক্ষতি করছি?

না কি আমার নিজেরই ক্ষতি করছি?

বড় হয়ে ও কি আমাকে ঘেন্না করবে? সাগর বড় হবে। ওর সেই বড় হয়ে যাওয়া চেহারাটা কতদিন কল্পনা করি আমি। লম্বা হয়ে যাওয়া সাহসী হয়ে যাওয়া সত্যিকার বড়। তখন আর কুণ্ঠায় সঙ্কোচে গুটিয়ে থাকবে না ও। ওর সেই দীপ্ত দৃপ্ত মূর্তিটা কেমন না জানি হবে তখন!

কিন্তু আমি?

আমি কি তখন এমনি থাকবো?

এইটা ভাবতে গেলেই কেমন যেন তাল গোল পাকিয়ে যায় আমার।

আমার মনের মধ্যেকার নিটোল মুক্তোটি যতই আমি লুকিয়ে তুলে রেখে থাকি, বাইরের চেহারাটা তো বদলে যাবে আমার! মিলিটারী ডাক্তারের 'ফিগার' ঠিক রাখার ওষুধের মহিমাও আর কোনো কাজ দেবে না।

হয়তো দাঁত পড়ে যাবে, হয় তো চুল পেকে যাবে, হয় তো মুখটা বেচারী বেচারী হয়ে যাবে, সাগর করুণা করবে সেই বুড়িটাকে। হয় তো ওর বৌয়ের সঙ্গে গল্প করতে করতে বলবে, 'উঃ কী খাওয়ানোটাই খাওয়াতেন উনি আমায়, নিজের মাসি পিসিতে অমন পারেনা।'

তা ছাড়া আর কি ই বা বলবে?

খাওয়ানো ছাড়া আর কোন স্মৃতি থাকবে সাগরের?

সাগরের বৌ!

কেমন না জানি হবে সে। ভাবতে গেলে যেন বিশ্বাসই হয় না। ভবিষ্যতের কথা ভাবতে পারিনা আমি, মাথার মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করে। আচ্ছা এত রকম ওষুধ বেরোচ্ছে জগতে, এমন ওষুধ কেউ বার করতে পারে না, যাতে বয়স আর বাড়ে না, যেখানে আছে, সেখানেই একেবারে স্থির হয়ে থাকে?'

যেখানে আছে সেখানেই স্থির হয়ে থাকে!

সংবরণ সামনের একটা সাদা শূন্য দেওয়ালের দিকে তাকালেন; তারপর মনে মনে উচ্চারণ করলেন, আছে বৈকি, সে ওষুধ তো আছেই। আর তুমিও তো শেষ অবধি সে ওষুধের খোঁজ পেয়েছিলে। পেয়েছিলে তাই সেই একটা

বয়সেই স্থির হয়ে আছ তুমি। যে বয়সে তুমি একদিন স্বদেশী মেলা দেখতে গিয়েছিলে।

তোমার সেই—'আধ ঘন্টায় তোলা ফটো' খানা সাগরের কাছে আছে আমি জানি।

ছিলনা, হারিয়ে গিয়েছিল।

সাগরের সেই জ্যেঠা জ্যেঠির বাড়িতে, সাগরের নিজস্ব বলতে সেই যে একটা ভাঙা টিনের বাক্স ছিল, যার মধ্যে সাগরের বাল্যকালের সব সঞ্চয় লুকোনো থাকতো, লাট্টু, লেত্তি, মার্বেল গুলি, গুলতির রবার, চকখড়ি, চকোলেটের রাংতা, আরো সব কত কি হাবি জাবি, সেই বাক্সটার একেবারে তলার দিকে সেই ফটো খানা ছিল তোমার। কিন্তু ও বাড়ি থেকে চলে আসার সময় বাক্স গোছাতে গিয়ে সে ছবি আর দেখতে পেলনা সাগর।

কিন্তু খুঁজে দেখবে কি করে?

কোথায় বা খুঁজবে?

আর কাকেই বা জিগ্যেস করবে? তলে তলে পাগলের মত সারা সংসার হাঁটকেছে। পুরনো পঞ্জিকার, আর পুরনো খবরের কাগজের তলা, লেপ তোষকের চালি, কিছুই খুঁজতে বাকি রাখেনি সাগর। তারপর সাগর কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে তোমায় মনে মনে বলেছে, 'কিছুনয়' দেখছো তো তুমি স্বর্গে থেকে? নিজে আমি অসাবধানে হারিয়ে ফেলিনি। এ ওই পাজীদের কাজ। তোমাকে যারা নিন্দে করে আর আমাকে হিংসে করে, সেই তারা।

সাগরের সেই সন্দেহ যে ভুল নয়, তা জানেন সংবরণ। সাগরের সব কথাই জানেন। সাগরের সব কথাই তাঁর কাছে ব্যক্ত আছে।

অনেক কাল পরে একদিন অজয় এসেছিল সাগরের কাছে সেই ছবি নিয়ে!

প্রথমটা দেখায়নি। বলেও নি।

এসেই বসে পড়ে বলেছিল, 'এক গেলাশ জল দে দেখি।'

অজয়ের মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। রংটা কালি পড়া, বেশভূষা একেবারে হাড় লক্ষ্মীছাড়ার মত আর বুকটা যেন একটা সরু কাঠিতে গড়া পাখির খাঁচা।

দেখে মায়া না হয়ে পারে নি সাগরের। চাকরকে ডেকে এক গ্লাস জল তাড়াতাড়ি আনিয়ে দিয়েছিল।

জলটা এক নিঃশ্বাসে শেষ করে অজয় বলে উঠেছিল, 'বিয়ে টিয়ে আর করলি না তা হলে? ধ্যেৎ! এত পয়সা কড়ি করলি বিয়ে না করার হেতু?'

সাগর একটু হেসে বলেছিল, 'আমি বিয়ে করা না করায় তোমার লাভ ক্ষতি কি?'

'কি আর!' অজয় বলেছিল, 'একটা গেরস্থ বাড়িতে এলে তবু একটু আদর আপ্যায়ন পাওয়া যায়। তোর বৌয়ের আমি তো আবার ভাসুর হতাম, যাকে বলে গুরুজন। অবিশ্যিই আদর যত্ন করতো। জল চাইলে শুধু এক গেলাশ জল ঠেকিয়ে দিত না।'

সাগর লজ্জিত হয়ে চাকরকে দিয়ে খাবার টাবার আনিয়ে দিয়েছিল। তারপর অজয় আসল কথাটি পেড়েছিল, 'কিছু টাকা ছাড় দিকি?'

'টাকা!'

'হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ। বড় টাইট যাচ্ছে। সিগারেটের বদলে বিড়ি চালাচ্ছি, তবু কুলোতে পাচ্ছি না। বৌ তো রাতদিন ঝাঁটা ধরে বসে আছে। তা টাকাটা অমনি নেবনা তোর কাছে, একটা দুর্লভ বস্তুর বদলে—'

সাগর ভুরু কুঁচকেছিল, আর অজয় পকেট থেকে বার করেছিল সেই অনেক দিন আগে হারিয়ে যাওয়া ফটোখানা!

কিন্তু সে ফটোর কি কিছু ছিল আর?

মেলা তলায় 'আধ ঘন্টায় ফটো নিন' এর সেই ফটো কবেই ঝাপসা হয়ে গেছে, বিবর্ণ হয়ে গেছে।

শুধু যেন একটা বিষণ্ণ করুণ ছায়াকে সেই কাগজ খণ্ডটুকু বেষ্টন করে আছে।

মুহূর্তের জন্য প্রচণ্ড একটা ভূমিকম্পের আলোড়ন উঠেছিল সাগরের মধ্যে, তারপরই স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থেকেছিল সে সেই বিষণ্ণ ছায়াটার দিকে।

অজয় কথাটা বিশ্রী হাসি হেসে বলেছিল, 'গোটা পঞ্চাশ হবে না?....তোর কাছে তো বাবা এ ছবির দাম আছে। যাকে বলে প্রথম প্রেম—'

'চুপ' বলে থামিয়ে দিয়েছিল সাগর। ওর মুখ দেখে হঠাৎ অজিতও একটু ভয় খেয়ে গিয়েছিল।

বোকার মত বসে বসে গাল চুলকেছিল কিছুক্ষণ, তারপর বলেছিল 'মিথ্যে বলবনা সাগর, কালে ভবিষ্যতে কখনো তোর কাছে প্যাঁচ্ কসে কিছু বাগাবো

এই আশায় ছবিটা তোর বাক্স থেকে চুরি করেছিলাম আমি। তারপর ভুলেই গিয়েছিলাম। সেদিন হঠাৎ বৌ কি যেন গোছাতে গোছাতে বার করল, বলল 'কার ছবি?'

'কেড়ে নিয়ে বলে এলাম ও আমাদের এক বৌদির ছবি। আর কি বলি বল? তা যাক গে, গোটা পাঁচেক টাকা না হয় এমনিই দে, ভাই, তোর তো এখন অভাব নেই।'

সাগর আলমারি খুলে পঞ্চাশটা টাকাই বার করে দিয়েছিল। অজয় কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আস্তে তুলে নিয়ে পকেটে পুরে ভয়ে ভয়ে বলেছিল, 'ছবিটা নিবি না?'

সাগর ঠোঁট কামড়ে বলেছিল, 'নেওয়া আর না নেওয়া, ওতে আছে কি? থাক গে রেখে যেতে পারো।'

রেখে গিয়েছিল অজয়।

সাগর সেই ছবিটাকে সামনে রেখে অনেকক্ষণ বসেছিল। আর ভাবছিল অজয় ভুলে গিয়েছিল, কিন্তু আমারই কি মনে ছিল? হয় তো সেই অভিমানেই ছবিটা অমন ঝাপসা হয়ে গেছে, ধূসর হয়ে গেছে। সে রাত্রে সাগর ঘুমোতে পারেনি।

সাগরের সেকথা সংবরণ জানেন।

কিন্তু ঘুমোতে না পারা আর কি?

লেখক সংবরণ চৌধুরীও তো রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে কাটান।

শুক্তির খাতায় আবার ফিরে গেলেন সংবরণ। খাতা নয়, খাতার ভগ্নাবশেষ। তবু—তাই। যা আছে, আর যা থাকতে পারতো, তাই নিয়েই তো মানুষের সব কিছু। 'জীবন খাতার অনেক পাতাইতো শূন্য' থাকে, থাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। 'আপন মনের ধেয়ান' দিয়েই তো তার পরিপূর্ণতা।

শূন্যতাই তো পূর্ণতার ধারক।

তাই মিলনের চেয়ে বিরহে পূর্ণতা।

মিলন প্রতি মুহূর্তে নিজেকে ক্ষয় করে, বিরহ প্রতিটি মুহূর্তে নতুন করে সৃষ্টি করে চলে। মিলন তোমাকে হরণ করে নেয়, বিরহ তোমাকে পূরণ করে দেয়।

মিলন শুধু প্রিয়জনের ভগ্নাংশটুকু তোমার চোখের সামনে মেলে ধরে, বিরহ পুরো মানুষটাকে তোমার কাছে ধরে দেয়।

শুক্তি যদি সেই ওষুধটার সন্ধান না পেত।

যে ওষুধটা শুক্তিকে একটা বয়সেই স্থির রেখে দিয়েছে। তা হলে কি হতো? তা হলে—হয়তো শুক্তি—সেই ধীরে ধীরে ফুরিয়ে যাওয়া শুক্তি আস্তে আস্তে মুছে যেত সাগরের মন থেকে। ওই ফটোটার মতই ঝাপসা হয়ে যেত, ধূসর হয়ে যেত।

কিন্তু শুক্তি জীবনের উপর মর্মান্তিক একটা রেখা টেনে দিয়ে নিজেকে বিরহের ঘরে জমা দিয়ে রেখে গেছে। সে ঘর থেকে মুছে যায় না কেউ। সে ঘর কখনো কপাট বন্ধ করে বসে থাকে, কখনো কপাট খুলে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

সেই কথাই বুঝি লিখে রেখে গেছে শুক্তি।

কিন্তু সেদিনও কি শুক্তির কথাটা সমান পরিস্কার থাকা উচিত ছিল? তাই এত খুঁটি নাটি লিখে রাখতে পারবে?

ঘড়ির দিনের কথা তার আগের দিনের কথা। এগুলো বরং বেশী পরিস্কার। শুক্তি কি ভেবেছিল ওর ডায়েরিটা কেউ ছাপিয়ে দেবে?

কিন্তু এতো লেখক সংবরণের গড়া শুক্তি।

খাতাটাকে আলোর আরো কাছাকাছি নিয়ে এলেন সংবরণ।

দেখলেন শুক্তির মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ প্রশ্ন চিরে চিরে ফেলছে শুক্তিকে।

....'আমি কি খুব খারাপ? হিন্দু শাস্ত্রে কি আমার মত মেয়েকেই 'অসতী' বলে? নইলে তিন বছর পরে স্বামী বাড়ি ফিরল আমার, তবু কিছুতেই কেন 'আহ্লাদ' খুঁজে পাচ্ছি না। কেন মনে হচ্ছে ওর এই খবর না দিয়ে হঠাৎ চলে আসাটা নীচ, কুৎসিত ইতরতা।

তবু বাড়িতে খুব একটা জমজমাট ঘটা লেগে গেল বৈ কি! লাগাতে হল। বাড়ির কর্তা এতদিনের পর বাড়ি ফিরেছে।

সাগর যদি এই ঘটার মধ্যে এসে না পড়তো।

সাগরকে ঘড়িটা দিয়ে আমি ভুল করেছিলাম।

আমার বোঝা উচিত ছিল।

সাগরকে যদি আমি 'পুষ্যি' নিতাম সাগরের সঙ্গে যদি আমি ধর্ম ভাই'

পাতাতাম, অনায়াসে দিতে পারতুম। তা' হলে ঘড়িটা আবার আমার টেবিলে এসে আছড়ে পড়তনা।.......

সাগরের সেই মুখ দেখে বুকটা ফেটে গিয়েছিল আমার। তখন মনে হয়েছিল, আমার ননদ হয়তো ঠিকই বলে। আমার কবলে পড়ে ও খালি যান্ত্রণাই পাচ্ছে।

কিন্তু সাগরের চোখের মধ্যে আমি আজ বিদ্যুতের জ্বালা দেখেছি। যে জ্বালা শুধু যৌবনের ঘরেই মজুৎ থাকে।

সাগর কি তবে সহসা 'বড়' হয়ে উঠল?

সাগর কি এবার সব কিছু বুঝতে পারবে? ওর তেজ দিয়ে ওর শক্তি দিয়ে আর একজনকে বহন করবার ক্ষমতা হবে ওর? আশ্রয় দেবার সাহস?

... ...

আমি কি তবে এখন সাহস করে বলতে পারবো 'দেখ, সাগর আমার জন্যে তো তুই এযাবৎকাল নিন্দেকে শিরোভূষণ করেছিস, আরও একটু নিন্দে কুড়োতে পারবি না? এই অশোকবন থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারবি না আমাকে?'

... ...

মিলিটারী ডাক্তার আজ আর আমাকে রাগাবে না, আজ আমাকে তোয়াজ করতে চেষ্টা করবে। তিন বছর পরে এসেছে ও, আজ সেটা উসুল করতে চাইবে। তাই আজ আমায় বলেছে ও, 'রান্না বান্নার আয়োজনটা তো ভালই করছ, তোমার দাদাকে আর বৌদিকে খেতে বলে পাঠাও না।'

কথা বাড়াব না। তাই আমি শুধু বললাম 'ওরা এখানে নেই।' কাশী গেছে।

ডাক্তার বিশ্রী একটা হাসি হেসে বলল, 'তা' তোমার আর যদি কোনো বন্ধু বান্ধব থাকে বল না? আমোদ আহ্লাদ কর একটু।'

বললাম, 'আমার কোনো বন্ধু নেই।'

ও আমার খুব কাছে সরে এল। ও যা খেয়েছে, যা খায়, তার গন্ধ পেলাম।

সরে এসে বলে উঠল, 'আই সি! তাই না কি? এই হতভাগ্যই তা হলে তোমার একমাত্র বান্ধব? শুনে বড় আনন্দ পাচ্ছি।'

বললাম, 'নিজের ওপর তো খুব আস্থা তোমার। আমি তো জানি তুমিই আমার একমাত্র শত্রু! পরম শত্রু।'

শুনে ও টেনে টেনে হাসতে লাগল।

বোধ হয় ভাবতে চেষ্টা করল আমি ওর সঙ্গে মজার একটা ঠাট্টা করছি। ও আসা মাত্র আমি চাকর বাকরকে তম্বি করে হৈ হৈ তুলেছি, মুরগী রাঁধানোর ব্যবস্থা করেছি, এটা ওকে নিশ্চয়ই অভিভূত করেছে.....

আচ্ছা এখনো পর্যন্ত ওর দিদি ওর কাছে এই তিন বছরের ঘটনাবলী বিবৃত করছে না কেন? চুপি চুপি ফিস্‌ফিসিয়ে? জপের মালা হাতে নিয়ে ওই তো কাজ ওর! তবে দোষ আমি দিতে পারি না আমার ননদকে। আজীবন বৈধব্য জ্বালায় জ্বলছে ও। ওর কাছে উদারতা আশা করবো কেন?

কিন্তু ওর ভাই?

ও তো বঞ্চিত নয়, ভাগ্য বিড়ম্বিত নয়।

ওর মধ্যে যদি ছটাক খানেক সভ্যতা ভব্যতা উদারতা থাকতো!

... ...

সাগরকে আমি 'দূর দূর' করে তাড়িয়ে দিলাম। আমার বাড়ির চৌকাঠ ডিঙোতে বারণ করেছি।......কেন করবো না? ওই ডাক্তারের মুখের ওপর মারবার জন্যে আর কোন্ চাবুক ছিল আমার?

সাগর চলে গেলো!

সাগর আর কখনো এ বাড়িতে আসবে না। সাগর বলে গেছে 'আসতে আমি চাই ও না। নিজেই সেধে সেধে—'

সত্যিই কি একথা সাগরের মনের কথা? না না, অসম্ভব। সাগর শুধু নিতান্ত অপমানে আর অভিমানে—'

হাতের কলমটা আস্তে ঠুকতে ঠুকতে সংবরণ সাগরের 'মনের' কথাটাই ভাবতে চেষ্টা করলেন।

সাগর কি ওই শুক্তিকে তার জীবনের শনি ভাবত? তাই তো ভাবা উচিত ছিল। জীবনের প্রারম্ভ থেকে সাগর তো ওই শুক্তির জন্যে শুধু লাঞ্ছিত হয়েছে, নিন্দিত হয়েছে, নির্যাতিত হয়েছে, অপমানিত হয়েছে। আর পরে, বড় হয়ে?

বড় হয়ে কি হল, তা ও জানেন বৈ কি সংবরণ। সাগরের কোন কথাটাই বা না জানেন? বড় হয়ে ওঠার পর, সাগর যখন বহু কর্মের ঘাটে ঘাটে ঘুরছিল, সাগরের মায়ের রোগজীর্ণ দেহটা তখন একটু হাঁফ ফেলবার আশায় উদগ্রীব। যেন সাগরের ভারটা কারো হাতে তুলে দিয়ে সেই নিশ্চন্তুতার নিঃশ্বাসটা ফেলতে চান তিনি।

তখন 'সাগর তোর কনে দেখি', এই হল বুলি। ঝুমিও শ্বশুরবাড়ী থেকে

এসে এসে যোগ দিত। 'দাদা, ভেবেছ কি তুমি? মাকে একটু শান্তি দেবেনা? চিরকাল মা খেটে খেটে সারা হবেন? এক ঘটি জল দেবার লোক হবেনা কখনো?'

সাগর একটা রাঁধুনী ধরে এনে দিয়েছিল। গিন্নী বান্নী—বিধবা বামুনের মেয়ে!

দেখে সাগরের মা রেগে কেঁদে হাট বাধিয়ে হঠাৎ বলে উঠেছিল, 'তার মানে তুই জীবনে আর বিয়ে থাওয়া ঘর সংসার করবিনা? সেই লক্ষ্মীছাড়ী, ধর্মখোওয়ানো, কালনাগিনী মেয়েমানুষটার জন্যেই জীবনটাকে বরবাদ দিবি?'

সেদিনে সাগর হঠাৎ তার চিরকালের স্বভাব ত্যাগ করে ক্ষেপে গিয়েছিল। বলেছিল, 'ভদ্রলোকের মেয়ের মত কথা যদি বলতে না পারো তো, আমার সঙ্গে আর কোনোদিন কথা বলতে এসো না।'

অন্যায় হয়েছিল সাগরের, খুব অন্যায় হয়েছিল। সাহিত্যিক সংবরণ বারবার সাগরকে বলেছেন একথা তাঁর সাহিত্যের দৃষ্টি দিয়ে, সত্যের দৃষ্টি দিয়ে।

'তোমার মার কাছ থেকে এ ছাড়া আর কোনো কথা শোনবার আশা করা তোমার উচিত হয়নি সাগর। তাঁর জীবনে তুমিই তো ছিলে একমাত্র সম্পদ একমাত্র আলো। তুমি তাঁর সেই আলোটিকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলবে, সেই আলো থেকে আর এক আলো জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে তোমার সেই অল্প বয়সে মৃত পিতার বংশধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে অফুরন্ত প্রাণপ্রবাহের ধারায়, এ আকাঙ্খা তো করবেনই তিনি।

তুমি তাঁর সেই বহুদিন লালিত আকাঙ্খাকে কঠিন আঘাতে ধূলো গুঁড়ো করে দিলে। আর—

সংবরণ ঈষৎ আবেগে ভাবলেন, আর আরো একটা বস্তুকে ও তাঁর ভেঙে গুঁড়ো করে দিয়েছিলে তুমি সাগর। সে বস্তু হচ্ছে তোমার ওপর তাঁর বিশ্বাস। তোমার সম্পর্কে বহুজন বহুকথা বলেছে, ডাক্তারের স্ত্রীর সঙ্গে তোমার নাম জড়িয়ে ছি ছি কারের আর অন্ত রাখেনি, তিনি তাতে বিচলিত হয়েছেন, আহত হয়েছেন, ধাঁধাঁর মধ্যে পড়ে 'কী, এ কী?' ভেবে দুশ্চিন্তায় কাতর হয়েছেন, কিন্তু তোমাকে কখনো সত্যিকরে সন্দেহ করেননি। বিশ্বাস হারান নি তোমার ওপর।

যারা তোমাকে অবিশ্বাস করেছে, ক্রুদ্ধ হয়েছেন তাদের ওপর। তিনি তোমাকে শিশু ভেবেছেন, পবিত্র ভেবেছেন, নির্মল ভেবেছেন।

সেই বিশ্বাসের ঘর ভেঙে দিলে তুমি।

উনি তবে কেন বলবেন না, 'এখন বুঝছি সেই মায়ের বয়সী মেয়ে মানুষটার সঙ্গেই তুমি—'

সংবরণ জানেন কথা শেষ করতে পারেননি সাগরের মা। গলা ভেঙে গিয়েছিল ওঁর। বুকটাও ভেঙে গিয়েছিল।

আর কোনো দিন বিয়ের কথা বলেননি তিনি সাগরকে। তার কিছুদিন পরেই মারা গিয়েছিলেন। সাগরের জীবনে এই এক নিষ্ঠুর অভিশাপ। তার একান্ত আপন জনের মৃত্যুর কারণ সে নিজে।

মিলিটারী ডাক্তারও তো বলতে ছাড়েনি সে কথা। সেই সেদিনই বলেছিল.....'তোমাকে আমার গুলি করে মারতে ইচ্ছে হয় কেন জানো? কেন ইচ্ছে হয় কুকুর দিয়ে খাওয়াতে? জানোনা? ওই মহিলাটির মৃত্যুর কারণ হচ্ছ তুমি। বুঝলে? এই তুমি।.....নইলে তিনি এভাবে মারা যেতেন না। লড়ায়ে মেয়েমানুষ ছিলেন তিনি, লড়তেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লড়তেন।....কিন্তু তুমি তাঁর সেই লড়াইয়ের শক্তিটি নষ্ট করে দিয়েছিলে। বাইরের এই পরম শত্রুটিকে ছেড়ে শেষ অবধি মনের সঙ্গে লড়াই করতে সুরু করলেন।।.......তার পরিণাম দেখতেই পেলে।.....তবু দেখ তোমায় আমি গুলি করে মারলাম না, কুকুর দিয়ে খাওয়ালাম না, ক্ষমা করে ফেললাম। বুঝলে? বিশ্বাস করছ? আমি তোমায় ক্ষমা করে ফেলেছি।.....কিন্তু বড় আক্ষেপ বয়ে গেল 'লাভার'— আমার এই মহানুভবতা সেই মহিলাটিকে দেখানো হল না।'

তখন সাগর সে কথা শুনে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। চেঁচিয়ে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে হয়েছিল সাগরের। বলতে ইচ্ছে হয়েছিল 'কেন, কেন! কেন তবে দেখাওনি? তোমার এই মহত্ত্বর এক কণা দেখতে পেলেও হয়তো সেই প্রাণটা অমন করে চলে যেত না।

কিন্তু পরে সাগর নিজের সে ভুল বুঝতে পেরেছিল।

ওই অনুতাপদগ্ধ মাতালের 'মহত্ত্বে'র সাধ্যও ছিলনা সে প্রাণকে রক্ষা করে....সেই প্রাণের ইতিহাস জেনেছিল সাগর।......ওই টুকরো কাগজগুলোর মধ্যে টুকরো টুকরো হয়ে যা ছড়িয়ে ছিল, যা সংবরণের কলম পূর্ণতার রূপ দিতে চেষ্টা করেছে। তা অখণ্ড হয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছিল ছোট্ট একখানা চিঠির মধ্যে।

লাইন কয়েক চিঠি।

যে চিঠিটা সাগরের মনের মধ্যে তাতানো সীসের অক্ষর দিয়ে ছাপা

আছে।.....টুকরো কাগজগুলো বলেছে.....'ওদের এত নিন্দে করি, ওই দুটি ভাইবোনকে। কিন্তু ওরা যদি খুব ভাল হতো, আমার কিছু লাভ হতো? আমার জীবনের গতি বদলাতো তাতে?....সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করতাম আমি, পাকা মাথায় সিঁদুর পরে?

তা' হত না।

তা' হয় না।

অপরের সঙ্গে আপোস চলে, নিজের সঙ্গে আপোস চলেনা।

... ...

কিন্তু শুক্তির কথা, সাগরের কথা, সংবরণের কথা, এমন একাকার হয়ে যাচ্ছে কেন আজ?

বহু যুগের বিস্মৃতির ঢেউ ঠেলে শুক্তি কেন উঠে এল মৎস্যকন্যার মত?

ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের মোড়ে সহসা যেদিন সেই মিলিটারী ডাক্তারের ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল, সেদিনও তো কই এমন একাকার হয়ে যায়নি? সেদিন তো সংবরণ দূরে থেকে দেখতে পেরেছিলেন সাগরকে, শুক্তিকে, তার বরকে।

ট্যাক্সীর জন্যে দাঁড়িয়েছিল লোকটা।

ঠিক একটা বুড়ো এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানের মত দেখাচ্ছিল তাকে।.....বুড়ো আর দুঃস্থ।

মিলিটারী ডাক্তারের প্যান্টের পায়ে কেন সুতো ঝুলছে, আর খাকি বুশ কোটটার বুক পকেটের কোণ দুটো কেন ছিঁড়ে ঝুলছে, ভেবে পাননি সংবরণ। নিজের গাড়ি থেকে হঠাৎ নেমেই বা পড়েছিলেন কেন সেটাও ভেবে পাননি।

হয়তো অজ্ঞাতসারেই নেমে পড়েছিলেন। খোলা-বোতাম শার্টটার পিছন থেকে লোকটার লোমশ বুকটা দেখা যাচ্ছিল।......

সংবরণ অবাক হয়ে ভেবেছিলেন, কত বয়েস হয়েছে ওঁর? বুকের লোমগুলো পেকে যাবার মত বয়েস?

'কোথায় যাবেন?'

জিগ্যেস করেছিলেন সংবরণ।

লোকটা অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। ঝাপসা ঝাপসা গলায় বলে উঠেছিল, 'আপনি কে? আপনাকে তো—'

না, আমাকে চিনবেন না।' বলেছিলেন সংবরণ। 'চিনবার দরকারই বা কি? কোথায় যাবেন বলুন, পৌঁছে দিচ্ছি।'

'পৌঁছে দেবেন? আমি যেখানে যাবো আপনি সেখানে আমায় পৌঁছে দেবেন?' লোকটা ভয়ানক একটা সন্দেহে চোখটা বিস্ফারিত করে বলেছিল, 'কেন বলুন তো?'

'এমনি!'

'এমনি! এমনি আপনি রাস্তা থেকে জঞ্জাল কুড়িয়ে তাকে তার ডাষ্টবিনে পৌঁছে দেবেন?' লোকটা হঠাৎ ভীষণ ভাঙা ভাঙা গলায় জোরে হেসে উঠেছিল।

আর শুনে সংবরণের মনে হয়েছিল লোকটার এত বিকৃতি ঘটেছে, কিন্তু বলার ভঙ্গী আর হাসির ধরণের একেবারে বিকৃতি ঘটেনি কেন?

'হাসছেন কেন?'

বলেছিলেন সংবরণ।

ডাক্তার হাসতে হাসতেই বলেছিল, 'হাসব না? এমন মজার বোকামী দেখে হাসব না? বলি আমাকে দেখে কি খুব একটা খানদানী লোক বলে মনে হচ্ছে আর এখন? তাই পৌঁছে দেবার লোভ দেখিয়ে 'কিডন্যাপ' করে নিয়ে পালাবেন?....কিচ্ছু নেই মশাই কিচ্ছু নেই। পকেট একেবারে গড়ের মাঠ!'

সংবরণ বলেছিলেন, 'আপনার পকেটের দিকে লক্ষ্য করছি একথা ভাবছেন কেন?'

ডাক্তার হেসে উঠেছিল।

হা হা করা ওর সেই প্রচণ্ড হাসি।

'বলি মশাই, তার উল্টোটাই বা ভাববো কেন? এ জগতে তো ওইটাই দেখে আসছি!'

সংবরণ বলেছিলেন, 'দেখাটাই যে সব সময় ঠিক হয় তার মানে নেই। যাদের চোখই বাঁকা তারা উল্টো দেখে, ভুল দেখে।'

বুড়ো তার ক্ষীণ দৃষ্টিটাকে তীক্ষ্ণ করেছিল। ভুরু তুলে বলেছিল, 'কথাগুলো তো বেশ জমকালো দেখছি। মানুষটা কে মশাই আপনি? দেশ নেতা? না অভিনেতা?'

'আমি কিছুই নই। আসবেন তো বলুন। নইলে অগত্যা চলেই যাবো।'

'আহা-হা, রাগ করছেন কেন? চলুন চলুন। বুড়ো লোকটা রাস্তায় হাপিত্যেস

দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে কেউ হৃদয়দরজা খুলে তাকে তুলে নিচ্ছে, এ দৃশ্য তো দেখিনি কখনো।......বিশ্বাস করতে দেরী লাগছে।'......

'কোন দিকে যাবেন?'

'চলুন। চলুন বলে দিচ্ছি। খুব একটা রাজকীয় পাড়ায় তো থাকি না।'......

লোকটাকে তার আস্তানায় পৌঁছে দিয়েছিলেন সংবরণ। 'আস্তানা' ছাড়া আর কিছুই নয়। ভাঙা নড়বড়ে একটা কাঠের সিঁড়ি দিয়ে আধতলা মত উঠে গিয়ে কাঠের ঘর একখানা। মাঠ কোঠারই আর এক সংস্করণ।

লোকটা বলেছিল, 'কেন যে আপনি আমায় এত যত্ন করে পৌঁছে দিয়ে গেলেন জানিনা মশাই। মানুষের মধ্যে যে দয়া ধর্ম আছে এখনো বিশ্বাসই হয় না। তাও আবার মাতালকে দয়া।.....তা আমার উচিত ছিল আপনাকে এককাপ চা অফার করা, কিন্তু নেই নেই কিছু নেই। সব লবডঙ্কা! তবু বিশ্বাস করুন মশাই, আমারও একদিন সব ছিল। ঘর বাড়ি সুন্দবী স্ত্রী।......তা রইল না। মরে গেল!'

সংবরণ বলেছিলেন, 'আমি যাই এবার!'

'যাবেন? তা যান!'

লোকটা একটা বড়সড় নিঃশ্বাস ফেলেছিল। 'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন কত কালের চেনা! যেন গভীর একটা সম্পর্ক ছিল।..... এ রকম কি করে হয় বলুন তো?'

সংবরণ চলে এসেছিলেন, বলেছিলেন 'বোধ হয় পূর্বজন্মে দেখে থাকবেন।'

আর কি বলবেন?

ওকে কি বলবেন, 'সাগরকে তো চিনতে তুমি? সাগরকে আমি জানি।' বলবেন,—'তোমার সবই ছিল, ছিল না শুধু বুদ্ধি। ছিল না মমতা! ছিল না রুচি।'

তাই তোমাব সবই গেল।

তোমার সেই মস্ত বাড়িটা তো এখনো রয়েছে, যে কিনেছিল সে সাত টুকরো করে ভাড়া দিয়েছে।.....যে দরজাটায় দাঁড়িয়ে থাকতো তোমার সেই সুন্দরী স্ত্রী, যেখানে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে একটা পথ চলতি ছেলের হাত খপ করে ধরে ফেলে বলতো 'এই পাজী, পালাচ্ছিস যে?' সেই দরজাটা ভেঙে চওড়া করে ওঁরা গ্যারেজ বানিয়েছে।.......

মানে হয় এসব বলবার?

বলেন নি।

চলে এসেছিলেন সংবরণ।

মাতালটা বসে পড়ে বলেছিল, 'আপনি কিন্তু মশাই বড় ফ্যাসাদে ফেলে গেলেন আমাকে! ঘুমুতে পাবো না। সারারাত জেগে বসে ভাবতে হবে আপনাকে কোথায় দেখেছি!'

সে রাত্রে কেন কে জানে সংবরণেরও ঘুম হয়নি।

কেন? মানুষের পরিণাম দেখে?

কিন্তু ওই পর্যন্ত।

তার বেশী নয়।

সেদিনও দূরে থেকে দেখতে পেরেছিলেন। আজকের মত এমন সব একাকার হয়ে যায় নি।

সকাল হয়ে এসেছিল।

কতকগুলো এলোমেলো কাগজের গোছা, যা দীর্ঘকাল ধরে শুধু এলোমেলোই থেকেছে, যাকে পঞ্চাশখানা বইয়ের লেখক সংবরণ চৌধুরীও কোনো দিন গুছিয়ে লিখে তুলতে পারেননি। পারেননি তাকে একটা কাহিনীর রূপ দিতে, সেইগুলোকে আবার তুলে ফেললেন এলোমেলো করেই। তারপর বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।

পূবের বারান্দা।

এই বারান্দাটিই এই সম্পদ এ ঘরের, পরম ঐশ্বর্য!

এখানে থেকে ভোরের আকাশ দেখা যায়। যে আকাশে বহু বিচিত্র রঙের মেলা বসে, আর তার পর যে আকাশ প্রখর রৌদ্রের সাদায় ঝলসে ওঠে।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে যখন সেই রৌদ্রের প্রখরতা ঝলসে উঠেছে, তখন সরে এলেন।

এলেন আর ঝনঝনিয়ে উঠল টেলিফোন।

এত ভোরে কে?

এত ভোরে কার দরকার?

'নমস্কার, কে?'

ওপক্ষ প্রাণপণে চেঁচিয়ে বক্তব্য পেশ করছে। 'আমি! আমি সতীশ মিত্তির, 'মধু কাকলী'র সম্পাদক.....আমার লেখাটার কি হল?....হয়নি? বলেন কি? মারা যাবো যে? কি বলছেন? বাইরে যেতে হয়েছিল? আঃ এই সব বাইরে

টাইরে গিয়ে সময় নষ্ট করেন-কেন?......আপনাদের কি এখনো প্যাবলিসিটির দরকার আছে মশাই? ওসব উদীয়মানেরা করুকগে। আপনাদের এখন কেবল সাহিত্য-সাধনা।.....যাক লেখাটা কবে আনতে যাচ্ছি?....কী সর্বনাশ ধরেননিইনি? সে কি!'

ভদ্রলোক বোধ হয় বসে পড়েছেন।

সংবরণ হাসলেন।

সংবরণকে এখন আর মনে রাখলে চলবে না পরপর দুদিন সারারাত জেগেছেন তিনি। মনে রাখলে চলবে না হঠাৎ স্থান কাল পাত্রয় গুলিয়ে যাচ্ছিল তাঁর।......সারারাত ভয়ানক একটা যন্ত্রণাবোধ করছিলেন।

এখন সংবরণকে হাসতে হবে।

হাসলেন।

তারপর বললেন, ভাবছি একটা নতুন ধরণের প্লট নেব—।

'নিন না নিন না!'

সারা ঘরে সতীশ মিত্তিরের কণ্ঠস্বর গম্‌গম্‌ করে ছড়িয়ে পড়ছে।......ভদ্রলোক বোধহয় ভুলে গেছেন যে এটা ভোরবেলা।

এটা দিনের পবিত্রতম অংশ।

'না না, মনেই তো রেখেছেন। মনে আছে বলেই তো বলছেন, আপনার তো সব সময়ই নতুন প্লট।......প্লটের রাজা আপনি।....সবাইতো তাই বলে—সেই জন্যেই তো এই ভোর বেলায়, শান্তি ভঙ্গ করছি। কখন কোথায় থাকবেন। পাবো কি না পাবো, এ জানি, এই হচ্ছে মোক্ষম সময়। চেপে ধরবার উৎকৃষ্ট অবসর।....তা হলে কবে নিতে যাচ্ছি? কি বললেন প্লটটা আমার পছন্দ হবে কি না?....কী বলছেন মশাই? আপনার প্লট—কি?....কি বলছেন?.....সমাজ বিরোধী?....তেরো বছরের নায়ক, আর তিরিশ বছরের নায়িকা?'

সতীশ মিত্তিরের উৎসাহী কণ্ঠস্বর একটু স্তিমিত শোনালো.....আপনার কলমের মুখে পড়লে সবই উৎরে যাবে। তার জন্যে ভাবছিনা। তবে কিনা বলছি ওটা না হয় পরে ধীরে সুস্থে লিখবেন। জটিল জিনিস! আপাততঃ আমায় যা হোক একটা দিয়ে ফেলুন।.... আচ্ছা সামনের সপ্তাহে আসছি।.....মনে কিছু করবেন না, তবে কি জানেন আমাদের দেশের পাঠকরা মুখে যতই আধুনিকতার জয়গান করুক, যতই প্রগতির বড়াই করুক, চিন্তায় বিপ্লব সহ্য করতে পারে না। সেই গতানুগতিকটি না হলে—আপনি ওর বিপরীতটা দিন, এক প্রৌঢ়

অধ্যাপক, আর তরুণী ছাত্রী, লুফে নেবে পাঠক পাঠিকা।.....বেশী করে পাঠিকারা। দেখছি তো! আমাদের এই পত্র পিত্রকাগুলিই হচ্ছে মশাই সমাজের দর্পণ। ওদের দিকে ভাল করে দৃষ্টিপাত করলেই বুঝতে পারবেন কোথায় আছে সমাজ।.......তা আপনারা তো আবার শুনেছি একে অপরের লেখা পড়েন না।.....হাঃ হাঃ হাঃ।.

আচ্ছা রাখছি।

রাখলেন।

সংবরণ বাঁচলেন।

সক্কালবেলা এই বাচালতা কী অসহ্য! তবে ওঁর ওই অতি ভাষণের মধ্যে থেকে একটা তথ্য আবিষ্কার করতে পেরেছেন সংবরণ, আমাদের দেশের পাঠকরা গতানুগতিকতাই চায়। 'চিন্তায় বিপ্লব তাদের অসহ্য।'

সাগর তোমার গল্প তবে এখনো রইল।

শুক্তি, তোমার সেই খাতা।

যা শুধু তোমাকে ভেবে ভেবে তৈরি করে তুলেছিলেন সংবরণ, আর আজও পারনে নি যাকে সম্পূর্ণতা দিতে।......

কেন পারেননি বলতো? সে কি ওই গতানুগতিকের ভক্তদের অবহেলার আশঙ্কায়? না গতানুগতিক সমাজের মুখ চেয়ে?.....না কি কেবল মাত্র পেরে ওঠেন নি বলেই। তাই, তাছাড়া আর কিছু নয়। বারে বারে যে মনে হয়েছে এ ভাষা কি শুক্তির? না ও এযুগের লেখক সংবরণ চৌধুরীর নায়িকার?

ওই সন্দেহটা-ই সেই এলোমেলো কাগজগুলোকে কিছুতেই গুছিয়ে তুলতে দেয় নি!

এখনো থাক অগোছালো।

শুধু আজ যখন লিখতে বসবেন সংবরণ, হয়তো লিখবেন 'শুক্তি, তোমার মত চোখ ও কোথায় পেল বল তো? ওই সুপারিন্টেণ্ডেন্টের স্ত্রী!....তোমার তো কোনো মেয়ে ছিল না?.....ও কি তোমার ভাইঝি?.....যে ভাইয়ের বাড়িতে তুমি—'

কিম্বা কিছুই নয়।

ওটা মাত্র বিধাতার খেয়াল।

কোনো একটা সুন্দর জিনিস তৈরি করে আবার তেমনি একটা হয়তো করতে ইচ্ছে করে।....

বিধাতার এই কৌতুক ইচ্ছার জন্যেই আমরা মাঝে মাঝে অবাক হই বিচলিত হই, হঠাৎ নিজের ওপর প্রভুত্বের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলি।

না গল্প লিখতে বসে ওই কথাগুলো লেখেননি সংবরণ।

দ্বিতীয় বিধাতার ভূমিকা নিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন অন্য নতুন চোখ, নতুন মুখ, নতুন ভাষাভঙ্গী।.....

সংবরণের গড়া নায়িকারা বিধাতার গড়া নায়িকার মত আবেগ প্রবণ নয়। তারা জোরালো, তারা শক্ত হাতে নিজের জীবনের হাল নিজে ধরে।.....

ওদের নিয়েই সংবরণের কলম!

বিধাতার গড়া ওই প্লটটায় আর হাত লাগাবার দরকার নেই।.... ও থাক হিজিবিজি কাগজের মধ্যে.....বিবর্ণ হয়ে আসা একখানা ফটোর মধ্যে, আর অনেকগুলো ডাকের ছাপমারা একখানা চিঠির মধ্যে।

আবার যদি কোনো দিন ঘুমের শান্তি ভেঙে স্মৃতির সাগর এসে উথলে পড়তে চায়, যদি প্রৌঢ় সংবরণ চৌধুরী সহসা একটা নির্বোধ কিশোরের মৌন বেদনার মূর্তি স্মরণ করে উদ্বেল হয়ে ওঠেন, তখন আবার হয়তো খুলে বার করবেন সেগুলো।.....

পড়বেন সেই চিঠিটা।

যে চিঠিটা শুক্তি লিখে রেখে গিয়েছিল, যে চিঠিটার বন্ধ খামের ওপর শুক্তি লিখে রেখেছিল, 'বিশ্বাস করে রেখে গেলাম, যদি ইচ্ছে হয় পোষ্ট করে দিও।'

কাকে সম্বোধন করেছিল।

কাউকেই নয়।

কে জানে হয়তো পৃথিবীর যে কাউকেই, হয়তো পৃথিবীর উপর সেই বিশ্বাসটুকু তখনো ছিল শুক্তির! ভেবেছিল মৃতার অনুরোধ রাখবে!

তা রেখেছিল। অনুরোধ রেখেছিল।

সংবরণ জানেন না কে সে!

আর কেন অতদিন পরে তার টনক নড়েছিল।

শুক্তি বিষ খাওয়ার তারিখের অনেক অনেক দিন পরের একটা তারিখ ছিল পোষ্টের ছাপে।....অনেক ঠিকানা ঘুরে সাগরের হাতে পৌঁছেছিল।....সাগর তুলে রেখে দিয়েছে সংবরণ চৌধুরীর নিভৃত সংগ্রহের ঘরে।

চিঠিটা কি সংবরণও বারম্বার পড়েছেন?

পড়ে পড়ে মুখস্থ করে ফেলেছেন?

না, বারবার নয়, হয়তো একবার, হয়তো দু'বার, তবু মুখস্থ হয়ে গেছে। অক্ষরগুলো কি তাতানো সীসের অক্ষর ছিল? তাই মনের মধ্যে কেটে বসে আছে?

আর ভাষা?

সে কি কোনো নায়িকার ভাষা?

নাঃ।

একেবারে সাধারণ।

একেবারে গেরস্থালী।

... ...

'সাগর সাগর, তুই কেন সত্যি সাগর হয়ে দেখা দিলি না? তা হলে সবটা এমন জটপাকানো হতো না। সত্যি সাগরের বুকের মধ্যে কত ঝিনুক কত শুক্তির আশ্রয়।....

তা হলিনা তুই। মিথ্যে একটা নামের লোভ দেখালি।....সেই তো দুঃখু, সেই তো জ্বালা!

দেখ শেষ পর্যন্ত মরাই ঠিক করে ফেললাম।....মনে করিস না ডাক্তারের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে মরছি আমি। মরা অত সস্তা নয়।.....ওকে আমি অতটা দাম দিতে যাব কেন রে?....না, ওর জ্বালায় আমি মরছি না।

মরছি কেন জানিস?

বেঁচে থাকলে কোনো দিনও তোর চাইতে ছোট হতে পাব না বলে।.....তুই বড় হবি, সাহসী হবি, হয়তো নামের মান মর্যাদা বজায় রাখতে সত্যি অগাধ সমুদ্র হয়ে উঠবি। কিন্তু কী বিপদ বল দেখি, সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও বুড়ো হয়ে চলতে হবে।

ইস্!

ভাবতে পারিস?

তার চাইতে এ বেশ কেমন মজা করলাম? যেখান পর্যন্ত এসেছি সেখানেই থেমে রইলাম।.... ....

তুই চলতে চলতে এসে আমাকে 'খুড়ি' ছুঁবি, একবার থমকে দাঁড়াবি, ভাববি 'তাইতো'। ....

তারপর আরো এগোতে থাকবি, আমাকে ছাড়িয়ে অনেক অনেক দূরে এগিয়ে যাবি।.....অ-নেক বড় হয়ে যাবি। তখন তো—তোর আমাকে

'ছেলেমানুষ' বলে একটু মায়া হবে? তখন তো কোনো দিনও আমার কথা ভাববি? তখন তো আমার ছবিটার দিকে কোনো দিন চোখ পড়লে, একটা নিঃশ্বাস পড়বে তোর?......

ভাববি, 'আহা বেচারা!'

তখন তো সবটাই 'ঠাট্টা' বলে উড়িয়ে দিয়েছিলি ভেবে মনটা একটু খারাপ খারাপ উদাস উদাস হয়ে যাবে তোর?......

যাবে না?

নিশ্চয় যাবে।

হ্যাঁ বাপু, আমার কথা ভেবে তোর মনটা মাঝে মাঝে উদাস হয়ে যাবে, এ আমি চাই। এত কষ্ট করে বিষ টিস জোগাড় করে মরলাম আমি তোর জন্যে, আর তুই আমার জন্যে এটুকু করবিনা?

মাঝে মাঝে আমার ছবিটার দিকে তাকিয়ে বিভোর হয়ে বসে থাকবি তুই, বুঝলি? ছেলেমানুষ বলে মায়া করবি।.....তাই চলতে চলতে থেমে পড়লাম। একদিন তোর চাইতে ছোট হয়ে যাবো এই আশায় ছবি হয়ে তাকিয়ে রইলাম।.....

খুব মজা হল, না?

বিধাতা পুরুষকে কেমন একখানা ফাঁকি দিলাম!.....তবে কিন্তু বলে রাখছি—সাগর, যদি বিয়ে করিস (আহা বিয়ে করবিনা তা' বলছি না, যদি দিয়ে বলছি) খবরদার কোনো এক সময় প্রেমে গদগদ হয়ে তোর সেই আহ্লাদী বৌয়ের কাছে আমার গল্পটি করবিনা। খবরদার না।.....মনে থাকবে তো?

এই পৃথিবী, এই আলো বাতাস, আমার আদুরে মাণিক তুই, আমার ওই মিলিটারী বর, এমন কি আমার ওই আগুন-মুখী ননদ, সবাইয়ের জন্যেই মন কেমন করছে আমার, সবাইকেই ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে, তবু এই সিদ্ধান্তই নিলাম।.....

মজা বলিস মজা।

সাজা বলিস সাজা।

... ...

না, নাম সই করেনি শুক্তি।

'ইতি' লেখেনি।

'ইতি' লিখে শেষের সুর বাজায়নি। যেন আরো অনেক কথা বলবে, আরো

অনেক কথা লিখবে, রইল সম্ভাবনা হয়ে। সেই অফুরন্ত কথার ফুলে সাগরের ইচ্ছে হয় মালা গাঁথুক, সেই অফুরন্ত কথার ফুলঝুরি সাগরের ইচ্ছে হয়তো জ্বালাক।

... ...

চিঠিটা পড়ে হয়তো ছবিটা বার করবেন সংবরণ। সাগরের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া সংবরণ।

কিন্তু ছবি কোথা?

সে তো কালের হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে বসেছে।

শুধু ধূসর বিষণ্ণ একটু ছায়া! তবু তার মাঝখান থেকেই বুঝি উঁকি দেবে অপরূপ একজোড়া চোখের আভাস, অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় একটি ঠোঁটের সৌকুমার্য।....

যা দেখলে মমতায় বুক ভরে ওঠে। যা দেখলে হঠাৎ অবাক হয়ে গিয়ে মনে হয়—আশ্চর্য! আমি একে অত বড় ভাবতাম কেন?

—০—